৫২ বর্ষ।

বামাবোধিনী পত্রিকা

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি. এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

বৈশাখ, ১৩২২। মে, ১৯১৫।

সূচী।

১ম কল্প
৪র্থ ভাগ

"বামাবোধিনী"র নিয়মাবলী।

১। বামাবোধিনীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৵০, অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১।৵০, পশ্চাদ্দেয় বার্ষিক মূল্য ৩৲; প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য চারি আনা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র লাগে না। মূল্য অগ্রিম না পাঠাইলে "বামাবোধিনী" পাঠান হইবে না। নমুনা দেখিতে চাহিলে ।০ আনা মূল্য বা ঐ মূল্যের টিকিট পাঠাইতে হইবে।

২। বামাবোধিনী কার্য্যালয়ে কিম্বা সরকারদিগের নিকট "বামাবোধিনী"র মূল্য দিলে গ্রাহকগণ ছাপা রসিদ পাইবেন।

৩। কেহ যদি উপযুক্ত সময়ে "বামাবোধিনী" না পান, তবে ইংরাজী মাসের শেষ তারিখের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন।

৪। কাহার কোন বিষয় জ্ঞাতব্য থাকিলে তিনি যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক রিপ্লাই পোষ্টকার্ডে পত্র লিখেন। নতুবা উত্তর না পাইবার সম্ভাবনা।

৫। গ্রাহকগণের মধ্যে কেহ স্থানান্তরিত হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইবেন, নতুবা পত্রিকা না পাইলে আমরা তাহার জন্য দায়ী হইব না।

৬। মফঃস্বল হইতে মণি অর্ডার, রেজেষ্টারি চিঠি বা অন্য উপায়ে যাঁহারা বামাবোধিনীর মূল্যাদি পাঠাইবেন, তাঁহারা অন্য নামে না পাঠাইয়া কার্য্যাধ্যক্ষের নামে, ৩৯ নং আণ্টনি বাগান লেন, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

৭। আমরা নিয়মমত বামাবোধিনীতে মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া থাকি। যদি কাহারও নাম প্রকাশিত না হয়, অবিলম্বে আমাদিগকে জানাইবেন।

৮। বামাবোধিনীর জন্য প্রবন্ধ ও বামারচনা প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে উপরি-উক্ত ঠিকানায় পাঠাইবেন। পরিচিতা ভিন্ন অপর স্ত্রীলোকের লেখার বিশ্বাসযোগ্য সার্টিফিকেট চাই। কোন প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে ফেরত দেওয়া হয় না।

৯। কোনও মাসে কোনও বিজ্ঞাপন পরিবর্ত্তিত করিতে হইলে ঐ পরিবর্ত্তিত বিজ্ঞাপনটী পূর্ব্ববর্ত্তী মাসে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

নিবেদক—শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত, কার্য্যাধ্যক্ষ।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 621. May, 1915.

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫২ বর্ষ। ৬২১ সংখ্যা। { বৈশাখ, ১৩২২। মে, ১৯১৫। } ১০ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

	*বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
আঃ	বু	শ	বু	শ	বু	শ
শেঃ	৩১	৩২	৩১	৩২	৩১	৩০
	শু	ম	শু	ম	শু	র
†	A	M	J	Jy.	Au.	S
‡	14	15	16	17	18	18
আঃ	বৃ	শ	ম	বৃ	র	বু
শেঃ	30	31	30	31	31	30
	শু	সো	বু	শ	ম	বৃ

বু	শ	বু	শ	বু	শ
বৃ	র	বৃ	র	বৃ	র
শু	সো	শু	সো	শু	সো
শ	ম	শ	ম	শ	ম
র	বু	র	বু	র	বু
সো	বৃ	সো	বৃ	সো	বৃ
ম	শু	ম	শু	ম	শু

	বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
শুঃ এঃ,	১২	১১	৮	৭	৪	২
পূঃ,	১৬	১৪	১২	১০	৭	৬
কৃঃ এঃ,	২৬	২৫	২৩	২১	১৯	১৭
অঃ,	১,৩১	২৯	২৭	২৫	২৩	২১

আঃ—আরম্ভ। শেঃ—শেষ।

শুঃ এঃ—শুক্ল একাদশী, পূঃ পূর্ণিমা। কৃঃ এঃ-কৃষ্ণ একাদশী, অঃ-অমাবস্যা।

*** ১২ই বৈশাখ রবিবার ও ১১ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার, শুক্ল একাদশী।

১৬ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার ও ১৪ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার পূর্ণিমা।

২৬শে বৈশাখ রবিবার ও ২৫শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার কৃষ্ণ একাদশী।

১লা বৈশাখ বুধবার, ৩১শে বৈশাখ শুক্রবার এবং ২৯শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার অমাবস্যা ইত্যাদি।

সংক্ষিপ্ত নূতন পাঞ্জিকা।

বঙ্গাব্দ ১৩২২ সাল।

ফসলী ১৩২২—২৩।

হিজরী ১৩৩২—৩৩।

খ্রীষ্টাব্দ ১৯১৫—১৬।

শকাব্দ ১৮৩৭।

সংবৎ ১৯৭২—৭৩।

মগী ১১৭৭-৭৮।

ব্রাহ্ম সংবৎ ৮৬—৮৭।

§				
১	৮	১৫	২২	২৯
২	৯	১৬	২৩	৩০
৩	১০	১৭	২৪	৩১
৪	১১	১৮	২৫	৩২
৫	১২	১৯	২৬	
৬	১৩	২০	২৭	
৭	১৪	২১	২৮	

* বৈ-বৈশাখ বুধবার আরম্ভ ও ৩১শে শুক্রবার শেষ।

১লা বৈশাখ ইং ১৪ই এপ্রেল।

† A-এপ্রেল, আরম্ভ বৃহস্পতিবার ও শেষ ৩০শে শুক্রবার।

‡ ১৪ই এপ্রেল ১লা বৈশাখ, ১৫ই মে ১লা জ্যৈষ্ঠ ইত্যাদি।

§ ১লা বৈশাখ বুধবার, ২রা বৃহস্পতিবার, ইত্যাদি। ১লা জ্যৈষ্ঠ শনিবার, ২রা রবিবার ইত্যাদি।

বৈশাখ বুধবার } ১, ৮, ১৫,
জ্যৈষ্ঠ শনিবার } ২২, ২৯।

এক এক দিকে ৬টী করিয়া দুই দিকে ১২ মাসের গণনা।

	কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
আঃ	সো	বু	শু	শ	র	ম
শেঃ	৩০	৩০	২৯	২৯	৩০	৩১
	ম	বৃ	শু	শ	সো	বৃ
	O	N	D	J	F	M
	18	17	17	15	13	14
আঃ	শু	সো	বু	শ	ম	বু
শেঃ	31	30	31	31	29	31
	র	ম	শু	সো	ম	শু

সো	বু	শু	শ	র	[illegible]
ম	বৃ	শ	র	সো	[illegible]
বু	শু	র	সো	ম	বৃ
বৃ	শ	সো	ম	বু	শু
শু	র	ম	বু	বৃ	[illegible]
শ	সো	বু	[illegible]	শু	র
র	ম	বৃ	শু	শ	সো

	কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
শুঃ এঃ,	২	১	১	১	২	২
পূঃ,	৫	৫	৫	৬	৭	৬
কৃঃ এঃ,	১৭	১৭	১৬	১৭	১৭	১৬
অঃ,	২১	২০	২০	২০	২১	২০

*** ২রা কার্ত্তিক মঙ্গলবার ও ১লা অগ্রহায়ণ বুধবার শুক্ল একাদশী। ৫ই কার্ত্তিক শুক্রবার ও ৫ই অগ্রহায়ণ রবিবার পূর্ণিমা।

১৭ই কার্ত্তিক বুধবার, কৃষ্ণ-একাদশী। ২১শে কার্ত্তিক রবিবার অমাবস্যা ইত্যাদি।

এইরূপ মধ্যম স্তম্ভের তারিখের সহিত বাম বা দক্ষিণ স্তম্ভের মাস, বার মিলাইয়া ধরিলে মাস, বার ও তিথি ঠিক হইবে।

নব বর্ষ।

শ্যামল সুন্দর সাজে বরষ নূতন!
ধরণীকে পরায়েছ নবীন বসন।
শুষ্ক তরুরাজি অই তোমার পরশে,
কিশলয়ে দেহ ঢাকি কি শোভা বিকাশে।
ভাই বোন এস সবে চল হাত ধরি,
শোক-তাপ যাতনার অশ্রু পরিহরি,
নূতন আহ্বান-গীতি কানে অই পশে,
নবীন-বরষ-রবি কি শোভে আকাশে।
গভীর কৃতজ্ঞভরে অবনত শিরে,
তাঁহারি আশীষ মাগি চল এ সংসারে।
পশ্চাতে ফিরিলে শুধু শ্মশান-অনল
যাহা হেরি ভগ্ন-প্রাণ হ'বে হীনবল।
নব ভাবে নব বর্ষে ডাক সমাদরে,
সুনব ভাবেতে সাজ উৎসাহের ভরে।
ভাঙা বীণা হাতে লও, বাজুক সুতান
হয়ত পাইতে পার নূতন জীবন।
শ্যামল-প্রকৃতি-মুখ নিখুঁত সুন্দর
হেরিয়া জাগুক প্রাণে আশা স্তরে স্তর।
(প্রভো!) অই কিশলয় মত নবীন ভূষণে
ভূষিত করহ আজি আশাহীন প্রাণে।
অসীম দুঃখের মাঝে শির নোঙাইয়া
তোমারি পথেতে যেন যাই হে চলিয়া।
এনেছ অভাগী তরে, বরষ নূতন!
কেবলি কি কুহেলিকা আঁধার ভীষণ।
যাও দূরে সরে যাও চাহিনা পরশ,
তোমার মূরতি হেরি পরাণ অবশ।
ধরণী আলোক-স্নাতা শ্যামল-বসনা,
আমা তরে শুধুই কি অসীম যাতনা?
এতকাল ছড়ায়েছ কত সজীবতা
তোমার পরশে দূরে যেত সব ব্যথা।
ভগ্নতরী সুবাতাসে দিতাম ছাড়িয়া
(হায়!) এখনও বিশ্বাসহীন এ বিচূর্ণ হিয়া।
তোমার মূরতি হেরি প্রাণ যে বিকল
ধরণী আঁধারে ঢাকা অশ্রুই সম্বল।
বড়ই অধীর প্রাণ খুলিনা দুয়ার,
চিররুদ্ধ এ মরণ-তমসা-আগার।
নবীন-বরষ-রবি ঢালে যেন মসী,
শুধুই তমসাময় হেরি দশ দিশি।
যে শুভ্র আলোক হাসি নয়নে হেরিয়া
আমার দেউটী প্রাণে উঠিত জ্বলিয়া,
সংসারের তাড়নাতে না পেতাম ভয়,
বিশ্বাসের সেই আলো আজি কোথা হায়!
গেছে নিভে চিরতরে আলোক আমার,
নব বর্ষ! এ জীবন চির অন্ধকার।
অতীত ভাবিয়া হয় পরাণ পাগল,
বিশুষ্ক নয়নে নাহি ঝরে অশ্রুজল।
কঠোর নিয়তি মোরে নিয়ে কোথা যাবে,
কত দিন এ আঁধারে ঘুরিতে বা হবে?
কে বলিয়া দিবে বর্ষ! বিধির বিধান,
একাকী গণিতে হবে চক্র-আবর্ত্তন।

নব নব প্রকার নব বর্ষের অভ্যর্থনা।

আমাদের বঙ্গদেশের ন্যায় প্রায় সকল দেশেই নববর্ষের অভ্যর্থনা উপলক্ষে উৎসবের প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির মধ্যে এই উৎসব-প্রথা বিভিন্ন প্রকার দৃষ্ট হয়। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানের অধিবাসিগণ সূর্য্য ঠিক যে সময়ে মেষ রাশিতে প্রবেশ করে, তাহা লক্ষ্য করিয়া সেই অনুসারে বস্ত্র পরিধান করিত। গভীর রাত্রিতে হইলে কৃষ্ণবর্ণ, মধ্যাহ্নে হইলে উজ্জ্বল রক্তবর্ণ, ইহাদের মধ্যবর্ত্তী অন্য সময়ে হইলে তাহার উপযুক্ত রঙের বস্ত্র ব্যবহার করিত। রাজা হইতে সামান্য কৃষক পর্য্যন্ত 'নোয়ারোজের' বস্ত্র পরিধান করিত। রাজা সিংহাসনে উপবেশন করিয়া অমাত্য ও প্রজাদিগের নিকট হইতে নজর গ্রহণ করিতেন। "মাবারখ নোয়ারোজ" নব বর্ষের জয় হউক এই বলিয়া সকলে পরস্পরকে সম্ভাষণ করিত। রাজা প্রথম ইহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেন। সমস্ত দিন আমোদে অতিবাহিত হইত। রাজপ্রাসাদে সর্ব্ব-সাধারণের জন্য মেলা হইত এবং পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ ও তত্ত্ব তল্লাস হইত। স্ত্রীলোকেরা বহু পূর্ব্ব হইতে শিল্প-কার্য্যাদি প্রস্তুত করিয়া বন্ধুগণকে উপঢৌকন প্রদান করিতেন।

প্রাচীন রোমকেরা নববর্ষের প্রথম দিনে পরস্পরের সহিত দেখা সাক্ষাৎ ও দ্রব্যাদির আদান প্রদান করিত। প্রজারা ভূস্বামীদিগকে সোণার পাতে মুড়িয়া খর্জ্জুর ও অন্যান্য ফল ভেট দিত এবং দেবমূর্ত্তি ক্রয় ও তাহার পূজার নিমিত্ত টাকা ব্যয় করিত। ইউরোপের উত্তরাংশের লোকেরা থর ও ওডিন দেবতার পূজা করিত। তাহারা কাষ্ঠ জ্বালাইয়া, বলি দিয়া, দেবতার স্তব গান করিয়া, নূতন বৎসরের প্রারম্ভে মহা আনন্দ লাভ করিয়া পরস্পরে পরস্পরের শুভকামনা করিত। ড্রুইড নামে ইংলণ্ডের প্রাচীন ধর্ম্মযাজকেরা অরণ্যের বৃহৎ এক বৃক্ষে আরোহণ করিয়া রৌপ্য-ছুরিকা দ্বারা তাহা হইতে পবিত্র লতা বিশেষ ছেদন করিত এবং তাহাই সকলে নববর্ষের উৎসব বলিয়া বিবেচনা করিত। রোমক, সাক্সন ও দিনামারেরা যখন ইংলণ্ডে রাজত্ব করে, তখন তাহারা ইংলণ্ডে নববর্ষের আনন্দ প্রকাশ করিত। নর্ম্মান রাজারাও ইহার অন্যথা করেন নাই। ইংলণ্ডেশ্বর তৃতীয় হেনরী নববর্ষের তোলা তুলিতেন। অষ্টম হেনরী, ষষ্ঠ এডওয়ার্ড ও রাজ্ঞী এলিজাবেথের সময়েও নববর্ষ উপলক্ষে রাজকীয় দানের রীতি ছিল এবং রাজকীয় কর্ম্মচারীরাও যথেষ্ট অর্থ-সংগ্রহ করিতেন।

ইংলণ্ড ও আইসলণ্ডে নববর্ষের দিনে নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, ভজনালয়ে উচ্চ ঘণ্টাধ্বনি হইয়া থাকে। স্কটলণ্ডে

নববর্ষের উৎসব ইংরাজদিগের বড় দিনকেও পরাস্ত করে।

চীনদেশে নববর্ষের দিনে ধূমধামের সীমা থাকে না। নূতন বৎসর না পড়িতে পড়িতেই পুরাতন বৎসরের সমুদায় দেনা পাওনা পরিষ্কার করিতে হইবে, এইরূপ নিয়ম। বৎসরের শেষ মাসের মধ্যে ব্যবসায়ী লোকে দেনা পাওনা পরিষ্কার না করিলে ঘোরতর রাজদণ্ড প্রাপ্ত হয়। গত বৎসরের সমুদায় ভাবনা চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া লোকে মহা আনন্দে উৎসব করে এবং বহুল পরিমাণে অগ্নিক্রীড়া প্রদর্শন করে। আমাদের দেশের ব্যবসায়ীদিগের ন্যায় চীনদেশের বণিকেরা দোকান সকল পুষ্পদ্বারা সজ্জিত ও আলোক-মালায় মণ্ডিত করে এবং বন্ধু-বান্ধবগণকে আহারার্থ নিমন্ত্রণ করিয়া থাকে।

ফ্রান্স দেশে নব বর্ষের উৎসব সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান উৎসব। দোকান সকলে ঘোর রোলে কোলাহল উত্থিত হয়। প্রত্যেক ব্যক্তিই নববর্ষের দান প্রদানও গ্রহণ করে। জার্ম্মিনিতে এই দিনে ঘণ্টা-ধ্বনি, তোপ-ধ্বনি, নৃত্য-গীত সমস্ত দিন ও সমস্ত রাত্রি চলিয়া থাকে। লাপ্‌ল্যাণ্ড, সুইডেন এবং ডেন্মার্কে নববর্ষের সময় অত্যন্ত শীত, তথাপি তাহারা গৃহমধ্যে মহোৎসব করিয়া থাকে। সুইজার্ল্যাণ্ডে শিঙ্গা বাজে এবং কৃষকেরা পর্ব্বতোপরি একত্র হইয়া আনন্দধ্বনি করে। আমেরিকার লোকেরা দলবদ্ধ হইয়া বাটী বাটী ভ্রমণ করে, গৃহস্বামিনীদিগকে সম্বর্দ্ধনা করে ও পরস্পরের স্বাস্থ্য ও সৌভাগ্য প্রার্থনা করিয়া সুরাপান করে।

নববর্ষের অভ্যর্থনা উপলক্ষে মনুষ্যজাতি সর্ব্বত্র এইরূপ আনন্দ ও উৎসাহজনক উৎসব করিয়া থাকে। ইহাতে তাহাদিগের জীবন গত বর্ষের ক্লান্তি, অবসাদ ও দুঃখ বিস্মৃত হইয়া নব উদ্যম ও বল সহকারে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হইতে পারে।

বড়-বৌ।

১

"মা। এই ওষুধ টুকু খাও!"

"আর আমায় ওষুধ দিওনা মা।"

"কবিরাজ মশাই বলে গেছেন, ঠিক নিয়ম-মত ওষুধ দিতে। তা না হ'লে আমাকে বক্‌বেন।"

"আর ওষুধে কি হবে মা! যাকে কালে ধরেছে, তার পক্ষে ওষুধের চেয়ে পরকালের ভাবনায় বেশী কাজ হবে।"

"মা! অমন নিষ্ঠুর কথা বলো না। তা হ'লে আমি যাবো কোথায়?"

"আমার নরেন বেঁচে থাক, তোমার

দেওরেরা ভাল থাক, তোমার সিঁথের সিঁদুর অক্ষয় হোক। ও কথা বলতে আছে পাগলি ?”

“আর বলবো না মা। আমার কথা শোন। কবিরাজ-কাকা বলে গেছেন, এই ওষুধটা না খেলে আবার তোমার জ্বর বাড়বে।”

ঔষধের খলে বড়ী মাড়িয়া, সেই খল-খানি হাতে লইয়া রোগিণীর শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া, বধূ তাহার শ্বশ্রূকে উল্লিখিত ভাবে ঔষধ খাইতে অনুরোধ করিতে-ছিল। বধূর নাম—স্বর্ণকুমারী।

কুন্দগ্রাম একটি ক্ষুদ্র গণ্ডগ্রাম। চারি দিকে মাঠ, জলা ও ধান-ক্ষেত। মধ্যে মধ্যে বাগান ও বসত পল্লী। গ্রামের মধ্যে কয়েকটী বড় বড় দীর্ঘিকা। গ্রামের জমীদার মিত্র বাবুরা এই দীর্ঘিকাগুলি খনন করাইয়া দিয়াছিলেন। মিত্র বাবুরা কায়স্থ। তবে অবস্থা আগে যেমন ছিল এখন আর তেমন নাই। চিরদিন কাহারও সমান যায় না, তাঁহাদেরও সেইরূপ ঘটিয়াছিল।

এই গ্রামটী কয়েকটী পল্লী বা পাড়ায় বিভক্ত। গ্রামে ব্রাহ্মণের বাসই কিছু বেশী। সর্ব্বসমেত পাঁচ সাত শত ঘর লোক এই গ্রামে বাস করে। ব্রাহ্মণেরা যে পল্লীতে বাস করিতেন, তাহা ব্রাহ্মণ-পাড়া বলিয়া পরিচিত। এইরূপ কায়েত-পাড়া, বৈদ্যপাড়া প্রভৃতি কয়েকটী পল্লী-বিভাগ ছিল।

এই কুন্দ গ্রামের একটী ব্রাহ্মণ-পল্লীতে রামনাথ সার্ব্বভৌম মহাশয়ের বাসভবন। বাসভবন বলিলাম বলিয়া, পাঠক-পাঠিকা যেন মনে না ভাবেন, তাহা একটী দ্বিতল বা ত্রিতল বাটী। সার্ব্বভৌম মহাশয়ের এই বাসভবন, একতালা পাকা বাড়ী। সেই বাড়ীর চারি দিক উচ্চ প্রাচীর দিয়া ঘেরা। মধ্যে একটী প্রশস্ত উঠান। উঠানের পূর্ব্ব প্রান্তে চারিটি সারি সারি দোহারা কামরা।

সার্ব্বভৌম মহাশয় কেবল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন না। তিনি ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত। দশ বৎসর হইল, তিনি পর-লোক গমন করিয়াছেন, কিন্তু এখনও লোকে তাঁহার তেজোদৃপ্ত মুখমণ্ডল, ত্রিপুণ্ড্রক-ভূষিত প্রশস্ত ললাট-দেশ, ব্রহ্মণ্যতেজঃপূরিত সমুজ্জ্বল কান্তি ভুলিতে পারে নাই। তিনি স্বাধীনচেতা, স্পষ্ট-বাদী ও সুপণ্ডিত লোক ছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মত লোভী ছিলেন না। গ্রামের লোকে কোন বিপদে পড়িলে তাঁহার নিকট পরামর্শ লইতে আসিত। তিনিও বিবেচনা করিয়া এরূপ ভাবে পরামর্শ দিতেন যে, তাহাতে তাহাদের কাজ উদ্ধার হইয়া যাইত।

সার্ব্বভৌম মহাশয়, অশূদ্র-প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণ। গ্রামের অধিকাংশ ব্রাহ্মণই তাঁহার যজমান। মিত্র-বাড়ীতে ক্রিয়া-কর্ম্মাদি উপলক্ষে তাঁহার নিমন্ত্রণ হইত। তিনি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া আসিতেন বটে, কিন্তু কখনও তাহাদের দান গ্রহণ করিতেন না।

তাঁহার তিন পুত্র। জ্যেষ্ঠের নাম নরেন্দ্র। মধ্যম ও কনিষ্ঠের নাম সুরেন্দ্র ও ধরেন্দ্র। সার্ব্বভৌম মহাশয়ের আমলে, সংসারের স্বচ্ছলতা ছিল বলিয়া কোন জিনিসের কখনও অভাব হইত না। যজমান-প্রদত্ত বৃত্তি ও দক্ষিণা প্রভৃতিতে তাঁহার সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া যাইত।

ইহা ছাড়া দুই চারি খানি বাগানবাড়ীও তাঁহার ছিল। বাগানের ফল, পুকুরের মাছ, ক্ষেতের ধান, প্রভৃতি তাঁহার পুণ্য-ফলে এত বেশী জন্মিত যে, তিনি তাহা প্রতিবেশীদের মধ্যে বিতরণ করিয়াও স্বচ্ছল ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন।

এই তিন পুত্র ব্যতীত, মহামায়া বলিয়া তাঁহার এক কন্যা ছিল। এই মহামায়া, নরেন্দ্রের পরবর্ত্তিনী। সার্ব্বভৌম মহাশয়ের মৃত্যুর সময় নরেনের বয়স ছিল কুড়ি বৎসর। মহামায়ার বয়স পনর বৎসর। মহামায়া সৎপাত্রেই অর্পিতা হইয়াছিল। সার্ব্বভৌম মহাশয়, নিজে কন্যাকে সু-শিক্ষা দান করিয়াছিলেন। সে সুশিক্ষা পুস্তকগত নহে, নীতি ও উপদেশমূলক। তিনি কন্যাকে পাখী পড়ানর মত সর্ব্বদা বুঝাইতেন—"মা! পরের ঘরে তুমি যাইবে। বিবাহের পর পিত্রালয়ের সহিত তোমার সম্বন্ধ খুব কম থাকিবে। তুমি আমার উপদেশ মত কাজ করিও, আমার শিক্ষা মত জীবনেকে পরিচালিত করিও। যে সংসারে তুমি যাইবে, তাহা সোনার সংসারে পরিণত করিবে। মনে কেবল দুইটী কথা রাখিবে—ক্ষমা ও ধৈর্য্য, স্ত্রী-লোকের প্রধান গুণ। স্বামিভক্তি ও গুরু-জনের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান-প্রদর্শন তাহাদের জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য। পরিজনমধ্যস্থ কাহারও উপর হিংসাদ্বেষ প্রকাশ করিবে না। স্বধর্ম্মে একান্ত বিশ্বাস রাখিবে।"

মহামায়া পড়িয়াছিলও খুব ভাল ঘরে। আর সার্ব্বভৌম মহাশয়ের শিক্ষা-গুণে মহামায়া যে সংসারে গিয়াছিল, তাহা সত্য সত্যই সোনার সংসার হইয়া উঠিয়াছিল।

জ্যেষ্ঠ নরেন্দ্র সর্ব্ববিষয়ে পিতার অনুগত ছিল। কালধর্ম্মে বাধ্য হইয়া সার্ব্বভৌম মহাশয়, নরেন্দ্রকে গ্রামের এণ্ট্রেন্স স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন। নরেন্দ্র অতি মেধাবী, পাঠে তার খুব আনুরক্তি। এই জন্য সে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া দশ টাকা জলপানী পাইল ও কলিকাতায় এসে পড়িতে গেল।

নরেন্দ্র যেবার এলে পরীক্ষা দিবে, সেই বৎসর পরীক্ষার মুখোমুখী সময়ে কলেরা রোগে সার্ব্বভৌম মহাশয় সহসা দেহত্যাগ করেন। এই পিতৃবিয়োগ-ব্যাপারে নরেন্দ্র বড়ই শক্তিহীন হইয়া পড়িল। নরেন্দ্র পিতৃগত-প্রাণ—সুতরাং তাহার প্রাণে পিতৃশোকটা বড়ই আধিপত্য বিকাশ করিল।

তখন অতবড় একটা বৃহৎ সংসারের ভরণ-পোষণ-ভার তাহার স্কন্ধে। দুইটী নাবালক ভাই--তাহাদিগকে মানুষ

করিতে হইবে, লেখাপড়া শিখাইতে হইবে। সংসারের খরচও ঢের। এ পুণ্যের সংসারে অনেক আশ্রিত লোকে অন্ন পাইত। সার্ব্বভৌম মহাশয়ের দেহান্তের সহিত, কয়েক জন আশ্রিত ব্যক্তি সংসারের অবস্থা দেখিয়া আপনি আপনি সরিয়া গেল।

নরেন্দ্র বিবাহিত। যে বৎসর সে এণ্ট্রান্স পাশ হয়, সেই বৎসর সার্ব্বভৌম মহাশয় তাহার বিবাহ দেন। নরেন্দ্রের পত্নীর নাম স্বর্ণকুমারী।

নামও যা—এই স্বর্ণকুমারী রূপেও সেইরূপ। সে পল্লীমধ্যে স্বর্ণকুমারীর মত রূপবতী বধূ খুব কম ঘরেই ছিল। স্বর্ণকুমারী এক অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে। তাহার মতিগতি পিতৃ-মাতৃ-প্রদত্ত সুশিক্ষায় অনুপ্রাণিত। সার্ব্বভৌম-মহাশয়, এই রূপবতী ও গুণবতী পুত্র-বধূকে সোণার চক্ষে দেখিয়াছিলেন। তিনি বালিকা বধূর কার্য্য-প্রণালী, গুরুজনে ভক্তি ও কর্ত্তব্যানুরাগ দেখিয়া, অনেক সময়ে গৃহিণীকে বলিতেন "আমার এই বড় বৌ হইতে সংসারে লক্ষ্মীশ্রী বৃদ্ধি হইবে। মা আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। কথায় বলে স্ত্রী-ভাগ্যে ধন। নরেন্দ্র বড় বৌমার অদৃষ্টের গুণে ধনশালী হইবে।

সার্ব্বভৌম মহাশয়ের এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছিল। নরেন্দ্র রাতারাতি ধনশালী না হইলেও, সেই সময়ে সংসারে যেন সকল দিক দিয়া উন্নতি হইতে লাগিল। যখন সার্ব্বভৌম মহাশয়ের এই সংসার উন্নতির দিকে সেই সময় তিনি দেহত্যাগ করিলেন। নরেন্দ্রের স্কন্ধে সংসারের ভার পড়িল।

পিতার মৃত্যুর পর নরেন্দ্র স্পষ্টই বুঝিতে পারিল যে, এলে পাশ করার পর হইতে তাহাকে কর্ম্মের চেষ্টা করিতে হইবে। নরেন্দ্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল বটে, কিন্তু পাঠ-সম্বন্ধে তাহার পূর্ব্বের সেই আগ্রহটা কমিয়া গেল।

নরেন্দ্রের ভাগ্যলক্ষ্মী, তখন তাহার প্রতি নিতান্ত অপ্রসন্না নহেন। সুতরাং সামান্য চেষ্টাতেই নরেন্দ্র ম্যাক্লিংটন কোম্পানীর আপিসে ত্রিশ টাকার একটী কর্ম্ম স্বীকার করিল। স্বর্ণকুমারীর ভাগ্য-গুণেই হউক, আর নিজের কৃতিত্বের জন্যই হউক, দুই বৎসরের মধ্যে নরেন্দ্রের ষাট টাকা বেতন হইল। আপিসের অধ্যক্ষ সাহেবেরাও তাহাকে বড় ভাল বাসিতেন। কারণ, নরেন্দ্র আপিসের মধ্যে একজন খুব কাজের লোক।

সার্ব্বভৌম মহাশয়ের মৃত্যুর পর, পাঁচ বৎসর সুখে দুঃখে কাটিয়া গিয়াছে। এ পর্য্যন্ত নরেন্দ্রের কোন পুত্র-সন্তানাদি হয় নাই। এজন্য গৃহিণী-ঠাকুরাণী বড়ই দুঃখিত। কিন্তু নরেন্দ্র, তজ্জন্য আদৌ দুঃখিত নহে। তাহার মা যখন বলিতেন "নরেন! আমার মনের বড় সাধ যে, নাতিকে কোলে করিয়া মনুষ্যজীবনের ও সংসারের

একটা প্রধান সুখ উপভোগ করি। কিন্তু দেখিতেছি বিধাতা আমাদের প্রতি এ বিষয়ে সদয় নহেন।" নরেন্দ্র এই কথায় লজ্জিত হইয়া কখনও বা স্থানান্তরে চলিয়া যাইত, আবার কখনও বা বলিত "দরিদ্রের সংসারে আসিলে সে শিশুত কোন সুখই পাইবে না মা। যে কষ্টে, বাবার মৃত্যুর পর, এই বৃহৎ সংসার চালাইতেছি, তাহার ত সবই তুমি জান।"

বস্তুত: নরেন্দ্রকে অর্থোপার্জ্জনের জন্য খুব বেশী পরিশ্রম করিতে হইত। এখন সে ষাট্ টাকা বেতন পাইতেছে বটে, কিন্তু আগে ত তা ছিল না। ত্রিশটী টাকায় এত বড় একটা সংসার চালানো বড় শক্ত কথা। দুইটী ভাই, বিধবা মাতা, একজন দাসী, তার উপর অতিথি অভ্যাগত, আত্মীয় কুটুম্ব ত প্রায়ই লাগিয়া আছে। ইহার উপর আবার সামাজিক লোকলৌকিকতা ও কুটুম্বিতা। দিন কাল যেমন পড়িয়াছে, সেইরূপ বুঝিয়া মহামায়ার শ্বশুর-বাটীতে পালেপার্ব্বণে তত্ব তালাস করিতে হয়। কনিষ্ঠ দুইটী ভায়ের মধ্যে মধ্যমটী এণ্ট্রাস পাস হইলে, নরেন্দ্র তাহাকে কলিকাতায় আনিয়া রাখিয়াছে। কনিষ্ঠ বরেণ গ্রামের স্কুলে পড়িতেছে। স্কুলের মাহিনা ও কলিকাতার বাসাখরচ বড় কম নয়। কাজেই নরেন্দ্রকে "প্রাইভেট টিউসান" করিতে হইত। এইরূপে দুই তিন জায়গায় ছেলে পড়াইয়া সে মাসে আরও বিশ টাকা উপায় করিত।

বহু কষ্টে, বহু পরিশ্রমে, নরেন্দ্র মাসিক ষাট সত্তর টাকা উপার্জ্জন করিয়া এই সুবৃহৎ সংসার পালন করিয়া আসিতেছে।

সার্ব্বভৌম মহাশয়ের শয্যাশায়িনী পত্নী নরেন্দ্রের জননীর সহিত, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ স্বর্ণকুমারীর যে কথোপকথন হইতেছিল, তাহার আভাস আমরা এই পরিচ্ছেদের প্রথমেই দিয়াছি।

সার্ব্বভৌম-পত্নী, নানাবিধ জটিল রোগে জীর্ণশীর্ণ ও শয্যাশায়িনী! নরেন্দ্র ও সুরেন্দ্র কলিকাতায় থাকে, তাহা বলিয়াছি। নরেন্দ্র মাতার জন্য কলিকাতার কোন নামজাদা কবিরাজের নিকট হইতে ঔষধ আনিয়া দিয়াছে ও নিজ গ্রামের দক্ষ চিকিৎসক ভবনাথ সেন গুপ্তের হস্তে চিকিৎসার ভার দিয়া গিয়াছে। ভবনাথ "শতেকমারী বৈদ্য" নহেন। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে জ্ঞান ও চিকিৎসায় অভিজ্ঞতা তাঁহার যথেষ্ট। সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট তিনি ব্যাকরণাদি শিক্ষা করিয়াছিলেন। তজ্জন্য সার্ব্বভৌম মহাশয়ের জীবদ্দশায়, তাঁহাকে প্রায়ই সুরেন্দ্রদের বাটীতে আসিতে হইত। সার্ব্বভৌম-মহাশয়কে তিনি দাদা বলিতেন, সার্ব্বভৌম পত্নীকে তিনি বধূ-ঠাকুরাণী বলিতেন। নরেন সুরেন ও বধূমাতা তাঁহাকে দেখিয়া কোনরূপ সংকোচও করিত না। কবিরাজ ভবনাথ, পূর্ব্বদিনে ঔষধ-ব্যবস্থা করিবার সময় স্বর্ণকুমারীকে ডাকিয়া বলিয়া দেন—"দেখ বৌমা! তোমাকে গোপনে বলিতেছি, তোমার শাশুড়ী ঠাকুরাণীর রোগটী বড় সহজ নহে। একে

বৃদ্ধ বয়স, তাহাতে এই ঘুসঘুসে জ্বর, তাহার উপর পেটের দোষও একটু আছে। এরূপ স্থলে খুব সাবধানে নিয়মিতরূপে ঔষধাদি খাওয়াইতে হইবে। আর এ ভার, তুমি ভিন্ন আর লইবেই বা কে ?"

কাজেই পুত্রবধূ স্বর্ণকুমারী তাহার শাশুড়ীকে ঔষধ খাওয়াইবার জন্য পূর্ব্বোক্ত ভাবে পীড়াপীড়ি করিতেছিল। পুত্রবধূর একান্ত পীড়াপীড়ি ও চোখে জল দেখিয়া গৃহিণী তাঁহার জেদ্ ত্যাগ করিয়া ঔষধ খাইলেন।

স্বর্ণকুমারী বলিল—"মা কবিরাজ-কাকা বলিয়া গিয়াছেন, আর দুই মোড়া ঔষধ আজ তোমাকে দিতে পারিলেই জ্বর বন্ধ হইয়া যাইবে—পেটের অসুখটাও থাকিবে না।"

গৃহিণী বলিলেন—"বৌমা! ডাক্তার-বদ্দিতে অনেক কথাই বলে থাকে। রোগ আরাম কর্ত্তে পারেন সেই ভগবান্। তা আমার রোগ সারুক আর নাই সারুক, তাতে বড় একটা আসে যায় না। তুমি সুরেনকে চিঠি লিখেছ কি? আজ কি বার? বৃহস্পতিবার না? যদি না লিখে থাক, তা হলে তাকে লিখে দাও, যেন সে মিছে পয়সা খরচ করে, আমার জন্য বেদানা প্রভৃতি না আনে। আমিত খাইনা, ও গুলো পড়ে থাকে। আর তাকে লিখে দিও যেন সে তিন চারি দিনের ছুটী নিয়ে বাড়ীতে আসে। যে উপায়ে হোক্—শনিবারে যেন বাড়ী আসে।"

পুত্রবধূ স্বর্ণকুমারী বলিল—"তুমি যা বলিলে সবই করিব। এখন আমি রান্না ঘরে যাই, উনুন জ্বলে যাচ্ছে।"

(ক্রমশঃ)

বারাণসী-তত্ত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

নবম অধ্যায়।

চৌক-মহল্লা।

পরবর্ত্তী মহল্লার নাম চৌক। ধর্ম্ম-সংক্রান্তই হউক বা বাণিজ্য-সংক্রান্তই হউক, ইহা বারাণসীধামের কেন্দ্রস্বরূপ। ইহার দক্ষিণ দিকে দশাশ্বমেধ, দক্ষিণ-পূর্ব্বে নদী, উত্তর-পূর্ব্বে কোতোয়ালী, উত্তর দিকে জেইতপুরা এবং পশ্চিম দিকে চেতগঞ্জ। মহল্লাটী ক্ষুদ্র হইলেও সম্পূর্ণরূপে পাক্কা। এখানকার সমগ্র অধিবাসী জাতিতে হিন্দু। স্থানটি চৌক-রাস্তা দ্বারা দ্বিধাকৃত। বারাণসীধামের সুপ্রসিদ্ধ পট্টবস্ত্র এবং পিত্তলের বাসনের দোকান এই স্থানেই দেখা যায়। কারমাইকেল লাইব্রেরী পর্য্যন্ত এখানকার রাস্তাটি মন্দ বটে, কিন্তু তাহার পরই চৌক

পর্য্যন্ত ভাল। এখানে একটি সুন্দর পুলিশ থানা, নিচিবাগ, ঘণ্টা ঘর এবং দুই পার্শ্বে উত্তমোত্তম সৌধরাজি আছে। সিটি পোষ্ট অফিস এবং বেঙ্গল ব্যাঙ্ক উক্ত অট্টালিকার মধ্যে অবস্থিত। নিচিবাগের সম্মুখ দিয়া যে রাস্তাটি চলিয়া গিয়াছে তাহা অবশ্য মন্দ বলিতে হইবে। ইহা চৌকের দাল-কি-মণ্ডি নামক রাস্তার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। শেষোক্ত রাস্তাটী চেতগঞ্জের পশ্চিম দিক দিয়া নায়া চৌকের প্রান্ত পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। নায়া চৌকে একটি মিউনিসিপ্যাল বাজার অবস্থিত। এখানে কাপড় এবং সাধারণ বস্তু বিক্রয় হইয়া থাকে। নিকটেই পুরাতন হরহা সরাই নামক পান্থনিবাস। দাল-কি-মণ্ডি হইতে কাশিপুরা রাস্তা উত্তরবাহিনী হইয়া ধাবিত হইয়াছে এবং যেখানে মিলিত হইয়াছে সেখানে লৌহ এবং জর্ম্মণ রোপ্য নির্ম্মিত বস্তুর প্রধান বিপণি অবস্থিত। উত্তরে "গোলা দিন নাথ"। এখানে মসলা, তামাক ইত্যাদি বিক্রয় হইয়া থাকে। সমগ্র চৌক রাস্তার উত্তর পশ্চিম দিকটা বিপণি দ্বারা পরিব্যাপ্ত। দক্ষিণপূর্ব্ব দিকে কতকগুলি বাজার আছে বটে, কিন্তু তাহাতে কেবল মাত্র ধর্ম্মসংক্রান্ত উপকরণাদি বিক্রয় হইয়া থাকে। কচুরিগলি রাস্তা দক্ষিণবাহিনী হইয়া চৌক হইতে দশাশ্বমেধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং তদুপরি অনেকগুলি মিষ্টান্নের দোকান অবস্থিত। এখান হইতে যে রাস্তা রামঘাট পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে তাহাতে অনেকগুলি কিংখাপের দোকান আছে। বারাণসীর মধ্যে এই স্থানটী প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান। কচুরি গলির উত্তর দিকে অন্য একটি রাস্তা পশ্চিমবাহিনী হইয়া চলিয়া গিয়াছে। ইহার উত্তর দিকের স্থানটী "থাথেরা" বাজার নামে খ্যাত। এখানে পিত্তলের বাসন আদির প্রধান আড্ডা। কচুরিগলির দক্ষিণ দিকটা প্রায় সম্পূর্ণরূপে মন্দিররাজি দ্বারা অধিকৃত এবং মধ্যে মধ্যে যে সকল দোকান অবস্থিত, তাহাতে দেবদেবীর মূর্ত্তি, যজ্ঞোপবীত এবং পূজার সামগ্রীনিচয় বিক্রয় হইয়া থাকে। মন্দিরের মধ্যে স্বুবর্ণমন্দির নামে খ্যাত মন্দিরটি সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান এবং বারাণসীধামের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বিশেশ্বরের স্থান। কাশীর দেবতাদিগের মধ্যে বিশেশ্বর রাজা। কোন কার্য্য করিতে হইলে তিনি নগরের কোতোয়াল ভৈরবনাথের উপর হুকুম জারি করিয়া থাকেন। ভৈরবনাথ নগরের হাল বিশেশ্বরকে অবগত করান। পঞ্চকোশী রাস্তার সর্ব্বত্রই কোতোয়ালের কর্ম্মচারিগণ অবস্থিত। যাহাতে দানবগণ নগর অধিকৃত করিতে না পারে তজ্জন্য তাহারা ইতস্ততঃ ভ্রামামাণ। বিশেশ্বরের মন্দিরের দৃশ্যটী অতি চমৎকার। এখানে মুণ্ডিতমস্তক অথচ শিখাধারী ব্রাহ্মণগণ কপালে তিলক ধারণ করিয়া উপবিষ্ট আছেন, সন্ন্যাসিগণ বিলম্বিত জটাভার লইয়া নগ্ন বেশে গাঁজায় দম চড়াইতেছেন, সালঙ্কারা

রমণীরা পূজার উপকরণাদি লইয়া ভক্তিভরে পূজা করিতেছেন। পূজার উপকরণ সামগ্রী গুড়, তণ্ডুল, ঘৃত, ফুল, ফল ইত্যাদি। ফুলের মধ্যে রাঙ্গা পদ্ম। এখানে পদ্ম ফুলের পূজার বিশেষত্বের পরিচয় দিতেছে। দূর হইতে বিশ্বেশ্বরের মন্দির দেখিলে প্রথমে মহাদেবের মন্দিরের চূড়া নয়নপথে পতিত হয়, দ্বিতীয়তঃ গিল্টি করা গম্বুজ এবং তৃতীয়তঃ গিল্টি করা বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের চূড়া। প্রাতে তাহার উপর সূর্য্যকিরণ পতিত হইয়া স্বর্ণের ন্যায় ঝক্‌মক্‌ করিতেছে। পঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহ এই মন্দিরের চূড়াটী স্বর্ণপত্রের দ্বারা মণ্ডিত করেন। এখান হইতে বিনায়কনামক একটী অপ্রশস্ত গলি দশাশ্বমেধ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে এবং এই গলিটীতে তীর্থযাত্রিগণ প্রত্যহ প্রাতে গমন করেন। ১১৯৪ খৃঃ সাহাবুদ্দিন ঘোরী দ্বারা ইহা বিচূর্ণীত হয়। অনতিবিলম্বে বর্ত্তমান মন্দির ও কারমাইকেল লাইব্রেরীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে অন্য একটী মন্দির গঠিত হয়; কিন্তু তাহাও ঔরঙ্গজেব দ্বারা বিধ্বংসিত হয়। এই চূর্ণীকৃত মন্দিরের সামগ্রী লইয়া তিনি একটি মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। ইহার প্রাচীরে অদ্যাপি হিন্দু শিল্প দেখিতে পাওয়া যায়। এই মসজিদের অস্তিত্ব নিবন্ধন হিন্দুরা অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হিন্দু মুসলমানে একটি ভয়ানক হাঙ্গাম উপস্থিত হয়। বর্ত্তমান মন্দির ও মস্‌জিদের মধ্যবর্ত্তী স্থানে জ্ঞানবাপী নামে একটী প্রসিদ্ধ কূপ অবস্থিত। হিন্দুদিগের বিশ্বাস যে, জ্ঞানবাপীতে মহাদেব বাস করেন। প্রবাদ এইরূপ যে, কোন সময়ে বারাণসী ধামে দ্বাদশবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি হয়। জলাভাবে জনসমাজের অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে দেখিয়া একজন ঋষি মহাদেবের ত্রিশূল লইয়া মৃত্তিকা বিদ্ধ করেন, অমনি নীচে হইতে জল উত্থিত হইতে লাগিল। ক্রমে মহাদেবের কর্ণে এই কথা পহুঁছিলে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া সেই কূপে বাস করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। অন্য প্রবাদ এই যে, যখন বিশ্বেশ্বরের পুরাতন মন্দির মুসলমানগণ ধ্বংস করে, তখন একজন ব্রাহ্মণ বিশ্বেশ্বরের মূর্ত্তি ম্লেচ্ছের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই কূপে নিক্ষেপ করেন। হিন্দুগণ এই কূপে দলে দলে আইসে এবং ফুল বিল্বপত্র ও জল আদি দিয়া মহাদেবের অর্চ্চনা করে। কূপোদক অত্যন্ত দুর্গন্ধময়। পুষ্পাদি অর্চ্চনা দ্রব্য পচিয়া পূতিগন্ধ বিকীর্ণ করিতেছে। ১৮২৪ খৃঃ অঃ জ্ঞানবাপীর চতুষ্পার্শ্বে সিন্ধিয়া ঘাটের নয়ানবিশ গোয়ালিয়রনিবাসী বাজরবাই নামক জনৈক ব্যক্তি নিম্নছাদবিশিষ্ট স্তম্ভশ্রেণী দ্বারা পরিবেষ্টিত করেন। উত্তর-পশ্চিম দিকে ঔরঙ্গজেবের মস্‌জিদের পরেই আদি-বিশ্বেশ্বরের বহু পুরাতন মন্দির অবস্থিত। ইহার অনতিদূরে পশ্চিম দিকে "কাশী করাইত" নামে একটি কূপ আছে। কূপোদক পর্য্যন্ত গমন করিবার রাস্তাও বিদ্যমান। পূর্ব্বে

একজন যোগী আপনাকে মহাদেবের নিকট বলি প্রদান করে। এইজন্য ইংরাজ সরকার কূপটী বন্ধ করিয়া দেন। কিন্তু পাণ্ডাগণের আবেদনে গভর্ণমেণ্ট প্রতি সোমবারে কূপটীকে খুলিতে আদেশ দেন। সন্নিকটস্থ স্থানটী মন্দিররাজি দ্বারা বেষ্টিত, তাহার প্রত্যেকটির বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। এই মন্দিরগুলির মধ্যে প্রসিদ্ধ মন্দিরদ্বয়ের নাম সাক্ষীবিনায়ক এবং অন্নপূর্ণার মন্দির। তীর্থযাত্রিগণ পঞ্চকোশী রাস্তা পরিভ্রমণ করিয়া সাক্ষীবিনায়কের মন্দিরে আসিবেই আসিবে। নতুবা তাহাদিগের পরিভ্রমণের ফল হইবে না। সাক্ষীবিনায়কের মন্দিরটী একজন মহারাষ্ট্রীয় দ্বারা নির্ম্মিত। জ্ঞানবাপীর পূর্ব্ব দিকে একটি বৃহৎ প্রস্তরনির্ম্মিত ষাঁড় দণ্ডায়মান আছে। নেপালাধিপ এই ষাঁড়টী মহাদেবের নামে দান করিয়াছেন। মন্দিরটী হায়দ্রাবাদের রাণী দ্বারা নির্ম্মিত। দক্ষিণ দিকে লোহার গরাদে দ্বারা একটি স্থান পরিবেষ্টিত। ইহার মধ্যে একটি শ্বেত প্রস্তর এবং অন্য একটি সাধারণ প্রস্তর নির্ম্মিত দেবস্থান আছে। এই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া উত্তরপশ্চিম দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ৬০ ফিট উচ্চ একটি মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। মস্‌জিদ হইতে ইহা ৫০ গজ দূরে অবস্থিত। ইহাই আদি বিশ্বেশ্বরের মন্দির। আমরা ইতিপূর্ব্বে অন্নপূর্ণার মন্দিরের উল্লেখ করিয়াছি। অন্নপূর্ণা দেবী বারাণসীধামে অত্যন্ত প্রসিদ্ধা। ইহাঁর অনুকম্পায় এখানে কেহই ক্ষুধায় কাতর হয় না। সকলেরই ইনি অন্নদাত্রী। প্রবাদ এইরূপ যে, বারাণসী ক্ষেত্রে সকলকে অন্নদান করা দুঃসাধ্য ভাবিয়া অন্নপূর্ণা দেবী গঙ্গাকে স্মরণ করিলেন। গঙ্গাও উপস্থিত হইলেন। উভয়ে পরামর্শ করিয়া স্থিরীকৃত হইল যে, অন্নপূর্ণা এক অঞ্জলি শস্য দিলেই গঙ্গা এক পাত্র জল দিবেন। অন্নপূর্ণাও আশ্বস্ত হইলেন। তদবধি যাহারা এই স্থান দর্শন করিতে আইসে, সঙ্গে করিয়া এক অঞ্জলি শস্য লইয়া আইসে। তাহার ফলে অনেক গরীব দুঃখীর প্রতিপালন হইতেছে। যে কার্য্য বাগাড়ম্বরপূর্ণ বক্তৃতায় সিদ্ধ হয় না, তাহা যদি ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ হয় তবে সহজেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। অন্নপূর্ণার মন্দিরের সমক্ষে অনেক গরীব দুঃখীকে উপবিষ্ট দেখিবে। লোকের নিকট হইতে ইহারা ত ভিক্ষা পাইয়াই থাকে। তদ্ব্যতীত পূজারিগণও লোকের নিকট হইতে গরীবদিগের জন্য আটা শস্যাদি সংগ্রহ করে। অন্নপূর্ণার মন্দিরের চবুতরার এক কোণে সূর্য্যের মূর্ত্তি আছে। ইহাঁর রথে সপ্তাশ্ব সংযোজিত। সপ্ত রশ্মি ইহাঁ হইতে সমুদ্ভূত হইয়া অবনীমণ্ডলে কিরণ দান করিতেছে। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের সন্নিকটে এবং শনৈশ্চরের মন্দিরের দক্ষিণে শুকরেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। পুত্রকামী ব্যক্তিগণ পুত্রপ্রাপ্তির আশায় এই স্থানে আগমন করিয়া অপত্য কামনা করিয়া থাকে। শুকরেশ্বর সুন্দর পুত্রদাতা। চৌক মহল্লায় বহুসংখ্যক আখড়া

আছে, তন্মধ্যে চৌক মহল্লার "বাড়ী-সংঘাত" নামক আথড়াটী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহা পাতিয়ালার মহারাজ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং বহুসংখ্যক শিখের সেখানে আবাস। তেজ বাহাদুর নামক তৃতীয় শিখ গুরুর সম্মানার্থ ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

দশম অধ্যায়।

কোতোয়ালী মহল্লা।

চৌকের উত্তর এবং পশ্চিম দিকে কেতোয়ালী অবস্থিত। পূর্ব্বে ভৈরবনাথের মন্দির ছিল বলিয়া এই মহল্লাটির নাম কালভৈরব ছিল। ইহার দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে গঙ্গা, উত্তরপশ্চিম দিকে আদমপুরা, উত্তরে জেইত পুরা এবং উত্তরপশ্চিম কোণে চেতগঞ্জ। মহল্লা ভেদ করিয়া একটি রাস্তা চেতগঞ্জ হইতে রাজঘাট পর্য্যন্ত ধাবমান হইয়া মদয়াগিন নামক সরকারি বাগানের নিকট চৌক রাস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে। রাস্তাটীর দক্ষিণ দিকটা সম্পূর্ণ পাকা। দুইটি গলি এই রাস্তার সহিত আড়ভাবে সংলগ্ন হইয়াছে। প্রথমটীর নাম চৌথম্বা এবং তাহা পূর্ব্বদিক হইতে থাথেরী বাজার পর্য্যন্ত বিস্তৃত। থাথেরী বাজারে "ধান তেরস" মেলা হয়। কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশীতে এই মেলাটি হইয়া থাকে। কুসীদব্যবসায়িগণ এই দিনে ধান্যের পূজা করিয়া থাকে। ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ এই দিনে ধাতুপাত্র ক্রয় করে। অন্য গলিটি শ্মশান-ঘাট হইতে পূর্ব্বদিকে চৌথম্বায় আসিয়া মিলিত হইয়াছে। রাস্তাটির উত্তর পূর্ব্বদিকে যে একটি ইষ্টকনির্ম্মিত বাটী চারিটী স্তম্ভের উপর দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাই চৌথম্বা নামে প্রসিদ্ধ। এই নামেই রাস্তাটির নামকরণ হইয়াছে। নিকটেই রাস্তাটীর বহির্ভাগে একটী অপ্রশস্ত গলিতে, ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণের মধ্যে একটী পুরাতন মসজিদ অবস্থিত। মসজিদটী চৌকোণা স্তম্ভের উপর স্থাপিত। চৌথম্বা এবং নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে গোপাল মন্দির আছে, ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি বিরাজিত। মহল্লার দক্ষিণাংশের বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থানটীর নাম কালভৈরব মহল্লা। ইহাতে ভৈরবনাথের মন্দির অবস্থিত। লোকদিগের বিশ্বাস এই যে, ভৈরবনাথ সমুদায় বারাণসীর উপর আধিপত্য করিয়া থাকেন। এই সুবৃহৎ মন্দিরটী পুনার পেশোয়া বাজীরাও দ্বারা নির্ম্মিত। ভৈরবনাথের বাহন কুকুর। ময়রারা চিনি দ্বারা কুকুরের মূর্ত্তি প্রস্তুত করে। লোকে তাহাই ক্রয় করিয়া পূজা দিয়া থাকে। দ্বারের বাম দিকে একটি কুকুরের বৃহৎ প্রতিমূর্ত্তি আছে। ইহার উপর বিষ্ণুর দশ অবতারের দশটী মূর্ত্তি চিত্রিত। উত্তর দিক দিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। মন্দিরের সমক্ষে একটি ঘরে ঘণ্টাচতুষ্টয় বিলম্বিত দেখিতে পাইবে। একজন পূজারি বাম দিকে ও অন্য একজন দক্ষিণ দিকে ময়ূরপুচ্ছের একটী দণ্ড ধারণ করিয়া স্ত্রী পুরুষ ও বালক নির্ব্বিশেষে যাত্রিমাত্রেরই উপর স্পর্শ

করায়। জনসাধারণের বিশ্বাস যে, ইহা দ্বারা ভূতাদি পলাইয়া যায়। অবশ্য এই কার্য্যের জন্য পূজারিদ্বয় লোকের নিকট হইতে কিছু প্রত্যাশা করেন। তজ্জন্য তাঁহারা একটি নারিকেল খোল এমন স্থানে রাখিয়া দেন যে তাহা লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যাত্রিগণ তাহাতে পয়সা রাখিয়া দেয়। এই দেবস্থানটী দুইটী দ্বার-পাল দ্বারা রক্ষিত। তাহাদিগের মূর্ত্তিও এই স্থানে স্থাপিত আছে। উক্ত রক্ষিদ্বয় "দ্বারপালেশ্বর" নামে খ্যাত। প্রাচীর-গাত্রে ভৈরবনাথের ত্রিশূল অঙ্কিত। দেবস্থানের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে তাম্রনির্ম্মিত একটি ক্ষুদ্র দেবস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই ভৈরবনাথের আবাসস্থান। মূর্ত্তিটি প্রস্তরনির্ম্মিত; কিন্তু মুখ রৌপ্যের। ইনি চতুর্ভুজ, গলে হার বিলম্বিত, ইঁহার সম্মুখে একটী প্রদীপ জ্বলিতেছে। পূজান্তে পূজারিগণ লোক-দিগের কপালে তিলক দিয়া থাকেন। সম্মুখে একটি ঘণ্টা ঝুলিতেছে। কুকুর এই মন্দিরে আসিতে পায়, কিন্তু অন্য মন্দিরে যাইতে পারে না। পূজারিগণ মদ্যপায়ী। আসব দিয়া ভৈরবনাথের পূজা হইয়া থাকে। অদূরে পূর্ব্বদিকে নবগ্রহের মন্দির—সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতি নবগ্রহের নামে উৎসর্গীকৃত। ইহার পরেই দণ্ড-পাণিনামক মন্দির বিরাজিত। জনশ্রুতি এইরূপ যে, ভৈরবনাথ এই স্থানে দণ্ড গ্রহণপূর্ব্বক পাপীর শাস্তি বিধান করিয়া থাকেন। এখানে "কালকূপ" নামে একটি কূপ আছে। লোকমাত্রেই এই কূপে স্বীয় প্রতিবিম্ব দেখিয়া থাকে। যদি কেহ নিজ প্রতিবিম্ব দেখিতে না পায়, তবে তাহার ছয় মাসের মধ্যে মৃত্যু ধ্রুব। চেতগঞ্জ হইতে যে প্রধান রাস্তা চলিয়া গিয়াছে, তদুপরি অনেকগুলি উত্তম উত্তম অট্টালিকা বিরাজিত। সে গুলি দেখিবার বস্তু। রাস্তাটি কবির চওড়া নামক স্থানটী অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছে। বারাণসীর প্রসিদ্ধ তন্তু-বায় এবং ধর্ম্মসংস্কারক কবিরের নামে কবির চওড়ার নামকরণ হইয়াছে। মিউনিসিপাল অফিসের পরেই প্রিন্স অব ওয়েল্‌স হাঁসপাতাল এবং মহিলাগণের জন্য ঈশ্বরী মেমোরিয়্যাল হাঁসপাতাল অবস্থিত। অতঃপর মাধোদাসের উদ্যান। উদ্যানটি উচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই স্থানটি রাধাস্বামী পন্থীর আড্ডা। পূর্ব্বে চেত সিংহের বিদ্রোহকালে ইহা Warren Hastings এর আবাসস্থান ছিল। পরে নবাব ওয়াজীর আলি লক্ষ্ণৌ হইতে বিতাড়িত হইলে তাঁহাকে এই স্থানটি বাস করিবার জন্য দেওয়া হয়। ইহার পূর্ব্ব দিকে যে একটি উদ্যান ও আধুনিক অট্টালিকানিচয় দেখা যায়, তাহা ১৮৭৬ খৃঃ ভিজিয়ানগরের মহারাজ-দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। পুলিশ কোতো-য়ালী, দক্ষিণে তারঘর, উত্তরে ময়দাগিন উদ্যান, নাগরী প্রচারিণী সভা এবং রাজা শিবপ্রসাদের বাড়ী এখানে বিরাজিত। এখান হইতে রাস্তাটি পূর্ব্ববাহিনী হইয়া

বিশ্বেশ্বর গঞ্জে গমন করিয়াছে। গঞ্জটিতে শস্যাদি, চিনি এবং শাক শব্জীর বাজার অবস্থিত। এই বাজার মিউনিসিপালিটি দ্বারা পরিচালিত। অতঃপর "মচ্ছোদ্রি" পুষ্করিণীতে যাইয়া রাস্তাটি শেষ হইয়াছে। এখান হইতে আদমপুরামহল্লার প্রারম্ভ। প্রধান রাস্তাটির উত্তরাংশ পাকা, কিন্তু বহির্ভাগটি কাঁচা অট্টালিকায় পূর্ণ। স্থানটি ব্যবসায়ী ব্যক্তিদিগের জন্য। ইহার উত্তর দিকে কতকগুলি শাখা শড়ক প্রধাবিত হইয়াছে। তন্মধ্যে, একটি রাস্তা মাধোদাসের উদ্যানবাটী হইতে অওসানগঞ্জ এবং সাইতপুরা পুলিশ ষ্টেশন পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই স্থানটিতে লোহার বাজার অবস্থিত। হনুমান ফাটক নামে অপর একটি অপ্রশস্ত রাস্তা বিশ্বেশ্বরগঞ্জ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বিশ্বেশ্বর গঞ্জের উত্তর দিকে হরতীর্থ নামে একটি পুরাতন ভগ্ন পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়। নিকটেই প্রসিদ্ধ বৃদ্ধ কালের মন্দির অবস্থিত। প্রবাদ এই যে, সত্য যুগে এক বৃদ্ধ রাজা জরা-পীড়িত হইয়া বারাণসী ধামে আগমনপূর্ব্বক যোগে রত থাকেন। মহাদেব প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে জরা হইতে মুক্ত করেন। রাজা কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ বর্ত্তমান মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া বৃদ্ধ কালের আখ্যা দেন। বিশ্বেশ্বরগঞ্জ হইতে যে রাস্তাটি এই স্থান পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে, তাহাতে রত্নেশ্বরের মন্দির বিরাজমান। প্রবাদ এই যে, একজন ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট নগরের উন্নতি সাধন করিবার জন্য মন্দিরটি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে সঙ্কল্প করেন। মহাদেব রাত্রিতে তাঁহাকে স্বপ্ন দেন যে, তুমি এমন কুকর্ম্ম করিও না। পরদিন প্রত্যূষে ম্যাজিষ্ট্রেট স্বয়ং আসিয়া মন্দির ভগ্ন রদ করেন। অদূরে আলমগির মস্‌জিদ্ অবস্থিত। লোকের বিশ্বাস এই যে, ইহা ১৬৫৯ খৃঃ ঔরঙ্গজেব দ্বারা নির্ম্মিত। প্রবাদ এই যে, বিশ্বেশ্বরের পুরাতন মন্দির চূর্ণীকৃত করিয়া তাহার মসলা দ্বারা এই মসজিদটি গঠিত হইয়াছে। হিন্দুরা কিন্তু স্থানটি পবিত্র বলিয়া মানিয়া থাকে এবং মস্‌জিদের মধ্যবর্ত্তী স্থানে যেখানে ফোয়ারা অবস্থিত তথায় পূজাদি করিয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

পিতৃভক্তি

(১)

প্রফুল্ল কুমার বসু এক ধনাঢ্যের একমাত্র সন্তান। বয়ঃক্রম ২৪ বৎসর। রূপে গুণে প্রফুল্ল একটি শ্রেষ্ঠ রত্ন! অনেক স্থানে দেখা যায়, ধনবানের পুত্র ধনগর্ব্বে মাতোয়ারা হইয়া বাগ্‌দেবীকে গ্রাহ্য

করেন না। কমলার প্রসন্নতা লাভ করিয়া ধরাকে সরার ন্যায় দেখেন। কিন্তু আমাদের প্রফুল্ল সেরূপ নহেন। তিনি লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়েরই প্রিয়পাত্র।

প্রফুল্ল প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে প্রশংসার সহিত বি, এস্, সি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইলেন, এবং সারদার কৃপায় সেখানেও উত্তরোত্তর পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন। প্রফুল্লের পিতা আনন্দ মোহন বসু হাইকোর্টের একজন খ্যাতনামা আটর্ণী, তিনি মাসে মাসে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন। তাঁহার আদি নিবাস যশোহর জেলার অন্তর্গত গৌরীপুর গ্রামে। তথায় পৈতৃক সম্পত্তিও যথেষ্ট আছে। পৈতৃক ভিটাতে ক্রিয়াকলাপাদি এখনও যথানিয়মে সম্পাদিত হইয়া থাকে। তিনি স্বয়ং তথায় বড় একটা যান না, কলিকাতায় তাঁহার স্বকৃত সুবৃহৎ অট্টালিকাতেই সপরিবারে বাস করিয়া থাকেন। স্বদেশে বিষয় সম্পত্তি দেখিবার জন্য উপযুক্ত কর্ম্মচারী সকল নিযুক্ত আছে, তাহারাই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। প্রফুল্লর কিন্তু স্বদেশের উপর বড় টান, বড় অনুরাগ! তিনি অবকাশ পাইলেই গৌরিপুরে যান।

আনন্দ বাবুর পরিবারের মধ্যে তাঁহার বৃদ্ধা মাতা, পত্নী সুকুমারী এবং একমাত্র পুত্র প্রফুল্ল কুমার! এতদ্ভিন্ন বড়লোকের যেমন হইয়া থাকে, সেইরূপ কতকগুলি দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় তাঁহার আশ্রয়ে প্রতিপালিত হয়। কিন্তু অপরাপর স্থলে যেরূপ দেখা যায় যে, লোকে আশ্রিতের প্রতি কেমন একটা অবজ্ঞা ভাব প্রকাশ করে, এখানে সেরূপ হয় না! সুকুমারী প্রকৃত সুগৃহিণী, তাঁহার গৃহিণীপণার গুণে তাঁহার সংসারে সর্ব্বদাই শান্তি মূর্ত্তিমতী হইয়া বিরাজ করিতেছে।

প্রফুল্লও মাতার গুণ সকল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রফুল্ল শান্ত, মিষ্টভাষী, গর্ব্বরহিত, নম্র। যে একবার প্রফুল্লের মুখের একটী কথা শুনিয়াছে, সে জীবনে তাহা ভুলিতে পারিত না। কি এক মোহিনী শক্তি যেন অলক্ষ্যে প্রফুল্লের হৃদয়ে বাস করিত।

এ সংসারের যাবতীয় সদ্‌গুণরাশি একত্রীভূত করিয়া বিধাতা প্রফুল্লকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। প্রফুল্লের সেই হাসি হাসি মুখখানি প্রফুল্ল নামের স্বার্থকতা সম্পাদন করিত। প্রফুল্ল আত্মীয়, পর সকলের সঙ্গেই সরল ভাবে মিশিতেন। বালক বালিকাদিগের সঙ্গে প্রফুল্ল আজিও বালকের মত খেলা করেন। কলেজ হইতে প্রত্যাগত হইয়া ঠাকুরমার কাছে বসিয়া প্রত্যহ 'উপকথা' শুনিবার বাসনা তাঁহার আজিও প্রবল। জ্যোৎস্না নিশিতে ত্রিতলের ছাদে, ঠাকুরমার কোলে মাথা রাখিয়া, বালক বালিকা পরিবেষ্টিত হইয়া প্রফুল্ল উপকথা শুনিতেন। কোন কোন দিন উপকথা শুনিতে শুনিতে প্রফুল্ল ঠাকুরমার কোলেই ঘুমাইয়া পড়িতেন। এমন পৌত্র লাভ করিয়া বৃদ্ধা পিতামহীর

আর আনন্দের সীমা ছিল না। তিনি প্রত্যহ করযোড়ে ইষ্টদেবতার কাছে পৌত্রের দীর্ঘ জীবন কামনা করিতেন। শুভ্র রজনী, শুভ্র জগৎ, আকাশে চন্দ্রমার শুভ্র হাসি, ক্রোড়দেশে কুসুমস্তবকবৎ গৌর-কান্তি-বিশিষ্ট প্রফুল্লকুমার! চাহিয়া চাহিয়া বৃদ্ধার হৃদয় আনন্দে উথলিয়া উঠিত।

প্রফুল্ল যে দিন গল্প শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িতেন, সে দিন প্রফুল্লের নিদ্রাভঙ্গের পরে "আমরা সব গল্প শুনিয়াছি, তুমি শুনিতে পাও নাই" বলিয়া বালকবালিকারা প্রফুল্লকে লইয়া কত রহস্য করিত। প্রফুল্লও তাহাদের সহিত বালকের ন্যায় কলহ করিয়া কত আনন্দ অনুভব করিতেন।

বৃদ্ধার বড় সাধ প্রফুল্লের অনুরূপ রূপ-গুণান্বিতা একটী বালিকার সঙ্গে প্রফুল্লের বিবাহ দিয়া, পৌত্র ও পৌত্রবধূ লইয়া শেষ জীবনে পূর্ণানন্দ উপভোগ করেন, কিন্তু প্রফুল্লকুমার বিবাহ করিতে আদৌ সম্মত হইতেন না। বৃদ্ধা এক এক দিন আদরে প্রফুল্লকে জিজ্ঞাসা করিতেন "হাঁরে, আমার রামের বামে সীতা এসে বোসবে কবে?" প্রফুল্ল অমনি হাসি-মুখে "কেন ঠাকুর মা! তুমিই ত আমার সীতা, এসনা, আমার বাঁদিকে বোসনা," এই বলিয়া নিজে পিতামহীর দক্ষিণে উপবেশন করিতেন! বালক-বালিকাগণ করতালি দিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিত।

(২)

সন্ধ্যার সময়ে বৃদ্ধা বালক-বালিকা-পরিবেষ্টিতা হইয়া ত্রিতলের ছাদে বসিয়া তাঁহার দৈনিক কার্য্য হরিনামের মালা জপ করিতেছিলেন, আর শ্যাম গোয়ালা গাভী দোহন করিতেছে কি না মনে মনে তাহারই চিন্তা করিতেছিলেন। উপকথা বলিবার জন্য বালকবালিকারা তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছিল, এক এক জনে এক একটি গল্পের ফরমাইস করিতেছিল, কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত প্রফুল্লকুমার আসিয়া উপস্থিত হয়েন নাই বলিয়া বৃদ্ধা উপকথা বলিবার তত আগ্রহ করিতেছিলেন না। তিনি বালকবালিকাদিগকে স্তোকবাক্যে ভুলাইতেছিলেন এবং ঘন ঘন প্রফুল্লের আগমন-পথ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। এমন সময়ে সহাস্যে ধীর পাদবিক্ষেপে প্রফুল্ল তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পশ্চাতে তাঁহার মাসতুতো ভাই এবং প্রিয় সুহৃৎ বিজয়ও আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

প্রফুল্ল আসিয়া তাঁহার চির-অভ্যস্ত ইজারা মহল ঠাকুরমার কোলে মাথা রাখিয়া ছাদের উপরে শুইয়া পড়িলেন, বিজয় ছাদের আলিসার উপরে বসিলেন। প্রফুল্ল হাসি হাসি মুখে বলিলেন "ঠাকুরমা একটা উপকথা বলনা গা, আজ একজন তোমার নূতন শ্রোতা এসেছে! প্রফুল্ল বিবাহে অসম্মত বলিয়া বৃদ্ধা সর্ব্বদা প্রফুল্লকে অনুযোগ করিতেন, আজিও তিনি সময় বুঝিয়া বলিলেন "আমি আর

তোকে উপকথা বলবো না, তুই আমার একটা কথা শুনিস্‌নে, আমি কেন তোর কথা শুন্‌বো? আমি রোজ রোজ তোকে উপকথা বোল্‌তে পার্‌ব না।” এই কথা শুনিয়া প্রফুল্ল উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন “সে কি ঠাকুর মা! উপ-কথায় তোমার অরুচি হলো কবে? আমি তো জানি যে দিন উপকথায় তোমার অরুচি হবে, সে দিন আর তুমি বাঁচবে না। দেখি দেখি হাতটা, ধাত ছেড়ে যায় নি তো? গঙ্গায় নে যাব?

বৃদ্ধা। আমাকে গঙ্গায় দিতে পাল্লে বাঁচিস! না?

প্রফুল্ল হাসিয়া বলিলেন, “এক রকম! একটা ভাবনা কেটে যায় বৈ কি।

বৃদ্ধা। তোদের মাষ্টার বুঝি কেবল ফুক্কুড়ি শেখায়, গুরুজনের কথা শুন্‌তে শেখায় না?

প্র। মাষ্টার কি শেখায় না শেখায় সে কথা পরে বলবো, এখন তোমার কোন্ কথাটা শুনি নি তাই বল দেখি?

এই বলিয়া প্রফুল্ল অঙ্গুলি গণনা দ্বারা ঠাকুরমার কি কি কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন তাহার তালিকা প্রদান করিলেন,—

“গলায় তুলসির মালার ফরমাইস ছিল, তা নবদ্বীপে বেড়াতে গিয়ে এনে দিয়েছি; রাধাকৃষ্ণ নাম লেখা ঝুলির কথা বোলে-ছিলে, তা কাল কিনে এনেছি; আর ভাল নামাবলীর জন্য বৃন্দাবনে অর্ডার দিয়েছি; তবে তোমার কথা শুনিনি কবে ঠাকুর মা! বাকি কেবল গঙ্গায় নে' যাওয়া।

বৃদ্ধা প্রফুল্লের কথায় বড় সন্তুষ্ট হইলেন, প্রফুল্লের চিবুক ধরিয়া মুখচুম্বন করিলেন, বলিলেন “ভাই! একটি কথা যে কিছুতেই শুন্‌চিস্ না! বুড়ি কবে মরে যাবে, বুড়িকে গঙ্গায় না দিলে কি বে করবি না?”

শুনিয়া প্রফুল্ল আবার উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন, বলিলেন “ঠাকুরমা তুমি কি আমায় লেখা পড়া ক'ত্তে দেবে না?”

বৃদ্ধা। বালাই! লেখা পড়া কত্তে দেব না কেন? কত লেখা পড়া করবে কর না ভাই, তোমার অভাব কিসের?

প্র। তবে এখন বিয়ে কত্তে বল কি করে? বিয়ে কল্লে কি আর লেখা পড়ার অবকাশ থাক্‌বে? মেম সাহেবের জুতা সাফ কত্তে কত্তেই আমার দিন কেটে যাবে যে।

বৃদ্ধা আশ্চর্য্য হইলেন, প্রফুল্লের কথার ভাবার্থ গ্রহণ করিতে সক্ষম হইলেন না। বলিলেন “সে কিরে? জুতো কার সাফ্ কর্ব্বিরে? তুই কি মেম বিয়ে কর্ব্বি না কি রে?”

“এক রকম তাই বৈ কি?” বলিয়া প্রফুল্ল হাসিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা আরও বিস্মিত হইয়া বলিলেন, “অমন অলুক্ষণে কথা বলিস্ নি। মেম বিয়ে কর্ব্বি কিরে?”

বৃদ্ধার ভাব দেখিয়া প্রফুল্লের রহস্যের প্রবৃত্তি আরও বৃদ্ধি পাইল, গম্ভীর ভাবে তিনি বলিলেন, “কি করি? আমাদের

কলেজের সাহেব বড় ধরেচেন তাঁর মেয়ের সঙ্গে আমার বে দেবেন, মাষ্টারের কথা অগ্রাহ্য করি কি করে? কাজেই আমাকে স্বীকার কত্তে হয়েচে।"

বৃদ্ধা মনে করিলেন, যথার্থই প্রফুল্ল কোন সাহেবের মেয়েকে বিবাহ করিবেন স্থির করিয়াছেন, সেই জন্যই বিবাহে এত অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। এই ভাবিয়া তিনি বলিলেন, 'ও' তাইতে তুই বে কত্তে চাস্ না বটে? দাঁড়া তোর মাষ্টারের মেয়ে বে করা বার কচ্চি, আমি তোর সব কথা আনন্দকে বলে দেব। এই বলিয়া বৃদ্ধা এ কালের ছেলেদিগকে এবং তার সঙ্গে ইংরাজী শিক্ষাকে অজস্র গালি দিতে আরম্ভ করিলেন।

গতিক নিতান্ত ভাল নয় দেখিয়া, বিজয় মীমাংসা করিয়া বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিলেন। তথাপিও বৃদ্ধার মনের সন্দেহ একেবারে তিরোহিত হইল না।

প্রফুল্লকুমার যে নিতান্ত বিনা কারণে বিবাহে এত অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেন, তাহা নহে। শুধুই যে শিক্ষার ব্যাঘাত হইবে বলিয়া বিবাহে অসম্মত হইতেন, সে কথা প্রকৃত নহে। কেন যে তিনি বিবাহ করিতে চাহিতেন না, তাহার কোনও নিগূঢ় কারণ ছিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তিনি কলেজের অবকাশ পাইলেই গৌরীপুরে যাইতেন। সেই গৌরীপুরবাসিনী দরিদ্রা বালিকা রমা তাঁহার চিত্ত হরণ করিয়াছিল। রমার কিঞ্চিৎ পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

রামলোচন ঘোষ গৌরীপুরে একজন বিখ্যাত লোক ছিলেন। প্রচুর ধন সম্পত্তি এবং তদতিরিক্ত দানশীলতাই তাঁহার যশ এবং সুনাম দিগদিগন্তে প্রচার করিয়াছিল। তাঁহারা পুরুষানুক্রমে বনিয়াদী বংশ

বিধাতা রামলোচন বাবুকে সমস্তই দিয়াছিলেন, কেবল এক বিষয়ে তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়াছিলেন, তাঁহার সন্তানাদি কিছুই হয় নাই। তাহার জন্য অনেক যাগযজ্ঞ করা হইয়াছিল, গৃহিণীও অনেক ঠাকুর দেবতার পায়ে মাথা খুঁড়িয়া গলায় অনেক মাদুলী ঝুলাইয়াছিলেন, কিন্তু ফল কিছুই হয় নাই।

এত সম্পত্তি ভোগ করিবে কে? এই ভাবিয়া তাঁহারা পতিপত্নী সর্ব্বদাই আক্ষেপ করিতেন, এবং রামলোচন বাবু তাঁহার প্রচুর অর্থ সর্ব্বদা সৎকার্য্যে ব্যয় করিতেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁহার পত্নীর মৃত্যু হইল। পত্নীবিয়োগের পরে তিনি সংসারে আরও বীতস্পৃহ হইলেন, এবং দান ধ্যান লইয়াই কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিকে তিনি অর্থ দ্বারা কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিতেন, কাহারও পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে তিনিই শ্রাদ্ধের সকল ভার গ্রহণ করিতেন, দরিদ্র ছাত্রগণের পাঠের ব্যয় বহন করিতেন, ফলতঃ তিনি দরিদ্রের পিতামাতা স্বরূপ

ছিলেন। এতদ্ভিন্ন যেখানে চতুষ্পাঠী, বিদ্যালয়, হাঁসপাতাল নির্ম্মাণ হইত, তিনিই সে সকলের ভার গ্রহণ করিতেন। যত অর্থের আবশ্যক হইত, তিনিই তাহার অধিকাংশ প্রদান করিতেন। যশোহর জেলার মধ্যে তাঁহার নাম প্রাতঃ স্মরণীয় হইয়া উঠিয়াছিল।

এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পরে বিধির বিধানে তিনি পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহ করিলেন। সেই স্ত্রীর গর্ভে একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, সেই কন্যাই আমাদের রমা! রমা যখন তিন বৎসরের মাত্র, সেই সময়ে রামলোচন বাবু হঠাৎ কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের যুবতী পত্নী শিশু কন্যা লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন। রামলোচন বাবু যেরূপ দানশীল ছিলেন, তাহাতে তাঁহার পত্নী ও কন্যার জন্য নগদ কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। অধিকন্তু তিনি তাঁহার সম্পত্তির কিয়দংশ বন্ধক দিয়াছিলেন। সুদে আসলে ঋণ বৰ্দ্ধিত হইলে উত্তমর্ণ সেই বন্ধকী বিষয় নিলামে ডাকিয়া লইল। বাকি যাহা ছিল তাহা পাঁচজনে সড় করিয়া যে যেরূপে পারিল আত্মসাৎ করিল। এমনি কালের গতি, রামলোচন বাবু যাহাদিগকে বড় বিশ্বাসী ভাবিতেন, যত্নের সহিত যাহাদিগকে প্রতিপালন করিতেন, তাহারাই সময় পাইয়া তাঁহার স্ত্রী-কন্যার সর্ব্বনাশ সাধন করিল কেহ ধর্ম্মের দিকে চাহিল না, প্রভাতের তারকার ন্যায় সকলে একে একে প্রস্থান করিল। বিধবা যুবতী একাকী সংসারের আবর্ত্তে পতিত হইয়া বড়ই বিপদে পড়িলেন। "আহা" বলিয়া একবার সমবেদনা জানাইবারও তাঁহার কেহ ছিল না। কিন্তু তিনি অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন। ঈশ্বরে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি এবং অটল বিশ্বাস ছিল। ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া তিনি সেই শিশু কন্যাটি লইয়া একাকিনী সেই বৃহৎ পুরীমধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। বঞ্চকের প্রবঞ্চনায় পড়িয়া তাঁহার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে নাই। তিনি ধীরচিত্তে ভগবানের দিকে চাহিয়া কন্যাটিকে লালন পালন করিতে লাগিলেন। শুক্ল পক্ষের শশধরের ন্যায় বালিকা দিন দিন বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল। রূপে গুণে সেই ক্ষুদ্র বালিকা রমা অতুলনীয়া হইয়া উঠিল। আনন্দ বাবুর বাটীর সন্নিকটেই রামলোচন বাবুর বাটী, প্রফুল্ল বাটী আসিলেই রমার সহিত সাক্ষাৎ ঘটিত। বালিকার অসাধারণ বুদ্ধি এবং অদ্ভুত সরলতা দেখিয়া প্রফুল্লকুমার মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

রমার মাতা প্রফুল্লকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন, আর রমার মাতার সেই অকৃত্রিম স্নেহে প্রফুল্লকুমারও অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতেন। ক্রমে প্রফুল্ল রমার সেই অতুল রূপ লাবণ্যে বিমোহিত হইলেন, বাল্যের সেই ভালবাসা ক্রমে প্রেমে পরিণত হইল।

রমা কুলে, শীলে উচ্চ, সম্ভ্রান্ত বংশের

কন্যা। প্রফুল্ল অপেক্ষা জাত্যাংশে কিছু-মাত্র ন্যূন নহে। প্রফুল্লের সহিত বিবাহে কোনও প্রতিবন্ধক ঘটিতে পারে না। প্রফুল্ল ধনবান্ পিতার একমাত্র সন্তান! পিতা মাতা প্রফুল্লের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কখনও কোন কার্য্য করেন না। সুতরাং প্রফুল্ল ভাবিলেন, তিনি রমাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেই পিতা মাতা অবশ্যই এ বিবাহে সম্মত হইবেন।

হায়! ভ্রান্ত বিষয়ানভিজ্ঞ যুবক! বিষয়ী ব্যক্তির অন্তরমধ্যে প্রবেশ লাভ করা তোমার সাধ্য কি?

রমার রূপ গুণ থাকিলে কি হইবে? রমা বনীয়াদি বংশের কন্যা হইলে কি হইবে? এ সংসারে মানুষের যাহা স্পৃহণীয়, রমার তাহা কই? রমার অর্থ কই? বিধির বিধানে সে যে আজ দরিদ্র বিধবার কন্যা। অগাধ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী তুমি প্রফুল্লকুমার। রমার সঙ্গে বিবাহ কি তোমার সম্ভবে?

প্রফুল্ল লজ্জা বশতঃ স্বীয় পিতামাতাকে মনোভাব প্রকাশ করিয়া বলিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু রমার মাতাকে বলিলেন রমার মাতা বুদ্ধিমতী। তিনি বুঝিলেন এ বিবাহে প্রফুল্লের পিতা কিছুতেই সম্মত হইবেন না। কিন্তু প্রফুল্ল দৃঢ়তার সহিত বলিলেন যে, তিনি পিতার নিকটে স্বীয় মনোভাব প্রকাশ করিলে অবশ্যই তিনি সম্মত হইবেন, কখনই তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিবেন না, তাঁহার পিতা সে প্রকার লোক নহেন।

যথাসময়ে প্রফুল্লকুমার মেডিকেল কলেজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এম্. বি, উপাধি লাভ করিলেন। তাঁহার পাঠ শেষ হইলে বৃদ্ধা পিতামহী স্বীয় পুত্রকে প্রফুল্লকুমারের বিবাহের নিমিত্ত যথেষ্ট অনুযোগ করিতে লাগিলেন, আনন্দ বাবুও এইবার পুত্রের বিবাহ দিতে স্থির সংকল্প করিলেন।

আজ কালিকার দিনে কি আর প্রফুল্লের মত পাত্রের বিবাহের জন্য চেষ্টা করিতে হয়? সমাজ যদি দশটা মেয়ে প্রফুল্লের কণ্ঠে তুলিয়া দিতে সক্ষম হইত, তবে তাহাও দিত! বহু ধনাঢ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি লোলুপ দৃষ্টিতে প্রফুল্লের দিকে চাহিয়াছিলেন। তাঁহারা স্ব স্ব কন্যার সহিত প্রফুল্লের বিবাহ দিবার নিমিত্ত আনন্দ বাবুর নিকটে লোক প্রেরণ করিতে লাগিলেন। আনন্দ বাবুও তন্মধ্য হইতে পাত্রী নির্ব্বাচন করিয়া লইবার পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

প্রফুল্ল দেখিলেন বিপদ! আর তো তাঁহার "বিবাহ করিব না" বলিয়া কোনও ওজর আপত্তি চলিবে না। কিন্তু তাঁহার চিত্ত যে রমাকে সমর্পণ করিয়াছেন। তিনি যে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়া-ছিলেন রমা ভিন্ন অন্য কাহাকে জীবনের সঙ্গিনী করিবেন না। যদি রমাকে না পান, তবে চিরকুমার হইয়া থাকিবেন, তথাপি অন্য মহিলার পাণি-গ্রহণ করিবেন না।

হায়! বাঙালীর আশা, বাঙালীর পণ কি সকলি জলের রেখাবৎ মুছিয়া যায়!

প্রফুল্ল পিতামাতার কাছে মনোভাব প্রকাশ করিতে সক্ষম হইলেন না। লজ্জা আসিয়া বাধা প্রদান করিতে লাগিল।

সাত পাঁচ ভাবিয়া তিনি বিজয়কে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। বিজয় ধীর ও বুদ্ধিমান্, তিনি সব শুনিয়া বড় বিমর্ষ হইলেন, বলিলেন "ভাই! এ আশা পরিত্যাগ কর। বিবাহ সম্বন্ধে তোমার স্বাধীনতা কিছুমাত্র নাই। তোমার পিতা যাহা করিবেন তাহাই হইবে, এবং এ সম্বন্ধে তোমার স্বাধীন মত প্রকাশ করাও গর্হিত, তাহা সুসন্তানের কার্য্য নহে। আর ভাই এ বিবাহে তোমার পিতা যে সম্মত হইবেন, তাহাও আমার বোধ হয় না। কেননা, রমা রূপে গুণে অতুলনীয়া হইলে কি হইবে? রমা দরিদ্রের কন্যা, বংশমর্য্যাদা থাকিলে কি হয়, সে দরিদ্র বিধবার কন্যা, এরূপ দরিদ্র বিধবার সহিত কুটুম্বিতা স্থাপন করিতে তোমার পিতা কখনই ইচ্ছুক হইবেন না। অতএব ভাই! তুমি এ আশা পরিত্যাগ কর।"

প্রফুল্ল দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন "ভাই সংসারে অর্থই কি এত শ্রেষ্ঠ, এত স্পৃহণীয়? পিতামাতা কি আপনাদের সন্তানের সুখশান্তির দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন না? আমার পিতার অর্থের তো কোনও অভাব নাই। আর আমি ভিন্ন তাঁর অন্য সন্তানও নাই, তথাপি কি তিনি অর্থ বিনিময়ে আমাকে অপরের নিকটে বিক্রয় করিবেন। আমি যদি রমাকে না পাই, তবে, নিশ্চয় জানিও এ জীবনের মত আমার সুখ, শান্তি সমস্ত নষ্ট হইয়া যাইবে।"

বিজয় অবসর মত আনন্দ বাবুকে সমস্ত কথা বলিলেন, এবং যাহাতে রমার সহিত প্রফুল্লকুমারের বিবাহ হয়, তাহার জন্য বিশেষ অনুরোধও করিলেন। আনন্দ বাবু মনোযোগ সহকারে বিজয়ের কথাগুলি শুনিলেন, কিন্তু কোনও উত্তর করিলেন না।

প্রফুল্ল পরীক্ষার পরই গৌরীপুরে চলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল, বিজয়ের কাছে সকল কথা শুনিলে পিতা অবশ্যই সম্মত হইবেন। প্রফুল্ল হৃষ্টচিত্তে গৌরীপুরে বাস করিতে লাগিলেন, প্রতি দিন রমার মুখকমল দর্শন করিয়া রমালাভের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার আরও প্রবল হইয়া উঠিল।

রমার মাতার অকপট স্নেহে প্রফুল্ল বড়ই সুখী হইতেন। রমার মাতা তাঁহার বাগানের শশা, কলা, আম, কাঁটাল প্রভৃতি ফলমূল ছাড়াইয়া প্রফুল্লকে খাইতে দিতেন, প্রফুল্ল তাহা উপাদেয় জ্ঞানে ভক্ষণ করিতেন। রমা তাহার সুকোমল হাতে পান সাজিয়া আনিয়া দিত, প্রফুল্ল তাহা অতি দুর্লভ জ্ঞানে চর্ব্বণ করিতেন। সে দরিদ্র বিধবার ঘরে বিষয়ের আবিলতা নাই, শান্তি ও

সরলতা তথায় সর্ব্বদা বিরাজ করিত। আর সেই সারল্যপ্রতিমা রমার দিকে চাহিয়া চাহিয়া প্রফুল্ল আত্মহারা হইয়া উঠিতেন। ভ্রান্ত প্রফুল্ল ভাবিতেন এক দিন এই স্বর্ণ-প্রতিমা হৃদয়ে ধারণ করিয়া জীবন সফল করিবেন।

আশার আনন্দে প্রফুল্ল দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে একদিন হঠাৎ ডাকযোগে তিনি দুইখানি পত্র প্রাপ্ত হইলেন, একখানি পত্র তাঁহার পিতার হস্তলিখিত, অপরখানি বিজয়ের। পত্র দুইখানি দেখিয়া প্রফুল্লের মন কেমন বিচলিত হইয়া উঠিল। তিনি কম্পিত হস্তে পত্র দুইখানি খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন।

প্রথমে পিতার পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল—

দীর্ঘায়ু নিরাপদেষু—

বাবা প্রফুল্ল! পত্র পাঠ মাত্র তুমি এখানে চলিয়া আসিবে। ২৩শে আষাঢ় তোমার শুভ বিবাহের দিন স্থির করিয়াছি। তুমি ওখানে আর বিলম্ব করিবে না। তোমার কুশল প্রার্থনীয়। অত্র শুভ।

ইতি নিত্যাশীর্ব্বাদক

আনন্দ।

পত্রখানি বড় তাড়াতাড়িতে লেখা, প্রফুল্ল পত্র পাঠ করিয়া বিশেষ কিছু মর্ম্ম বুঝিতে সক্ষম হইলেন না, কোথায় বিবাহ? কাহার সহিত? রমার সঙ্গে কি? ভয়ে ভয়ে প্রফুল্ল বিজয়ের পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন।

বিজয় লিখিয়াছেন—"ভাই, প্রফুল্ল! তুমি যে কার্য্যের জন্য আমাকে নিযুক্ত করিয়াছিলে আমি যথাসাধ্য তাহার চেষ্টা করিয়া দেখিলাম, কিন্তু কিছুতেই তোমার পিতার মত পরিবর্ত্তন করিতে পারিলাম না। ব্যারিষ্টার এ, পি, ঘোষের কন্যার সহিত তোমার বিবাহ স্থির করিয়াছেন। ভাই, তুমি যদি এ বিবাহে অসম্মত হও, তবে তাঁহার মনস্তাপ এবং অপমানের একশেষ হইবে। তুমি হিন্দু-সন্তান, আশা করি পিতার অবাধ্য হইবে না। স্মরণ রাখিও হিন্দু শাস্ত্রে আছে—

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ।

পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্ব-দেবতাঃ॥" ইতি।

অভিন্নহৃদয়—বিজয়।

পত্রখানি পাঠ করিয়া প্রফুল্লের মাথা ঘুরিতে লাগিল, তাঁহার মনের অবস্থা যে কি প্রকার হইল তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন আর কে বুঝিবে? তিনি যে কি করিবেন তাহা ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। এক দিকে নিজের সুখশান্তি, অপর দিকে পিতৃভক্তি, একদিকে স্বীয় প্রতিজ্ঞা পালন, অন্য দিকে পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন স্বরূপ মহাপাতক। তিনি কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া অচেতনবৎ শয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন।

হায়! জন্মের মত তাঁহার আশা ভরসা কি বিসর্জ্জন দিতে হইবে? তাঁহার হৃদয় হইতে সেই অপূর্ব্ব-প্রেম-প্রতিমা রমার প্রতিমূর্ত্তি কি মুছিয়া ফেলিতে হইবে?

রমার মাতার নিকটে তিনি যে স্পর্দ্ধা সহকারে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, রমাকে বিবাহ করিবেন, এবং তাঁহাকে যে রমার অন্য সম্বন্ধ এ পর্য্যন্ত করিতে দেন নাই। এখন তিনি তাঁহাকে কি বলিবেন?

হৃদয়ের স্তরে স্তরে যে প্রেমময়ী মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে, এখন কিরূপে তাহা মুছিয়া ফেলিবেন?

চিন্তায় প্রফুল্লকুমারের হৃদয় আলোড়িত হইতে লাগিল। তিনি বালকের ন্যায় শয্যায় পড়িয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অশ্রুজলে উপাধান সিক্ত হইতে লাগিল। এক এক বার তাঁহার পিতার উপর অত্যন্ত রাগ হইতে লাগিল। এক এক বার ভাবিতে লাগিলেন তিনি পিতার প্রস্তাবিত পাত্রীকে বিবাহ করিবন না, যেরূপে হউক রমাকেই বিবাহ করিবেন। আবার পরক্ষণেই বিজয়ের পত্রোক্ত শ্লোকটী স্মরণ করিয়া পিতার প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা স্থাপন করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। সমস্ত রাত্রি চিন্তা করিয়া তিনি স্বীয় কর্ত্তব্য অবধারিত করিয়া লইলেন। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক স্বার্থত্যাগ এবং পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। কে বলে,—ইংরাজী শিক্ষায় ধর্ম্মজ্ঞান লোপ পায়? কে বলে,—ইংরাজী শিক্ষায় হৃদয়ে পাশ্চাত্য ভাব আনয়ন করে? হিন্দু চিরদিনই হিন্দু থাকিবে। যত দিন হিন্দুশাস্ত্র বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন হিন্দুর হৃদয়ে ধর্ম্মজ্ঞানও জাগরিত থাকিবে। তবে দৈবাৎ যদি কোথাও দুই একটা কুলাঙ্গার ইহার ব্যতিক্রম করে, তাহার জন্য সমগ্র হিন্দু-জাতি দায়ী নহে।

প্রাতে প্রফুল্লকুমার যখন শয্যাত্যাগ করিলেন, তখন তাঁহার চিত্ত স্থির অবিচলিত! কিন্তু এক রাত্রির মধ্যে তাঁহার চেহারা এত পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল যে, লোকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। তাঁহার বদন বিশুষ্ক, কেশ রুক্ষ, মুখের সে হাসি হাসি প্রফুল্ল ভাব তিরোহিত হইয়া গিয়াছে! তিনি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া রমার মাতার ভবনে গেলেন। প্রভাতে উঠিয়া গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিয়া রমার মাতা তখন রমার কেশবিন্যাস করিয়া দিতেছিলেন, রমার সুন্দর রেসম-বিনিন্দিত কেশরাশি লইয়া বেণী বিনাইতেছিলেন। এমন সময়ে প্রফুল্ল তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মুহূর্ত্তমাত্র প্রফুল্ল অনিমেষ নয়নে সে দৃশ্য দেখিয়া লইলেন।

রমার মাতা তাড়াতাড়ি উঠিয়া একখানি আসন পাতিয়া দিলেন।

(ক্রমশঃ)

নারীর কর্ত্তব্য

আজ কাল আমাদের সমাজে একটা কথা উঠিয়াছে যে, পুত্রের বিবাহে পিতার যদিও বিনা পণে বিবাহ দেওয়া অভিমত হয় ত গৃহিণীগণ মিহিসুরে বলেন "আমার রাঙা বৌ এবং চুড়ী খুটের গহনা চাই, নতুবা পুত্রের বিবাহ দিব না। আর তারা যেন ভাল করিয়া তত্ত্ব করিতে পারে, নতুবা প্রতিবেশিনীগণ বলিবে 'হাঘরে ঘরের মেয়ে ঘরে এনেছে।' সব দিক দেখিয়া কার্য্য করিও, নহিলে আমি গলায় দড়ি দিব।"

হায়! কি দুঃখের বিষয়। সমগ্র নারীর গর্ব্ব ও মর্য্যাদা এই নীচতায় ডুবিয়া যায় না কি? সুতরাং যাহাতে এই সকল কথা না উঠিতে পারে, নারীমাত্রেরই তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

সকল সন্তানবতীই যদি এ কথা বলেন, তাহা হইলে আমাদের জিজ্ঞাসা—কুৎসিত ও দরিদ্র কুমারীগণ কি চিরকুমারী থাকিবে?

শুভ বিবাহে আজ কাল কন্যার বাটীতে প্রায়ই গভীর নিরানন্দের ছায়াপাত হইয়া থাকে। এমন কি আত্মহত্যাও দৃষ্ট হয়, তথাপি আমাদের চৈতন্য হয় নাই। পুত্রকন্যাগণ যখন একই ঈশ্বর-প্রেরিত ও এক মাতৃগর্ভে উৎপন্ন, তখন কার্য্যক্ষেত্রে উভয়ের স্বাতন্ত্র্য দৃষ্ট হয় কেন? উভয়ের স্বতন্ত্র মূল্য কেন? এক-বার আমার এক আত্মীয়ার একটি কন্যা জন্মিয়াছে শুনিয়া দেখিতে যাই, এবং গিয়া প্রসূতিকে জিজ্ঞাসা করি "কেমন মেয়ে হ'ল তোমার, বকুল?" তিনি সঙ্কুচিত ভাবে একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিয়া বলিলেন, "মেয়ে আর কেমন হবে ভাই! ওরা সুন্দর হ'লেও কুৎসিত। যে মুহূর্ত্তে খুকী ভূমিষ্ঠ হয়েছে, আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়েছে, আর বাটীর লোকেরও মুখ আঁধার হয়ে গেছে।" প্রসূতির সেই করুণ স্বর আজিও আমার কর্ণে প্রতি-ধ্বনিত হইতেছে। তাহার পর সেই কচি মেয়েটিকে দেখিলাম যেন একটি গোলাপের কুঁড়ির মত জননীর কোল আলো করিয়া শয়ন করিয়া আছে। তাহাকে স্বর্গের একটা স্থানভ্রষ্ট আলোকো-জ্জ্বল রশ্মির অন্যতমা বলিয়া বোধ হইল। ভাবিলাম মেয়েটি কি সুন্দর! তখনি তাহার জননীর কাতর মুখ পানে চাহিলাম। ভাবিলাম, গৃহস্থের অমঙ্গল-কারিণী মেয়ে! তুই এখনি মর।

কন্যা জন্মগ্রহণ করিলে আজ কাল হিন্দু সমাজ বড়ই অমঙ্গল বলিয়া গণ্য করি-তেছে। তাহার কারণ সমাজের লোকেরা নিজেরাই নহেন কি? সকলেই যদি নিজ নিজ পুত্র কন্যা বিনা পণে পরস্পর বিনি-ময় করিয়া লয়েন, তাহা হইলে কেহই আর কন্যাগণকে অমঙ্গলকারিণী বলিয়া

মনে করিবেন না। পুত্র অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে বটে, কিন্তু শুধু অর্থেই বিধাতার রাজ্য চলে না। প্রত্যেক নারীই যদি এককালে পুত্রের জননী হইবার আশা করেন, তবে সংসার, সৃষ্টি, লয়, উৎপত্তি এককালে সবই বিলয় প্রাপ্ত হইবে। বংশরক্ষার জন্য প্রত্যেকেরই দুই একটী পুত্রের আবশ্যক বটে, কিন্তু আমরা ছয় সাতটী পুত্রের জনক জননীকেও একটী কন্যার ভার গ্রহণ করিতে কাতর দেখিয়াছি।

সমাজে উত্তরোত্তর কন্যার অনাদর বৃদ্ধি পাইতেছে। এমন কি বয়ঃস্থা অনূঢ়া কন্যাকে সম্মুখে দেখিয়া পিতা মাতা তাহার মৃত্যু কামনা পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন। সকলের মূলেই এই বিবাহের পণ-প্রথা। বিবাহে অর্থ ব্যয় হয় বলিয়াই কন্যা আমাদের সমাজে এত উপেক্ষণীয়া। সুতরাং যাহাতে আমাদের জাতির এই অনাদর সমাজ হইতে উঠিয়া যায় সকল নারীরই তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আজ যাঁহার বিবাহের জন্য পিতা মাতা ভাবিয়া সারা হইতেছেন, হয়ত বাস্তু ভিটা বিক্রয় ও তৈজস বাঁধা দিয়া যেন তেন প্রকারে এক বিপত্নীক আশী বছরের কুটীরবাসী বৃদ্ধের সহিত মাল্য বিনিময় করাইয়া দিলেন, কাল পুত্রবতী হইয়া তিনি হাঁকিলেন "৫০০০৲ হাজার মুদ্রা, হীরার আংটী, বৌয়ের জড়োয়া সুটের গহনা চাই। আর তার বাপ বার মাসে তেরটা তত্ত্ব কর্ত্তে পারে এমন মেয়ের সঙ্গে আমার সোণার ছেলের বিয়ে দেব। আমার বাছার মতন ছেলে পাবে কোথায়? দুবার পাশ দিতে ফেল হয়েছে, এমন ছেলে কি পাওয়া যায়? যাদের ভাগ্যে থাক্‌বে এমন ছেলেকে জামাই করবে।" সেই সময় তাঁর একবার নিজের বিবাহের কথা স্মরণ হয় না কি? সেই সময় তাঁর সেই চিন্তা-ভারগ্রস্ত পিতার রোদন ও জননীর কাতর মুখ মনে পড়ে না কি?

আর বাড়ীর কর্ত্তাদিগকে প্রায়ই বলিতে শুনিয়াছি "ওরা মেয়ে মানুষ ওদের বুদ্ধি কি? ওদের কথা শুনে কাজ করলেই সব পণ্ড হবে।" তবে জিজ্ঞাসা, তাঁরা যখন মেয়েদের সব কথাই অগ্রাহ্য বলিয়া মনে করেন, বিবাহের কথাটার বেলায়ই বা শুনেন কেন? যেখানে সেখানে গম্ভীর ভাবে বলেন কেন যে "গিন্নি বলেছেন 'বৌমাটি যেন একটু সুন্দর হয়, এমন গহনা পত্র দেবে যেন রায় বাহাদুরের বড় বৌ এসে তার গহনার বড়াই না করতে পারে, আর ছোট মেয়ে নলিনীর বিয়ের খরচটাও যেন বেহাই দেন। তাঁর জামাইয়ের পড়বার ভার ত তিনি নেবেনই। তত্ত্বটা যেন পাঁচজনকে দিয়ে খেতে পারি, এমন বেহাই কর।' তা আমার মত ছিল আপনার ছোট মেয়েটীকে ঘরে নিয়ে যাই, কিন্তু কি করব গিন্নির আব্দার।" অম্লানবদনে সে সকল কথা বলিতে যে পুরুষ লজ্জা না পান, তাঁহাকে শত ধিক্কার। ইহাঁরাই না "সমাজ! সমাজ!" করিয়া চীৎকার

করেন। হায়! "সমাজের উপকারের জন্য পুত্রের বিবাহের পণ লওয়া গর্হিত কার্য্য। আমাদের হরনাথ বাবু বড় সৎ ও মহৎ ব্যক্তি ছিলেন, তিনি উপর্য্যুপরি চারিটি পুত্রের বিবাহে একটি পয়সাও লয়েন নাই।" বলিয়া ইহাঁরাই না উপন্যাস লেখেন? ইহাঁরাই না সভাসমিতিতে উচ্চ মঞ্চে দাড়াইয়া "বরদান লওয়ার মত পাপ আর নাই, সুতরাং আমাদের সমাজে বরপণ যাহাতে উঠিয়া যায় সকলের একমত হয়ে তাহাই করা কর্ত্তব্য" ইত্যাদি বলিয়া গগনভেদী চীৎকার করিয়া কানে তালা ধরাইয়া দেন? আর দর্শকমণ্ডলী করতালির সঙ্গে "সাধু সাধু" শব্দ শুনিয়া ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়েন ও ইলেক্‌ট্রিক ফ্যানের বায়ু সেবন ও বোতল বোতল লেমনেড ও বরফের শ্রাদ্ধ করেন। তার পর বাড়ী গিয়া নিজ ধনুর্দ্ধর অকাল কুষ্মাণ্ড বখাট ছেলের বিবাহের জন্য গিন্নির মতানুসারে বিশ হাজার টাকা পণ চাহিয়া বসেন। ধিক্ শত ধিক্!

ইহাঁরাই আবার সমাজপতি! যাহাদের সমাজের নেতা এ প্রকার, তাহাদের সমাজ উচ্ছন্ন যাইবার আর বিলম্ব নাই।

উপন্যাস লেখা ও বক্তৃতা করা যদি অর্থসাপেক্ষ হইত, তবে তাহাও নিশ্চয় দুর্ম্মূল্য হইত।

মুখে যেরূপ কথা, কাজে সেইরূপ করিবার লোক বুঝি আজ কাল আমাদের সমাজে নাই। হিন্দু সমাজ তাই শ্রীহীন হইয়াছে। সে শ্রী ফিরাইয়া আনিবার মত লোক সমাজে নাই। অথচ বক্তৃতাগৃহে অর্থহীন ফাঁকা কথায় সেই পূর্ব্ব শ্রী ফিরাইয়া আনিবার প্রয়াস। তাহার অপেক্ষা সেই সময় নিজ নিজ কক্ষে বসিয়া চিত্ত সংযত করিবার আভ্যাস করিলে ফল দর্শে, এবং সমাজেরও উপকার হয়।

যা হ'ক সমাজপতিদের কথা তাঁহারা নিজেরা বলিবেন। অনধিকার চর্চ্চায় আমার প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি পাইবে মাত্র।

ভগিনীগণ! যাহাতে সমাজ আমাদের জাতির বিরুদ্ধে কোনও কথা বলিতে না পারে এমন কার্য্য করা, যাহাতে সমাজ আমাদের জাতি জন্মিবামাত্র অমঙ্গল বলিয়া মনে না করিতে পারে, তাহার চেষ্টা করা, কি আমাদের কর্ত্তব্য নহে?

সকলে মিলিয়া আমরা যদি সমাজ হইতে বরপণ প্রথা দূর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হই, তাহা হইলে অবশ্যই এ প্রথা সমাজ থেকে দূর হইবে। একদিন আবার সেই শুভ বিবাহ ফিরিয়া আসিবে, এ অশুভ বিবাহ দূর হইবে। রাঙা বৌ, তত্ত্ব ও অর্থের লোভ ত্যাগ করিয়া স্বামী পুত্রকে উদ্দীপিত করিয়া যাহাতে এ পাপ প্রথা ত্যাগ করাইতে পারি, আসুন তাহার চেষ্টা করি। নারীর কার্য্য নারী না করিলে, নারীর মান নারী না রাখিলে, আর কে রাখিবে? স্বামী পুত্র? সেদিন অনেক দিন আগে চলিয়া গিয়াছে। এখন স্ত্রৈণতার ভান দেখাইয়া স্বামিগণ অবলীলাক্রমে স্ত্রীর অযশ সমাজের

সম্মুখে গাহিতে কুণ্ঠিত বোধ করেন না। পুত্র হাসি-মুখে জননীকে অবজ্ঞা করিয়া নিজ অভীষ্ট পূরণ করিতে পারেন। স্বামী মনে করেন স্ত্রীর বশ্যতা স্বীকার করিয়া আমি সমাজের দশজনের সম্মুখে নিজেকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছি, আর স্ত্রীকেও সম্মান দেখাইয়াছি। অমন সম্মান যে স্ত্রী অবলীলাক্রমে মাথায় তুলিয়া লয়েন, তিনি নারী-নামের অযোগ্য। অমন সম্মান আমরা চাহি না, যাহাতে সমাজ আমাদের কোন রূপ নিন্দা না করিতে পারে, যাহাতে অশুভ বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে গিন্নির রাঙা বৌয়ের সাধও সমাজের চক্ষু হইতে বিলুপ্ত হয়, বিধিমতে গৃহিণী-গণের সে চেষ্টা করা উচিত।

আমরা দরিদ্রকন্যাবধূকে যৎপরো নাস্তি পীড়ন করিতে ছাড়ি না। কারণ তাহার পিতা আমাদের তত্ত্ব করেন না। আমাদের হতশ্রদ্ধায় কত বধূ অকালে জীবন শেষ করিয়া চলিয়া যাইতেছে। হায়! হায়! কি দুর্দৈব? হিন্দু সমাজ উৎসন্ন যায় না কেন? বধূর শ্বশ্রূমাতা-গণও ত এককালে বধূ ছিলেন। আবার শুনেছি সেকালে বধূদের শাস্তি বড় কঠিন ছিল। কালে শাশুড়ীর পদ পাইয়া কোন্ প্রাণে তাঁহারা আবার বধূকে অনাদর করেন। আমরা স্বচক্ষে বধূর প্রতি বধূর মাতৃস্থানীয়া স্নেহময়ী শ্বশ্রূমাতা কর্তৃক এত লাঞ্ছনা হইতে দেখিয়াছি, যে তাহা শুনিলে কেহ কেহ হয়ত আশ্চর্য্য হইবেন। হিন্দু সমাজের বধূগণ কবে শাশুড়ীর নিকট মাতৃস্নেহ পাইবে?

হায়! জননী স্নেহলতা! হায় কুমারী সরলা! তোমরা বিবাহ-যজ্ঞে জীবন আহুতি দিয়া ভাবিয়াছিলে সমাজের এ অমঙ্গল মেঘ অপসৃত হইবে? বঙ্গ-গগনকে যে পণ-প্রথা রূপ পুঞ্জীকৃত কৃষ্ণ মেঘরাশি ঘেরিয়া ফেলিয়াছে, সে মেঘ হইতে মুক্ত হইবার আশা আর আছে কি মা? তোমাদের মরণে বঙ্গ সমাজের চক্ষু ক্ষণকালের জন্য উন্মোলিত হইয়াছিল। আবার পলকের মধ্যে সে জ্ঞান-চক্ষু মুদ্রিত হইয়াছে, সুতরাং এ কালঘুম আর ভাঙ্গিবে না।

যে সমাজ, যে পিতামাতা, এ সব কুমারী কন্যা বলি দিয়াও পণপ্রথা বজায় রাখিতে পারিয়াছে, তাহারা যে কোনও কালে পরার্থের প্রতি লোভ ও রূপের মোহ ত্যাগ করিতে পারিবে তাহাত বোধ হয় না।

কুৎসিতাদের কি হৃদয় নাই? তাহারা কি সাধারণ মানুষের মত নহে? শরীরের উপরকার চামড়াটা কটা হইলেই কি একাধারে সব পাওয়া যায়? সেই বধূর গর্ভে কুৎসিত সন্তান সন্ততি জন্মিলে বিবাহ দিবার মুস্কিল বটে, কিন্তু ঐ পণ-প্রথা দূর হইলেই সমাজ সুন্দর কালোয় বিনিময় করিয়া লইতে পারেন। আমরা সুন্দরী বধূকেও কালো কন্যার জননী হইতে দেখিতেছি। অনেক ইউরোপীয় ত "কালা বাঙ্গালীর" নামে

নাসিকা কুঞ্চিত করেনই, তাহার উপর সেই কালা বাঙ্গালী যদি সামান্য কটা চামড়া বিশিষ্ট, অর্থাৎ সুন্দর হইয়া এরূপ করেন, তাহ'লে আর রক্ষা নাই। তাহ'লে বিধাতার নিকট 'আমরা কালো মেয়ে ভাল বাসি না' বলিয়া আবেদন জানাইতে হয়। আমাদের হিন্দু দেবদেবীর মধ্যে দেবকীনন্দন কৃষ্ণ ও মহাশক্তি, মুক্তিদায়িনী, মাতৃকা মূর্ত্তির বর্ণ ত ঘোর মসিবরণ। তাহা হইলে তাঁহাদের সৃজিত জগতে আমাদের অবস্থান করা উচিত নহে, আর তাঁহাদের দত্ত অবস্থাতেই বা আমরা সুখ দুঃখানুভব করি কেন? পুরাকালের মূর্খ সাধকগণ কি গুণে যে ঐ দুই কালোমূর্ত্তির ভিতর জগৎ-আলো-করা রূপের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহারাই জানেন।

কালোরূপের পক্ষপাতিত্ব দেখাইতেছি বলিয়া আমায় যেন কেহ কালো না মনে করেন, আমার বর্ণ সকলে বলেন ঠিক যেন কাঁচা সোণা। সত্যের অনুরোধে আমি নিজেকেও দুকথা বলিতেও পরাঙ্মুখ নহি।

যাক ও বিষয় বলিবার মতন উপস্থিত আর কিছুই পাইলাম না, সুতরাং এইবার বিদায় লইব। ভগ্নিগণ, যদি নিজেরা আপন আপন সম্মান রাখিতে সচেষ্ট হয়েন, তবে পতি পুত্রকে রূপের মোহ ও অর্থের লালসা বহ্নির মুখ হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করুন। তাহা হইলে আমাদের সমাজে নারী আবার লক্ষ্মীস্বরূপিণী হইবেন। কন্যা সন্তান আবার সকলের আদরণীয় হইবে, সংসারে স্বর্গরাজ্যের সৃষ্টি হইবে। ভগ্নিগণের মধ্যে একজনও যদি প্রাণের সঙ্গে বুঝিয়া সমাজের এই শোচনীয় অবস্থা দর্শনে আমার এই সাময়িক মনোচ্ছ্বাসের কিয়দংশ গ্রহণ করিয়া, ইহার এক কণাও সদ্ব্যবহার করেন, তবে শ্রম সফল জ্ঞানে কৃতার্থ হইব।

নিবেদিকা—

শ্রীমতী প্রমীলাবালা মিত্র,

গয়া, ২৩-৫-১৫

নূতন সংবাদ।

সংস্কৃত পরীক্ষায় মুসলমান রমণীর উপাধি লাভ।

নদীয়া জেলানিবাসী সেখ জমীরুদ্দিন সেখের কন্যা বিবি নুরজাহান সংস্কৃত পরীক্ষায় আর্য্য সমাজ হইতে সরস্বতী উপাধি পাইয়াছেন। ইহাঁর পিতা সেখ জমীরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ উপাধিধারী।

রমণীর গৌরব।

সুপ্রসিদ্ধ রায় রামজী মালবারীর কন্যা

কুমারী ফিরোজা সম্প্রতি বিলাতের রয়াল লণ্ডন অপথ্যালমিক হাঁসপাতালের কর্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক জীবাণুতত্ত্ববিদের কার্য্যে সহকারী নিযুক্ত হইয়াছেন।

বামারচনা।

নববর্ষ।

অতীতের সনে যা কিছু মলিন
করিয়া সুদূরে দূর,
এ নব প্রভাতে দাও মা! বীণায়
নবীন রাগিণী সুর।
নবীন ছন্দে নব অনুরাগে
নবীন ভরসা বুকে,
নবীন উদ্যমে নব শকতিতে
বাজাই যেন মা সুখে।
জীবনে মরণে বিপদে বিষাদে
জাগায়ে মরমে প্রীতি,
তোমারি রাগিণী বাজাও বীণায়
নব নব রূপে নিতি।

শ্রীহেমন্তবালা দত্ত,
চট্টগ্রাম।

মৌন।

তব—শুদ্ধ-শান্ত-স্নিগ্ধ সৌম্য মূর্ত্তি কাছে,
নাহিক বিবাদ-দ্বন্দ্ব,
তর্ক বিতর্কের কুটিল কলাপ,
প্রখর মুখর মন্দ।
নাহি—দুঃখ, করুণার তীব্র হাহাকার,
নিখিল-অখিল ধন্দ,
প্রণয় বিভোল উচ্চ হাসি রোল,
উতল মাতল বন্ধ।
তুমি—ক্রোধে মহা ধৈর্য্য, অভিমানে শান্তি
প্রেমের সরম স্পন্দ,
কবির জল্পনা, কাব্যের কল্পনা,
মধুর মোহন ছন্দ।
যত—যোগী, মুনি, ঋষি, জীবন সাধনে,
পিয়ি তব মকরন্দ,
ভুলি পরমাদ বাদ-বিসম্বাদ,
লভেছিল ব্রহ্মানন্দ।
তবে—এস সৌম্য তুমি! হৃদয়ে আমার
হও হে জীবনবন্দ্য,
তোমার পরশে দূর হ'ক যত,
কল্লোল-কোলাহল-দ্বন্দ্ব।

শ্রীমতী সুশীলা সুন্দরী মিত্র,
শোভাবাজার রাজবাটী।

"অর্ঘ।"

বনের মাঝারে নিভৃত আঁধারে
কুসুমটি ছিল ফুটিয়া,
প্রভাত শীতল অনিল চঞ্চল
যেত পরিমল লুটিয়া,
বৃক্ষতলায় দেখিনু সেদিন
পড়ে আছে ফুল গন্ধবিহীন,
এনেছি ছিন্ন পুষ্প অর্ঘ
অঞ্জলি মোর পূরিয়া,
চরণে তোমার পুনঃ অভগার
উঠুক সে ফুল ফুটিয়া।

আশীষ।

এস আজ এস, নবীনা কুমারী,
এসেছি বরিতে শঙ্খ-ধ্বনি করি,—
আনন্দ, আশীষ, শুভ ইচ্ছা হ'য়ে
স্বর্গ হ'তে তুমি এসেছ নামিয়ে।
নৃপেন্দ্র-প্রাসাদে জিতেন্দ্র-দুহিতা,
বরদা-দুহিতা তোমার সুমাতা,
এ জগতে তুমি হবে পরিচিত,
মনোনীত নামে হ'য়ে অভিহিত।
শুভ দিনে এই শুভক্ষণে আজ
বাজিছে বাজনা প্রাসাদের মাঝ,
তব পিতামহী মহারাণী সতী,
তোমা ধনে লয়ে হৃষ্টমন অতি,—
সঙ্গে লয়ে সব আত্মীয় স্বজন,
পূজিছেন আজি শ্রীহরিচরণ।
আকুল হৃদয়ে উঠিছে প্রার্থনা,
বিভুপদে করি কল্যাণ কামনা।
ভক্ত ব্রহ্মানন্দ, নৃপতি নৃপেন্দ্র,
প্রিয় দরশন সে রাজরাজেন্দ্র,
তুমি যে তাঁদের বড় আদরের,
শুভাশীষ যাচি আজি তাঁহাদের।
স্বর্গবাসী তাঁরা বিধাতৃ-বিধানে,
কেমনে দেখিব তাঁদের এখানে,
তাঁরা না আসিলে এ শুভ উৎসবে,
প্রাণের অভাব কেমনে পূরিবে?
ভক্ত-মাতা তুমি কল্যাণ-দায়িনী,
ভক্তগণ ল'য়ে এস মা জননী,
স্বর্গ, মর্ত্ত আজ এক হ'য়ে যাক্,
সে শোভা দেখিয়া হৃদয় জুড়াক।
দীর্ঘজীবী হ'য়ে পিতৃ-মাতৃ-কোলে,
জীবন-সৌরভে তুষিও সকলে।
তব তরে আজ চরণে তাঁহার,
দিই পুষ্পাঞ্জলি, এ দান যাঁহার।

সুমতি মজুমদার।

প্রহ্লাদের প্রতি।

দনুজকুলের মণি কহগো প্রহ্লাদ শুনি,
এ অমূল্য নাম তুমি কোথায় পাইলে।
যাঁর বলে বিষপানে প্রাণ দান পেলে॥
পিতা তব হরিদ্বেষী, তুমি হ'লে অবিনাশী,
পিয়ে যেই সুধারাশি দাও মোরে কয়ে।
অমর অমৃত সেই নাম মধুময়ে॥
ঘাতকের তীক্ষ্ণ অসি, ভগ্ন যাহে অঙ্গে পশি,
নিষ্পেষিত নাহি করি নিজ পদতলে,
সাদরে বারণ পৃষ্ঠে লইল যে বলে॥

বক্ষমাঝে গিরি ধরি, স্থির অবিচল হেরি,
ওপদে মিনতি করি হইয়া সদয়।
সে অমৃত নামে দাও ভরিয়া হৃদয়॥
ভীষণ জলধিজলে, সন্তরণ করি কূলে,
আইলে যাঁহার বলে দাও তাঁর পরিচয়।
কি নাম তাঁহার হয়, কোথা বা আলয়॥
শুনি সেই নাম গান, পুলকে ভরিবে প্রাণ,
মহার্ণবে হই পার সেই নাম ধরে।
জীবনের পরপার মহাসিন্ধুতীরে॥

হরধনুর্ভঙ্গকালে।

কূর্ম্মপৃষ্ঠ সম কঠোর বিষম
পিনাকীর হেন সুকঠিন ধনু।
কেমনে সখিরে এ কোমল করে
করিবেন ভঙ্গ দূর্ব্বাদল তনু॥

সুকোমল অতি রঘুকুলপতি
হেরি আতঙ্কেতে কাঁপিতেছে প্রাণ।
হায় পিতঃ তব অতি অসম্ভব
না জানি কেন এ দারুণ পণ॥

---

৩১ নং মধুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষ কুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

৫২ বর্ষ।

বামাবোধিনী পত্রিকা

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি. এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২। জুন. ১৯১৫।

সূচী।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২।৶০ ; অগ্রিম বাণ্মাষিক মূল্য ১৶০ ; প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।০ (চারি আনা মাত্র)

বিতরণ! বিতরণ!!

মোহান্ত অভয়ানন্দ গিরির দৈবপ্রাপ্ত

দেবদত্ত অক্ষয় কবচ।

অতি দুষ্প্রাপ্য ত্রিধাতু নির্ম্মিত—আবরণ মধ্যে মহাযোগ প্রভাবে অতি কঠোর নিয়মে স্থাপিত, ইহা অতি দুর্ল্লভ।

আমি কৌলাচার গিরি মোহান্ত। সচ্চিদানন্দময় তারার সাধনা এবং তীর্থ পর্যটন আমার সারব্রত। বয়োধর্ম্মে জরাজীর্ণ হইয়াছি। আর পর্যটনের ক্ষমতা নাই। সংপ্রতি এই ভীষণ অরণ্যময় বিন্ধ্যাচল গিরিতে একটি বিজন গুহায় অবস্থান করিতেছি। মনের বাসনা এই মহাতীর্থে এক অষ্টধাতুমূর্ত্তি অষ্টভুজা প্রতিষ্ঠা করিয়া তৎসাধনায় জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিব। এই কার্য্য বহুব্যয়সাপেক্ষ; এমন মহাত্মা অতি বিরল, যিনি সাহায্য করিয়া আমার এই সদিচ্ছা পূরণ করেন। এইজন্য সাধারণের নিকট ১।০ পাঁচ সিকা করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি।

যিনি এই শুভকার্য্যে সাহায্য করিবেন, বিনিময় স্বরূপ তাঁহাকে আমার সাধন স্বোপার্জ্জিত বিশ্বজননী বিন্ধ্যাচলবাসিনী দেবী যোগমায়া মাতা প্রদত্ত উপরোক্ত রক্ষা কবচ বিনামূল্যে প্রদান করিব।

ভক্তিপূর্ব্বক এই কবচ ধারণে সমস্ত বিপদ হইতে পরিত্রাণ হয়। অকালমৃত্যু, জরা, গ্রহদোষ, শোক, রোগ, মনের সন্তাপ, দুরূহ ব্যাধি, দৈবদুর্ব্বিপাক, অভাব প্রভৃতি দূর হয়। বিশেষতঃ ব্যবসায় বাণিজ্যে সিদ্ধিলাভ, মামলা মোকদ্দমায় জয়, শত্রুনাশ, চাকরী না থাকিলে চাকরী, কৃষিকার্য্যে লাভ, শিল্পে উন্নতি হয় এবং লক্ষ্মী প্রসন্ন হন। ফল কথা সর্ব্বপ্রকারে সুখী ও উন্নতিশালী হওয়া যায়।

রবিবারে গোধূলিলগ্নে কুমারী কন্যার দ্বারা লাল সূতায় বাঁধিয়া পুরুষের দক্ষিণ বাহুতে এবং স্ত্রীজাতির বাম বাহুতে ধারণ করিলে বাত, বন্ধ্যাত্ব, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, মৃগী, হিষ্টিরিয়া, মূর্চ্ছা, কাশী, হাঁপানী, বাধক, মেহ, অম্ল, অম্লশূল, অর্শ, শিরঃপীড়া, একশিরা, পুরাতন ও পালাজ্বর, মৃতবৎসাদোষ প্রভৃতি তিন দিনের মধ্যে আরোগ্য হয়।

ইহার সহিত আবার আমি এতদিন দুর্গম তীর্থসমূহ, পুণ্যতম বন, উপবনে ভীষণ পর্ব্বত কন্দরে বিভীষিকাময়ী শ্মশানভূমি পরিভ্রমণ করিয়া যে সকল লুপ্ত গুপ্ত বিদ্যার উদ্ধার করিয়াছি মঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তিগণকে আমি তাহা হইতে গৃহীর উপযোগী কয়েকটী আশ্চর্য্য বিদ্যা প্রদান করিব। কিন্তু ইহা কিছু বিলম্বে পাইবেন। কারণ ইহা শাস্ত্রানুসারে শূদ্র দ্বারা রক্তমসি (লালকালি) প্রস্তুত করাইয়া ব্রাহ্মণের হস্তে লিখিত হইয়া বিতরণ হইবে। রক্ষা কবচ পত্র প্রাপ্তি মাত্র ভিঃ পিঃতে প্রেরিত হইবে।

আমি আজীবন শান্তির ক্রোড়ে পালিত। কেবল দেবী প্রতিষ্ঠার জন্যই আমার এই উদ্যম। সুতরাং আমার পরম ভক্ত সেবানন্দ ব্রহ্মচারীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় টাকা বা পত্র লিখিলেই এই দুর্ল্লভ কবচ প্রাপ্ত হইবেন। মাতৃসেবার ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র এবং ডাকমাশুলাদি।০ চারি আনা মোট দেড় টাকা মাত্র।

পত্র লিখিবার ঠিকানা—**সেবানন্দ ব্রহ্মচারী।**

পোঃ বিন্ধ্যাচল, জেলা মৃজা।

বামাবোধিনী পত্রিকা

No. 622. June, 1915.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫২ বর্ষ। ৬২২ সংখ্যা। { জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২। জুন, ১৯১৫। } ১০ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

আমাদের কথা।

(উপন্যাস)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সরলা।

(১)

আর তো অধিক দিন বাঁচিব না, আমার অসার জীবন-কাহিনী কিছু লিখিয়া রাখি। তোমাদের সহিত আমার আর কোনো সম্বন্ধ নাই—কাহারও খাতির রাখিয়া কথা বলিব না। শীঘ্রই সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিব; এখনো হাত চলে,—এই বেলা লিখিয়া রাখি, আমার জীবনের অবশিষ্টাংশ আর কেহ ইচ্ছা করেন,—লিখিবেন।

আমাদের নিবাস নদীয়া জেলার অন্তর্গত ······গ্রামে। গ্রামখান প্রকাণ্ড, অনেক ভদ্র লোকের বাস এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলিও বেশ সুসম্পন্ন। আমাদের অবস্থা পূর্ব্বে ভালই ছিল, এক্ষণে খারাপ। প্রকাণ্ড বাড়ী, কিন্তু মেরামতের অভাবে তাহা শ্রীহীন। পিতা দরিদ্র ছিলেন, কষ্টে সৃষ্টে সংসার চালাইতেন, তাহার উপর আমরা তিনটি ভগ্নী ও একটি ভাই।—আরও অনেক হইয়া মরিয়া গিয়াছে। আমার বড় দিদির বিবাহ দিতেই বাবার যাহা কিছু ছিল তাহা গিয়াছে। মেজ দিদির বিবাহ আমাদের পাড়াতেই হইয়াছে। তাঁর স্বামী তাঁর অপেক্ষা মাত্র তিন বৎসরের বড়; ছোট বেলা থেকেই দুজনে বেশ ভাব-সাব ছিল; তারপর যখন মেজদিদির বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয় এবং বাবা বাড়ী বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার করিতে যাইতেছিলেন, তখন দাদাবাবু (মেজদিদির স্বামী) কলিকাতায় পড়েন, এবং সেই ভাবী পাত্রটি মাত্র এনট্রান্স পাশ অথচ দেড় হাজার টাকা চাহিয়াছে শুনিয়া বিনা টাকায় তিনি মেজদিদিকে বিবাহ করেন;—এজন্য চারি দিকে তাঁহার ধন্য

ধন্য পড়িয়া যায়। মোট কথা মেজ'দিদির রূপেই সত্যেন্দ্র দত্ত মহাশয় ভুলিয়াছিলেন, —এ ছাড়া বাল্য-প্রণয়ের অঙ্কুর তো ছিলই। সেই থেকে এখানকার ইস্কুলের হেড্ মাষ্টার মুখার্জ্জী সাহেবের স্ত্রীর কাছে মেজ-দিদি লেখা পড়া ও শিল্প কার্য্যাদি শিখিতে আরম্ভ করেন,—অবশ্য পূর্ব্বেও মেজদিদি বেশ লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন। দাদা বাবু মুখার্জ্জী সাহেবের বড় প্রিয় ছাত্র ছিলেন।

বিবাহের এক মাস পরেই বড়দিদির মৃত্যু হয়। এখন আমরা তিন ভাই বোনে আছি। দাদা কলিকাতায় পড়েন, দাদা বাবু বাড়ীতেই থাকেন। এদিকে আমার বিবাহের বয়স হইয়া আসিল,—ত্রয়োদশ! লোকে বলিত আমি নাকি ভারি "সুন্দরী"। কেহ বলিত, "এমন রূপ রাজসিংহাসনেই শোভা পায়!" দাদাবাবু বড় বেহায়া, তিনি বলিতেন—"সরলা, আর দু'বছর পরে তোর দিকে আর চাওয়া যাবে না।" অর্থাৎ কিনা রূপের ঝলসে তাঁর চোখ ঠিক্‌রে যাবে—পুরুষ মানুষের চোখ কি না! ঠিক্‌রাইতে বড় বেশী ক্ষণ লাগে না। আমি বলিতাম,—"নীল চস্‌মা পরিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ো",—তিনি হাসিতেন।

বলা বাহুল্য বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছিল। বাড়ীটি এর মধ্যেই বন্ধক পড়িয়াছে, বাবার অর্থ দিবারও তেমন ক্ষমতা নাই, এজন্য দত্ত মহাশয়ের মতই চোখ ঝল্‌সাক—আইবড় ছেলের বাপ জাতীয় যে এক শ্রেণীর জীব আছেন, তাঁহারা বড় ঘেঁসিতেন না। মানুষ যতই যা হোক, রূপচাঁদের চেয়ে রূপ সে কোথায় পাইবে! তাঁদের চোখ রূপে ঝল্‌সায় না। একটি কলেজের ছেলের নাকি আমাকে দেখিয়া মন কেমন করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার মাতুল পড়ার খরচ দিতেন, অতএব রুধির চাই। তিনি শেষে ক্ষেপিয়া দেশান্তরী হইয়াছেন, কি কোনো ঔপন্যাসিক চরিত্রের মত রোমাণ্টিক্ ভাবে জীবন অতিবাহিত করিতেছেন তাহা খবরের কাগজে লেখে নাই।

একদিন বৈকালে বাবা হঠাৎ মাকে বলিলেন, "মেয়ে সাজাও।" সাজিবার খুব বেশী কিছু ছিল না, তবে যা-হয় করিয়া মেজদিদি আমায় দালানের কাছে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দিয়া আসিলেন। আমি এলো চুলেই গিয়া হাজির হইলাম, বাবা হাত ধরিয়া বসাইলেন, মেজদিদির মতলব আমার মাথা-ভরা কোঁক্‌ড়া কোঁক্‌ড়া চুল-গুলি দেখানো,—তাই চুল বাঁধিলেন না।

আমি বড় বেহায়া,—ক্রমে নমুনা পাইবে। মেজদিদির মুখে শুনিলাম, যিনি দেখিতে আসিবেন সম্প্রতি তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে। আবার "সংসার" করিবেন। এহেন রসের নাগর গুণের সাগরকে একবার ভাল করিয়া দেখিতে কোন্ মেয়েমানুষের না ইচ্ছা করে? কিন্তু চোখ তুলিতে লজ্জা করিতে লাগিল; তথাপি মরিয়া ফুটিয়া, মাড়ি চাপিয়া, একবার চোখ তুলিয়া ফেলিলাম। গায়ে

পিরাণ, কাঁধে কোঁচানো চাদর, পরণে মিহি কালোপেড়ে ধুতি, পায়ে সাদা মোজা, গায়ে আতরের গন্ধ ভুর ভুর করিতেছে। চাপ দাড়ী, মাথায় তেড়ি, অধরে তাম্বুল-রাগ, চুল কালো! কিন্তু তিনি চলিয়া গেলে মেজদি মার কাছে বলিয়াছিলেন, "যে রকম মুখ তাতে বারো আনা চুল সাদা হইলে তবে মানাইত।" আমায় দেখিতে আসিয়া, দেখিলাম ভারি আহ্লাদ; যতক্ষণ ছিলেন, দাঁত কয়টি বাহিরেই ছিল,—সম্প্রতি পত্নী-বিয়োগ হইয়াছে কি না! পুরুষ-মানুষেরা ভয়ানক প্রেমিক,—এক তিল প্রেম ভিন্ন থাকিতে পারেন না। কত উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের প্রেমিকও নাকি বিবাহ করিয়া ফেলেন! —শত খুন মাপ।

তোমরা খেংরা লইয়া আসিবে—"কি! স্বামীর রূপের ব্যাখ্যা!" দোহাই তোমাদের—তখনো আমার বিবাহ হয় নাই, বিবাহের পর কি আর এ সব কথা মনে স্থান পাইত? ছি ছি! আর ঈশ্বরেরও বড় অন্যায়, তিনি কি অশুভ-ক্ষণেই মেয়েমানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহার গায়ে আগুন চাপিয়া ধরিলেও পড়্ পড়্ করিয়া পুড়িয়া উঠে, মুখে কুই-নাইন পুরে' দিলেও মিষ্ট লাগে না, আর কানের গোড়ায় কেনেস্তারা বাজাইলেও ঝাঁটার বাড়ি দিতে ইচ্ছা করে,—অবশ্য পুরুষমানুষে এ সব বিশ্বাস করে না। বলিয়াছি তো, আমি বেহায়া; তোমরা খেংরাই মার, আর হাতা-বেড়ী পোড়াইয়াই মুখে দাও, আমি সত্য কথা বলিবই বলিব। আমায় দেখিবার সময় ও একটি প্রশ্নও করিয়াছিলেন আমিও সপ্রতিভ ভাবে উত্তর দিয়াছিলাম,—ভারি হাসি!

২

বিবাহ যথাসময়ে এবং যথানিয়মেই হইয়া গেল। আমি যে মটা দিয়া বৌ সাজিয়া শ্বশুর বাড়ী চলিলাম। এখনকার মেয়েরা শ্বশুর বাড়ী যাইবার সময় বড় একটা কাঁদে না—কিন্তু আমি কাঁদিলাম, কেন কাঁদিলাম, তাহা তোমরা পুরুষ মানুষ কি বুঝিবে? তোমরা জানো মেয়ে মানুষের কান্না মায়া-কান্না, আর তোমাদের আফিসের সাহেবের কানমলা খাইয়া যে কান্না তাহাই আসল কান্না। যাই হোক, আমি কাঁদিলাম। মা এবং মেজদিদিও কাঁদিলেন। যাইবার সময় মেজদিদি স্বামি ভক্তি ইত্যাদি বিষয়ক স্ত্রী-জাতির পক্ষে বিশেষ আবশ্যকীয়, গভীর গবেষণা-পূর্ণ একটি সুদীর্ঘ লেকচার দিলেন। মাও ত্রুটি করিলেন না।

এ সকল শিক্ষা সাধারণতঃ আমাদের সমাজে স্ত্রীলোকের যাহা হইয়া থাকে আমার তাহা অপেক্ষা কোনো অংশেই কম ছিল না। সাবিত্রী-উপাখ্যান নলোপাখ্যান তো আমার কণ্ঠস্থই ছিল। পথে যাইতে যাইতে আবার সব ঝালাইয়া লইলাম, শানাইয়া রাখিলাম,—শ্বশুরবাড়ী গিয়াই অভিনয় আরম্ভ করিব।

রেলের পথ, যাইতে প্রায় পাঁচ ছয়

ঘণ্টা লাগিল ; পথে দশ পনেরোটা ষ্টেশনে গাড়ী থামিল। যেখানে যেখানে গাড়ী থামে, আমার স্বামী মহাশয় পানের দোনা হাতে করিয়া আমায় পান দিতে আসেন, মুখে বলেন "নেও না নেও, আমার কাছে লজ্জা করিতে আছে?" মনে মনে বলিলাম, "একটুও না।" তোমরা যদি মেয়েমানুষ হইতে তবে বুঝিতে পারিতে, এই থিয়েটারী ধরণের লজ্জাভঞ্জন-রসাত্মক আপ্যায়িতে লজ্জা আরও ডাকিয়া আনে কিনা। যা'হোক তাঁর শ্রীচরণের দাসী সরলা সর্ব্বনাশী তাঁহার শ্রীমুখের আজ্ঞা পালনে ক্রুটি করে নাই।

আমি ঘোমটা দিয়া বসিয়া ছিলাম গ্রীষ্মকাল, গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতেছিল। করি কি?—তোমাদের শাস্ত্রে বলে যে বিবাহ নামক লজ্জাকর ঘটনার পর হইতে এ বাঁদীর জাতির কালামুখ আর মনুষ্য-সমাজে দেখাইতে নাই!—কিন্তু তোমরাই নিয়ম করিয়াছ, আবার তোমরাই তবে অমন করিয়া মর কেন? তার সাক্ষী দেখ না কেন, যেখানে যেখানে গাড়ী থামে, অমনি সব রসিক ছোক্‌রা টিকিট্-কলেক্টরের দল মেয়ে-কামরার সম্মুখে আসিয়া হাট বসাইতে লাগিল। নবা রসিক প্যাসেঞ্জারের দল কেবল মেয়ে-গাড়ীর সামনে দিয়া অকারণ যাওয়া-আসা করিবে,—তার মধ্যে আমার স্বামীর বয়সীও অনেক থাকেন, মনে মনে বলিলাম, "মুখে আগুন তোমাদের!"

আমার কামরায় আমাদের জাতির আর একটি জীব ছিলেন,—সুন্দরী বটে, বয়সও অল্প, চোখে চসমা, পায়ে জুতা, হাতে একখানি ইংরাজি খবরের কাগজ, মুখ খোলা, চাহনি সপ্রতিভ এবং গম্ভীর। বুঝিলাম বিলাতী বাগানের দেশীয় ফুল! সুন্দরী বটে, বলিহারি রূপ! কিন্তু কৈ এর মুখের পানে তো কেহই চাহে না, যেন চাহিয়া থাকিতে সাহসই করে না! যত বক্র দৃষ্টি এই ঘোমটার মধ্যে! একবার ভাবিলাম মুখটা খুলিয়া দিই, তাদেরও গোজন্ম সার্থক হোক, আমার মুখেও একটু বাতাস লাগুক, তাহা আর করিলাম না,—কি জানি যদি পাপ হয়!

একবার আমার স্বামী মহাশয় আপ্যায়িত করিয়া চলিয়া গেলে সেই স্ত্রী-লোকটি আমায় জিজ্ঞাসা করিল—"ঐ ভদ্র লোকটি কি তোমার স্বামী?" তাহার উপর বড় রাগ হইল, কারণ দেখিলাম জিজ্ঞাসার সুরটি যেন একটু ব্যঙ্গ রসে মাখানো। কি করি?—ভদ্রতার খাতিরে তিন চারি বার ঢোক্ গিলিয়া উত্তর দিলাম "হুঁ"। বলি রাগ হয় না গা?—তোমরা যদি দুর্ভাগ্যক্রমে পথে যাইতে যাইতে হোঁচোট্ খাইয়া পড়িয়া যাও, তখন আগে চারি দিকে তাকিয়ে দেখ, কেহ দেখিতে পাইল কিনা; যদি দেখ অমুখ দেখিয়া ফেলিয়াছে, তবে ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে মনে মনে তাহার মুণ্ডপাত কর কি না?

অবশেষে একটি ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ী থামিলে, স্বামী মহাশয় মহা আগ্রহের সহিত গাড়ীর দরজা খুলিয়া বলিলেন,

"এস।" অতি লজ্জার সহিত গাত্রোত্থান করিয়া জড়-ভরতের মত আস্তে আস্তে অগ্রসর হইলাম। গাড়ীর দরজার কাছে যেতেই স্বামী মহাশয় হাত ধরিয়া নামাইলেন এবং হাত ধরিয়াই লইয়া চলিলেন, লজ্জায় মরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিল। সেখানে বাবা আসিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। এখন সঙ্গে বাপের বাড়ীর পুরুষমানুষ কেহ নাই। মেজদিদির চাকরাণী হিমী সঙ্গে আছে, কিন্তু স্বামী মহাশয় আসিয়া নিজে আমার হাত ধরিলে সে আর কি করিবে—গো বেচারীর মত পেছনে পেছনে আসিতে লাগিল। গরম প্লাটফরমে পায়ের তলায় ফোস্কা পড়িয়া উঠিল। কিন্তু মেয়েমানুষের অনেক সয়—আমারও সহিল। যথাসময়ে শ্বশুর-বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলাম।

৩

আজ আট দিন হইল বাপের বাড়ী হইতে আসিয়াছি। বিবাহের আনুষঙ্গিক আচার-ব্যবহার সবই সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কিছুদিন পরে বাবা আসিয়া আমায় লইয়া যাইবেন এইরূপ কথা ছিল। কিন্তু এখান হইতে স্পষ্ট জবাব গিয়াছে "এখন পাঠানো হইবে না;" কি জন্য তাহা পরে জানিতে পারিবে।

শ্বশুর-বাড়ীর পরিচয়ে তোমাদের বিশেষ লাভ নাই; তবে একটু শুনিয়া রাখ,—এদের বিষয়-সম্পত্তি বেশ আছে, বাড়ীটিও বেশ জমকালো, উপর নীচে দশ বারোটি কুঠারী আছে, বাগান-বাগিচাও আছে, এঁরা দুই ভাই। আমার দেবর কলিকাতায় চাকরী করেন, স্বামী মহাশয় পেন্‌সন্ লইয়া বাড়ীতে আছেন,—পেন্‌সনের বয়স অবশ্য হয় নাই, তবে চাকরী করিতে আর ভাল লাগে না বলিয়াই নাকি ইচ্ছা করিয়া পেন্‌সন্ গ্রহণ করিয়াছেন। আমার সপত্নী একটি কন্যা এবং তিনটি পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন। আরও কতকগুলি নাকি হইয়া মরিয়া গিয়াছে। কন্যাটিই বর্ত্তমানে বড়; কিন্তু সে বিধবা এবং শ্বশুরালয়েই থাকে—তাঁরা বিবাহের সময়েও নাকি পাঠান নাই, তাহার পক্ষে এ বিবাহ দর্শন করা বড় সুখকর হইত বলিয়াও বোধ হয় না। ছেলেগুলি ছোট, আহা তাদের মা নাই। সর্ব্বদা পিসীর কাছেই থাকে, আমার কাছে বড় আসিতে চাহে না। আমার ছোট জা'য়ের উপর ষষ্ঠীর কিছু বেশী রকম অনুগ্রহ দেখিলাম। পাঁচ ছেলে ছয় মেয়ে—এখনো বেশ বয়স আছে। তিনি আমায় দিদি না বলিয়া 'বড়-বৌ' বলিতে লাগিলেন। মানুষটি বেশ, কথাগুলিও বেশ মিষ্ট, স্বভাবটা যেন একটু ভাল মানুষ গোছের। তিনটি মেয়ে পার করিয়াছেন। তারা শ্বশুর-বাড়ী থাকে, এখনো তিনটি বাকি। আমার ছেলেদের পোষ মানাইবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলাম, কিন্তু তারা আমার কাছে বড় ঘেঁসে না—(তোমরা পুরুষমানুষেরা বলিবে, "কালামুখী? তোর বিয়ে না হ'তেই ছেলে-মেয়ে কোথা হতে আসিবে রে?"—প্রভু সকল, এসব

তোমাদেরই মহিমা, তোমাদেরই লীলা!) সংসারে আর আছেন একটি বিধবা প্রৌঢ়া রমণী—তিনি আমার ননদিনী রায় বাঘিনী। মানুষটি জবরদস্ত বটে। আমি আসা অবধি আমার লাগাম কসিয়া রাখিয়াছেন—দ্বিতীয় পক্ষের বৌ, আসকারা পাইলে পাছে বেয়াড়া হইয়া যাই; আমিও ভয়ে জুজু হইয়া আছি—শক্তরে সবাই ভক্ত।

এ সব কথা যাউক, আমি এখানে আসিয়া অবধি স্বামি-সেবা-রূপ ব্রত অনুষ্ঠানের খুব প্রশস্ত সুযোগ পাইয়াছি। কয়জন ভাগ্যবতীর এমন জোর কপাল? ইতিপূর্ব্বেই আমার স্বামীর নাকি কি ব্যারাম ছিল—এ নাকি কি বিলাতী ব্যারাম, বড় মানুষদেরই হয়! আজ চারি দিন বড় বাড়িয়াছে,—শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছেন, সেবা-শুশ্রূষা আমিই করিতেছি, সমস্ত রাত্রি ঘুম হয় না, দুপুর বেলা একটু আঁচল পাতিয়া গড়াগড়ি দিতে গেলে আমার ননদ ঠাকুরাণী তাঁহার আতার বিচির মত মিশি দেওয়া দাঁতগুলি বাহির করিয়া কর্কশস্বরে, আমার মাতৃ-পিতৃ-উচ্চারণ পূর্ব্বক, বুঝাইয়া দিয়া থাকেন যে, স্বামি-সেবা করিয়া আমার বিফল নারীজন্ম সার্থক করাইবার জন্যই তাঁহার সহোদর, এত কষ্ট স্বীকার করিয়া, এই শেষ বয়সে, "পরের বালাই ঘাড়ে করিয়াছেন।" তাঁর সেই সময়কার মুখ-ভঙ্গিমা দেখিলে, ছোট বেলায় একবার চিড়িয়াখানায় গিয়া ছিলাম, তথাকার এক প্রকার জীবের কথা মনে পড়িত।

জামাতার অসুখের কথা শুনিয়া বাবা দেখিতে আসিয়াছেন, আর অনুনয় বিনয় করিয়া যদি অনুমতি পান, তবে আমাকে লইয়া আসিবেন, কিন্তু আমার স্বামীর অসুখ ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগল, বেশী কথা কহিবারও শক্তি রহিল না, বাবা ফিরিয়া গেলেন। আমার স্বামী আজ কাল আমায় আর বড় কিছু বলেন না; আমায় দেখিতে যাইয়া তাঁর মুখে যে হাসির প্রদীপ জ্বলিয়াছিল, আজ কাল তাহা নিবিয়া গিয়াছে! তাহাতে আর তেল নাই—শুষ্ক সলিতা আছে মাত্র।

একদিন আমি ঘরে গেলে, কিছুক্ষণ ম্লান দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া ছিলেন; আমি জড়োসড়ো হইয়া, ঘোমটা টানিয়া, দেওয়ালের সঙ্গে মিশিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। দেখিলাম তাঁহার চক্ষে জল; ছল-ছল-চক্ষে আমার দিকে চাহিতে লাগিলেন। অবশেষে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ক্ষীণকাতর-স্বরে আমায় বলিতে লাগিলেন—"আমায় ক্ষমা করিয়ো, আমি মহাপাতকী, আমি নর-রাক্ষস, বুঝিবা জন্মের মত তোমায় ভাসাইলাম,—" কণ্ঠ-রোধ হইয়া আসিল, আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না; কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মনোবেগ একটু সামলাইয়া লইয়া আবার বলিলেন—"ধিক্ আমাদের সমাজের নিষ্ঠুরতাকে,—আমার মত পাষণ্ডের শাসন নাই! পুরুষেরা যতদিন আমাদের

সমাজে যথেচ্ছাচার—" কি বলিতে যাইতে ছিলেন, আর বলিতে পারিলেন না, কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া আসিল। জল চাহিলেন, জল খাওয়া বারণ, ডাবের জল ছিল, আনিয়া পান করাইলাম, আমার কান্না আসিয়াছিল, চক্ষু জলে ভরিয়া গিয়াছিল, বুকের মধ্য হইতে যেন কি-একটা ভারী পদার্থ উঠিয়া আসিয়া কণ্ঠে বাধিয়াছিল, ঢোক গিলিতে পারিতেছিলাম না। কি মনে হইয়া যে তখন কান্না আসিতেছিল, এখন তাহা ভাল মনে নাই—সে আজ দশ বৎসরের কথা। ডাবের জল পান করিয়া একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া আবার বলিলেন—"তোমার দাদা শীঘ্র ডাক্তারি পাশ করিবেন, ঈশ্বরেচ্ছায় দু'পয়সা রোজগার করিবেন, তোমার কষ্ট হইবে না। এখানে থাকিয়ো না—" উপযাচক হইয়া এক দিনও কথা কহি নাই, আজ কহিলাম,—জিজ্ঞাসা করিলাম, "আজ কি শরীর বড় খারাপ?" তিনি বলিলেন, "না না, তেমন খারাপ নয়, বেশ আছি, তবু—" কি জানি কেন, আপনা আপনিই যেন দময়ন্তীর সেই কথাটি মনে আসিল,—আপন মনে বলিতে লাগিলাম :—

"যদি মাং ত্বং মহারাজ ন বিহাতুমিহেচ্ছসি।
তৎ কিমর্থং বিদর্ভাণাং পন্থানং মাং উপেষ্যসি॥

আবার ভাবিলাম "কি জানি—আমি কি বুঝি? মন্দ কথা ভাবিতে নাই—আর ভাবিব না।" এমন সময় সিঁড়িতে জুতার মস্‌মস্ শব্দ হইল, বুঝিলাম ডাক্তার বাবু আসিতেছেন, আমি আমার জায়ের ঘরে গিয়া ঢুকিলাম। তখন অপরাহ্ণ, ডাক্তার বাবু চলিয়া গেলে আমার ননদ আমায় বলিলেন, "বড় (!) বৌ, আজ তুমি ছোট বৌএর ঘরে শুইয়ো, এ ঘরে আর তোমার আজ শুইবার দরকার নাই—ও ঘরে আর যেয়ো না।" তথাস্তু। মনে করিলাম আজ বুঝি ভালই আছেন, তবে? আমার মলের শব্দে হয়তো তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত হইবে, এই জন্য যাইতে বুঝি বারণ করিলেন। আর আজ বুঝি ঠাকুরঝির আমার উপর দয়া হইয়াছে, তাই আমায় আজ ঘুমাইতে দিবেন। আজ আর তবে ওদিকে যাবো না। আমি অনেক সময় অনাহূতভাবেই "তাঁর" ঘরে যাইতাম—বিয়ের ক'নে হ'লে কি হয়? বড়বৌ যে!

রাত্রে যথাসময়ে আমার জায়ের ঘরে গিয়া শয়ন করিলাম, তাঁর কোলের মেয়েটি এরই মধ্যে আমার বড় 'নেওটো' হইয়াছে, সে তাহার মায়ের কাছ থেকে উঠিয়া আসিয়া আমার কাছে দাঁড়াইল, বলিল, "দেতাইমা, আমি তোমাল তাছে ছোবো।" তাহাকে কোলের মধ্যে লইয়া শয়ন করিলাম। একে তো মেয়েমানুষের ঘুমের বদনাম আছেই, তার উপর আজ বিছানার উপর শুইয়াছি (অন্য দিন আমি প্রায় আঁচল পাতিয়া "তাঁর" পালঙ্কের নিকটে মেঝেয় শুইতাম), মনটাও একটু সুস্থ আছে, কারণ মনে করিলাম, আজ বুঝি ডাক্তার বাবু

অনেকটা ভাল দেখিয়া গিয়াছেন, তন্দ্রা আসিতে লাগিল, কিন্তু কি-জানি-কেন, পূর্ণ-নিদ্রা আসিল না।

অন্য দিন জড়োসড়ো হইয়া শুইয়া থাকি, আজ একটু হাতাপাতা মেলাইয়া একটু আরাম করিয়া শুইয়াছি। গ্রীষ্মকাল, ঘরের জানালা সব খোলা ছিল, নৈশ নিদাঘের মৃদুমন্দ সমীরণ জানালা দিয়া ঝির্ ঝির্ করিয়া ঘরে আসিয়া, আমার পরণের ফিন্‌ফিনে পাতলা কাপড়খানিকে এখানে-ওখানে ইচ্ছামত নাড়া চাড়া দিয়া, কখনো বা কাপড় ফুঁড়িয়া আমার ঘর্ম্মাক্ত চর্ম্মে একটু ফুঁ দিয়া, আবার অপর জানালা দিয়া বাহির হইয়া, আবার কাহার ঘরে, আমার মত কাহারো সঙ্গে রসিকতা করিতে চলিল। কোনো বালাই নাই। মনে ভাবিলাম "বাপু! এখন বড় স্ফূর্ত্তি করিয়া বেড়াইতেছ, পরকালের ভাবনা একবার ভাবিতেছ না। একবার মেয়েমানুষ হইয়া জন্মাইয়া স্বামি-সেবা কর, নহিলে স্বর্গে যায়গা পাবে না যে—" কে শোনে? আমার সর্ব্ব শরীরে অলসের মদিরা ঢালিয়া রাখিয়া অম্লান-বদনে চলিয়া গেল। আমি আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলাম।

ভাবিলাম "আমার তো বিবাহ হইল, সকলেরই হয়, আমারও হইল, মেজদিদি দাদাবাবু, মা সকলে শিখাইয়াছেন স্বামী দেবতা, আমি তো এখন দেবতা পাইয়াছি; কিন্তু আমি ছেলে মানুষ, দেবতা লইয়া কি করিব? দেবতা লইয়া কি করিতে হয়? আমায় কে শিখাইবে! বুঝি মানুষের সঙ্গে বিবাহ হইলে আমার আহ্লাদ হইত। আচ্ছা, মানুষের সঙ্গে দেবতার কেন বিবাহ হয়? সকলের স্বামীই কি তবে দেবতা? কৈ, দাদাবাবুকে তো কেমন মানুষের মত বোধ হয়। হায়! আমার স্বামী যদি একটু মানুষের মত হইতেন! তাঁর অসুখ, মুখের দিকে তাকাইলে বড় দুঃখ হয়, মেজদিদির শ্বশুরের যখন বড় অসুখ করিয়াছিল, তখন তাঁর দিকে চাহিয়া আমার ঐ রকম বড় দুঃখ হইত। মা কালী, তাঁকে ভাল কর। তিনি কত লেখাপড়া জানেন, আমি কিছুই বুঝিতে পারি না, আমায় তিনি সব বুঝাইবেন, কি করিলে তাঁর তৃপ্তি হয় আমি কেমন করিয়া বুঝিব? ঠাকুরঝি যাহা করিতে বলেন আমি তাই করি। তাহাতে কি তাঁহার সেবার ত্রুটি হয়? আমার কি পাপ হয়? তবে কি হবে?—এবার আমি বাড়ী গিয়া মেজদিদির কাছে ভাল করিয়া শিখিব।"

হাই উঠিতে লাগিল, চোখ টানিতে আরম্ভ করিল, ঘুমাইয়া পড়িলাম।

৪

পর দিবস প্রাতে বাড়ীতে গোলমাল শুনিয়া হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল!—ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম, এলো থেলো হ'য়ে এদিকে-ওদিকে চাহিতে লাগিলাম, হঠাৎ যেন কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না, বুকের মধ্যে ধড়ফড় করিতে লাগিল, —ব্যাপারখানা কি!

তখন নেহাত খুকীটি নই,—ঠাকুরঝির রোদনের বাক্যবিন্যাসেই সব বুঝিলাম,—আমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে। আমার তখনকার মনের ভাব আমি তখন নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই, তা আর আজ দশ বৎসর পরে মনে করিয়া তোমাদের কি বুঝাইব ?

আমায় তখন যে কি ভাবিতে হইবে, কি করিতে হইবে, ঘর থেকে বাহির হইব কি না, কিছুই যেন স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না। হতবুদ্ধি হইয়া কিছুক্ষণ বিছানায় বসিয়া ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক তাকাইতে লাগিলাম। বেশ শুনিতে পাইলাম, ঠাকুরঝি কাঁদিয়া আছাড় পিছাড় করিতেছেন, আর কপাল ভাঙিয়া বুক চাপড়াইয়া বলিতেছেন "ওরে কি কালনাগিনী বৌ ঘরে এনেছিলাম রে—" ইত্যাদি। বুঝিলাম এই সর্ব্বনাশীই যত অনর্থের মূল।

স্বামী মরিলে কাঁদিতে হয়, এটা বুঝিবার মত বয়স তখন আমার হইয়াছিল; কিন্তু আমার ঠিক যে তখনই কান্না আসিয়াছিল, তাহা নহে। বলিয়াছি তো, আমি তখন কি করিব, কি ভাবিব, কার কাছে যাইয়া দাঁড়াইব, কিছুই বুঝিয়া পাইতেছিলাম না। একটু পরে কিন্তু আমি কাঁদিয়াই ফেলিলাম, চোখ রগড়াইয়া রগড়াইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। কাঁদিয়া যেন আমার বড় তৃপ্তি হইতে লাগিল, কিন্তু তখন মনে কি ভাবের উদয় হইয়া কাঁদিতে ছিলাম তাহা আমার যেন এখন ঠিক মনে আসিতেছে না। যেন তাহা অনেকটা অভিমানেরই কান্না, যেন কোনো আপনার জনের হাতে মার খাইয়াই সে কান্না। যেন মা ও মেজদিদি ঘোষেদের বাড়ী নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়াছেন, আমি ঘুমাইয়াছিলাম, ডাকিয়া লইয়া যান নাই, যেন সেই ঘুম থেকে উঠিয়াই এই কান্না ; কিম্বা যেন বাবা, মা, দাদা, ও মেজদিদির সঙ্গে গঙ্গাস্নানে যাইতেছিলাম, পথে প্রান্তরের মাঝে আমি হারাইয়া গিয়াছি, আর এদিকে সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে, কালো মেঘে আকাশ ছাইয়াছে, ঝক্‌মক্ বিদ্যুৎ চমকিতেছে, যে যাহার আশ্রয় পানে ছুটিয়া চলিয়াছে,—আমার পানে কেহ চাহিতেছে না, আর আমি বালিকা, একাকিনী, প্রান্তরমাঝে নিরাশ্রয়া, পথ-হারা, অনাথিনীর মত কিছুক্ষণ এদিকে ওদিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া, অবশেষে কাঁদিয়া ফেলিয়াছি। কড় কড় মেঘগর্জ্জনে আমার সে ক্রন্দনধ্বনিও ঢাকিয়া ফেলিতেছে,—এ যেন ঠিক সেই কান্না। এত দিন পরে তোমাদের কেমন করিয়া বুঝাইব, সে কান্না কেমন কান্না ? সে কান্নার মধ্যে রাগ, দুঃখ, অভিমান এই তিনে মিশিয়া কেমন একটা কি ভাব,—তাহাতে শোকের চিহ্নমাত্রও ছিল না। সে কান্না স্বামিশোকের কান্না বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয়,—তাহা আমি বলিতে বসি নাই।

সপ্তাহ কাল অতীত—আমি বিধবা হইয়াছি। বাবা আসিয়াছেন, আমায় লইয়া যাইবেন, এবার অনুমতি পাইয়াছি, আজ মার কাছে যাইব, মেজদিদির কাছে যাইব, দাদা বাবুর কাছে যাইব।

যে দিন আমি আইবড় মেয়ে চুল এলো করিয়া—র সম্মুখে আসিয়া রূপ দেখাইতে বসিয়াছিলাম, সেদিন হইতে আজিও এক মাস অতীত হয় নাই, এলো চুল ছিল, বাঁধা হইল, আবার এলাইয়া বাড়ী চলিলাম, সাদা সিঁথি ছিল, সিন্দুর পরিলাম, আবার মুছিয়া বাড়ী চলিলাম। বাবার কাছে গহনা পরিতে পাই নাই,—গা-ভরা গহনা পাইলাম, পরিলাম আবার খুলিয়া বাড়ী চলিলাম। এক মাসের মধ্যে আমার সব হইল, সব ফুরাইল! মুহূর্ত্তমধ্যে জন্মিলাম, বাঁচিলাম, মরিলাম, মুহূর্ত্তমধ্যে ফুটিলাম, ঝরিলাম, শুকাইলাম। মুহূর্ত্ত কালের জন্য জ্বলিয়া উঠিলাম, তখনি নিবিলাম। আজ আমার সব ফুরাইল! সবই কি ফুরাইল? না, কেবল সুখের দিন ফুরাইল—দুঃখ কি ফুরায়?

আমার "আড়াই দিনের বাদসাহী" আড়াই দিনেই শেষ হইল, আমার জীবন-নাটকের একই গর্ভাঙ্কে কুমারী সাজিলাম, এয়ো সাজিলাম, বিধবা সাজিলাম। তিন লীলা একই আসরে দেখাইলাম। আমার রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস, একই পরিচ্ছেদে সম্পন্ন হইয়া গেল। আর কি চাই? "অপরং বা কিং ভবিষ্যতি"র প্রতীক্ষায় বাবার সঙ্গে বাড়ী চলিলাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,
এম, এ।

বারাণসী-তত্ত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

একাদশ অধ্যায়।

আদম পুরা।

বারাণসীধামের উত্তর-পূর্ব্ব দিক ব্যাপিয়া আদম পুরা মহল্লা অবস্থিত। উত্তরে রেলওয়ে, দক্ষিণ-পশ্চিমে কোতোয়ালী, দক্ষিণ পূর্ব্বে গঙ্গা এবং পশ্চিমে জাইত পুরা। মহল্লার দক্ষিণাংশ ভেদ করিয়া চেতগঞ্জ হইতে রাজঘাট এবং মচ্ছোদ্রি হইতে পুল পর্য্যন্ত একটি রাস্তা চলিয়া আসিতেছে। রাস্তা ও নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানের বাটীগুলি পাকা এবং মধ্যবিৎ হিন্দুদিগের দ্বারা আবাসিত। মহল্লার কেন্দ্রটি কাঁচা এবং গরীব মুসলমানদিগের আবাস-ভূমি। উত্তর দিকে অনেকগুলি পুষ্করিণী আছে। তন্মধ্যে "লড্ডু সুরিয়া" এবং "গোয়াল গদ্দাই" সুবৃহৎ। এই স্থান হইতে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড চলিয়া গিয়াছে। তিলিয়া নালা ঘাট হইতে

বরুণার উপরিস্থ পুলকোহানা নামক সেতু পর্য্যন্ত একটি রাস্তা আড়ভাবে মিলিত হইয়া সারনাথ-অভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। এ স্থানটিতে ধ্বংসাবশেষ চিহ্নগুলি বিদ্যমান আছে। এখানকার বাজারগুলির প্রাসিদ্ধি নাই। যতদিন নদীর বাণিজ্য ছিল, ততদিন স্থানটিও বর্দ্ধিষ্ঠ ছিল। এখন নদী অতিক্রম করা সহজ হওয়াতে বাণিজ্যটি লুপ্ত হইয়াছে, সুতরাং স্থানটিও অবনতি-দশাগ্রস্ত। পুরাকালে যে এই স্থানটি বহুজনাকীর্ণ ছিল, বহু পুরাতন বাটীগুলি তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। মচ্ছোদ্রী পুষ্করিণী এক্ষণে মিউনিসিপাল উদ্যানে পরিণত হইয়াছে। ইহার সন্নিকটে কামেশ্বর দেবের মন্দির অবস্থিত। এখানে অনেকগুলি দেবমন্দির আছে। কিন্তু পুষ্করিণীর অনস্তিত্বে জনসমাগমও বিরল হইয়াছে। তিলিয়া নালার সন্নিকটে একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত মস্‌জিদ আছে। ইহা স্তম্ভত্রয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। শিরোদেশে গম্বুজ শোভা পাইতেছে। লোকের বিশ্বাস যে ইহা বৌদ্ধদিগের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। গুলজার মহল্লায় মকদম সাহেব নামে একটি সমাধিস্থান আছে। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের সন্নিকটে একটি মস্‌জিদ আপনার অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। রেলওয়ের পরেই পালং সাহিদ নামে একটি সমাধিস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। রেলওয়ে হইতে বরুণার তট পর্য্যন্ত বহু পুরাতন বাটীর অস্তিত্ব দেখিয়া অনুমান করা যায় যে, এখানে পূর্ব্বে লোকেরা বাস করিত, কিন্তু তাহা এক্ষণে ফলকর উদ্যানে পরিণত হইয়াছে। আদম পুরা মহল্লায় লাট ভৈরব নামে একটি প্রসিদ্ধ প্রস্তর স্তম্ভ আছে। পূর্ব্বে এখানে একটি মন্দির ছিল, কিন্তু ঔরঙ্গজেব তাহা চূর্ণীকৃত করিয়া মস্‌জিদে পরিণত করিয়াছেন। ১৮০৯ খৃঃ অব্দের হাঙ্গামায় এই স্তম্ভটিকে মুসলমানগণ ভাঙ্গিয়া ফেলে। হিন্দুরাও প্রতিহিংসা স্বরূপ মস্‌জিদটি চূর্ণ করিয়া ফেলে। উত্তর দিকে মুসলমানদিগের গোরস্থান আছে, তন্মধ্যে রওজা অবস্থিত।

দ্বাদশ অধ্যায়।

জাইত পুরা।

আদম পুরার পশ্চিম দিকে জাইত পুরা মহল্লা অবস্থিত। ইহা পশ্চিমে চেতগঞ্জ, উত্তরে রেলওয়ে এবং দক্ষিণে কোতোয়ালী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার উত্তর দিকটা ফাঁকা, নালা ডোবা, মাটির ঢিবি প্রভৃতির অভাব নাই—স্থানে স্থানে কৃষিকার্য্যও হইয়া থাকে। পশ্চিমার্দ্ধটাও ন্যূনাধিক পরিমাণে ফাঁকা—উদ্যান এবং সুন্দর অট্টালিকা যে নাই তাহা নহে। পূর্ব্বার্দ্ধের কেন্দ্র-স্থানটি কাঁচা। মুসলমান এবং ইতর শ্রেণীর হিন্দুগণ এইখানে বাস করে। এখানকার মুসলমানেরা কিংখাপ বুনিয়া থাকে। দক্ষিণ দিকে লোকের আবাস এবং ইহাই অওসান গঞ্জের ব্যবসার স্থান। অওসান গঞ্জটি বাবু অওসান সিংহ দ্বারা স্থাপিত। পল্লীটি সুবৃহৎ, ইহাতে বাজারও আছে। ইহার সন্নিকটে যোগেশ্বরের মন্দির। ইনি ধনাঢ্যদিগের উপাস্য

দেবতা। যোগেশ্বরের মন্দিরের মেজেটা পালিশ করা প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত, দ্বারের সমক্ষে একটি ষাঁড়-মূর্ত্তি আছে। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, একদা দেবগন সমবেত হইয়া হোম করিতেছিলেন, এমন সময়ে আহুতি-প্রদত্ত বস্তু ভেদ করিয়া প্রস্তরাকারে মহাদেবের আবির্ভাব হয়। মূর্ত্তির ঠিক উপরে একটি পাত্র আছে। গ্রীষ্মকালে পাত্রটিতে জল রক্ষিত হয়। ছিদ্র দিয়া বারিবিন্দু মূর্ত্তির উপর পতিত হইতে থাকে। নিকটে নাগকূপ নামে একটি পুরাতন কূপ আছে। কবে যে নাগকূপ খনন করা হয় তাহা বলা দুঃসাধ্য। কাশীখণ্ডে কিন্তু ইহার উল্লেখ আছে। কূপের সোপানাবলী প্রস্তর-নির্ম্মিত। জলের নিম্নদেশে একটি লৌহচাদর নয়নগোচর হইয়া থাকে। ইহার নিম্নে আরও একটি কূপ বিদ্যমান আছে। উক্ত কূপে সর্পের পূজা হইয়া থাকে। একটা সিঁড়িতে তিনটী সর্পমূর্ত্তি অঙ্কিত। মেজেতে মহাদেবের মূর্ত্তি বিরাজমান। সর্প তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। শ্রাবণ মাসে একটি মেলা হয়। মেলাটি দুই দিন থাকে। প্রথম দিনে স্ত্রীলোকেরা এবং দ্বিতীয় দিনে পুরুষগণ মেলায় আসেন। এই সময় নাগেশ্বরের পূজা হইয়া থাকে। জাইত পুরার উত্তর দিকে বাঘেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। পশ্চিম দিকে সতী ইমলী নামক স্থান। এখান হইতে রামলীলার সমারোহ আরম্ভ হইয়া চিত্রকোটে যাইয়া সমাপ্ত হয়। জগৎগঞ্জে চিত্রকোট নামক স্থান অবস্থিত। বাবু জগৎ সিংহ জগৎগঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা। সারনাথের উপকরণাদি লইয়াই তিনি এই গঞ্জ স্থাপন করেন। সতী ইমলী রাস্তা হইতে মত্তপ্রস্তরের স্থান পর্য্যন্ত ঈশ্বর গাঙ্গী নামক যে পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে ভাদ্র মাসে "কজরি মেলা" হইয়া থাকে। মেলার দিনে রমণীগণ উপবাস করে এবং ঈশ্বর গাঙ্গীতে স্নান করিয়া থাকে। উক্ত মেলায় জনতা কম হয়। ভদ্র ব্যক্তির সমাগম এই মেলায় হয় না। ঈশ্বর গাঙ্গীতে একটী পুরাতন কূপ আছে। প্রবাদ এইরূপ যে, এই কূপের নিম্ন প্রদেশে একটী রাস্তা অবস্থিত, তদ্দ্বারা এলাহাবাদে গমন করা যাইতে পারে। অপর জনশ্রুতি এইরূপ যে, উক্ত রাস্তা পাতালপুরী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আওসান গঞ্জের সন্নিকটে বড় গণেশের একটি প্রসিদ্ধ মন্দির আছে। এখানে তীর্থ-সেবীদিগের বিশেষ ভীড় দেখিতে পাওয়া যায়। ৪ঠা ভাদ্র এখানে "ঢেলা চৌথ মেলা" হইয়া থাকে। রাত্রে নষ্টচন্দ্র দেখিয়া লোকে অপরের বাটীতে ঢেলা নিক্ষেপ করে। লোকের বিশ্বাস নষ্ট চন্দ্র দেখিলেই সে বৎসরে সে কোন অপকর্ম্মে বৃথা অভিযুক্ত হইবে। সুতরাং মুক্তির উপায় লোকের বাটীতে ঢেলা ফেলা ব্যতীত আর কি হইতে পারে? পুলিশ কিন্তু এই অপকর্ম্মটি আংশিক রোধ করিয়াছে। এই পল্লীর পূর্ব্ব দিকে দারা নগর। ঔরঙ্গজেবের ভ্রাতা দারা

সিকো এই স্থানে বহুকাল যাপন করিয়া হিন্দুধর্ম্মের আলোচনা করিয়াছিলেন। অদূরে "আড়াই কাড়ুয়া" নামক একটী মস্‌জিদ বিরাজিত। বারাণসীধামে যে কয়েকটি সুন্দর মস্‌জিদ আছে তন্মধ্যে "আড়াই কাড়ুয়া" একটি। আরও উত্তর দিকে আলাইপুরা মহল্লায় "বকরিয়া কুণ্ড" নামে একটি পুষ্করিণী অবস্থিত। এখানে অনেকগুলি বহু পুরাতন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। লোকের বিশ্বাস যে, সেগুলি বৌদ্ধদিগের। ১লা জ্যৈষ্ঠ "বকরিয়া কুণ্ডে" গাজিমিয়ার "গাজিমিয়া" মেলা হইয়া থাকে। এ মেলাটি মুসলমানদিগের। সুলতান গজনবির ভাগিনেয়ের সম্মানার্থ এই মেলা হইয়া থাকে। উক্ত সুলতান তাঁহার শ্যালক সালারসাহুকে ভারতবর্ষে কোন কার্য্যোপলক্ষে প্রেরণ করেন। প্রবাসকালে তাঁহার স্ত্রী সাত্তারি মুল্লা আজমির সহরে একটী পুত্র প্রসব করেন। এই পুত্রটি সালার মস্থদ নামে খ্যাত। ইনি ঊনবিংশ বৎসর বয়ঃক্রমে হিন্দুদিগের সহিত রণে হত হন। অযোধ্যার অন্তঃপাতী ব্যারাইচ নামক স্থানে তাঁহাকে গোর দেওয়া হয়। মুসলমান ধর্ম্মের জন্য ইনি প্রাণোৎসর্গ করেন বলিয়াই ইনি পরে মুসলমান উগ-সুহদা নামে খ্যাত হন। গাজিমিয়ার মেলায় নীচজাতীয় হিন্দু ও মুসলমান স্ত্রী পুরুষ একত্রিত হয়। বলা বাহুল্য যে,পাপস্রোত অবাধে বহিয়া থাকে। বকরিয়া কুণ্ডের দক্ষিণ পশ্চিমে ফকরুদ্দিন আলাইয়ের দর্গা অবস্থিত। উক্ত কুণ্ডের পূর্ব্ব দিকে প্রায় ৬০০ গজ দূরে ৩২ খম্বা নামে একটী সমাধিস্থান আছে। ইহা ৩২টি স্তম্ভোপরি স্থাপিত। কতকগুলি স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া ফেলাতে ইহা ২৪টি স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান আছে। লোকের বিশ্বাস যে, ইহা পূর্ব্বে বৌদ্ধদিগের দ্বারা নির্ম্মিত হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী।

পিতৃভক্তি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

তিনি প্রফুল্লকে বসিতে বলিলেন, কিন্তু প্রফুল্ল বসিলেন না। প্রফুল্লের মুখের দিকে চাহিয়া রমার মাতা ভীতা হইলেন। কি যে একটা ঘটিয়াছে তাহা তিনি অনুভবে বুঝিতে পারিলেন। পূর্ব্ব দিবসে প্রাপ্ত পত্র দুইখানি প্রফুল্ল রমার মাতার হাতে দিয়া বলিলেন "মা, আমি মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক, শঠ, আমি আপনার ক্ষমা প্রার্থনারও অযোগ্য। মা, এ হতভাগ্য আজি জন্মের মত আপনার নিকটে

বিদায় লইতে আসিয়াছে। এ অভাগাকে বিস্মৃত হইয়া যাউন্—মনে করিবেন—"। প্রফুল্ল আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না, অশ্রু আসিয়া তাঁহার কণ্ঠরোধ করিল। তিনি ধীরে ধীরে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। রমার মাতা বিস্মিত হইয়া কিয়ংক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, প্রফুল্লের সহিত একটী কথা কহিবারও তিনি অবকাশ পাইলেন না।

কিছুক্ষণ পরে প্রফুল্লের প্রদত্ত পত্র দুই খানি পাঠ করিয়া সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন। তিনি একটী সুগভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন "আমি বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার বাসনা করিয়াছিলাম, তার ফল এই প্রকারই হওয়া উচিত!"

৫

আষাঢ়ের পূর্ণিমা তিথিতে নব বর্ষার মধুর যামিনীতে প্রফুল্ল কুমার জীবনের নূতন পথে অগ্রসর হইলেন, তাঁহার বিবাহ হইয়া গেল। তিনি কোন ওজর আপত্তি করিলেন না, শাস্ত্রমতে মন্ত্র পাঠ করিয়া অনুপমার পাণিগ্রহণ করিলেন। অনুপমা তাঁহার ইহ পর লোকের সঙ্গিনী ধর্ম্মপত্নী হইলেন। কিন্তু তিনি যে, এ বিবাহে আন্তরিক সুখী হয়েন নাই, এ কথা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি। আনন্দবাবু প্রভৃতি সকলেই সুখী হইয়াছিলেন বটে, কারণ এ, পি, ঘোষ গহনায় ও নগদে সর্ব্বসমেত প্রায় আট হাজার টাকা দিয়াছিলেন, ফুলশয্যা প্রভৃতিতেও বিস্তর মূল্যবান্ সামগ্রী দিয়াছিলেন। দ্রব্যাদি দেখিয়া প্রতিবেশিবর্গ সকলে এ, পি, ঘোষের বিস্তর প্রশংসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু বধূ দেখিয়া সকলে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। অনেকেই বলিলেন "যেমন ছেলে সে রকম বৌ হয় নি।" আবার অনেকে বলিলেন "তা হোক, তা হোক্ বয়েস হোলে বেশ হবে, বড় ঘরের মেয়ে এ রকম হোয়ে থাকে।" এ প্রকার প্রশংসা শুনিয়া প্রফুল্ল মনে মনে হাসিতে লাগিলেন। বুঝিলেন এ প্রশংসা নব বধূর নহে, বধূর ধনবান্ পিতার ধনের। হায়! রমা! তুমি যদি ধনাঢ্যের কন্যা হইতে!

প্রফুল্লের বিবাহ তো হইয়া গেল, কিন্তু প্রফুল্লের বিবাহের নিমিত্ত যাঁহার এত আগ্রহ ছিল, প্রফুল্লের বৌ দেখিয়া যিনি 'চরিতার্থ' হইবেন মনে করিয়াছিলেন, প্রফুল্লের সেই পিতামহী প্রফুল্লের বৌ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিয়াছিলেন কি? না। একে তো বধূ প্রফুল্লের অনুরূপ সুন্দরী নহে—তাহাতে বধূর যেরূপ উদ্ধত গর্ব্বিত স্বভাব, বৃদ্ধা তাহা দেখিয়া আদৌ সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। কত যত্নের, কত সাধনার প্রফুল্লের বৌ, বৃদ্ধার ইচ্ছা নাতবৌকে কোলে নিয়ে আদর করেন, কাছে বসিয়ে উপকথা বলেন, কিন্তু পঞ্চদশবর্ষীয়া যুবতী পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বৌ উপকথার নাম শুনিয়া হাসেন! যে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক

প্রফুল্ল আজিও ঠাকুর মার কাছে বসিয়া উপকথা শুনিতে ভাল বাসেন, তাঁহার পত্নী বৃদ্ধার উপকথাকে পাগলের প্রলাপ বলিয়া হাসেন। তিনি বৃদ্ধাকে ভূত-গ্রস্ত রোগী বলিয়া বিদ্রূপ করিয়া থাকেন।

বৃদ্ধার নিকটে বসিতে তিনি ঘৃণা বোধ করিয়া থাকেন। স্ত্রীর ব্যবহারে প্রফুল্ল মর্ম্মে মর্ম্মে আঘাত পাইতে লাগিলেন। কোথায় সরলা রমা, আর কোথায় এই গর্ব্বিতা অনুপমা? প্রফুল্ল বহু কষ্টে আত্ম-সংবরণ করিয়া থাকিতেন, এবং "পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ" ভাবিয়া পিতার প্রতি অবিচল শ্রদ্ধা স্থাপন করিতেন। এই-রূপ নৈরাশ্য ও অশান্তিতে প্রফুল্লের দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। তিনি প্রশংসার সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, এম্, বি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু প্র্যাকটীস্ করিতে সক্ষম হইলেন না।

যাহার হৃদয়ে শান্তি নাই, জীবনে সুখ নাই, মন সর্ব্বদাই চঞ্চল, সে লোকের চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিবে কি প্রকারে?

যদি অনুপমার স্বভাবটী এরূপ না হইয়া কোমল হইত, তাহা হইলে বোধ হয় প্রফুল্লের এত কষ্টের কারণ হইত না। কর্ত্তব্যের ভার বলিয়াও তিনি মনকে কতকটা প্রবোধ দিতে পারিতেন, কিন্তু অনুপমার এই প্রকার কঠোর গর্ব্বিত স্বভাব তাঁহাকে আরও যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা প্রদান করিতে লাগিল।

আমাদের দেশের কোনও বিখ্যাত লেখক বলিয়াছেন "যাহারা বিষয় করে, তাহাদের প্রাণে অহঙ্কার থাকে না, কিন্তু যাহারা সে বিষয় ভোগ করে তাহারা ধরাকে প্রায়ই সরা জ্ঞান করিয়া থাকে। আমাদের ব্যারিষ্টারদুহিতা অনুপমা এ কথার জলন্ত দৃষ্টান্ত।

দিবা রাত্রি এইরূপ মনাগুনে দগ্ধ হইয়া প্রফুল্লের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে আরম্ভ হইল। আজ জ্বর, কাল পেট ফাঁপা, তার পরদিন পেটের অসুখ, এই রকমে তাঁহার অর্দ্ধেক দিন আহার বন্ধ হইয়া গেল। শরীর ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে লাগিল। এই সময়ে তাঁহার একমাত্র সান্ত্বনাস্থল, পিতামহীর মৃত্যু হইল। তাহাতে প্রফুল্লের প্রাণে যে কিরূপ আঘাত লাগিল তাহা অবর্ণনীয়।

মনের কষ্টেই হউক, কিম্বা এক মাস অশৌচ পালনের জন্যই হউক, এই সময়ে প্রফুল্লের পীড়া অতিশয় বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। তিনি একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। কলিকাতার খ্যাতনামা চিকিৎসকগণ প্রফুল্লের চিকিৎসার্থ নিযুক্ত হইলেন, কিন্তু রোগের কিছুই উপশম হইল না, বরং দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। যে পীড়ার হেতু অন্তরে, বাহিরে তাহার ঔষধ প্রয়োগ করিলে কি ফল দর্শিবে?

চিকিৎসকগণ রোগ নির্ণয় করিতে পারিলেন না। কেহ বলিলেন "অম্বল", কেহ বলিলেন "ডিস্পেপ্সিয়া", আবার কেহ বা অন্য রোগের নাম করিলেন।

যাই হউক রোগের উপশম করিতে কেহই সক্ষম হইলেন না। অবশেষে চিকিৎসকগণের চিরপ্রথামত সকলে একমত হইয়া বায়ুপরিবর্ত্তনের পরামর্শ দিলেন।

আনন্দ বাবুও তাহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন। আনন্দ বাবু গোড়া কাটিয়া আগায় বিস্তর জল ঢালিতে লাগিলেন। দরিদ্রকন্যা রমাকে উপেক্ষা করিয়া, প্রফুল্লকুমারের চিরপোষিত আশালতার মূলোচ্ছেদ করিয়া, তাঁহার ভগ্নহৃদয়ে বৃথা ঔষধ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। আনন্দ বাবু বড় আগ্রহে "বড় কুটুম্ব" করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাতে তিনি যে স্বয়ং বিষবৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে পারেন নাই। চিকিৎসকগণ যখন চিকিৎসা পরিত্যাগ করিয়া বায়ুপরিবর্ত্তনের পরামর্শ দিলেন, তখন আনন্দ বাবুর চিন্তার পরিসীমা রহিল না। তিনি সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বিদেশ যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। অনুপমা তাঁহাদের সঙ্গে যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করাতে তাহাকে পিত্রালয়ে প্রেরণ করা হইল। অনুপমাকে পিত্রালয়ে প্রেরণ করাতে প্রফুল্ল বাস্তবিক কতকটা শান্তি অনুভব করিলেন, কারণ অনুপমার ব্যবহারে প্রফুল্ল মর্ম্মে মর্ম্মে যন্ত্রণা পাইতেন। গর্ব্বিত অনুপমা সদ্ব্যবহার দ্বারা পীড়িত স্বামীর মনস্তুটি সাধন করা দূরে থাক, সর্ব্বদাই স্বামীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করিত।

ধীরপ্রকৃতি প্রফুল্লকুমার পিতা মাতাকে এ সকল কিছু জানিতে দিতেন না। তিনি হৃদয়ের ব্যথা হৃদয়ে গোপনে রাখিতেন।

তাঁহার একমাত্র সুহৃৎ বিজয় তখন তাঁহার নিকটে ছিল না। বিজয় চাকুরী গ্রহণ করিয়া সুদূর উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গিয়াছিল। সুতরাং তাঁহার মনের কথা, প্রাণের ব্যথা খুলিয়া বলিবার লোক আর কেহ ছিল না।

হৃদয়ের বেদনা হৃদয়ে লুকাইয়া তিনি নীরবে দিনপাত করিতেন।

এলাহাবাদের ষ্টেষণ মাষ্টার আনন্দ বাবুর স্বদেশবাসী এবং বাল্যবন্ধু। বিদেশে একজন পরিচিত লোক থাকিলে সুবিধা হইবে ভাবিয়া আনন্দ বাবু এলাহাবাদে যাওয়াই প্রশস্ত মনে করিলেন।

কলিকাতার বাড়ীর সুবন্দোবস্ত করিয়া তিনি নির্দ্দিষ্ট দিনে স্ত্রী সুকুমারী এবং পুত্র প্রফুল্লকুমার, আর একজন পাচক ব্রাহ্মণ ও দুইজন ভৃত্য লইয়া এলাহাবাদে রহনা হইলেন। ষ্টেষণ মাষ্টার নিত্যানন্দ বাবুকে বাসার জন্য পূর্ব্বেই পত্র লেখা হইয়াছিল। ট্রেণ যথাসময়ে এলাহাবাদ ষ্টেষণে পৌঁছিলে নিত্যানন্দ বাবু স্বয়ং অভ্যর্থনা করিয়া আনন্দ বাবুকে সপরিবারে নিজের বাসায় সমাদরে লইয়া গেলেন। তিনি আনন্দ বাবুর নিমিত্ত গঙ্গার ধারে একটী অতি সুন্দর বাসাবাটী ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু সে দিন সে

বাসায় তাঁহাদের যাওয়া হইল না। আনন্দ বাবু বাল্য-বন্ধুর সাদর নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, সে দিন সপরিবারে নিত্যানন্দ বাবুর বাসাতেই রহিলেন। পথশ্রমে প্রফুল্ল বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। নিত্যানন্দ বাবু অতি যত্ন সহকারে প্রফুল্লকুমারকে অন্দরমধ্যে লইয়া গেলেন। প্রফুল্ল ক্লান্ত দেহ লইয়া শয্যায় শয়ন করিয়া পড়িলেন! তাঁহার বদনে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম দেখা দিল। শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিল বলিয়া তিনি কেমন এক প্রকার হইয়া পড়িলেন। সুকুমারী প্রফুল্লের শিয়রে বসিয়া বাতাস করিতে লাগিলেন! নিত্যানন্দ বাবুর আলয়ে তাঁহার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী ভিন্ন আর কোন আত্মীয় ছিল না। নিত্যানন্দ বাবু তাঁহার ভৃত্যকে প্রফুল্লের জন্য গরম দুধ আনিবার আদেশ করিয়া আনন্দ বাবুর সঙ্গে প্রফুল্ল যে কক্ষে শয়ন করিয়াছিলেন, সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সুকুমারী ঈষৎ অবগুণ্ঠন দিয়া কিঞ্চিৎ সরিয়া বসিলেন। প্রফুল্লকুমার চক্ষু নিমীলিত করিয়া শুইয়াছিলেন। তাঁহার নিমিত্ত দুধ লইয়া নিত্যানন্দ বাবুর স্ত্রী স্বয়ং আসিতেছিলেন, কিন্তু গৃহমধ্যে আনন্দ বাবু ও নিত্যানন্দ বাবু থাকায় তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইলেন না। দ্বারের পার্শ্বে তাঁহার মলের শব্দ শ্রুত হইল। শব্দ শুনিয়া নিত্যানন্দ বাবু ডাকিলেন "এস, ভিতরে এস!" হাতে দুধের বাটী, বালিকা একপদ অগ্রসর হইলেন, কিন্তু গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। লজ্জা আসিয়া তাঁহাকে বাধা প্রদান করিল। নিত্যানন্দ বাবু আবার ডাকিলেন "এস না, ভিতরে এস না, তোমার এত লজ্জা কেন রমা! আচ্ছা আমি যাচ্চি, তুমি দুধটা প্রফুল্লকে দিয়ে যাও।" এই বলিয়া নিত্যানন্দ বাবু আনন্দ বাবুর সঙ্গে সে কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। 'রমা' নাম শুনিয়া প্রফুল্ল চকিতের ন্যায় একবার চারি দিকে চাহিয়া দেখিলেন। হায়! এ নাম যে প্রফুল্লের হৃদয়ের পত্রে পত্রে লেখা রহিয়াছে! এ নাম তিনি কি জীবনে কখনও ভুলিতে পারেন? আজ পাঁচ বৎসর এ নাম প্রফুল্ল কাহারও মুখে শুনেন নাই। নিত্যানন্দ বাবুর স্ত্রী দুধ লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। ঈষৎ অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে রমাও এক বার প্রফুল্লকে দেখিয়া লইলেন। প্রফুল্ল অনিমেষ লোচনে চাহিয়া রহিলেন। বালিকার উজ্জ্বল চক্ষু দুটী দেখিয়া প্রফুল্ল চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন "রমা? রমা তুমি এখানে? তুমি এই পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধের পরিণীতা স্ত্রী? কি দারুণ অত্যাচার! হায়! প্রফুল্ল আর অধিক কথা কহিতে পারিলেন না। একে দুর্ব্বল শরীর, তাহার উপর এই অত্যধিক মানসিক উত্তেজনা বশতঃ তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

(৬)

অত্যধিক মানসিক উত্তেজনা হেতু যখন প্রফুল্ল কুমার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেই হইতে তাঁহার পীড়া অতি শঙ্কট-

জনক হইয়া উঠিল। বহু কষ্টে তাঁহার মূর্চ্ছাপনোদন হইল বটে, কিন্তু উত্থান-শক্তি আর রহিল না।

তাঁহার জীবন রক্ষা হওয়া ভার হইয়া উঠিল! স্থানীয় চিকিৎসকেরা অনেক যত্নে চিকিৎসা করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু কোনও ফলোদয় হইল না। তাঁহারা প্রফুল্লের জীবন সম্বন্ধে এক প্রকার হতাশ হইলেন। তখন আনন্দ বাবু নিজকৃত কর্ম্মের ফল বুঝিতে পারিলেন। বিস্তর অনুতাপ করিতে লাগিলেন। রমার অলৌকিক রূপলাবণ্য দর্শনে সুকুমারীরও অনুতাপের সীমা রহিল না! রমার রূপ, রমার সরলতা, রমার কার্য্যকলাপ দেখিয়া তিনি মনে করিতে লাগিলেন "হায়! ইচ্ছা করিলেই এই দেবীতুল্য বালিকাকে আমার কুললক্ষ্মী করিতে পারিতাম! নিজের দোষে নিজে এই স্বর্ণপ্রতিমা হারাইয়াছি। আমাদেরি দোষে আমাদের একমাত্র পুত্র এই দারুণ কষ্ট ভোগ করিতেছে।"

তাঁহাদের বুঝিতে বাকি রহিল না যে, এই দেবীপ্রতিমা লাভে বঞ্চিত হইয়াই প্রফুল্লের আজি এই দশা!

কিন্তু তখন বুঝিলে আর কি ফল? মানুষ এত অল্পবুদ্ধি যে, ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কোন কায করিতে পারে না, বর্ত্তমানই মানুষ বোঝে ভাল! শেষে অনুতাপের বিষে জর্জ্জরিত হইতে থাকে। আনন্দ বাবু ও সুকুমারীরও তাহাই হইল। এখন তাঁহারা বুঝিলেন অর্থ ক্ষণস্থায়ী, শান্তিই মানুষের জীবনের প্রধান বাঞ্ছনীয়!

এখন তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন যদি প্রফুল্লকুমারের জীবন রক্ষা না হয়, তবে এ অগাধ সম্পত্তি লইয়া কি হইবে? এখন আনন্দ বাবু স্বীয় মস্তকে করাঘাত করিয়া নিজের বুদ্ধিকে সহস্র ধিক্কার দিতে লাগিলেন।

এখন কথা এই যে, রমা আবার কি প্রকারে প্রফুল্লের অদৃষ্টচক্রের সঙ্গে জড়িত হইয়া এলাহাবাদে আসিয়া উপস্থিত হইল? তাহা জানিবার জন্য যদি পাঠিকা ভগ্নীদিগের কৌতূহল হইয়া থাকে, তবে শুনিয়া যান!

পিতার পত্র পাইয়া প্রফুল্লকুমার তো রমার আশা পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন! আনন্দ বাবুও নির্দ্দিষ্ট দিনে মহা সমারোহের সহিত পুত্রের বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিলেন। এ দিকে রমার মাতা কন্যা লইয়া মহা-বিব্রত হইয়া পড়িলেন। এ সংসারে যাহার অর্থ নাই, তাহার কিছুই নাই, অর্থ না থাকিলে আজকালকার বাজারে কি মেয়ের বিবাহ হয়? রমার মাতা যে কিরূপ বিপদে পড়িয়াছিলেন, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন আর কে বুঝিবে?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নিত্যানন্দ বাবুর বাড়ী গৌরীপুরে। রমার মাতা যখন কন্যা লইয়া বিব্রত, সেই সময় নিত্যানন্দ বাবু কোন কার্য্য উপলক্ষে বাটীতে আসিয়া-

ছিলেন। বাটীতে আসিয়া তিনি রমার কথা শুনিলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে দুইবার বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অদৃষ্টের ফলে তাঁহার দুই স্ত্রীই কয়েকটী শিশু সন্তান রাখিয়া পরলোকে গমন করেন। বিপত্নীক নিত্যানন্দ বাবু রমার রূপলাবণ্য দেখিয়া বিমোহিত হইলেন।

তিনি রমার মাতার নিকটে বিবাহের প্রস্তাব করিলে পর রমার মাতা অগত্যা তাহাতে সম্মত হইলেন।

সম্মত না হইয়া তিনি কি করেন? তিনি বুঝিলেন অর্থব্যয় করিতে না পারিলে মনের মত পাত্র মিলিবে না। অর্থ তিনি কোথায় পাইবেন? এদিকে মেয়ে বড় হইয়াছে, বিয়ে না দিলেই নয়? লোকে নিন্দা করিতেছে। তিনি অসহায় বিধবা, কি করিবেন? কাযেই তাঁহাকে নিত্যানন্দ বাবুর প্রস্তাবে সম্মত হইতে হইল! পাষাণে প্রাণ বাঁধিয়া প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক তৃতীয় পক্ষের পাত্রের হস্তে দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা অলোকসামান্য-রূপবতী কন্যাকে সমর্পণ করিয়া কন্যাদায় হইতে মুক্ত হইলেন, সমাজের লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। পঞ্চাশ বৎসরের পাত্র, দ্বাদশ-বর্ষীয়া পাত্রী, কি সুন্দর মিলন! নিত্যানন্দ বাবু বিবাহ করিয়া, রমাকে লইয়া স্বীয় কর্ম্মস্থান এলাহাবাদে প্রস্থান করিলেন। বৃদ্ধ নবপত্নী লইয়া শুষ্কহৃদয়ে নূতন প্রণয় স্থাপন করিয়া ঘর করিতে লাগিলেন।

ঘটনাচক্রে কিছুদিন পরে প্রফুল্ল-কুমারও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়া-ছিলেন।

(৭)

প্রফুল্লকুমারের পীড়া যখন বড় বাড়া বাড়ি—শোচনীয় অবস্থা, সেই সময়ে হঠাৎ একদিন আনন্দ বাবুর বাসায় বিজয় আসিয়া দেখা দিলেন। বিদেশে রুগ্ন-শয্যায় শয়ন করিয়া বন্ধুহীন স্থানে বিজয়ের মত বন্ধুকে পাইয়া প্রফুল্ল যেন মৃত দেহে প্রাণ পাইলেন। তাঁহার সেই রক্তহীন শুষ্ক ওষ্ঠপ্রান্তে বহুদিবস পরে আজি হাসি দেখা দিল।

আনন্দ বাবু ও সুকুমারীর মুখে বিজয় সকল কথা শুনিয়াছিলেন। তিনি আসিয়া প্রফুল্লের শয্যাপার্শ্বে বসিলেন। প্রফুল্লের হাত দুইখানি ধরিয়া কত কথা বলিতে লাগিলেন, কত সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন "ভাই! তুমি হিন্দুসন্তান! হিন্দুর পিতামাতা অপেক্ষা গুরু আর কেহ নাই। হিন্দুশাস্ত্রে পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠার দৃষ্টান্ত প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবান্ রামচন্দ্র পিতার সত্য পালনের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া বনে গমন করিয়াছিলেন। পরশুরাম পিতার আজ্ঞাক্রমে মাতার মস্তকে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। তুমিও সেই হিন্দুকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। ভাই! আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ এই প্রকার গরিষ্ঠ ছিলেন বলিয়া আমরা হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করা

পরম শ্লাঘনীয় মনে করিয়া থাকি। তুমি হিন্দুস্থানের উপযুক্ত কার্য্যই করিয়াছ, পিতার আজ্ঞাক্রমে বিবাহ করিয়া পিতাকে সন্তুষ্ট করিয়াছ। তবে আর বৃথা কেন ভাই পরস্ত্রীর চিন্তা করিয়া নিজের শরীর মাটী করিতেছ ও পিতা মাতার মনে কষ্ট দিতেছ? বিবাহ করিয়াছ, নিজের ধর্ম্মপত্নীর প্রতি ভাল বাসা অর্পণ কর, হৃদয়ে সুখশান্তি আনয়ন কর।" প্রফুল্ল একটু ম্লান হাসি হাসিলেন, বলিলেন 'ভাই সুখশান্তি আমার এ জন্মের মত ফুরাইয়া গিয়াছে। জানি না, বাবা কেন আমার বিবাহ দিয়াছিলেন? যত দিন বিবাহ করি নাই, তত দিন বেশ ছিলাম। ঠাকুরমার কাছে উপকথা শুনিয়া তখন কত আনন্দ উপভোগ করিয়াছি! চাঁদের আলো দেখে, পাখীর গান শুনে, কত সুখ পেতাম। তোমার সঙ্গে গঙ্গাতীরে বেড়াইয়া গল্প করিয়া কত শান্তি পেতাম। কিন্তু সে দিন আর নাই বিজয়! সে দিন আর ফিরিবে না। এখন এ জীবন গেলেই মঙ্গল?"

প্রফুল্লের এই প্রকার কাতরোক্তি শুনিয়া বিজয় বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন, কিন্তু মুখে সে ভাব প্রকাশ করিলেন না। তিনি বলিলেন "তুমি এমন কথা বল্‌তে পার না প্রফুল্ল! ছিঃ পিতার একমাত্র সন্তান তুমি, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর! পিতা মাতার নয়নমণি, এ কথা বলা তোমার শোভা পায় না। সামান্য এক নারীর চিন্তায় দেখ্‌ছি তুমি পিতৃভক্তি পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইতে বসিয়াছ"।

প্রফুল্ল বিজয়ের এই মৃদু ভৎসনা শুনিয়া লজ্জিত হইলেন। তিনি বলিলেন, "না বিজয়! আমি পিতৃভক্তি বিস্মৃত হই নাই। আমার এ দেহে যতক্ষণ জীবন থাকিবে, পিতা আমার কাছে ততক্ষণ ঈশ্বর স্বরূপ থাকিবেন। বোধ হয় জগদীশ্বরের চেয়ে আমার পিতা আমার কাছে অধিক বরেণ্য! আমার প্রাণ থাকিতে আমি কখনো পিতার মনে কষ্ট দিব না। আমি ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই রমাকে বিবাহ করিতে পারিতাম, কিন্তু পিতার অনভিমতে কোন কার্য্য করিব না বলিয়াই আমি সে কায করি নাই। আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে রমার মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে, এ জীবনে তাহা মুছিবার নহে, আমি পিতার আজ্ঞা বলিয়াই কেবল রমার আশা ত্যাগ করিয়াছিলাম।

বিজয়। তুমি বিবাহিত, তোমার ধর্ম্মপত্নী ভিন্ন অন্য রমণীর চিন্তা করাও তোমার মহাপাপ। তোমার সেই ধর্ম্মপত্নীকে ভাল বাসিবার চেষ্টা কর।

প্রফুল্ল। ধর্ম্মপত্নীর কথা কি বলিতেছ ভাই? আমি পূর্ব্বেই তোমাকে সে কথা বলিয়াছি। বাবা যদি আমার বিবাহ না দিতেন, তাহা হইলে আমি বেশ থাকিতাম! পিতামাতার চরণে এ জীবন উৎসর্গ করিয়া তাঁহাদের সেবা করিয়া হাসিতে হাসিতে এ জীবন কাটাইতে পারিতাম। কিন্তু অনুপমাকে

বিবাহ করাই আমার কাল হইয়াছে। মনে করিয়াছিলাম পিতার অনুরোধে বিবাহ করিয়াছি, ধর্ম্মের অনুরোধে অনুপমাকে ভাল বাসিব, কিন্তু তাহা হইবার নয়, বিজয়! অনুপমার শ্লেষপূর্ণ কথা, তাহার তীব্র তিরস্কার, মর্ম্মভেদী ভর্ৎসনা, সর্ব্বদাই আমার অন্তর্দ্দাহ উপস্থিত করে। অনুপমা আমাকে ঘৃণার চক্ষে দেখে। তাই বলি, বিজয়! আমার এ জীবন গেলেই মঙ্গল।”

বিজয় শুনিয়া বড় দুঃখিত হইলেন ও কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন “ভাই! এ সংসারে এই নিয়ম। যে যাহাকে ভাল বাসে, সে তাহাকে পায় না! মানুষ যাহা চায়, তাহা পায় না। এ সংসারে কার কত বাসনা পূর্ণ হইয়াছে, প্রফুল্ল? রমার স্মৃতি হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেল, কর্ত্তব্যের পথে চলিতে আরম্ভ কর, তা হলেই প্রাণে শান্তি আসিবে। কর্ত্তব্য পালন রোগ, শোক, দুঃখ সব নিবারণ করিবে।”

প্রফুল্ল আবার মৃদু হাসিলেন। বলিলেন “ভাই! রমাকে আমি বড় ভালবাসি, কিন্তু এ ভালবাসায় লালসা নাই। আমি তাহাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসি, তাহার নির্ম্মল প্রকৃতিকে শ্রদ্ধা করি, তার সরলতাকে ভক্তি করি, তার কোমলতাকে স্নেহ করি। তার দেহ লইয়া ক্রীড়া করিতে পারিলাম না বলিয়া আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নই! মানুষের নিষ্ঠুর প্রকৃতি ও সমাজের উৎপীড়ন দেখিয়া আমি বড় মর্ম্মাহত হইতেছি।

দেখ ভাই! অর্থ ভিন্ন মানুষ আর কিছুই চায় না? রমার মত রূপগুণ-যুক্ত লোক-ললামভূত বালিকার দরিদ্রের কন্যা বলিয়া বিবাহ হইল না। তাহার সৌন্দর্য্য, তাহার বংশমর্য্যাদা কিছুতেই মানুষকে বশীভূত করিতে পারিল না। অর্থ নাই বলিয়া কোন ভদ্রসন্তান তাহাকে বিবাহ করিল না। অবশেষে পঞ্চাশবর্ষীয় একজন বৃদ্ধ এই অপূর্ব্ব-সুন্দরী বালিকাকে বিবাহ করিল বৃদ্ধ আর কতদিন এ সংসারে জীবিত থাকিবে। পরে বালিকার দশা কি হইবে? শুধু রমা বলিয়া নহে, আমাদের সমাজমধ্যে প্রতিনিয়তই এই প্রকার ঘটিতেছে। এই জন্যই হিন্দুসংসারে বাল্য-বৈধব্য, ব্যভিচার, ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি নানা-বিধ পাপস্রোত বহিয়া যাইতেছে। তবুও মানুষ বুঝে না? তবুও বাঙ্গালীর চক্ষু-রুন্মীলন হয় না।

বিধবার উষ্ণ দীর্ঘশ্বাসে এই সংসার পরি-পূর্ণ! এই সব পাপের ফলেই আমাদের বাঙালী জাতি উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। এই জন্যই বাঙালীর গৃহে কন্যা জন্মগ্রহণ করিলে সকলে কি এক অমঙ্গল আশঙ্কায় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ দরিদ্রের গৃহে এইরূপ।

বিধাতার রাজ্যে কেন এত অবিচার হয়, ভাই! ইচ্ছা হয় সমাজকে ভাঙিয়া নূতন করিয়া গঠন করি, কিন্তু হায়! একা দুর্ব্বল আমি কি করিতে পারি?”

বিজয় বলিলেন “বেশ বলিয়াছ

প্রফুল্ল! এ সংসার কর্ম্মক্ষেত্র। কর্ম্ম করাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য। উঠ, হৃদয়ে শক্তি আনয়ন কর, সংসারের কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ কর, সমাজের উন্নতিকল্পে জীবন পণ কর। অবশ্যই কৃতকার্য্য হইতে পারিবে। রোগশয্যায় শুইয়া চিন্তা করা রমণীর কার্য্য, পুরুষের নহে।"

বিজয় বন্ধুর হিতার্থে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া প্রফুল্লের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন, সর্ব্বদা তাঁহাকে উপদেশ দিতেন।

বিজয়ের সঙ্গ লাভ করিয়া ও সর্ব্বদা প্রাণ খুলিয়া কথা কহিয়া প্রফুল্ল অনেকটা শান্তিলাভ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দেহও সুস্থ হইতে লাগিল।

হতাশ প্রেমকে পরাজিত করিয়া বিশ্ব-প্রেমে তিনি আপনাকে নিয়োজিত করিতে লাগিলেন। প্রফুল্ল বেশ সুস্থ হইয়া উঠিলে আনন্দ বাবু তাঁহাদিগকে লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। প্রফুল্ল প্রাণপণে পিতামাতার সেবা করিতে লাগিলেন। যাহাতে তাঁহাদের মনস্তুষ্টি সাধন হয়, তাহার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। প্রফুল্ল এই বার কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন। স্বয়ং প্র্যাক্‌টিস্ আরম্ভ করিলেন। অর্থোপার্জ্জন করিয়া দরিদ্রের দুঃখ মোচন, পীড়িতের শুশ্রূষা, পরের উপকার, তিনি যথাসাধ্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিজয়কে তিনি আর কখনও কাছ ছাড়া হইতে দিলেন না। বিজয় তাঁহার কার্য্যে উৎসাহ, হৃদয়ে বল, কর্ম্মে সাহস। বিজয় তাঁহার সর্ব্বস্ব। বিজয়কে তিনি এক মুহূর্ত্ত না দেখিলে সব অন্ধকার দেখিতেন। বিজয় তাঁহার অন্ধকার হৃদয়ের জ্যোতি, ধর্ম্ম-পথের সহায়?

অনুপমা অধিকাংশ কাল তাহার পিত্রালয়েই অবস্থান করিত, কখন কখন আনন্দ বাবুর বাটীতে আসিত। প্রফুল্লের সহিত মনের মিল তাহার কখনও হইল না। তাহার গর্ব্বিত স্বভাবটীরও কখনও পরিবর্ত্তন হইল না। তাহার ব্যবহারে শ্বশুর ও শ্বশ্রূ, কেহ কখনও সুখী হইতে পারিলেন না। চিরদিন তার স্বভাব সমভাবেই রহিল।

শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র।

৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জীবনী

(তাঁহার লিখিত ডায়েরী)

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের পত্র।

লাহোর।

২রা নবেম্বর ১৮৭৩

প্রিয় উমেশচন্দ্র,

ছুটীতে স্থানে স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য তুমি যে চেষ্টা করিয়াছ, তাহার বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলাম।

এইরূপ চেষ্টা আমার পক্ষে বিশেষ সন্তোষের কারণ। যাঁহারা বিধিপূর্ব্বক প্রচারব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা তো দেশ বিদেশে ব্রহ্মনাম প্রচার করিবেনই। কিন্তু আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে ধর্ম্মোৎসাহী ও প্রেমিক ব্রাহ্মমাত্রেই সময়ে সময়ে সত্যরাজ্য বিস্তারের জন্য যত্ন প্রকাশ করেন। প্রত্যেক ব্রাহ্ম কি প্রচারক নহেন? অমৃত পান করিলেই পান করাইতে ইচ্ছা হয়, ইহা স্বাভাবিক শাস্ত্র, কে ইহা অস্বীকার করিবেন? বিশেষতঃ বর্ত্তমান সময়ে তোমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে উৎসাহী হইলে আমি কৃতার্থ হই। এমন সুধামাখা দয়াল নাম যতই ঘরে ঘরে বিলাইবে, ততই আমার প্রাণ তোমরা ক্রয় করিয়া লইবে।

আমি অনেক দিন হইতে বলিতেছি যে, স্ত্রী বিদ্যালয়ের অবস্থা ভাল নহে। এত টাকা ব্যয় হইতেছে, কিন্তু ফল তদ্রূপ হইতেছে না। মেয়েগুলি ধর্ম্মেতে, জ্ঞানেতে, যথার্থ উন্নতি লাভ করেন এই আমার আন্তরিক ইচ্ছা। আমি তাঁহাদিগকে আপনার বলিয়া ভালবাসি। কেবল কতকগুলি অসার কথা শিখাইয়া তাঁহাদিগকে বিকৃত করিতে কোন মতে ইচ্ছা হয় না। প্রকৃত জ্ঞান দিতে না পারিলে আমার মনে বড় কষ্ট হইবে। এ বিদ্যালয়টী যেন অন্যান্য বিদ্যালয়ের মত না হয়। তোমাদের নিকট আমি এই প্রার্থনা করি এবং আশাও করি। একটী মণ্ডলীকে যথার্থ মানুষ করিয়া দিতে হইবে। আর দুই মাস দেখা যা'ক, এই দুই মাস খুব চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কি কি উপায় অবলম্বন করিলে বিদ্যালয়টী ভাল হয় এবং আমার মেয়েগুলি সুখী হয়? সে বিষয়ে তোমরা কি করিতে পার আমাকে লিখিলে আমি মতামত প্রকাশ করিতে পারি। আপাততঃ তোমার ইচ্ছানুসারে একটী তালিকা পাঠাইতেছি, তদনুসারে নিয়মিত বক্তৃতা দ্বারা উপদেশ প্রদত্ত হইবে। জানুয়ারী মাসে ঐ সকল বিষয়ে বিশেষ পরীক্ষা হইবে। এখানকার সংবাদ মঙ্গল। তোমার পরিবারকে এবং আশ্রমবাসী আর আর সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে। মিস্ কলেট্ বামাহিতৈষিণী সভা সম্বন্ধে রাধারাণীর নামে আমার নিকট এক উৎকৃষ্ট পত্র পাঠাইয়াছেন। আমি উহা পরে পাঠাইব? উহার উত্তর দিতে হইবে।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন

PURNIA B S.

১৮ই জুন রবিবার প্রাতে।

ধর্ম্মবিষয়ে অচৈতন্য সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়, কেননা তাহা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সম্পদের প্রতি ঔদাসীন্য।

এই ঔদাসীন্য দ্বারা এক দিকে অমূল্য সম্পদে বঞ্চিত হওয়া, অন্য দিকে অসার মোহে মুগ্ধ হইয়া পরিণামে প্রতারিত হওয়া। প্রাচীন কালের ঋষিগণের এবং বর্ত্তমান কালের সভ্যতাভিমানীদিগের জ্ঞানের এই তারতম্য।

আমাদিগের শরীরের চক্ষু দ্বারা যাহা

দর্শন করি, তাহা অসার বিষয় দর্শন—পশু-জীবনের ভাব, মৃত্যু। এই চক্ষুর অতীত যে চক্ষু আছে, তাহা না খুললে সার জীবনের পথ দে'খতে পাই না। অদৃশ্য আশ্চর্য্য জগতের সকল ব্যাপার সেই চক্ষুর গোচর।

(১) এই চক্ষু কত লোকের খুলে নাই। কত লোকের খুলিয়া পুনরায় নিদ্রিত।

(২) কত লোকের খুলিয়াছে বলিয়া বোধ আছে, কিন্তু বস্তুতঃ নিদ্রিত।

ধর্ম্মরাজ্যে জাগ্রত হওয়া প্রথম কথা, পরে দেখা, চলা, সুখাস্বাদন করা। ঈশ্বর এই জন্য জিজ্ঞাসেন এখনও নিদ্রিত? উৎসবের বিশেষ ঘটনা প্রেরণ ঘোর নিদ্রা ভঙ্গ করিবার জন্য।

৮ই জুন রবিবার রাত্রি।

ঈশ্বর যেরূপ পূর্ণ, সেইরূপ পূর্ণ হও।

১। মানুষের এক অংশ পৃথিবীর, তাহা নশ্বর—কিন্তু আর এক অংশ অমর—ঈশ্বরের প্রতিকৃতি। তাহাই যথার্থ মনুষ্যের প্রকৃতি।

২। ঈশ্বর পূর্ণস্বভাব—জ্ঞান, প্রীতি, ন্যায় ও পুণ্যে মানব প্রকৃতির আদর্শ।

৩। মানবপ্রকৃতি কুসুমের ন্যায় বিকসিত হইবে—জ্ঞান, প্রীতি, ন্যায় ও পবিত্রতায়।

৪। উন্নতি একদিকে সমঞ্জস, অন্য দিকে অসীম।

৫। চক্ষু ক্ষুদ্র হইলেও অসীম আকাশ দেখিতে চায়, ক্ষুদ্র সীমাতে পীড়িত হয়। আত্মা ক্ষুদ্র হইলেও অনন্ত আদর্শ চায়, সীমাবদ্ধ আদর্শে পীড়িত হয়।

৬। আত্মার ভাবের উন্নতি মনুষ্য অনেক করিয়াছে, কিন্তু "এই পর্য্যন্ত" কেহ বলিতে পারে না।

ব্যবধান মনুষ্যের আত্মার বিষম শত্রু। মুক্তির অর্থ অমুক্তভাব, বদ্ধভাব নহে।

৭। ব্রাহ্মধর্ম্ম মনুষ্য-প্রকৃতির পূর্ণ উন্নতি সাধন করিতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

৯ই জুন সোমবার প্রাতে।

প্রীতি পরম সাধন।

১। প্রকৃত ধর্ম্মের আদি, মধ্য ও অন্তে প্রীতি।

২। প্রীতি জ্ঞান ও কার্য্যের প্রাণ ও উন্নতির সাধক।

৩। ঈশ্বর আমাদিগের প্রীতির পাত্র অনেক বার।

(১) তাঁহার ন্যায় সুন্দর পদার্থ কে?

(২) তাঁহার ন্যায় ভালবাসে কে?

(৩) তাঁহার সঙ্গে প্রীতির অনন্ত ফল।

৪। এই প্রীতি জন্মিয়াছে কিনা লক্ষণ দ্বারা বুঝিতে হয়—

(১) বিচ্ছেদে ক্লেশ। (২) মিলনে সুখ এবং নিকটস্থ করিয়া রাখিবার ইচ্ছা। (৩) প্রিয়ের প্রিয় কার্য্য অকাতরে অনুষ্ঠান, স্বার্থ-বিস্মৃত হইয়া।

৫। ঈশ্বর-প্রেমিকদিগের ভাব ও কার্য্য।

৬। ঈশ্বর অপ্রেমের প্রতিবন্ধক।

৭। অপ্রেমিকও প্রেমিক হইবে ব্রহ্মকৃপাতে।

"উৎস যত উৎসারিত মরুভূমি প্রান্তরে॥"

৯ই জুন সোমবার রাত্রি।

১। ধর্ম্মপথ কঠিন না সহজ?

২। কঠিন হইলেও একমাত্র যে পথে পরম ধনলাভ হয়, তাহা কি পরিত্যাগ করা যায়?

৩। ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া।

৪। ধর্ম্মের কঠিনত্বের কারণ ইহার প্রথমাবস্থায় অত্যন্ত পরীক্ষা, বাহ্য ও আন্তরিক।

৫। সংসার-লক্ষ্য ব্যক্তিদিগের নিকট ইহা কঠিন, কারণ তাহারা ত্যাগ স্বীকার ও ক্লেশ বহনে ভয় করে।

৬। প্রকৃত ধর্ম্মার্থীর নিকট ধর্ম্মার্থে ত্যাগ স্বীকার ও কষ্ট বহন অতি তুচ্ছ, এই জন্য ধর্ম্মপথ সহজ।

৭। সাধনের প্রথম অবস্থা অতিক্রম করিলে অনুকূল অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৮। প্রথমতঃ সাধকের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া বীরবেশে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া দক্ষিণে ও বামে না হেলিয়া অগ্রসর হইতে হয়।

৯। পর্ব্বতারোহণের ন্যায় ধর্ম্মপথারোহণের যত শেষ তত মনোরম, শেষ প্রান্ত অনির্ব্বচনীয়।

১০ই জুন মঙ্গলবার প্রাতঃকাল।

ধর্ম্ম মনে নয়, ভাবে নয়, কার্য্যে নয়, কিন্তু বিশ্বাসে।

২। বিশ্বাস স্বর্গীয় বস্তু, ইহার এক কণার অদ্ভুত ক্ষমতা পার্থিব সমুদায় বলকে চূর্ণ করে, এক কণা বিশ্বাসকে কেহ চূর্ণ করিতে পারে না।

ধর্ম্মজগতের ইতিহাসে বিশ্বাস দ্বারা সত্য ও ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা কিরূপে হইয়াছে? সামান্য লোকের বিশ্বাসে, একব্যক্তির প্রাণ বিসর্জ্জনে সহস্র প্রাণ উৎপন্ন হইয়াছে।

৪। বিশ্বাসের আলোককে যে রক্ষা করে, সে আরও অধিক প্রাপ্ত হয়। যে লুক্কায়িত করে, সে হারায়।

৫। সত্য প্রচার জীবন দ্বারা করিতেই হইবে।

লোকের প্রতিকূলতা তাহার পরীক্ষার জন্য, পরে লোকে চিনিয়া তাহাকে আদরে লইবে। যাহাতে অপ্রেমে বধ করে, তাহাতে দেবতা করে।

অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে কখন বলিব? যখন এরূপ বিশ্বাসে অবনতিশীল, দুর্গত জীবের সদ্গতি হইবে।

(ক্রমশঃ)

মনীষা ।

সন্ধ্যার তখনও দেরী আছে,

চায়ের শূন্য পাত্রটী নামাইয়া রাখিয়া নবীন মুন্সেফ মহেন্দ্র বাবু একটু গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "কাযটা ভাল হচ্ছে না মনীষা, তোমায় বল্লে তুমি গ্রাহ্য কর না,

হাস্যোৎফুল্ল মুখে মনীষা বলিল "কিন্তু আমার জন্য চারি দিকের চিন্তাশীল লোকেদের ভারি দুর্ভাবনা জুটেছে,—না? আচ্ছা, তুমিত হাকিম, একটা নোটিশ বার করে দাও—নির্ভয়!"

"না না দেখ গৃহস্থ ঘরের মেয়ে তুমি, গৃহস্থ ঘরের চালে থাক, কোন আপত্তি নাই"—

স্বামীর অসমাপ্ত কথার উত্তরে মনীষা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল "বা! আমি কি পথস্থ ঘরের মেয়ের মত চালে আছি?"—

বিদ্রূপে বিচলিত হইয়া মহেন্দ্র নাথ ঈষৎ রুষ্ট হইয়া বলিলেন "নয় কেন? সকাল নেই, সন্ধ্যা নেই, পাড়ায় পাড়ায় যত ছোট লোকদের ঘরে ঘরে বেড়ান, এ গুলো বুঝি বড় ভাল কায? লোকে ভারি সুখ্যাতি করে,—না?

মনীষা দুর্লক্ষণ দেখিয়া আত্মসম্বরণ করিল, বিনীত ভাবে বলিল "সকালে আমি বেরুই না।"

"না হোক, সন্ধ্যার পর বেরোও তো? লোকে বল্‌তে ছাড়বে কেন? লজ্জায় আমার মাথা হেট হয় জান? যে আসে, সেই বলে মশাই আপনার স্ত্রী—"

"থাম থাম, তোমার গোটাকতক লক্ষ্মী-ছাড়া উকীল বন্ধু জুটে খোসামোদের তোড়ে তোমার মাথা খারাপ করে দিচ্চে তা আমি জানি, আমি বড় লোকের বাড়ী নেমন্তন্ন খেতেও যাই না, আর গেরস্ত বাড়ীতে গল্প কর্ত্তেও যাই না, দু-দশ জন অনাথ গরীবের খবর নিলে, কি এত গুরুতর অপরাধ হয় বলত—যে সবাই মিলে অত বিজ্ঞতা ফলিয়ে বাধা দিতে আসেন? সাধে বলি যত অকেযো লোকের আরাম শুধু পরচর্চ্চা চিবিয়ে।—"

মনীষা দুর্দ্দাড় করিয়া টেবিলের জিনিস গুলা নাবাইয়া, ঝাড়নে করিয়া সপাসপ্ টেবিল ঢাকা ঝাড়িতে লাগিল। মহেন্দ্র নাথ গোঁপে মোচড় দিয়া মিনিট দুই ভাবিলেন, মনীষা সম্বন্ধে বাহির হইতে সংগৃহীত কতকগুলো জবানবন্দ,—মায় টীকা, অন্বয়, ব্যাখ্যা সহ যথেষ্ট ধৈর্য্যের সহিত আদ্যোপান্ত বিশ্লেষণ করিয়া শুনাইলেন, পরে বলিলেন "দেখ পয়সার দ্বারা যতটা পার তুমি গরীব দুঃখীর উপকার কর,—কিন্তু নিজে অমন টো টো করে যেখানে সেখানে ঘুরো না—"

"বাঃ বেশতঃ, তোমার রোজকারের টাকাগুলো ঘুস দিয়ে আমি আরামে বসে

পুষিয়ে কিন্‌বো? চমৎকার মীমাংসা তো!—মনীষা আবার হাসিয়া ফেলিল। তার পর ধীরে ধীরে বলিল "দেখ, আমার এই সব ছোট কাযের এত বেশী খোঁজ খবর নিয়ে তোমার কাছে হিতৈষীগণ যাঁরা জানাতে আসেন, তাঁরা যে কি রকম নির্লজ্জ আমি শুধু তাই ভাবি!—"

নিজের পক্ষটা অত্যন্ত হাল্কা হইয়া যায় দেখিয়া মহেন্দ্রনাথ পুনশ্চ নবোদ্যমে অন্য দিক দিয়া তর্ক আরম্ভ করিলেন, মনীষার ও জেদ্ চড়িল। খানিকক্ষণ কথা কাটাকাটি করিয়া শেষে মনীষা অত্যন্ত রাগিয়া শপথ করিয়া বলিল "বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড উৎসন্ন যাইলেও যদি আর কোন দিন এই ঘরের কোণটা ছাড়িয়া বাহির হই, তা হলে……।"

মহেন্দ্রনাথ ততোধিক ক্রুদ্ধ হইয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলেন, উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন দীনে, দীনে—"

কিশোর ভৃত্য দীনুয়া তখন বাহিরের প্রাঙ্গণে একটা কাগজের পাকান বল ও একটা দেবদারু কাঠের সরু তক্তাভাঙা লইয়া সাহেবদের টেনিস্ খেলার অনুকরণে লোফালুফি করিতেছিল, সহসা প্রভুর আহ্বান শুনিয়া ছুটিয়া আসিল। মহেন্দ্র নাথ তীব্র স্বরে বলিলেন "ব্যাটা ফের যদি তোমার মাইজীকে নিয়ে কোথাও গেছ শুনি, তা হলে…।"

প্রভুর মুখ চোখের ভাব দেখিয়া দীনুয়া বুঝিল, প্রতিদিন সন্ধ্যার পর লাঠী ও লণ্ঠন লইয়া মাইজীর সহিত বাড়ী বাড়ী ঘুরিতে যাওয়ায় একটা কিছু অপরাধ ঘটিয়াছে!—সে ভয়ে ভয়ে এক বার আড় চোখে মনীষার পানে চাহিল, কিন্তু মনীষা তখন তাহাদের দিকে পিছন ফিরিয়া টেবিলের ফুলদানীতে কতকগুলা সগন্ধ ফুটন্ত হাস্নাহানা সাজাইতে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল। দীনু কর্ত্রীর নিকট কোন আদেশ ইঙ্গিত না পাইয়া, অগত্যা প্রভুর বাক্যের উত্তরে নিঃশব্দে মাথা নোয়াইয়া বাহিরে [illegible]! আজ সে কাহার মুখ দেখিয়া শয্যাত্যাগ করিয়াছিল যে, অকারণ মনীবের কাছে ধমক খাইল!—

যাহাকে দশ কথা শুনান যায়, সে যদি দুকথা না জবাব দেয়, তাহা হইলে তাহা যেন বাতাসের সহিত মল্লযুদ্ধের ন্যায় নিতান্তই নিরর্থক হইয়া দাঁড়ায়। যতক্ষণ হাস্য বিদ্রূপের ধারে মনীষা স্বামীর কথা কাটিতেছিল, ততক্ষণ স্বামী খুব নির্ভাবনাতেই কথা চালাইতেছিলেন। কিন্তু শেষটা নিজের অত্যধিক রূঢ়তার দোষে প্রতিপক্ষের অবস্থান্তর ঘটিতে দেখিয়া তাঁহার কেমন দুঃসহ অস্বস্তি বোধ হইল। কিন্তু তখন হঠাৎ থামিয়া গেলে নিতান্তই পরাজয়ের মূঢ়তা স্বীকার করিতে হয় দেখিয়া মহেন্দ্রনাথ খুব জোরের সহিত আপনাকে ঠিক রাখিয়া নিঃশব্দে কার্য্যে রত স্ত্রীকে আরও গোটাকতক শক্ত কথা শুনাইয়া দিয়া, সশব্দে দ্বার ভেজাইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

(ক্রমশঃ)

মুষ্টিযোগ।

কুকুরের কামড়ান। (ঘেও কুকুর ও শেয়ালের জন্য—গৃহপালিতের জন্য নহে) সাদা অপরাজিতার বীজ ১টা ও ৩টা গোল মরিচ বাটিয়া (বার বৎসরের কম বয়সের অর্দ্ধ মাত্রা) তিন দিন প্রাতঃকালে সেবনীয়।

২। দুই দিন অন্তর পালা জ্বর—নাটার বীজ ও পিপুল (১ তোলা করিয়া) ও বাবলা পাতা (অর্দ্ধ তোলা) জলে বাটিয়া, ভিজে ছোলার মত বটি করিয়া দিনে তিন বার (বালকের অর্দ্ধ মাত্রা) বিজ্বরের দিন সেব্য। পথ্য একটু দুগ্ধ। আরোগ্য হইলে ১টা করিয়া গুলি ২।৩ দিন ধরিয়া দিবে।

৩। গ্রহণী, রক্তামাশায়, শ্বেতামাশায় ও ডায়ারিয়ায়—এক ছটাক জাঙ্গী হরিতকী, অর্দ্ধ ছটাক আমলকী কাটখোলায় ভাজিয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া কাপড়ে ছাঁকিবে। পরে গব্য ঘৃত মিশ্রিত করিয়া (ময়ান দেওয়ার পর) কাশীর চিনি ১৷৹ ছটাক মিশ্রিত করিবে। ।৵৹ ওজন পূর্ণ মাত্রা (দিনে দুই বার)। পথ্য জলমিশ্রিত বা খাঁটি দুগ্ধ।

৪। পৃষ্ঠব্রণ।—জল না ছুঁয়ে কাঠানোটের শিকড় তুলিয়া ছুরি দিয়া চাঁচিয়া ঘায়ের মুখে গুঁজে দিলে পুঁষ টানিয়া বাহির করে। কাঁটানটের শিকড় বাটিয়া প্রলেপ দিলে সকল ফোড়াই ফাটিয়া যায়। অস্ত্র করিতে হয় না।

৫। দাঁতের পোকার যন্ত্রণা—রোগী চিকিৎসক দুজনেই জল না ছুঁয়ে আফুলা আপাংএর শিকড় তুলিয়া কাপড়ে পুঁছিয়া দাঁতে ছপটির মত মারা। উহাতেই সারিবে।

৬। দুংড়ি কাশি। (১) এক ঝিনুক দ্রাক্ষী শাকের রস উষ্ণ করিয়া, কিম্বা ইশেনমূলের রস এক ঝিনুক খাওয়াইলে এক দিন বা দুই দিনেই সারিবে।

বালকের আদার রস ও মধু, দিনে ৪।৫ বার।

৭। সাধারণ কাশি। এক তোলা আদার টুকরা ও এক তোলা মিছরি, দিনে ৫।৬ বার। তিন দিন স্নান বন্ধ।

৮। দু আনা শুঁটের গুড়া এক ধান কর্পূর ও দুটা গোলমরিচ গুড়া, দিনে ৪।৬ বার। তিন দিবস স্নান বন্ধ।

৯। শুষ্ক কাশি। তালের মিছরি অনবরত মুখে রাখিবে, অথবা যষ্টিমধুচূর্ণ ও মিছরি চূর্ণ সমভাগে মিশাইয়া মুখে রাখিবে। স্নান করিবে। (উদ্ধৃত)

নূতন সংবাদ।

১। গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি, আমাদের অন্যতম লেখক

শ্রীযুক্ত ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় আমেরিকা হইতে প্রত্যাগমনের সময় "লুসিটেনিয়া" নামক জাহাজ ডুবি হইয়া কোন্ অজ্ঞাত স্থানে বাস করিতেছেন, তাহার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। আমাদের পাঠিকারা অনেকেই ইন্দুপ্রকাশের রচনা পাঠ করিয়াছেন। তিনি একজন সুলেখক ও উৎসাহশীল যুবক। সংসারের শত বিঘ্ন বাধা অগ্রাহ্য করিয়া সুদূর আমেরিকায় জ্ঞান উপার্জ্জনার্থ গমন করিয়াছিলেন। তথাকার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, এস, সি উপাধি লাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমনের পথে এই বিপদ সংঘটিত হয়। স্বদেশে ফিরিবার জন্য তিনি এত ব্যাকুল হইয়াছিলেন যে, পূর্ব্বে যে জাহাজে আসিবেন স্থির করিয়াছিলেন সে জাহাজ অপেক্ষা "লুসিটেনিয়ায়" আসিলে এক সপ্তাহ পূর্ব্বে দেশে ফিরিতে পারিবেন এই শুনিয়া পূর্ব্বের জাহাজ পরিত্যাগ করিয়া ইহাতেই আরোহণ করেন। বিধাতার ইচ্ছা কে বুঝিবে? বাড়ী আসিবার জন্য যে প্রাণ এত ব্যাকুল হইয়াছিল, সে আর এ জীবনে যে ফিরিয়া আসিবে তাহা আশাতীত। ইন্দুবাবুর বৃদ্ধ পিতা শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বৃদ্ধা জননী, তিনটী শিশু সন্তান, পত্নী ও আত্মীয় স্বজন এই নিদারুণ সংবাদে কিরূপে জীবন ধারণ করিতেছেন তাহা অন্তর্যামীই জানেন। তিনি এই শোকার্ত্তদিগকে সান্ত্বনা দান করুন।

ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ফল।

গুণানুসারে।

প্রথম বিভাগ।

১। আইরিস্, ভি, এম, দি ব্রুণ—লোরেটো হাউস
২। রায় সুশীলা—বেথুন
৩। সেন জ্যোৎস্নাময়ী—"
৪। আইরিন, ভারডন্—নন্‌কলেজিয়েট
৫। দত্ত সুধাময়ী—বেথুন
৬। মেবল জোহানস্—নন্‌কলেজিয়েট
৭। লিলিয়ালুটরে— "
৮। জিভারাথানাম এন্টনী—ডাওসেসন
৯। দাসগুপ্ত স্বর্ণপ্রভা—বেথুন
১০। এডিথ ষ্টিভেন্স—ননকলেজিয়েট
১১। অ্যানিক্রুপ—ডাওসেসন
১২। রায় মনীষা—বেথুন
১৩। ডোরিস মেকন্—নন্‌কলেজিয়েট
১৪। দাস, লাবণ্য লতা— "
১৫। দ্বিজবালা—" "
১৬। ভট্টাচার্য্য ঊষা—লরেটো হাউস
১৭। কিংস্‌লি ক্যামেলিন—নন্‌কলেজিয়েট
১৮। রাহা, হর্টেনস্ মেরিয়েন্স—ডাওসেসন,
১৯। গারেট্ কন্‌ষ্টান্স—নন্‌কলেজিয়েট

২০। লিলিয়ান ডোরা—লোরেটো-হাউস
২১। কোর্টগার্টুড—নন্‌কলেজিয়েট

দ্বিতীয় বিভাগ।

২২। বরজেস্‌ লিজি—লরেটো হাউস
২৩। চৌধুরী প্রেমলতা—বেথুন
২৪। ক্রু, ইউনিফ্রেড—লরেটো হাউস
২৫। দাস নলিনী বালা—বেথুন
২৬। ঘোষাল পূর্ণিমা— ”
২৭। গ্রেস্‌ রেনার—নন্‌কলেজিয়েট
২৮। লিয়ার ফ্লোরেন্স, এল,— ”
২৯। মণ্ডল, লীলাবতী— ”
৩০। নায়ক, নিশীবালা—ডাওসেসন
৩১। পাণ্ডে, বসন্তকুমারী—বেথুন
৩২। রায়, শান্তশীলা—ননকলেজিয়েট।
৩৩ হেমবালা—বেথুন
৩৪। সোম সুনীতিবালা—নন্‌কলেজিয়েট
৩৫। টারগেট বিট্রাইস— ”

তৃতীয় বিভাগ।

৩৬। দাসগুপ্তা প্রভাবতী—”

বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রী।

পশ্চিম বাঙ্গালা।

আইরিস ব্লণ্ড—২৫৲ লরেটো
সুশীলা রায়—২০৲ বেথুন
সুধাময়ী— ” ”
জিভারাথানাম এণ্টনী—ডাওসেসন
অ্যানি ক্রপ ”

পূর্ব্ববাঙ্গালা।

জ্যোৎস্নাময়ী সেন—২৫৲ বেথুন
স্বর্ণপ্রভা দাস গুপ্তা—২৫৲ বেথুন

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল।

প্রথম বিভাগ।

১। ব্যানার্জ্জি—মাধবিকা, বেথুন
২। চিত্রলেখা, ব্রাহ্ম গার্লস
৩। ”—ডলি, ডাওসেসন
৪। বড়ুয়া—রাজবালা, বেথুন
৫। বসাক—ইন্দিরা, রাভেন্সগার্লস
৬। বসু—মুক্তি, ব্রাহ্ম গার্লস
৭। ভৌমিক—মাণিকা ”
৮। বিশ্বাস—প্রীতিকণা, ছোট নাগপুর গার্লস
৯। চক্রবর্ত্তী—চারু লতা, বিদ্যাময়ী
১০। চট্টোপাধ্যায়—নিরুপমা, ঢাকা ইডেন
১১। দত্ত—রেণুকা, দার্জ্জিলিং মহারাণী স্কুল
১২। গাঙ্গুলী—জয়ন্তী, বেথুন
১৩। ঘোষ—বেলা, তুলাসার
১৪। „ —লীনা, ডেওসেসন
১৫। গুহ—নিহারবালা, চাটগাঁও বালিকা।
১৬। হালদার—সরল প্রভা, ডাওসেসন
১৭। মৈত্র—কমলা, ব্রাহ্ম গার্লস
১৮। মজুমদার—সুমতি, চট্টগ্রাম
১৯। মিত্র—শৈবলিনী ব্রাহ্মবালিকা
২০। নন্দী—বিমলা, বেথুন
২১। রাও—শকুন্তলা, ব্রাহ্ম গার্লস
২২। রায়—সুপ্রভা, বিদ্যাময়ী
২৩। নেজসা রসুল—লোরেটো হাউস

দ্বিতীয় বিভাগ।

আচার্য্য—সরোজিনী

২৪। ব্যানার্জ্জি—অসীমা, ক্রাইষ্টচার্চ

২৫। বসু—নিরোজ নলিনী বেলা অসেশ প্রবাল

২৬। ঘোষ—তরুলতা, প্রাইভেট

২৭। ’—সুপ্রভা, ডাওসেসন

২৮। গুহ—পুণ্যপ্রভা, প্রাইভেট

২৯। কোয়ার—লাছী বাই, ব্রাহ্ম-গার্লস

৩০। মুখার্জ্জি—নীহারযামিনী ক্রাইষ্ট চার্চ।

৩১। রায়—গিরীন্দ্রবালা, ডাওসেসন

৩২। ”—কান্তবালা, গার্ডিনার মেমোরিয়াল

৩৩। ”—ছোট নাগপুর

৩৪। সেন—শান্তিবালা, বেথুন

৩৫। সিংহ—প্রেমসুধা, ব্রাহ্মবালিকা

৩৬। সুকুল—জয়ন্তি, বেথুন

তৃতীয় বিভাগ।

৩৭। দে—মৃণালীনী, প্রাইভেট

৩৮। দত্ত—বিনোদিনী, বারাকপুর মিশন

৩৯। সিংহ—রমোলা, ব্রাহ্ম গার্লস

বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রী।

বালিকাদের মধ্যে প্রথম

চিত্রলেখা বন্দ্যোপাধ্যায়—২০৲

দ্বিতীয়

কুসুম কুমারী সেন ১৫৲

শকুন্তলা রাও—১০৲

মাধবিকা বন্দ্যোপাধ্যায়—১৫৲

নেজলা রসুল—১৫৲

বিমলা নন্দী— ”

নীহারবালা গুহ—২০৲

পূর্ব্ববঙ্গের বৃত্তি।

সুপ্রভা রায়—২০৲

নিরুপমা চট্টোপাধ্যায় —”

চারুলতা চন্দ—„

রেণুকা দত্ত—„

মিনতিবালা আচার্য্য—”

কমলকুমারী মৈত্র ২০৲

মুক্তি বসু ১৫৲

বামারচনা।

বিপত্নীকের পত্নীমিলন।

শুন যত সভাজন বল হরি বোল
বুড়োর বিয়ে প্রয়াগ ধামে পড়্‌ল হাসির রোল।
সত্তর বর্ষ বয়স হল গিন্নী গত তার,
বিয়ের তরে বুড়ো পাগল খোঁজে পরিবার।
গিন্নী গত, গৃহশূন্য, দুনিয়া অন্ধকার,
ভাবে বুড়ো কবে পাব, বনিতা আবার।
তিন পুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্র, পৌত্রী, আর
জামাতা দুহিতা দিয়ে পূর্ণিত আগার।
সে সকলে নাইক মন ভাবে নিশিদিন,

কোথায় পাব পত্নী হবে কবে শুভদিন।
তার পরেতে বিধির লীলা শুন চমৎকার,
বিজ্ঞাপনে নজর পড়ে একদিন বুড়ার।
সুদূর পল্লীতে এক কুলীন ব্রাহ্মণ
তাহার ঘরে আছে কন্যা কুমারী তিন জন।
পঞ্চাশ বছর বয়স, মেজটি তিরিশ,
কনিষ্ঠা যে কন্যা, তাহার বয়স হল বিশ।
অর্থাভাবে পিতা তাদের করেনিক দান,
করুন বিয়ে, যদি কেহ শুধু কন্যা চান।
বিজ্ঞাপন দেখে বুড়ার নেচে উঠল প্রাণ,
এত দিনে বুঝি দয়া করলেন ভগবান।
হারা নিধি পেলে লোকের যে আনন্দ হয়,
শুভ খবর পেয়ে বুড়োর তেম্নি সুখোদয়।
পাঠিয়ে তাদের রাহা খরচ তড়িৎ-যন্ত্র-যোগে
হেথা বুড়ো লেগে গেল বিবাহ উদ্যোগে।
প্রয়াগ ধামে কন্যা এলে করবে বিয়ে তায়,
আনন্দেতে বুড়োর দেহে যুবার শক্তি বয়।
তার পরেতে আরো মজা শুন চমৎকার,
তিনটি মেয়ে নিয়ে হাজির জনক কন্যার!
বড়টিরে সমর্পিতে পিতার প্রাণ চায়,
কনে দেখে জলে গেলেন পাত্র মহাশয়।
প্রৌঢ়া মেয়ে বিয়ে করতে তিনি রাজী নন,
তিরিশ যে তারি তরে ব্যাকুলিত মন।
কনের বাপ বলে শুন, পাত্র মহাশয়
বড় রেখে ছোটর বিয়ে সে ত নাহি হয়।
ঝগড়া ঝাঁটি কাজ নাইক হিত কথা কই,
শুভ লগ্নে বিয়ে কর বড়, মেজ, দুই।
ব্যাপার দেখে ভাবে বুড়ো এত মন্দ নয়
একটা গিয়ে দুটা হ'ল ভাগ্য পরিচয়।
বড় গিন্নী দাসী রূপে থাক্‌বে গৃহে মোর,
ছোট নিয়ে আনন্দেতে থাকব আমি ভোর।
রান্না বান্না কাজ কর্ম্মে দিব নাক তায়,
এই না ভেবে বিবাহেতে দিল বুড়ো সায়।
ফাল্গুনে শুভ তিথিতে মলয় মধুর বয়,
সেজে গুজে চল্ল বুড়ো বিবাহ সভায়।
ছাঁদলা তলায় বর দাঁড়াল বলিহারি যাই,
চুলে কলপ তোবড়া গালে দাঁতের বালাই
নাই।
দুই কন্যা বরণ হল চোদ্দ পাক দিয়ে,
এক সঙ্গে মন্ত্রপূত করে নিল দুয়ে।
বিয়ে করে ছোট নিয়ে পাল্কি চড়ে যায়,
বড় চল্লেন দাসীরূপে, কে দেখে তাহায়।
পথের মাঝে দেশের যত নব্য ছেলের দল
সঙ্গে সঙ্গে চল্ল সবে বাজিয়ে কর্ত্তাল খোল।
তার পরেতে ফুলশয্যা শুন সভাজন,
বর বিছানা সাজাইতে দিল বুড়ো মন।
দেশের যত যুবকবৃন্দ দিয়ে মালা ফুল
বুড়োয় দিল সাজাইয়ে বল হরিবোল।
বুড়ো মড়া মলে যেমন সাজায় তারে সবে,
সাজিয়ে তেম্নি হরি হরি বলে উচ্চ রবে!
বল হরি, হরি বোল, বল হরি বোল,
বুড়োর বিয়ে প্রয়াগ ধামে পড়্‌ল হাসির
রোল।

শ্রীনীরদবরণী দেবী।

৩৭ নং মধুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষ কুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

৫২ বর্ষ।

বামাবোধিনী পত্রিকা

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি. এ. কর্তৃক প্রবর্ত্তিত।

শ্রাবণ, ১৩২২। আগষ্ট ১৯১৫।

সূচী।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২।৵০; অগ্রিম ষাণ্মাষিক মূল্য ১৷৴০; প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।০ (চারি আনা মাত্র।)

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 624. August, 1915.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫২ বর্ষ। ৬২৪ সংখ্যা। | শ্রাবণ, ১৩২২। আগষ্ট, ১৯১৫। | ১০ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

আমাদের কথা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রফুল্লকুমার

(১)

সরলার বিবাহের সময় বাড়ী আসিতে পারি নাই, অথবা ইচ্ছা করিয়াই আসি নাই। কলির ছেলেরা যেমন "পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ" ভুলিতেছে, কলির পিতাঠাকুরমহাশয়েরাও বুঝি তেমনি "প্রাপ্তেতু ষোড়শে বর্ষে পুত্রে মিত্রবদাচরেৎ" ভুলিয়া তাহার প্রতিশোধ লইতেছেন। নহিলে আজ আমার সোণার সরলার এই দশা। তোমরা বলিবে তাহার "কপাল"। ড্যাম্ তোমাদের কথা! আমি হিন্দু হইয়াও "ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র নচ বিদ্যা নচ পৌরুষম্" এ কথায় পদাঘাত করি। আমি ছোট বেলা হইতে শিখিয়াছি "দৈবেন দেয়ম্ ইতি কাপুরুষা বদন্তি।" বড় হইয়া হিন্দুদিগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম-গ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতায়, গীতার প্রধান নায়ক শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখে শুনিয়াছি :—

নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈ গুণৈঃ॥

আমার তরুণ বুদ্ধিতে এই কথার মর্ম্ম যতদূর বুঝিয়াছি তাহা "পুরুষকার", passiveness নহে। ভাগ্য যাহা করিবার থাকে করুক, আমার সে দিকে দৃক্‌পাত করিবার আবশ্যক নাই,—ভাগ্যের দোহাই দিয়া হাত পা কোলে করিয়া বসিয়া থাকিবার আমার অধিকার নাই। গীতোক্ত ধর্ম্মোপদেশের এক অংশ শিক্ষা করিবার জন্য এই কর্ম্মবীর পাশ্চাত্য

জাতিকে আজি সম্মুখে পাইয়াছি। আমাদের ধর্ম্ম পুঁথিতে আছে কাজে নাই, তাহাদের ধর্ম্ম কাজে আছে পুঁথিতে নাই, তাই তাহারা বড়।

জিজ্ঞাসা করিবে "তুমি কি রকম হিন্দু?"—এই প্রাচ্য আদর্শ ও পাশ্চাত্য উদাহরণের সমবায়ে যে হিন্দু সৃষ্ট হইবে, যে হিন্দু প্রবৃত্তি নিবৃত্তির সমন্বয় করিবে, যে হিন্দু "এদিক্ ওদিক্ দু দিক্ রেখে দুধের বাটী" খাইবে, যে হিন্দু সংসার ও সন্ন্যাসের দুখানি তরবারি দুই হাতে ঘুরাইবে, যে হিন্দু ভারতের দর্শন ও পাশ্চাত্যের শিল্পবিজ্ঞান একত্র করিয়া সোণার সংসার গড়িবে, যে হিন্দু বর্ত্তমান অধঃপতিত হিন্দু সমাজের আবর্জ্জনায় ঝাড়ু দিয়া, তাহার স্থানে সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের সার উদ্দেশ্যের উপর সমাজের ভিত্তি স্থাপন করিবে,—সেই হিন্দু আসিতেছে! এই আশার অরুণালোক যে সকল বঙ্গীয় যুবকের মানস-চক্ষে পতিত হইয়াছে, এ অধম তাহাদেরই অন্যতম। যে হিন্দুকে দেখিয়া জগৎ ধর্ম্ম শিক্ষা করিবে, যে হিন্দু প্রাচীন আর্য্য জাতির জ্ঞানগরিমার সুপ্ত আদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করিবে, আর যে হিন্দু স্বর্গাদপি-গরীয়সী জন্মভূমি, মাতৃভূমি, আর্য্যভূমি, ভারতবর্ষকে আবার ঐশ্বর্য্য-শালিনী করিবে, সেই হিন্দু আসিতেছে,—এই দুরাশা (?) যে সকল যুবক হৃদয়ে পোষণ করে, এ অধম তাহাদেরই একজন।

(২)

যাক্ সে কথা; এখন, যাহা বলিতেছিলাম, বাবার কথা, সরলার বিবাহের কথা, সরলার অকাল বৈধব্যের কথা,—আমার মর্ম্মজ্বালার কথা, ক্ষোভের কথা, দুঃখের কথা।

বাবা দরিদ্র স্বীকার করি, এবং ইহাও স্বীকার করি যে, "দারিদ্র্যদোষো গুণরাশি-নাশী,"—দরিদ্র হইলে মানুষের কাণ্ডজ্ঞান লোপ পায়, কিন্তু চক্ষে আঙ্গুল দিয়া বুঝাইলেও কি বুঝিতে নাই। আমিতো আর ছেলে মানুষ নহি; এখন আমার সহিত পরামর্শ করিয়া, আমার মতামত একটু শুনিয়া, একটু ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া আমার যুক্তিগুলি বিবেচনা করিয়া দেখিলে মন্দ ছিল কি? তাহাতো হইবার যো নাই; আমি ছেলে মানুষ, আমি নির্ব্বোধ, আমি সমাজের এবং কৌলীন্য-ধর্ম্মের কি বুঝি? আমি ইংরাজী পড়িয়া গোল্লায় গিয়াছি, তার উপর মড়া কাটিয়া কাটিয়া আমি আরও ধর্ম্ম-কর্ম্ম লোপ করিতেছি, বাস্!

গত বৈশাখ মাসে সরলার বিবাহ হইয়াছে, বাবার হাতে পয়সা থাকিলে আরও দুই তিন বৎসর পূর্ব্বেই হইয়া যাইত। তাহাতে আর কিছু লাভ হৌক আর না হৌক, গৌরী দানের ফললাভ হইত, কিন্তু তাহা হইয়া উঠে নাই।

গত বৎসর আমি স্বয়ং আমার একটী বন্ধুর সহিত তাহার বিবাহ স্থির করিয়াছিলাম। আমার বন্ধু সুন্দর, সবল,

সচ্চরিত্র এবং বুদ্ধিমান্, আমার সঙ্গেই পড়িতেন। তাঁহার পিতার অবস্থা ভাল, এজন্য বিনা অর্থে আমার ভগ্নীর পাণি-গ্রহণে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। বাবা তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন এবং সুখ্যাতি করিতেও বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু আপত্তি উঠিল, তাঁহারা উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থ—অতএব অস্পৃশ্য। কি সর্ব্বনাশ! তাঁহার পিতা শিক্ষিত, এজন্য আমাদের সহিত অর্থাৎ দক্ষিণ-রাঢ়ীর সহিত ক্রিয়া করিলে চৌদ্দ পুরুষ নরকস্থ হইবে, মনে করিতেন না, এজন্য রাজি হইয়াছিলেন, এবং আমার ভগ্নীর মত সুন্দরী এবং শিক্ষিতা সংজে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না বলিয়া, এ প্রস্তাবে বিশেষ আগ্রহও প্রকাশ করিয়া-ছিলেন। কিন্তু আমি কিছুতেই বাবার মত করাইতে পারিলাম না, দত্ত মহাশয় এবং মেজদিদিও বুঝাইতে ত্রুটি করেন নাই।

হয়ত বাবাকে বা রাজি করিতে পারিতাম, কিন্তু তর্করত্ন মহাশয়ের মধ্যস্থতায় সব মাটি হইল। তিনি বাবাকে বুঝাইয়া দিলেন যে,—এখনকার ছোঁড়াগুলা সমাজটাকে নষ্ট করিবে, তাহাদের মাথা গরম, তাহাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম-জ্ঞান নাই, তাহারা খৃষ্টান, ব্রহ্মজ্ঞানী, নৈল্লিক ইত্যাদি ইত্যাদি। বাবা বলিলেন "ঠিক কথা।" তর্করত্ন মহাশয় আমার উপর হাড়ে হাড়ে চটা ছিলেন, কারণ যখন তাঁহার চতুর্থ পক্ষের বিবাহ হয়, তখন অপরাধের মধ্যে আমি বলিয়াছিলাম "তর্ক-রত্ন ঠাকুরদাদা! পর পর তিনটি ঠান্‌দিদি যখন আপনার ঘরে আসিয়া বন্ধ্যা প্রমাণ হইলেন, তখন নূতন ঠান্‌দিদি যে উর্ব্বরা হইবেন, তাহা কেমন করিয়া বুঝিলেন? শেষ কাল, এখন ও সব ছাড়িয়া ঈশ্বরোপা-সনায় মন দিন,"—আর যাবে কোথায়? আমি যদি উকুন হইতাম, তবে বুঝি তিনি নখের উপর রাখিয়া নখ দিয়া আমাকে টিপিয়া মারিতেন। এজন্য বাবার কাছে বিস্তর বকুনি খাইয়াছিলাম।

তার পর দেখিয়া শুনিয়া আমরা হা'ল ছাড়িয়া দিলাম, কি করিব?

(৩)

মেজ দিদি ও দত্ত মহাশয় ইচ্ছা করিয়া-ছিলেন, অর্থ সাহায্য করিয়া সরলার ভাল যায়গায় বিবাহ দেন। কিন্তু বাবার একটি মহৎ গুণ ছিল,—উত্তরাধি-কারিত্বে আমিও তাঁহার সেই গুণের একটু অংশ বোধ হয় পাইয়াছি,—তিনি বিনিময় ব্যতীত কাহারও কোনও উপকার লইতে বড় রাজি ছিলেন না। বাবার সংসারে চির-দারিদ্র্য, মেজদিদি অতুল ধন-সম্পত্তির অধিকারিণী, এবং দত্ত মহাশয়ও সর্ব্বদা বাবাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত, কিন্তু বাবা কোনও দিন তাঁহাদের এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন নাই। অধিকন্তু তিনি বলিতেন "বাবা, তুমি গরিবের কন্যা বিনা দক্ষিণায় গ্রহণ করিয়াছ, তোমার ঋণ আমি জীবনে পরিশোধ করিতে পারিব না, তোমরা সুখ স্বচ্ছন্দে থাক, তাই দেখিয়াই আমার সুখ। আমার সন্তান ঈশ্বর এক রকম করিয়া অবশ্যই করিবেন।" সরলা

সর্ব্বদা মেজদিদির কাছে থাকিত, প্রায় সেইখানেই খাইত, মেজদিদি প্রায়ই তাকে এটা ওটা কিনিয়া দিতেন, তাহাও যেন বাবা পছন্দ করিতেন না।

আমি যখন এখান হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পঞ্চদশ টাকা বৃত্তি পাইলাম এবং কলিকাতায় পড়িতে চলিলাম, দত্ত মহাশয় ও মেজদিদি বার বার করিয়া বলিয়াছিলেন "তোর পোনেরো টাকায় কলিকাতায় থাকা কষ্ট হইবে, যখন যাহা আবশ্যক হবে লিখিস্ টাকা পাঠাবো—লজ্জা করিস্‌নে ভাই!" পাছে তাঁহারা প্রাণে ব্যথা পান, এজন্য আমি বলিয়াছিলাম "লিখিব, কিন্তু না লিখিলেও যদি টাকা পাঠাও তবে তাহা ফিরাইয়া দিব"। বলা বাহুল্য, অতি কষ্টে দিন কাটাইয়াছি, তথাপি চারি বৎসরের মধ্যে একটী পয়সাও গ্রহণ করি নাই। তবে বাড়ী আসিলে বা পূজার সময় পোষাক পরিচ্ছদ যাহা কিছু তাঁহারা আহ্লাদ করিয়া প্রস্তুত করাইয়া দিতেন তাহা ফিরাইয়া দিতে পারি নাই, কিন্তু মনে মনে মাথা কাটা যাইত।

এফ্, এ, পরীক্ষায়ও বৃত্তি পাইয়াছিলাম। পড়িবার কালে তাহাতেই চলিয়াছিল, কিন্তু বি, এ পাস করিবার পর যখন আমার মেডিকেল্ কলেজে পড়িবার কথা হইল, তখন আমার নিজের কোনও আয় ছিল না। ছেলে পড়াইয়া মেডিকেল কলেজে পড়া তেমন সুবিধা নহে। এবার মেজদিদি বাবাকে ধরিয়া পড়িলেন, আমার পড়াইবার ভার সব লইবেন, দত্ত মহাশয়তো আমায় বিলাতে পাঠাইতেই প্রস্তুত, কিন্তু এক পুত্র—পিণ্ড তো চাই, আমি তাহা উড়াইয়া দিলাম। বাবা ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, আমিও খবরের কাগজে wanted (কর্ম্মখালি) দেখিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু ১৯ বৎসর বয়স শুনিয়া আমার কোনও দরখাস্তই প্রায় মঞ্জুর হইল না—অবশ্য হেড্‌মাষ্টারী করিয়া এম্ এ দিবার জন্যই এই সকল দরখাস্ত করিয়াছিলাম। কেরাণী গিরীতে প্রবৃত্তি যায় নাই।

এদিকে দক্ষিণ পাড়া হইতে এক বিবাহের সম্বন্ধ আসিল। তখন জ্যৈষ্ঠ মাস, মেজদিদি লুকাইয়া আমার ভাবী পাত্রীকে তাঁর গাড়ী করিয়া আপনার বাড়ীতে আনিলেন—মা ও বাবাকে ভাল করিয়া দেখাইবেন এবং আমাদের দুটীকে বিবাহের আগেই একবার 'শুভদৃষ্টি' করাইয়া রাখিবেন। আমি অবশ্য এ সকল কথা আগে কিছুই টের পাই নাই। দত্ত মহাশয় হঠাৎ ন্যাকা সাজিয়া আমায় ডাকিয়া লইয়া গেলেন, বলিলেন "বাগান থেকে কলমের আম এসেছে, খাবি আয়।" দত্ত মহাশয় কিন্তু বাড়ীর মধ্যে না গিয়া, সরাসর খিড়কির বাগানের গেট খুলিয়া আমায় লইয়া চলিলেন। আমি বলিলাম "তুমি কি আমায় গাছে তুলিয়া দিয়া আম খাওয়াইবে নাকি?" তিনি বলিলেন "চল্‌তো!" রসাল লোভে লোল রসনায় আমি অগ্রসর হইলাম।

তিনি ক্রমে আমার হাত ধরিয়া লইয়া গিয়া তাঁর মাধবী-কুঞ্জের মধ্যে ঢুকিলেন, আমায় বলিলেন "শান্তমিদমাশ্রমপদম্—কেমন রে?" আমি বলিলাম "তার পর?" "তার পর তোর বোধ হয় এতক্ষণ "স্ফুরতি চ বাহু"। আমি বলিলাম "অপরাধ"? "তোর জন্য আজ যে শকুন্তলা যোগাড় করিয়া ফেলিয়াছি!" আমি বলিলাম "কোন্ গাছে?" "গাছে কিরে? ঐ একবার তাকিয়ে দেখ্ না—তখন বলিস্ সত্যসত্যই 'পরাজিতা খলু উদ্যান-লতা বনলতাভিঃ' কিনা?" আমি বলিলাম "তুমি খুব অং বং সং শিখেছ তা জানি, এখন আম দেবে তো দাও। "আরে আম তো খাবি, একবার দেখ্ দেখি, আজ মালতীকে কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে—তার সঙ্গে তোর বোন কেমন নেড়াচ্ছে, একবার তাকিয়ে দেখ্", এই বলিয়া আমায় আঙ্গুল দিয়া দেখাইলেন। তাঁর অঙ্গুলি নির্দ্দেশানুসারে চাহিয়া দেখি মেজদিদি আর মালতী দুজনে অদূরে পাঁচীলের ধারে বেলফুলের সারে জল দিতেছেন, অমনি সঙ্গে সঙ্গে দত্ত মহাশয় মেজদিদিকে লক্ষ্য করিয়া চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিলেন "ওগো প্রিয়ম্বদে!" এতক্ষণে দত্ত মহাশয়ের নষ্টামী বুঝিতে পারিলাম, সব ষড়যন্ত্র বুঝিলাম। মেজদিদি যেমন আমাদের দিকে চাহিয়াছেন, আমার লজ্জায় প্রাণ বাহির হইয়া গেল, দত্ত মহাশয়কে ধাক্কা দিয়া একখানা বেঞ্চের উপর ফেলিয়া দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পাঁচিল উল্লম্ফন করিয়া পলাইয়া এক দৌড়ে বাড়ী আসিলাম। মেজদিদি কি মনে করিবেন! লুকাইয়া আমি মালতীকে দেখিতে আসিয়াছিলাম! আর ওখানে যাবো না।

তোমরা বলিবে "কেমন দেখিলে?" মালতীকে আজ নূতন দেখি নাই। তাদের পাড়ায় আমাদের স্কুল, তাদেরই বাড়ীর পার্শ্বে আমাদের খেলিবার ময়দান এবং জিম্‌নাষ্টিকের আখ্‌ড়া। খেলিতে খেলিতে জল পিপাসা পাইলে হাঁপাইতে হাঁপাইতে তাদেরই বাড়ী যাইতাম, সে হাতে করিয়া অনেক জল দিয়াছে। তাহার দিদি মা তামাসা করিয়া বলিতেন "পেরকুল্লোর সঙ্গে মুলুতীর বিয়ে দেবো—দুটীতে বেশ মানাবে।" আমরা দুজনে চোখ-চোখি করিয়া হাসিতাম, আমি মুখ-ফোঁড় ছিলাম, বলিতাম "তুমি আমার বৌ", মালতী "যাঃ" বলিয়া হসিয়া পলাইত। আবার ঘরের ভিতর গিয়া সে জানালা দিয়া মুখ বাড়াইত, আমি মুখ ভেংচাইতাম, সে আবার আমায় ছোট রাঙা হাতের কীল দেখাইয়া পলাইত। যখন কলিকাতায় বি, এ পড়ি, তখনও পূজার ছুটীতে, গ্রীষ্মের ছুটীতে বাড়ী থাকিতাম, মালতীদের পাড়ায় খেলিতে গিয়া তাদের বাড়ী বসিতাম, আর তার সঙ্গে অমনি করিতাম। মালতী দূর সম্পর্কে মেজদিদির ননন্দা, মেজদিদি বলিয়াছিলেন নিশ্চয়ই এদের দুটীতে বিবাহ দিব। কাযেই মনে মনে মালতীর সঙ্গে এক প্রকার—হইয়াই গিয়াছিল। অতএব মালতীকে এই নূতন

দেখিলাম না। কিন্তু যদি নূতনও আজ দেখিতাম, তথাপি একবার মাত্র দেখিয়াই বলিতে পারিতাম "সুন্দরী"! আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই জানি যে, সৌন্দর্য্য চিনিতে খুঁটি নাটি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয় না। সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণের বিষয় নহে, সংশ্লেষণের বিষয়। কেমন নাক, কেমন চোখ, কেমন দাঁত, কেমন স্থান, কেমন তান, এমন করিয়া সৌন্দর্য্য দেখিতে যাওয়া অন্ধতার পরিচায়ক। যাহার চক্ষু আছে তাহার সম্মুখে একবারমাত্র পড়িলে সে তৎক্ষণাৎ সুন্দর অসুন্দর চিনিয়া লইতে পারে—তাহাকে আর অঙ্ক কসিয়া দেখিতে হয় না। সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া যাহারা মন প্রাণ নিক্ষেপ করে, তাদেরও বুঝি এই রীতি! তাই বুঝি জগতের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়াছেন—"Who ever loved, that loved not at the first sight?"

তোমরা জিজ্ঞাসা করিবে "তুমি কি তবে তাকে ভাল বাসিয়া ফেলিয়াছিলে?" আমি তাহা স্বীকার করি না। জীব-হৃদয়ের—বিশেষতঃ মনুষ্য-হৃদয়ের ঐ বৃত্তিটীকে আমি হৃদয়ের দুর্ব্বলতা মনে করিয়া তাহাকে আদৌ পশ্রয় দেওয়া শ্রেয়ঃ মনে করি নাই। ইচ্ছা ছিল মনকে কৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করাইব। শুনিয়াছি ভাল বাসিয়া আজিও নাকি কেহ সুখী হয় নাই। তবে তো এ যাত্রা বিলক্ষণ জিত দেখিতেছি।

(৪)

তার পর শুনিলাম বাবা ও মা দশমুখে মালতীর সুখ্যাতি করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বাস্তবিক আমার ভগ্নীদের পার্শ্বে দাঁড়াই-বার উপযুক্ত—রূপে ও গুণে—গ্রামে অন্য কোনো মেয়ে ছিল না—কেবল মালতীই ছিল। মার এজন্য ভারি টান ছিল তাকে পুত্রবধূ করেন। কিন্তু—

মেজদিদির ইচ্ছা সেই দ্বাদশবর্ষীয়া নারী-রত্নকে আমার হস্তে, অথবা আমাকে সেই নারী-রত্নের হস্তে, সমর্পণ করিয়া রাখিয়া, আমায় নিজের ব্যয়ে ডাক্তারী পড়ান। অথবা বাবা যদি তাতে রাজি নাও হন, তথাপি অন্য কোনও স্থানে চাকরীর জোগাড় করিয়া দেন, অথবা কলিকাতায় আমি ছেলে পড়াইয়া এম্ এ অথবা আইন পড়ি। দত্ত মহাশয়ের অনেক বড় লোক বন্ধু বান্ধব আছেন, এসব জোগাড় তিনিই করিয়া দিবেন।

মেজদিদির খরচে ডাক্তারী পড়ানতে বাবা কিছুতেই সম্মত হইলেন না—বলা বাহুল্য আমিও নই। শেষে বাবা প্রস্তাব করিলেন, যদি মালতীর পিতা আমাকে ডাক্তারী পড়াইতে পারেন, তবে বিবাহ দিবেন। তিনি এখন না হয় ধার কর্জ্জ করিয়া কিছু দিতে পারেন, কিন্তু পড়ার খরচ তাঁর সাধ্যাতীত। দত্ত মহাশয় অন্যত্র পাত্রী সন্ধান করিতে আরম্ভ করিলেন, যাহাতে পড়ার খরচও পাওয়া যায়, মেয়েও ভদ্রলোকের মত হয়;—কেননা বাবা কন্যা গ্রহণের বিনিময়ে পড়ার খরচ লইতে রাজি আছেন। বাবার ইচ্ছা আমি খুব বড় মানুষ হই—তার জন্য

ডাক্তারীই নাকি তাঁর মতে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায়।

এইবার হঠাৎ তাহা মিলিল। তর্করত্ন মহাশয় আসরে অবতীর্ণ হইলেন। যাহাতে আমার ভবিষ্যতে "ভাল" হয়, তাহার উপায় না করিয়া তিনি কিছুতেই নিরস্ত হইবেন না।—তিনি আমাকে বড় ভাল বাসেন কিনা! বাবাও তাঁর খুব অনুগত, যেহেতু তিনি জবরদস্ত পণ্ডিত, তর্কে তাঁর ভয়ানক তেজ, কত সব সংস্কৃত গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করিয়া অসাধ্য সাধন করিয়া ফেলিয়াছেন—খুব জাঁক। রামতনু বসুর পিতৃশ্রাদ্ধের দিনে যখন ভট্টপল্লীর বিখ্যাত রণজয়ী পণ্ডিতদিগের সঙ্গে তাঁহার "তৈলাধার ভাণ্ড অথবা ভাণ্ডাধার তৈল" এই গুরুগম্ভীর দার্শনিক মীমাংসা লইয়া গজকচ্ছপী তর্ক হয়, তখন তাঁহার সাতবার কাছা খুলিয়া গিয়াছিল এবং তিন বার নস্যের ডিবা উল্টাইয়া গালিচার উপর নস্য পড়িয়া গিয়া, নস্যাধার ডিবা প্রমাণ হওয়া সত্ত্বেও তিনি বীরদর্পে প্রমাণ করিয়াছিলেন—তৈলই ভাণ্ডের আধার, অন্ততঃ তৈল যে ভাণ্ডের আধার নহে, ইহা কেহ ন্যায় শাস্ত্রের সাহায্যে প্রতিপন্ন করিতে পারেন না। তাঁহার ন্যায় শাস্ত্রে প্রগাঢ় দখলের নমুনা আমাকে একদিন দিয়াছিলেন। আমি তাঁহার শেষ বিবাহ উপলক্ষ্য করিয়া যখন বলিয়াছিলাম "তিন কাল গিয়াছে, এখন ছেলে মানুষকে বিবাহ করিলে লোকেই বা কি মনে করে, আর বিবাহিতা তরুণীই বা কি মনে করবে?" তাহাতে তিনি আমায় বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, পঞ্জিকা যেমন কখনো পুরাতন হয় না, তেমনি পুরুষমানুষ কখনও পুরাতন হয় না। অধিকন্তু, মানুষের আহার্য্য চতুর্বিধ—চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য এবং পেয়—তার মধ্যে আজিও যখন তাঁহার চোষ্য, লেহ্য এবং পেয় এই ত্রিবিধ খাদ্য অধিকার আছে, তখন তাঁহার বয়সেরও তিন কাল আছে, এক কাল মাত্র গিয়াছে—ইহাই ন্যায়ানুমোদিত সিদ্ধান্ত। বলিহারি! আমি যখন তাঁহার এই অপূর্ব্ব লজিকের কথা মেজদিদি ও দত্ত মহাশয়কে শুনাইলাম, তখন দত্ত মহাশয় বলিলেন "হাঁ, genius বটে! নহিলে আর চার বিঘা ভূমিতে এক গাছা খড়ও জন্মিল না! ঝাঁজ কত!" মেজদিদি মুখে কাপড় দিয়া উঠিয়া গেলেন। দত্ত মহাশয় বড় বেয়াদব। যাহোক, এহেন পুরুষ-প্রধান, ধর্ম্ম এবং সমাজ তত্ত্বজ্ঞ তর্করত্ন মহাশয় যাহা বলিবেন বাবার তাহা শিরোধার্য্য।

কলিকাতার একজন ধনী ডাক্তার তাঁহার শিষ্য, তিনি কুলীন, তাঁহার কন্যা ঘরে আসিলে আমাদের বংশ-গৌরবে হৈ হৈ পড়িয়া যাইবে, এবং তিনি খোদ সুপারিস্ করিলে তাঁহার শিষ্য মহাশয় এ অধম বংশে কন্যা দান করিবেন, তাহাতে তাঁহার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিল না। আর কন্যাটীও দেখিতে "মন্দ নহে"—মেয়েমানুষ কুশ্রী হইতেই পারে না, নামই যার fair sex, যেমন বাংলাতে "কোমলাঙ্গী,"

"সুন্দরী" প্রভৃতি বলিলে, মেয়ে মানুষই বুঝিতে হইবে। তার পর গুণের তো কথাই নাই. এখনকার ছোঁড়ারা মেয়ে মানুষের লেখা পড়া পছন্দ করে, তা সে মেয়ের নাকি তাও পর্য্যন্ত জানা আছে—এমন কি যুক্ত অক্ষর পর্য্যন্ত সে নিজে হাতে লিখিতে পারে। অধিক কথা কি, তর্করত্ন মহাশয় স্বয়ং একবার দেখিয়া আসিয়াছেন যে, সে মেয়ে, এত বড় লোকের মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও, আপন হাতে ভাত তুলিয়া খাইতে পারে। আরও প্রশংসার কথা এই যে, পান পর্য্যন্ত সে শীঘ্রই সাজিতে শিখিবে এমন সম্ভাবনাও নাকি তিনি দেখিয়া আসিয়াছেন। বয়স ত্রয়োদশ মাত্র—এরই মধ্যে এমন তৈয়ার হইয়াছে। বাবা এ সকল কথায় কর্ণপাত যত করুন আর নাই করুন, পড়ার খরচ মিলিবে এ বিষয়ে নিশ্চিত হইলেন এবং আমি বড় মানুষ হইব তদ্বিষয়েও দৃঢ়-নিশ্চয় হইলেন।—মালতীর সঙ্গে বিবাহ দিলে ভবিষ্যতে আমার বড় লোক হওয়া অনিশ্চিত। ঝট্ পট্ সমস্ত স্থির হইয়া গেল, বিবাহও হইয়া গেল। আমিও good boy অর্থাৎ ভাল ছেলেটীর মত বিবাহ করিয়া ফেলিলাম। মেজদিদি ও দত্ত মহাশয় ক্রোধে গর্ গর্ করিতে লাগিলেন, আমি চুপ্ চাপ্! বাবার ইচ্ছা আমি বড় মানুষ হই,—তথাস্তু। সেই অবধি "যস্য কন্যা বিবাহিতা" মহাশয়ই আমায় ডাক্তারী পড়াইয়াছেন, এম্-বি পরীক্ষা দিয়া বাড়ী আসিয়াছি, দেখি কি হয়।

(৫)

সে সব কথা যাক, এখন একি সর্ব্বনাশ হইল!—আমার সরলার এখন কি হবে? এ কথা ভাবিয়া যে আমি অন্ধকার দেখিতেছি। আমার জ্ঞান, বুদ্ধি, শিক্ষা, দীক্ষা সবই যে আমায় ত্যাগ করিতেছে।

সরলা বড় চঞ্চলা, বড় মুখরা, বড় প্রখরা ছিল। আহা পর-দুঃখ-কাতর, শাস্ত্রজ্ঞ, দেবচরিত্র, বিদ্যারত্ন মহাশয় আজ দুই বৎসর হইল স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, তাঁহার সেই সূর্য্যদেবের মত তেজঃপুঞ্জময় অথচ শশধর-সদৃশ কমনীয় মুখকান্তি মনে হইলে ভক্তিভরে আজিও চক্ষে অশ্রু গড়াইয়া আসে। দয়ার সাগর, গুণের সাগর, পণ্ডিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার যেন হরি-হর আত্মা ছিল। মনে হয় এই সকল শ্রদ্ধেয় মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন বলিয়াই, আজিও ভারতের আকাশে চন্দ্র সূর্য্য উঠে, হিন্দুসমাজ আবার সুস্থ হইবে বলিয়া আশা হয়, আমরা আজিও মরি নাই বলিয়া বোধ হয়। বিদ্যারত্ন মহাশয় বাবাকে বলিতেন "ছেলে মেয়েগুলাকে ছোট বেলায় চঞ্চল দুরন্ত দেখিলে আমার বড় আনন্দ হয়। এ সকল তাহাদের ভবিষ্যতের বুদ্ধিপ্রাখর্য্য এবং কার্য্যতৎপরতার পূর্ব্বাভাস, তোমার ছোট মেয়েটিকে আমি বেশ দেখি—যেন ঠিক শারদ সন্ধ্যার চঞ্চল জোনাকি পোকাটি, তোমার সরোজিনীর চেয়েও এর বুদ্ধিসুদ্ধি বেশী হবে। এ সকল মেয়ে রত্ন-গর্ভা, ভাল দেখে বিয়ে দিও। আহা, বেঁচে

থাক্, বেঁচে থাক্।” স্বর্গীয় বিদ্যারত্ন মহাশয়! আপনার পবিত্র মুখের আশীর্ব্বাদ ব্যর্থ হইবার নহে,—সরলা বাঁচিয়া আছে। আপনি পরম জ্ঞানী, আপনি প্রকৃতির গতির উপর অভিমতের ভিত্তি গড়িয়াছিলেন। কিন্তু আমরা যে “খোদার উপর খোদ্‌কারি” করিতে শিখিয়াছি, আপনার সরল বুদ্ধিতে তাহা আপনি কেমন করিয়া ধরিবেন?

বিদ্যারত্ন মহাশয় সত্যই বলিতেন, সরলার মত প্রখরবুদ্ধি আমি দেখি নাই। তেরো বৎসর বয়সের মধ্যে সে দত্ত মহাশয় ও মেজদিদির কাছে যতটা শিক্ষালাভ করিয়াছে, আমি বুঝি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও ততটা পারি নাই, আমি চৌদ্দ বৎসরে এনট্র্যান্স পাশ করিয়াছিলাম। এ আশ্চর্য্য মেয়ে! এ ছাড়া মেজদিদির মস্তিষ্কে এমন কোনও প্রকার শিল্প-বিদ্যা নাই যাহা সে এই বয়সে আয়ত্ত করে নাই। মেজদিদি বলিতেন “আর তোকে কি শিখাইব? বিয়ে হ’লে শ্বশুরবাড়ী গিয়া ননদ-জায়েদের কাছে আরও শিখিস্।” তাতো সবই হইল, আর হইলেও তাঁহার শিষ্যার শিক্ষার উপর কেহ টেক্কা দিতে পারিত বলিয়া তো বোধ হয় না। আমার মেজদিদির মত শিক্ষিতা নারী-রত্ন আমাদের বর্ত্তমান সমাজ কয়জন বাহির করিতে পারে?—বড় বেশী নয়। কিন্তু সবই তো হইল! সরলা পাতা কুড়াইয়াই মরিল—আগুন পোহান আর তার হইল না,—বুঝি পাতা কুড়াইতেই তার জীবন যাইবে! কিন্তু—কিন্তু—কেন যাইবে? যাইতে দিব না—সে নিরপরাধিনী—রাক্ষস সমাজ আমার সরলাকে নিরপরাধে মারিবে? তা—কখনই না—এর জন্য আমার যাহা করিতে হয় করিব, বাবার অবাধ্য হইতে হয়, তাহাও হইব—বাবার পায়ে ধরিয়া কাঁদিব—আমি সরলার নিশ্চয়ই বিবাহ দিব—

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

ঠিক কথা, আর সহ্য হয় না—অন্যায়—এই মেজদিদির কাছে চলিলাম।

(ক্রমশঃ)

মার্কিন ও বঙ্গমহিলা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর):

স্বাস্থ্য।

আমেরিকাতে যে সমস্ত মহিলা উচ্চ-শিক্ষা পাইয়া থাকেন এবং যাঁহারা পুরুষোপযোগী কার্য্যে নিযুক্তা, তাঁহাদের স্বাস্থ্য ভাল নহে; কেহ বা অত্যন্ত স্থূলকায়, কেহ বা অত্যন্ত কৃশাঙ্গী এবং তাঁহাদের

শরীরের মধ্যেও নানাবিধ ব্যাধি আছে। আবার যাঁহারা পুরুষদের মত বেশী বক্তৃতাদি করেন, পুরুষদের সঙ্গে পাঠে প্রতিদ্বন্দ্বী হন, তাঁহাদেরও শরীরে নানাপ্রকার অস্বাভাবিক লক্ষণ প্রকাশিত হয়। আমাদের দেশের কলেজ-ক্লাসের মেয়েদের স্বাস্থ্য আমেরিকার ছাত্রীদের অপেক্ষাও মন্দ, তাহার কারণ এ ভিন্ন আর কিছু নহে —(১) তাহাদিগকে অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করিতে হয়। (২) হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম না করিলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। (৩) প্রচুর পরিমাণে ঘি, মশলা না দেওয়া বোর্ডিংএর রান্না ভাত, তরকারী খাইয়া তাহাদের মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। (৪) "বাস্" আসিয়া অপেক্ষা করিতেছে শুনিবামাত্র মেয়েরা নাকে মুখে তাড়াতাড়ি ভাত গুঁজিয়া স্কুল কলেজে যাওয়াতে অনেকে appendicitis রোগে ভুগিতেছেন। (৫) তাহাদিগকে যেরূপ মানসিক পরিশ্রম করিতে হয়, তদনুরূপ ব্যায়ামের সুব্যবস্থা নাই। আমেরিকার মহিলাদের dormitoryর যিনি তত্ত্বাবধায়ক, তাঁহার প্রথম কর্ত্তব্য এই যে, প্রত্যেক মেয়ে নিয়মমত কোনরূপ ব্যায়াম করিতেছে কিনা তাহা দেখা। বোধ হয় আমাদের মেয়েদের স্কুলের ও কলেজের হষ্টেলের সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্ট সে দিকে দৃষ্টি রাখেন না। আমেরিকার মহিলারা ঘোড়ায় চড়েন, বাইসাইকেলে চড়েন, বরফের উপরে স্কেট্ করেন, টেনিস্ খেলেন, পদব্রজেও বেড়ান। তাঁহারা আমাদের মেয়েদের মত অবরুদ্ধ গাড়ীতে এক স্থান হইতে আর এক স্থানে যাতায়াত করেন না, তাঁহাদের স্বাস্থ্য উন্নতিরও নানাবিধ সুবিধা আছে। আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন কোন একটী মেয়ে ভর্ত্তি হইবার জন্য আসেন, তাঁহাকে Black কার্ডে নিম্নলিখিত প্রশ্ন সকলের উত্তর লিখিয়া ঐ কার্ডটি সঙ্গে লইয়া স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য উপস্থিত হইতে হয়। যদি কাহারও শরীরমধ্যে কোন ব্যাধি থাকে, তাহা হইলে স্বাস্থ্য অধ্যক্ষের উপদেশ মত সে সম্বন্ধে ব্যবস্থা দেওয়া হয়:—

নং— নাম—

জন্ম তারিখ—

তোমার চেহারা তোমার পিতার মতন, না তোমার মাতার মতন, বা বংশের মধ্যে অন্য কাহার মতন?

তোমার পিতা জীবিত?—তাঁহার স্বাস্থ্য কিরূপ?—

তিনি মৃত?—কি অসুখে মারা যান?—

তোমার মাতা জীবিত?—তাঁহার স্বাস্থ্য কিরূপ?—

তিনি মৃত?—কি অসুখে মারা যান?—

তোমার ক'টী ভাই ও বোন?—কি কি ব্যারামে তাহাদের মৃত্যু হয়?—

তুমি সহরের মেয়ে? না পল্লিগ্রামের?—

কি কি পীড়ায় তুমি শয্যাশায়ী হইয়াছিলে?—তোমার ক্ষুধা হয়?—তোমার কি অজীর্ণ রোগ আছে?—তোমার কি কোষ্ঠবদ্ধ হয়?—তুমি নাক দিয়া সহজে

নিঃশ্বাস ফেলিতে পার?—তোমার কি মাথা ধরে?—তোমার চক্ষুর বা কর্ণের কোন পীড়া আছে?—তুমি কখন মূর্চ্ছা গিয়াছিলে?—তুমি কি ভালরূপ নিদ্রা যাও?—কয় ঘণ্টা?—কয় ঘণ্টা তুমি প্রত্যহ উন্মুক্ত বাতাসে কাটাও?—তোমার শরীরের উপর কখন অস্ত্র প্রয়োগ করা হইয়াছিল?—

Menstrual period—কোন্ বয়সে তুমি প্রথম অসুস্থ বোধ কর?—

নিম্নলিখিত ব্যায়ামের মধ্যে যে গুলি তুমি করিয়াছ, সে গুলির তলায় দাগ দাও:—টেনিস্, গল্ফ্, বাইসাইক্লিং, ঘোড়ায় চড়া, দৌড়ান, লাফান, কুস্তিকরা, সাঁতার দেওয়া, দাঁড়টানা, স্কেটিং, বরফের উপর হকি খেলা, বেড়ান, শীকার করা, বাস্কেট বল।'

স্নান।

আমেরিকার অনেক বাড়ীতে স্নানের বন্দোবস্ত না থাকাতে অনেক মহিলা প্রত্যহ স্নান করিতে পারেনা। কেহ কেহ মাসের মধ্যে দু, তিনবার মাত্র স্নান করিয়া থাকেন। আমরা প্রথম প্রথম ঐ সমস্ত মেয়েদের সহিত ক্লাসে বসিবার সময় তাহাদের শরীর হইতে কি রকম একটা দুর্গন্ধ পাইতাম। প্রত্যহ স্নান না করাতে এমন কি দেখিয়াছি যে, কেহ কেহ নানাপ্রকার চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হয়। তাঁহারা এমন সুন্দরী যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকাও উহাদের সৌন্দর্য্য অনুভব করিবার জন্য চর্ম্মের মধ্যে বাসা করিয়া থাকে। যে সমস্ত বাড়ীতে স্নান করিবার বন্দোবস্ত নাই, সে সমস্ত বাড়ীর মহিলারা Public Bath House-এতে ২৫ সেণ্ট অর্থাৎ ৸৹ আনা দিয়া একবার স্নান করিতে পারেন। তাহা সকলের অবস্থায় সম্ভবপর হয় না বলিয়া অনেকে নানারূপ অসুখে ভোগেন। যে সমস্ত বাড়ীতে স্নানের বন্দোবস্ত আছে, সেই বাড়ীর মহিলারা বলিয়া থাকেন যে, শীতপ্রধান দেশে সূর্য্যের মুখ কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়, সে জন্য চুল শুকাইবার অসুবিধা হয়, এই কারণ বশতঃ তাঁহারাও প্রত্যহ স্নান করেন না। আজকাল আমেরিকায় "electric hair dryer" ঘরে ঘরে হওয়াতে যখন তখন চুল শুকাইবার সুবিধা হইয়াছে। এক্ষণে মহিলারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্নান করিতেছেন।

আমাদের দেশে মেয়েদের যেমন স্নান করিবার সুবিধা আছে, তেমন আর কোন দেশে নাই। আমাদের দেশের মেয়েরা রাস্তা ঘাটে যে ভাবে স্নান করেন, তাহা পাশ্চাত্য জাতিদের চক্ষে কেমন ঠেকে। মহিলাদের Bath room ভিন্ন অন্য কোন প্রকাশ্য স্থানে বিশেষতঃ পুরুষের সাম্নে স্নান করাটা তাঁহাদের দেশের সভ্যতার মধ্যে গণনীয় নহে।—

"BEAUTY PARLOUR"

আমেরিকার অধিকাংশ মেয়েরাই পর্চুল পরিয়া থাকেন। শীত-প্রধান দেশে যে প্রকার বরফ পড়ে তাহাতে মাথায় টুপি অথবা কোন রূপ বনেট্ থাকা প্রয়োজন।

আজ কাল আমেরিকার মেয়েদের যে রকম বড় বড় টুপির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে যথেষ্ট পরিমাণ পরচুলা না পরিলে টুপির ভার বহা একটু শক্ত হয়। আমেরিকার মহিলাদের মধ্যে মধ্যে নাপিতের বাড়ী যাইয়া পরচুলা কিনিয়া আনিতে হয়, চুল রং করাইতে হয়, চুল ছাঁটিতে হয়, পা'র ও হাতের নখ কাটিতে এবং পায়ের কড়া আরোগ্য করিতে হয়। ইহার feeর দরুণ কোন কোন সোসাইটীকে ২৫ ডলার অর্থাৎ ৭৫ ্ টাকা একবারে দিতে হয়। নিউইয়র্কে Beauty Parlour নামে ঐ রকম বড় বড় নাপিতের দোকান আছে। সেখানে সর্ব্ব শ্রেণীর মহিলারা, কেহ বা সপ্তাহে একবার করিয়া, কেহ বা মাসের মধ্যে একবার করিয়া নিজের বেণী ঠিক করিবার জন্য ও গাল ও বক্ষ হইতে চর্ম্মরোগ ভাল করিবার জন্য যাইয়া থাকেন।

পাঠকপাঠিকাদের মধ্যে অনেকে অবাক হইতেছেন যে, সামান্য চুল ছাঁটিতে ও চুল রং করিতে ৭৫ ্ টাকা নাপিতকে দিতে হয়! আমি তবে ঐ Beauty Parlour কিরূপ তাহা একটু বলি। ওখানে দুই তিন জন পুরুষ নাপিত ও দুই তিন জন মেয়ে নাপিতানীও থাকে। 'Beauty Parlour' যখন নাম, তখন ওখানে মহিলা ভিন্ন পুরুষ চুল ছাটিবার জন্য ঢুকিতে পারেন না, তবুও কিন্তু পুরুষ নাপিত থাকে। সেখানে নাপিত ও নাপিতানীদিগকে নানাবিধ মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক সংবাদপত্র গ্রহণ করিতে হয়। সেগুলি সমস্ত টেবিলের উপর সাজান থাকে। তাস ও "পুল্" খেলিবার সরঞ্জামও তথায় আছে। মহিলাদিগের অপেক্ষা করিবার জন্য ২০।২৫ খান চেয়ারও রাখা হয়। ঘরগুলি বৈদ্যুতিক আলো ও পাখার দ্বারা সজ্জিত। মুখ ও চুল ধুইবার জন্য সেখানে গরম জল, সাবান প্রভৃতি পাওয়া যায়। ঘরের সমস্ত দেওয়ালগুলি বড় বড় আয়না দ্বারা আবৃত। যে নাপিতকে establishment স্বরূপ এতদূর সরঞ্জাম করিয়া রাখিতে হয়, তাঁহার পক্ষে ঐরূপ উচ্চ fee আদায় না করিলে তিনি কিরূপে ব্যবসায়ে উন্নতি করিতে পারিবেন?

যখন একেবারে অনেক মহিলা প্রবেশ করেন এবং নাপিত ও নাপিতানীগণ ইতিপূর্ব্বে যদি পাঁচ ছয়টী মহিলার চুল কাটিবার জন্য নিযুক্ত হইয়া থাকেন, তখন মহিলাদিগকে অগত্যা খবরের কাগজ পাঠে বা তাস খেলাতে বা বিলিয়ার্ড খেলাতে সেখানে সময় কাটাইতে হয়। নাপিত "Next" বলিয়া ডাক ছাড়িলেই তাঁহার পরে যিনি আসিয়াছেন, সেই মহিলাটী চুল ছাঁটিবার বা তাঁহার যে জন্য দরকার সেই জন্য প্রবেশ করেন। এখানে এই নিয়ম যে, যিনি যেমন প্রবেশ করিয়াছেন, তিনি পর পর চুলছাঁটা প্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া চলিয়া যাইবেন।

পোষাক।

"যাঁহাদের রূপ আছে তাঁহাদের বেশী

অলঙ্কারের দরকার নাই।” একজন আমেরিকার মহিলা গল্পচ্ছলে এই কথা আমাকে বলিয়াছিলেন। প্রকৃত তাই, সে দেশের মহিলাগণ আমাদের হিন্দু-রমণীদের মত অত অলঙ্কারপ্রিয় নহেন, তবে তাঁহাদের বেশ ভূষার খুব পারিপাট্য। যখন তাঁহারা কর্সেট্ আঁটিয়া, কোমরটী বোলতার ন্যায় সরু করিয়া, নাসিকা থাকিতে মুখ দিয়া নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে চলেন, লম্বা স্কার্ট পরিয়া খস্‌খস্ ও মস্‌মস্ শব্দে তদুপরি উচ্চ গোড়ালিযুক্ত জুতা পরিয়া হাঁটেন, এবং আরও যখন রং করা পরচুলার উপর ছাতার মত বড় টুপি পরেন, সে দৃশ্য দেখিয়া কোন বলবান্ পুরুষও nervous না হইয়া থাকিতে পারেন না। শুনিয়াছি আমাদের মধ্যে কোন কোন বিলাত-ফের্ত্তা নিজের গৃহলক্ষ্মীকে ঐরূপ পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ করিতে শিক্ষা দিতেছেন। কলিকাতার হোয়াইট্‌ওয়ে লেড্‌লো এণ্ড কোম্পানীর দোকানের সম্মুখে চৌরঙ্গির পথ দিয়া যাইতে যাইতে তাহা বেশ দেখা যায়। আমরা ঐ সমস্ত বিংশ শতাব্দীর নূতন বাঙ্গালী বিবিদের অগ্র হইতে সাবধান করিয়া দিতেছি যে, কর্সেট্ পরাতে শরীরের গঠন কখন স্বাভাবিক হয় না। নাসিকা থাকিতে গাল দিয়া নিঃশ্বাস ফেলিতে হয়, কর্সেট্ পরাতে পৃষ্ঠদেশ ও কোমরে চাপ পড়িয়া দাগের সৃষ্টি হয় ও তদ্দ্বারা চর্ম্মের শোভা নষ্ট হয়। মে মাসের আমেরিকার ‘Physical Culture’ নামক মাসিক পত্রে আছে:—“যদি তুমি বিবাহ করিতে চাও, কখন কর্সেট্ পরা মেয়ের পাণিগ্রহণ করিও না। নিশ্চয় জানিও তিনি কখন ভবিষ্যতে ভাল ‘মা’ হইতে পারিবেন না।” আজকাল বঙ্গমহিলাদিগের মধ্যে কেহ কেহ চাকচিক্য, জরীর কাজ করা পেটীকোট্ পরিয়া এবং তাহার উপর অতি পাতলা ফিন্‌ফিনে সাড়ী পরিয়া ভদ্রসমাজে বাহির হইতেছেন। এ সম্বন্ধে রেভারেণ্ড ডিকিন্‌সন্ তাঁহার নিউইয়র্ক বক্তৃতাতে বলিয়াছেন:—“ভদ্রবংশের মহিলাদের ঐরূপ পেটিকোট্ পরিধান করিয়া গির্জ্জায় আসাতে নিজেদের অতিশয় লজ্জা বোধ করা উচিত”। আমাদের দেশের মহিলারা যখন উচ্চ গোড়ালিযুক্ত ও টাইট্ জুতা পরিয়া হাঁটেন, তাঁহাদের দ্রুত চলিতে গেলে, হোঁচট খাইয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম হয়, এবং পরিশেষে “কড়ার” সৃষ্টি হওয়ায় জুতা পায়ে দেওয়া কিছু দিনের জন্য একেবারে ছাড়িতে হয়। আমাদের এইরূপ সভ্যতার প্রয়োজন কি?

(ক্রমশঃ)

শ্রীসত্যশরণ সিংহ।

মাতৃ-স্নেহ।

সন্ধ্যার পর অন্নপূর্ণ সরাইখানা কলরব-কোলাহলে গুলজার হইয়া উঠিয়াছে। এক দিকে দাবা-বড়ে, অন্য দিকে পাশা এবং অপর দিকটা বিষয়ী বুদ্ধিমান্‌দিগের মামলা-বাজীর উৎকট ছন্দে, উদ্দাম সুরে ধ্বনিত হইতেছিল। প্রকাণ্ড ঘরের একটা কোণে বসিয়া, আলোর কাছে হেঁট হইয়া, একজন তরুণ চিত্রকর আপন মনে তাহার সদ্যঃসম্পূর্ণ ছবিটার বর্ণবিন্যাসগুলি গভীর মনোযোগের সহিত সংশোধন করিতেছিল। সমস্ত সরাইখানা ভরা—সমস্ত কলরব তাহার স্থির নিবিষ্ট চিত্তের পরদায় ঠেকিয়া আহত হইয়া ফিরিতেছিল, চিত্রকর নিশ্চিন্ত উদাসীন।

পাশা-খেলাওয়াড়গণের কোলাহল ঝাঁকিয়া উঠিতে লাগিল। অন্য দিকে একটা পয়সাওয়ালা পিতৃহীন যুবককে ঘেরিয়া মামলাবাজ আইনজ্ঞের দল কি করিয়া বিধবা মাতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ফাঁকী দিয়া নিরুদ্বেগে পৈতৃক সম্পত্তি সমস্ত আত্মসাৎ করিতে পারা যায়, তাহার পরামর্শ দিতে লাগিলেন।

একটা মিথ্যা মার পিটের মামলা সাজান হইতেছিল। বুদ্ধিমান্ মোক্তার সুদক্ষ কারিকরের মত ঘটনাটা নিপুণতার সহিত গড়িয়া তুলিতেছিলেন। পরামর্শ চুপি চুপি চলিতেছিল, সহসা তিনি জোর গলায় শেষ কথা বলিয়া উঠিলেন "মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে ঠোঁট টা গেল ছেঁচে!"...

তুলি হাতে চিত্রশিল্পী চমকিয়া বলিল "কই?"—সে সবিস্ময়ে বক্তার মুখ পানে তাকাইল, বক্তা নির্ব্বাক্! চিত্রশিল্পী উদ্ভ্রান্তদৃষ্টিতে গৃহস্থ সকলের মুখপানে তাকাইল, তারপর ধীরে ধীরে দৃষ্টি নামাইয়া দারুণ বিস্ময়ে নিজের ছবিটা নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। কই না, তাহার ছবি তো কিছুমাত্র বিকৃত হয় নাই, তা তো তেমনি সুন্দর, তেমনি মনোহর—তেমনি উজ্জ্বল আছে। চিত্রশিল্পী আনন্দের আবেগে বলিয়া উঠিল, "না, ঠিক আছে!"

পরামর্শ উৎসবের কেন্দ্র সেই ধনী যুবকটী, মামলা-বাজীর সমিতির ভিতর হইতে উঠিয়া সৌৎসুক্যে তাহার দিকে ঝুঁকিয়া বলিলেন "কিহে ব্যাপার কি?"

—কিন্তু ব্যাপার কি, প্রশ্নের উত্তর দৃশ্যের মধ্যেই মিলিল। যুবক দেখিলেন, সে কি চমৎকার চিত্র!—

সদ্য দূরাগত পথ-শ্রান্ত পুত্রকে উৎসুক-নয়না জননী বক্ষে লইবার জন্য প্রসারিত-হস্তে গৃহদ্বারে দণ্ডায়মানা, ঘন-কুঞ্চিত-কেশগুচ্ছ-শোভিত সুকুমার-কান্তি পুত্র হাস্যোজ্জ্বল মুখে দুই হাত বাড়াইয়া ধাইয়া আসিতেছে, কি সুন্দর, কি চমৎকার দৃশ্য! জননীর ললাটে প্রশান্তি

সজল নয়নে উচ্ছ্বসিত আনন্দ, অধরে স্বর্গের সুষমা স্মিত হাসি, বক্ষে পরিপূর্ণ মমতা!

যুবক স্তব্ধ হইয়া দেখিতে লাগিলেন। চিত্রকর উল্লাসদীপ্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল "ঠিক আছে, আমার 'মাতৃ-স্নেহ' ছবিখানি ঠিকই আছে; ঠোঁটের হাসি টুকুন্ অবধি……।"

যুবক স্তম্ভিত দৃষ্টি তুলিয়া রুদ্ধস্বরে কহিল "শিল্পী—ভাই এ মূর্ত্তি কার?"

শিল্পী মুহূর্ত্ত কাল নীরব রহিল, তার পর গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বলিল "আমার অন্তরের—আমার ধ্যানের — প্রত্যক্ষ মাতৃ-স্নেহের!"

সে শব্দ গৃহের প্রত্যেক ক্ষুদ্র বৃহৎ শব্দ ছাপাইয়া—সমস্ত কলরবের উর্দ্ধে করুণ আবেগে কাঁপিয়া উঠিল! চালবাজ মোক্তারের মাথায় এতক্ষণ যতগুলি ফন্দীর অন্ধি সন্ধি দ্রুত লীলায় ঘুরিতেছিল, সেগুলি মুহূর্ত্তের জন্য—ইন্দ্রজাল-মুগ্ধ মূঢ়ের মত স্তব্ধ হইয়া গেল!—কিন্তু হায় রে—অভ্যাসের জয়,—সারা জগতের উপর যে মুহূর্ত্তে আত্মসম্বরণ করিয়া মোক্তারটী প্রবল বিজ্ঞতায় মাথা নাড়িয়া বলিলেন "তোমার কলা কৌশলে বোধ শোধ মন্দ নয়, তবে কি জান, প্রতিপাদ্য বিষয়টা—তেমন কিছু নয়, নেহাৎ হাল্কা!"

শিল্পী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার সেই ক্রূর দম্ভপূর্ণ প্রখর বুদ্ধিজীবী, আইনদক্ষ লোকটীর মুখপানে চাহিল!—হাঁ হাঁ ঠিক এমন নিষ্ঠুর স্বার্থ-সর্ব্বস্ব নীচ দৃষ্টি না হইলে কি চিত্র বর্ণিত দৃশ্যটা তুচ্ছ বে-আইনী ব্যাপার বলিয়া ঠাওর করে! ধিক্। শিল্পীর দুই চক্ষু ঘৃণায় ঝল্‌সিয়া উঠিল, শিল্পী বেগে মুখ ফিরাইল!

কম্পিত কণ্ঠে সেই পয়সাওয়ালা যুবক বলিল "ভাই যত দাম চাও দিতে রাজী, এ চিত্রখানি আমায় দাও।"

শিল্পী গম্ভীর দৃষ্টিতে যুবকের পানে চাহিল, সে চাহনির তেজস্ফুরিত আলোকে যুবকের গোপন মর্ম্মের সমস্ত দৃশ্য যেন প্রত্যক্ষ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল! যুবক সহ্য করিতে না পারিয়া অপরাধীর মত মাথা নামাইল, শিল্পী দৃঢ় স্বরে কহিল "না।"

তার পর একটী কথা বলিবার বা শুনিবার অবকাশ রহিল না, শিল্পী গৃহের বাহিরে চলিয়া গেল।

ঘরের নির্লজ্জ লোকগুলা সহসা দুঃসহ অপমান বোধ করিয়া নিষ্ফল ক্রোধে শিল্পীর ও শিল্পের কুৎসা জুড়িল!

(২)

সারা আদালত লোকে লোকারণ্য। আজ মাতা পুত্রের মামলার দিন! সম্পত্তি লইয়া বিবাদ? বাদী পুত্র, প্রতিবাদিনী মাতা! কি জমকাল হুজুক্? সারা সহরটা ভাঙ্গিয়া আদালতে আসিয়াছে।

আদালতের কাছে একটা দোকানে কতকগুলি লোক জটলা করিতেছিল। কেহ পান, কেহ তামাক খাইতেছিল, আর গল্প করিতে করিতে হো হো হাসির ঢেউ তুলিতেছিল।

সেই ধনী যুবকটী অত্যন্ত সাধারণ বেশে ম্লান মুখে অন্য দিকে একটা গাছ-তলায় নিঝুম হইয়া বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছিলেন। তাঁহার উদ্বেগ-কাতর ললাটে মর্ম্মভেদী বিষাদের অন্ধকার ক্রমশঃ ঘনাইয়া আসিতেছিল। যুবক কেবলই ভাবিতেছিলেন মানুষ মানুষকে ফাঁকী দিয়া সহস্র সম্পত্তি লইয়া নিজের বাহিরের ভাণ্ডার যতই ভরিয়া তুলুক না কেন—তাহার হৃদয় ভাণ্ডারটা কেবল সেই অগাধ অপরিমেয় অতৃপ্তির দাহ-জ্বালায় ভরিয়া উঠিবে!

মুহ্যমান যুবক নীরবে ভাবিতেছিলেন। অনেকক্ষণ পরে শিবিকারোহণে কোন পর্দ্দানসীন মহিলা আদালত গৃহের সম্মুখে আসিয়া পৌছিলেন, চারিদিক উৎসুক জনতার অস্ফুট গুঞ্জনে ধ্বনিয়া উঠিল— "ঐ—ঐরে!"

দূরাগত অস্ফুট চাঞ্চল্যের মৃদু অভিঘাতে যুবক মুখ তুলিয়া চাহিয়া শিহরিয়া উঠিলেন? হঁ, হাঁ, কৃতী পুত্রের দুর্ভাগিনী গর্ভধারিণীই আজ অপমান কলঙ্কের বোঝা ঘাড়ে লইয়া রাজকীয় বিচারালয়ের দ্বারে পৌছিয়াছেন বটে? আঃ!

যুবকের মস্তিষ্কের ভিতর উচ্ছৃঙ্খল আকুলতার সুরে মর্ম্মভেদী বেদনার ঝঞ্ঝনা জাগাইয়া তুলিল?......যুবক হৃদয়হীন স্বার্থপরতার দীন বন্ধ কাটাইয়া মুহূর্ত্তে অন্তরের মাঝে সতেজে সোজা হইয়া উঠিল। কোন দিকে না চাহিয়া সহসা তীব্র বেগে ছুটিয়া আসিয়া শিবিকার দ্বার উন্মোচন করিয়া মাতার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়ন ও বিকল কণ্ঠে বলিল "মা—মা, আমায় ক্ষমা কর।"

আকাশস্পর্শী অনির্ব্বাণ বহ্নিশিখার উপর যেন সপ্ত সমুদ্রের শান্তি-নির্ব্বাণ বারি যুগপৎ ঝাঁপাইয়া পড়িল। জননীর চক্ষু জলে পূরিয়া আসিল, তিনি কোন কথা কহিতে পারিলেন না। কেবল সযত্নে পুত্রের মাথাটী বুকে তুলিয়া তাহার উত্তপ্ত ললাটে একটি ক্ষমাপূর্ণ শীতল স্নেহের চুম্বন অঙ্কিত করিয়া দিলেন!

মাতা পুত্রের কাহারই মুখে কথা নাই, কেবল দুইজনেই রুদ্ধ আবেগে বুক-ফাটা অভিমানে অবিরল অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সে কি গভীর বেদনা! কি নিগূঢ় শান্তি!

খানিক পরে কোথা হইতে সংবাদ পাইয়া সেই আইনবাজ, কর্ত্তব্যপরায়ণ মোক্তারটী এই বে-আইনী ব্যাপারটা সংশোধন করিবার জন্য শশব্যস্তে ছুটিয়া আসিয়া ব্যস্তভাবে বলিলেন "ও মশাই শীঘ্রী আসুন, হাকিম এখনি মামলা ধরবেন।"

মুখ ফিরাইয়া তীব্র স্বরে যুবক বলিল "কিসের মামলা? কে ধরে?—আমাদের মামলা রদ্ হয়ে গেছে!"

পশ্চাৎ হইতে মোক্তারের গড়া পেটা চেলা চামুণ্ডার দল কোলাহল করিয়া বলিল "সে কি মশাই, আমরা যে সাক্ষী।

দীপ্ত নেত্রে চাহিয়া যুবক বলিল "চুপ

অপদার্থ ছোট লোকের দল, ঘৃণা হয় না! মাতা পুত্রের মনোমালিন্যের মাঝখানে সালিশীর মুখোস পরিয়া শয়তানী করতে লজ্জা হয় না! —মাতা পুত্রের এ বিবাদ, এ অন্তর-দ্বন্দ্বের ধারা, আজও রাজার আইনে নিধিবদ্ধ হয় নাই, রাজার বিচারালয়ের সাধ্য কি যে আমাদের এ হৃদয়-ভেদী সমস্যায় দন্তস্ফুট করে!—চলে যাও তোমরা, আমার সমস্ত অভিযোগের মীমাংসা সমাধান হইয়া গিয়াছে, সকলের চেয়ে উচ্চ আদালতে—এইখানে!"—যুবক মাতার চরণের নীচে নিজের মাথাটি পাতিয়া দিল।

লোকগুলা মুখ চাওয়া-চায়ি করিয়া পিছু হটিয়া গেল। এ যে অসহ্য বিশ্রী ব্যাপার, কাজের সময় এমন ছেলে-মানুষী! ভারি অন্যায় ছিঃ, নেহাৎ বাঁদর।

অন্তরীক্ষে দ্বিপ্রহরের রৌদ্র—তপ্ত পবন কর্কশ কৌতুকে হা হা করিয়া, অট্টহাস্যে প্রশ্ন করিলেন কে—কে—কে!

পুত্র নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "মা, সব ভুলে যাও"। কোমল কণ্ঠে জননী বলিলেন "ভুলিয়ে তো দিয়েছিস বাবা!"

পুত্র মুখ তুলিয়া চাহিল, হাঁ সেই ক্ষমা—সুন্দর, শান্ত, স্নেহপূত, মাতৃ-মূর্ত্তিই বটে। ললাটে সেই স্বর্গ-সুষমা-দীপ্তি, অধরে সেই অপার্থিব, পুণ্যস্মিত হাসি! কি অপরূপ লাবণ্য, কি সুমহান্ মাধুর্য্য রে, সমস্ত প্রাণ যে জুড়াইয়া গেল। অন্ধ মূঢ় তাই সে, এত দিন এই ত্রিদিব-লাঞ্ছিত মাতৃস্নেহ সে অবজ্ঞায় পদদলিত করিয়া আসিয়াছে। কি ভ্রম! আজ যে বুদ্ধিমান্ যাই বলে বলুক—সে কিছুতে মানিবে না, মাতৃ-স্নেহ মর শিল্পীর কল্পনা-সৃষ্ট অলীক বস্তু নয়, তুচ্ছ ব্যাপার নয়।—এ স্বয়ম্ভূ সৃষ্ট রমণীয় মহৎ ব্যাপার!

মানুষ যখন শ্রেয়ঃর মহিমা ভুলিয়া প্রেয়ঃর চরণে আত্মোৎসর্গ করিয়া রসাতলের দিকে অগ্রসর হয়, তখন যে শক্তি শুভ সহৃদয়তার বলে তাহাকে মুগ্ধ করিয়া ফিরিবার শক্তি সৃজন করিয়া দেয় তাহাই তো শিল্প, তাহাই তো সার্থক! তাহা যে সহস্র যুগ ধরিয়া, সহস্র হৃদয়ের সহস্র চিন্তা-বিকশিত অভিজ্ঞতার কল্যাণ ভাগিনী! অমৃতের মত চিরদিনই সাহিত্যে, শিল্পে, চিত্রে, কলা কৌশলে, তাহা সহস্র ধারায় ঝরিয়া পড়িতেছে। অত্যন্ত বুদ্ধি-মান সত্যকার জবর-জম্‌কাল আস্ফালন-কারী কাজের লোক তাহা কিছু নয় বলিয়া উড়াইয়া দিক্—কিন্তু হৃদয়ের 'নিরিখের' কাছে সেই মুখের কিছু নয়, সত্যের কিছু নয় বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়া যায়। তাহাকে আটকাইবার সাধ্য কাহারও নাই।

যুবক স্তব্ধ-মুগ্ধ-নীরব।—অকস্মাৎ নিবিড় নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া একখানি প্রসারিত চিত্র হস্তে এক তরুণ, সুন্দর মূর্ত্তি সম্মুখে আসিয়া হর্ষ-বিকম্পিত স্বরে বলিল "এই নিন্ মশায়, আপনার সেই ছবি।"

যুবক চকিতে দেখিলেন সেই সরাই-খানার শিল্পী। বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া

তিনি সানন্দে বলিয়া উঠিলেন "একি তুমি—এখানে!—"

প্রসন্ন উজ্জ্বল হাস্যে শিল্পী বলিল "হাঁ ছবিতে আজ আমার রং ফলান শেষ হয়েছে, তাই আপনাকে দিতে এসেছি।"

যুবক আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন "তুমি যে বলেছ আমায় দেবে না।"

"হাঁ সেদিন আপনার মুখ দেখে মনে হয়েছিল, এ চিত্রের মর্ম্ম আপনি বোঝেন নি, আজ আমার ভ্রম গেছে, ক্ষমা করুন, আমার চিত্র আজ বাস্তবের মধ্যে সার্থক হয়েছে!"

যুবক শ্রদ্ধা-মুগ্ধ দৃষ্টিতে একবার শিল্পীর পানে চাহিলেন, একবার চিত্রের পানে চাহিলেন, তার পর আবেগপূর্ণ দৃষ্টিতে জননীর স্নেহোজ্জ্বল মুখের পানে চাহিলেন। অশ্রুপূর্ণ নেত্রে তরুণ শিল্পীকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বাষ্পরুদ্ধ স্বরে কহিলেন তুমিই জ্ঞানদাতা গুরু,—সহৃদয় সহোদর! সংসারে তুমিই ধন্য!

যুবা ধূলার উপর জানু পাতিয়া বসিয়া সেই চিত্র মাথার উপর তুলিয়া লইলেন।

চারি দিকের জনতা মুগ্ধ, স্তম্ভিত।

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

শিখগ্রন্থ—সুখমণি সাহিব

৯ শ্লোক।

উর ধামে যো অন্তর নাম।
সরব মৈ পে মৈ ভগবান্।
সিমথ নিমথ ঠাকুর নমস্কারে।
নানক ওহে অপরশ সগল নিসতারৈ॥

যিনি নামকে হৃদয়ে ধারণ করেন,
তিনি সকল বস্তুতেই ভগবান্‌কে দর্শন করেন।
তিনি প্রতি নিমেষে ঠাকুরকে নমস্কার করেন।
নানক বলিতেছেন, তাঁহাকে পাপ স্পর্শ করিতে পারে না, তিনি সকলকে উদ্ধার করেন॥

অষ্টপদী।

মিথিয়া নাহি রসনা পরশ।
মন মহি প্রীতি নিরঞ্জন দরশ॥
পরত্রিয় রূপ ন পেখৈ নেত্র।
সাধকী টহম দস্ত সঙ্গ হেত॥
করণ ন শুনৈ কাহুকি নিন্দা।
সভতে জানৈ অপস কউ মংদা॥
গুরু প্রসাদি বিখ্যা পর হরৈ।
মন কি বাসনা মনতে উরৈ॥
ইন্দ্রী জিত পঞ্চ দোষতে রহত।
নানক কোটী মধ্যেকো ঐসা অপরশ॥১

যার রসনা মিথ্যা স্পর্শ করে না,
যার মনে নিরঞ্জন দর্শনে প্রীতি,
যার নেত্র পরস্ত্রীর রূপ দর্শন করে না,
যে সাধু সেবা করে এবং সাধু সঙ্গে যার প্রীতি,
যার কর্ণ কাহারও নিন্দা শুনে না,

যে আপনাকে সকলের অপেক্ষা নীচু জানে,
গুরুপ্রসাদে যে বিষয়-বাসনা ছাড়িয়াছে,
যে মনের বাসনা মনেই মিটাইয়া লয়,
যে ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছে, এবং পঞ্চ দোষ
যাহার দূর হইয়াছে,
নানক বলিতেছেন, এমন ব্যক্তি কোটির
মধ্যে একজন পাওয়া যায় ॥১
বৈষনী সো যিস উপর সুপ্রসংন।
বিষণ কী মায়াতে হোয় ভিংন ॥
কর্ম্ম করত হোবৈ নিহ কর্ম্ম।
তিস বৈষনী কা নির্ম্মল ধর্ম্ম ॥
কাহু ফল কী ইচ্ছা নহি বাছৈ।
কেবল ভগতি কীরতন সঙ্গ রাচৈ ॥
মন তন অন্তরি সিমরন গোপাল।
সভ উপর হোবত কির পাল ॥
আপি দৃড়ৈ অবরহ নাম জপাবৈ।
নানক ওহ বৈষনী পরমগতি পাবৈ ॥২
সেই বৈষ্ণব, যার প্রতি প্রভু সুপ্রসন্ন।
তিনি বিষ্ণুমায়া হইতে ভিন্ন।
তিনি নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিয়া যান।
তাঁহার স্বভাব অতি নির্ম্মল
কোন ফলেরই তিনি আকাঙ্ক্ষা করেন না।
তিনিও কেবল ভক্তি কীর্ত্তনেই মগ্ন থাকেন।
তাঁহার শরীর এবং মন কেবল গোপালের
স্মরণেই নিযুক্ত।
সকলের উপরেই তিনি দয়ালু।
আপনি দৃঢ় রূপে নামকে ধরিয়া থাকেন
এবং অপরকে নাম জপান।
নানক বলিতেছেন, এমন বৈষ্ণব পরম
গতি পাইয়া থাকেন ॥২
ভগউতী ভগবন্ত ভগতি কা রঙ্গ।
সগল তিয়াগৈ দুসট কা সঙ্গ ॥
মনতে বিনসৈ সগলা ভরম।
করি পূজে সগল পারব্রহ্ম ॥
সাধ সঙ্গি পাপা মল খোবৈ।
তিস ভগউতী কী মতি উতম হোবৈ ॥
ভগবন্ত কী টহল করৈ নিত নীতি।
মন তন অরপৈ বিষণ প্রীতি ॥
হরিকে চরণ হিরদৈ বসাবৈ।
নানক ঐসা ভগউতী ভগবন্ত কউ পাবৈ ॥৩
সেই ভাগবত, ভগবানের ভক্তিতে যার
আনন্দ,
যে সকল প্রকার দুষ্ট সঙ্গ ত্যাগ করে,
যে মন হইতে সকল ভ্রম নাশ করে,
যে সকল বস্তুতে পরব্রহ্ম জ্ঞানে পূজা
করে,
এবং যে সাধুসঙ্গে পাপের মল দূর করে।
সেই ভক্তেরই মতি উত্তম হয়,
সে ভগবানের সেবা নিত্য নিত্য করে,
সে শরীর মন বিষ্ণুর প্রীতিতে অর্পণ
করে,
সে হরির চরণ হৃদয়ে ধারণ করে।
নানক বলিতেছেন, এইরূপ ভক্তই ভগ-
বান্‌কে লাভ করেন ॥৩
সে পণ্ডিত যো মন পরবোধৈ।
রাম নাম আতম মহি সোধৈ ॥
রাম নাম সার রস পীবৈ।
উস্ পণ্ডিত কৈ উপদেশ জগ জীবৈ ॥
হরি কি কথা হির দৈ বসাবৈ।
সে পণ্ডিত কির যোনিন আবৈ ॥
বেদ পুরাণ সিমৃত বুঝৈ মূল।
সুথম মহি জানৈ অস্থূল ॥

চাহু বরনা কউ দে উপদেশ।
নানক উস পণ্ডিত কউ সদা আদেশ ॥৪
সেই পণ্ডিত যে মনে সন্তোষ রাখে এবং যে আপনাকে শোধন করিবার জন্য রাম-নাম করে।
যে রাম-নাম সার রস পান করে,
সেই পণ্ডিতের উপদেশে জগৎ বাঁচিয়া থাকে।
যে পণ্ডিত হরি-কথা হৃদয়ে বসায়,
সে আর যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে না।
সে বেদ পুরাণ ও স্মৃতির মূলকে বুঝিতে পারে,
সে সূক্ষ্মমধ্যে স্থূল ব্রহ্মাণ্ডকে দেখে,
সে চারি বর্ণকে উপদেশ প্রদান করে।
নানক বলিতেছেন, সেই পণ্ডিতকে সদা নমস্কার ॥৪

বীজ মন্ত্র সরব কউ গয়ান।
চাহু বরনা মহি জপৈ কেউ নাম॥
যো যো জপৈ তিস কী গতি হোয়।
সাধ সঙ্গি পাবৈ জন কোয়॥
করি কিরপা অন্তরি উর ধারৈ।
পশু প্রেত মুধদ পাথর কউ তারৈ॥
সরব রোগ কা ঔষধ নাম।
কলিয়ার রূপ মঙ্গল গুণ গাম॥
কাহু যুগত কি তৈ ন পাই ঐ ধর্ম্ম।
নানক তিস মিলৈ যিস লিখিয়া ধুর করমি ॥৫

বীজ মন্ত্র সকল জ্ঞানের সার।
চারি বর্ণের মধ্যে ভাগ্যক্রমে কেহ কেহ নাম জপ করে
যে জপ করে তার গতি হয়
সাধুসঙ্গে কোন কোন ভাগ্যবান্ নাম লাভ করে।
নাম ব্রহ্ম কৃপা করিয়া হৃদয়ে স্থান গ্রহণ করেন,
পশু, প্রেত, মুগ্ধ এবং পাথরকে তরান।
নাম, সকল রোগের ঔষধ।
ইহা কল্যাণকর এবং মঙ্গলের আধার।
কোন প্রকার যুক্তি বা ধর্ম্মকার্য্যে আসল ধর্ম্ম লাভ হয় না।
নানক বলিতেছেন, সেই সে বস্তু লাভ করে, যার ভাগ্য সুপ্রসন্ন ॥৫

যিসকে মনে পার ব্রহ্ম কা নিবাস।
তিসকা নাম সতি রামদাস॥
আতম রাম তিস নদরী আয়া।
দাস দসংতণ ভায় তিন পায়া
সদা নিকট নিকট হরি জান।
সোদাস দরগহ পরবান॥
অপুনৈ দাস কউ আপি কিরপা করৈ।
তিস দাস কউ সভ সোঝি পরৈ॥
সগল সংগি আতম উদাস।
ঐসী যুগতি নানক রামদাস ॥৬
যাঁর মনে পরব্রহ্মের বাস,
তাঁর নাম সত্য রামদাস।
আত্মারাম তাঁর দৃষ্টিপথে আসেন।
সেই ভক্ত দাসের দাস হয়ে তাঁহাকে লাভ করেন।
তিনি হরিকে সর্ব্বদা নিকটে বলিয়া জানেন।
সেই দাস ভগবানের দ্বারে সম্মানিত হন।
প্রভু আপনার দাসকে আপনি কৃপা করেন।

সেই দাসের দৃষ্টিপথে সকল বস্তু আসে।
তিনি সকলের মধ্যে থাকেন অথচ নিঃসঙ্গ।
নানক বলিতেছেন, রামদাসের এইরূপ যুক্তি॥৬

প্রভু কি আজ্ঞা আতম হিতাবৈ।
জীবন মুকতি সোউ কহা বৈ॥
তৈসা হরখ তৈসা উস শোগ।
সদা অনংদ তহ্‌ন বিয়োগ॥
তৈসা সুবরণ তৈসা উস্‌ মাটী।
তৈসা অমৃত তৈসী বিষ খাটী।
তৈসা মান তৈসা অভিমান।
তৈসা রংক তৈসা রাজন॥
যো বরতায় সাই যুগত।
নানক উহ পুরুষ কহিয়ৈ জীবন মুকত॥৭

যে আত্মার হিতের জন্য প্রভুর আজ্ঞার অনুসরণ করে, তাহাকে জীবনমুক্ত বলে।
তাহার পক্ষে যেমন হর্ষ তেমনি শোক,
সে সদাই আনন্দে মগ্ন, ভগবান হইতে বিচ্যুত হয় না।
তার কাছে সুবর্ণ এবং মাটি সমান।
তার কাছে অমৃত এবং বিষ সমান।
তার কাছে মান এবং অপমান দুই সমান।
তার কাছে যেমন ভিখারী তেমনি রাজা।
যার এইরূপ যুক্তি আছে,
নানক বলিতেছেন, সেই জীবনমুক্ত॥৭

পার ব্রহমকে সগলে ঠাউ।
যিত যিত ঘর রাখৈ তৈসা তিন নাউ॥
আপে করণ করাবন যোগ।
প্রভ ভাবৈ সেই ফুনি হোতা॥
পসরিয়ো আপ হোয় অনন্ত তরঙ্গ।
লখে ন যাহি পারব্রহমকে রঙ্গ॥
যৈসী মত দেয় তৈসা প্রগাশ।
পারব্রহম করতা অবিনাশ॥
সদা সদা সদা দয়াল।
~~সিমর~~ সিমর নানক ভয়ে নিহাল॥৮

পরব্রহ্মের আবাস সকল স্থান।
যেমন যেমন স্থানে জীবকে রাখেন, তেমনি তেমনি নামকরণ করেন।
তিনি আপনিই সৃষ্টি করিতে পারেন এবং সৃষ্টি করেন।
যাহা তিনি ভাবেন, তাহাই হয়।
তিনি আপনাকে প্রসারিত করিয়া অনন্ত হন।
তাঁহার রঙ্গ মনে ধারণা হয় না।
যার যতটুকু বুঝিবার শক্তি দেন সে ততটুকু বুঝে।
সেই কর্ত্তা পরব্রহ্ম অবিনাশী।
নানক বলিতেছেন, সর্ব্বদা তাঁহার ভাবনা করিয়া কৃতার্থ হইলাম॥৮

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র মোহন দত্ত।

৺উমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জীবনী।

(তাঁহার লিখিত ডায়েরী।)

ধৈর্য্য।

"তরোরিব সহিষ্ণুনা"।

তরুর ধৈর্য্য কেহ কি চিন্তা করিয়াছেন? গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে অগ্নিদাহে--তরু দহ দগ্ধ হইতেছে, বৃক্ষ অটল ভাবে দণ্ডায়মান—ঝড় বৃষ্টি সহ্য করিতেছে—দারুণ শীতের নিহারে তাহাকে পত্রহীন করিয়াছে—অবাক্। কিন্তু বৃক্ষ সমুদয় শক্তি দিয়া পৃথিবী ধরিয়া আছে এবং সজোরে রস আকর্ষণ করিতেছে। বসন্তের মৃদু মলয় ভ্রমরগুঞ্জন—বিশ্বাসী জীবন তো এইরূপ হইবে।

১। আমরা যে সংসারে বাস করিতেছি, এখানে নিজের ইচ্ছামত সব কার্য্য হয় না, পদে পদে আমাদের ইচ্ছ বিফল হয়। ধৈর্য্য ধর।

২। রোগ, শোক, দারিদ্র্য, বিপদ, এত ধৈর্য্য ধরা।

৩। পরিবার, জনসমাজ, লোক সকলের সঙ্গে ব্যবহার।

৪। ধৃতি ক্ষমা দমোস্তেয়ং—অধিকাংশ ধৈর্য্য শিক্ষা।

৫। ধর্ম্ম সংগ্রামের ব্যাপার—পরীক্ষা।

সুশীলেরা ধর্ম্ম করেন—স্বর্গরাজ্য তাঁহাদের।

সাধু লোকের জীবনে ধৈর্য্যের দৃষ্টান্ত—বিশিষ্ট।

ঈশ্বরের ধৈর্য্য। আমরা এক একটী পাপ করি তাঁহাকে আঘাত করিয়া।

স্ত্রীলোকের সতীত্ব পতির প্রতি এক মন। তাহার রাগ, হিংসা, সহস্র দোষ থাকিলেও সে সতী।—

ঈশ্বরকে আপনার গতি মুক্তির কারণ বলিয়া যে একমনে তাঁহাকে চায়, সেই ভক্ত, তাহার আর সহস্র দোষ থাকিলেও সে ভক্ত। এক নিষ্ঠা—

মানুষ নিষ্পাপ হইয়া ঈশ্বর সাধনে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। যে যে অবস্থায় থাকুক, তাহাতেই সে ঈশ্বর সাধনে অধিকারী হইতে পারে। কিন্তু সৎপতির অনুগত হইলে রমণী যেমন তাহার গুণ প্রাপ্ত হয়, ঈশ্বরে তদ্‌গতচিত্ত হইলে সকল দোষ গিয়া প্রাণ বিশুদ্ধ হয়।

সত্যং শিবং সুন্দরং দেবতাতে যে অনুরক্ত হয় অসত্য, অকল্যাণ, অপ্রেম লইয়া সে সুখী হইয়া থাকিতে পারে না। তাহার আপনার চরিত্রকে পবিত্র করিবার জন্য ব্যাকুলতা হয়।

দুরন্ত ইন্দ্রিয় ও প্রবৃত্তিগণকে বলদ্বারা দমনের আশা বিফল, কিন্তু প্রেমের আকর্ষণে হয়। বন্য হরিণকে কাটগড়ায় পুরিয়া প্রহারে স্থির করা যায় না, কিন্তু বংশীর ধ্বনিতে সে এমন মুগ্ধ হয় যে, প্রহারেও নড়ে না।

একনিষ্ঠ হইতে ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দরসপান, ক্রমে মধুর হয়, প্রেমের সঞ্চার হয়, তখন পাপের সংস্পর্শ ভাল লাগে না।

প্রেমময়কে হৃদয় সিংহাসনে বসাইতে হইলে ইহাকে নির্ম্মল করিতে হয়, তাঁহাকে মলিন হৃদয়ে ধরিয়া তাঁহাকে অসুখী করিতে ক্লেশ অনুভব কর।

আত্মহারা হইয়া তাঁহাতে আত্ম-সমর্পণ কর।

বারাণসী-তত্ত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বালুসাই প্রস্তুত করিতে হইলে নিম্ন-লিখিত বস্তুর আবশ্যক :—

	টা	আ	পা
ময়দা ২॥০ সের, মূল্য			
ঘৃত ৩ সের (মিশ্রি ঘি)		১	১৫
চিনি ২॥০ সের		১	৪
গন্ধ দ্রব্য			
জ্বালানী কাষ্ঠ			
মোট			

উক্ত উপকরণে দশ সের বালুসাই প্রস্তুত হইবে। ময়রা টাকায় ২॥০ সের এবং ফেরিওয়ালা সওয়া দুই সের বিক্রয় করিয়া থাকে। ময়রা পৌনে আট আনা এবং ফেরিওয়ালা সাত আনা লাভ করিয়া থাকে।

পঁ্যাড়া প্রস্তুতের উপকরণ

	টা	আ	পা
খির (জমাট বাঁধা) সওয়া ছয় সের দাম		২	৩
চিনি ৫ সের		২	৮
পেস্তা ২ ছটাক "	০	১	২
জ্বালানী কাষ্ঠ	০	১	০
মোট	৪	১৩	২

উক্ত উপকরণে ১১ সের পঁ্যাড়া প্রস্তুত হইবে। ময়রা টাকায় দুই সের এবং ফেরিওয়ালা পৌণে দুই সের বিক্রয় করে। এই হিসাবে ১১ সেরে ময়রার লাভ সাড়ে দশ আনা এবং ফেরিওয়ালার সাড়ে বার আনা।

লাড্ডু খাইতে মন্দ নহে। তবে বাঙ্গালীর রুচি অন্যরূপ। হিন্দুস্থানীদিগের মধ্যে লাড্ডুর আদর অধিক। ইহার উপকরণাদি :—

	টা	আ	পা
ব্যাসম ৪ সের মূল্য			
ঘি ৩ সের ২ ছটাক (খারাপ)			
চিনি ২ নম্বরের ৫ সের		৯	
কিস্‌মিস্		৪	
জ্বালানী কাষ্ঠ		১	
মোট			

উক্ত উপকরণে সাড়ে ১২০সের লাড্ডু প্রস্তুত হইবে। ময়রা স্বয়ং বিক্রয় করিলে টাকা প্রতি ২॥০ সের লাড্ডু বিক্রয় করে এবং ফেরিওয়ালা সওয়া দুই সের। ইহাতে ময়রার লাভ সাড়ে তের আনা ও ফেরিওয়ালার সাড়ে আট আনা।

লুচিকে পুরী বলে। বাঙ্গালা দেশে লুচির উপকরণ ময়দা কিন্তু এদেশে আটা। আটার লুচি খাইতে সুস্বাদ নহে, বিশেষতঃ বাঙ্গালীর পক্ষে। এদেশে কিন্তু পুরীর আদর খুবই অধিক। পুরী ক্রয় করিলেই তাহার সহিত তরকারীটা পাওয়া যায়। তরকারীটা ফাও।

পুরী প্রস্তুতের উপকরণ :—

	টা	আ	পা
আটা ১৪ ছটাক মূল্য	০	১	০
ঘি আড়াই ছটাক	০	১	২
তরকারীর জন্য শাক সব্জি ও আচার	০	০	১
জিরা	০	০	১
জ্বালানী কাষ্ঠ	০	০	১
মোট	০	৩	১

উক্ত উপকরণে দেড় সের পুরী প্রস্তুত হইবে। ময়রা সাড়ে চারি আনায় এক সের পুরী বিক্রয় করে, তাহাতে তাহার চারি আনা লাভ হয়। ফেরিওয়ালা পাঁচ আনায় এক সের বিক্রয় করে, তাহাতে তাহার লাভ নয় আনা।

ময়রা মিষ্টান্নের কড়া ধৌত করিয়া ফেলিয়া দেয় না। ধৌত পদার্থটা জমা করিয়া তাহা হইতে সির্কা প্রস্তুত করে। সেই সির্কা দ্বারা তাহাদিগের চাট্‌নি বা আচার প্রস্তুত হইয়া থাকে। সির্কা প্রস্তুতের প্রণালী এই :—যত রস তাহার দ্বিগুণ জল মিশ্রিত করিয়া একটা নাদে ভরিয়া মাটীতে পুঁতিয়া ফেলে। এরূপ অবস্থায় নাদটী মৃত্তিকামধ্যে পাঁচ মাস কাল প্রোথিত থাকে। মধ্যে এক দিন তৃতীয় মাসের অন্তে নাদটী উঠাইয়া পদার্থটি ছাঁকিয়া লয়। নাদে যদি পদার্থটী পৌণে দুই মাস থাকে, তবে তাহা হইতে এক মণ উত্তম সির্কা এবং ত্রিশ সের মধ্যম সির্কা পাওয়া যায়। পূর্ব্বোক্তটির দর চারি পয়সায় এক সের এবং শেষোক্তটীর দর দুই পয়সা।

ময়রারা বাতাসাও প্রস্তুত করিয়া থাকে। কাঁচা চিনি এক মন কিনিয়া তাহাতে জল মিশ্রিত করিয়া কড়ায় চড়াইয়া দেয়। যখন তাহা ফুটিয়া ফুটিয়া গাঢ় হইয়া আইসে, তখন তাহা হইতে কিয়দংশ লইয়া একটা ছোট কড়াইতে রাখে। এই ছোট কড়াই "দোহরা" নামে খ্যাত। ইহাতে কাষ্ঠনির্ম্মিত একটা লম্বা হাণ্ডল থাকে। রসটাকে দোহরায় পুনরায় পাক করা হয়। যখন তাহা গাঢ় হইতে আরম্ভ হয় তখন ময়রা দোহরাকে উত্তোলিত করিয়া "কতরণীর" সাহায্যে কাষ্ঠনির্ম্মিত হাণ্ডেলের গাত্রে কাটিতে থাকে। "কতরণী" একপ্রকার ছুরির নাম। নিম্নদেশে এক থানা কাপড় পাতিয়া

জমান যায়। উত্তম রসটায় বাতাসা হইয়া থাকে। যে রসটা বাকী থাকে তাহাকে কড়াতে জমিতে দেওয়া হয় এবং তৎপরে তাহাকে উঠাইয়া লইয়া সূতার ন্যায় টানা হয়। এইরূপে তাহা দড়ির ন্যায় হইয়া যাইলে পরে তাহাকে কাটিয়া লওয়া হয়। ইহাই খুটিয়া নামে খ্যাত। বাতাসা প্রস্তুত করিতে যে কাঁচা চিনি ব্যবহৃত হয় তাহাতে মণ প্রতি সাড়ে চারি সের বাতাসা প্রস্তুত হইলে ক্ষতি হইয়া থাকে। দেড় মণ কাঁচা চিনির মূল্য ১৪ টাকা মণ হিসাবে ২১ টাকা পড়ে। ঘুঁটে খরচ ৪ আনা এবং বাতাসা অন্যান্য দোকানে যোগাইবার জন্য চারিজন চাকরের আবশ্যক হয়। প্রত্যেক জনের পারিশ্রমিক দুই আনা হিসাবে ৮ আনা পড়ে। সর্ব্বশুদ্ধ খরচ ২১ টাকা ১২ আনা। ইহাতে সওয়া ষাট সের বাতাসা ও পৌনে চারি সের খুটিয়া প্রস্তুত হইবে। টাকা প্রতি ২৷৷০ সের বাতাসা বিক্রয় হইলে ২৪ টাকা ৪ আনা ৯ পাই দরে বিক্রয় হইবে। খুটিয়া টাকায় পাঁচ সের বিক্রয় হয়। এই হিসাবে পৌনে চারি সের খুটিয়ার দাম ১২ আনা। সর্ব্বশুদ্ধ বিক্রয়ের দাম ২৫ টাকা ৯ পাই।

আচার বিক্রেতা, আচার, চাটনি ও মোরব্বা প্রস্তুত করিয়া থাকে। সোহারা, কিসমিস্, লেবু, কাঁঠাল, আদ্রক, শালগম, শশা, পেঁপে, কমলা লেবু, পেটা, আমলকী, হরিতকী, নাসপাতী, বিবি, বাঁশ, সেব, আনারস, পেয়ারা, তেঁতুল প্রভৃতি উক্ত বস্তুর উপাদান স্বরূপ হইয়া থাকে। সিরাপ প্রস্তুত করিতে হইলে চিনি ও লেবুর রসের আবশ্যক হয়। শেষোক্তটী পূর্ব্বোক্তটির সহিত মিশ্রিত করা হয় না। সেবের চাটনি হইলে চিনির রসের সহিত লেবুর রসের সংমিশ্রণ আবশ্যক।

এক সের মোরব্বার মূল্য বস্তু বিশেষে ৮ আনা, ১২ আনা এবং ১ টাকা। আদ্রকের মোরব্বা ১২ আনায় সের। ইহা প্রস্তুত করিতে হইলে তিন পোয়া খাঁড় (চিনি) ও আধ সের আদার আবশ্যক। পূর্ব্বোক্তটী ৫ আনায় ও শেষোক্তটি দুই আনায় পাওয়া যায়। চিনিকে সওয়া দুই সের জলে মিশিত করিয়া অগ্নির উত্তাপে ফুটাইতে হইবে। যতক্ষণ না রসটা গাঢ় হইয়া হাতায় লাগে ততক্ষণ উহা অগ্নির উত্তাপে রাখা আবশ্যক। যখন দেখিবে রসটা হাতার গাত্রে এমন ভাবে লাগিয়াছে যে তাহা টানিয়া উঠাইতে পারা যায় তখনই জানিবে রসটা ঠিক হইয়াছে। আদাকে তৎপরে জলে সিদ্ধ করিয়া যখন নরম ও অনাবিল দেখিবে তখন উক্ত রসে ফেলিয়া দিবে। এক পয়সার কেওড়া তাহাতে মিশ্রিত করিলেই বেশ সুগন্ধ বিশিষ্ট হইবে। এই মোরব্বায় সওয়া সাত আনা খরচ পড়ে। ইহাতে জ্বালানী কাষ্ঠের খরচ আরও এক আনা যোগ কর। সর্ব্বশুদ্ধ খরচ সওয়া আট আনা। মোরব্বাটী বিক্রয় হইবে বার আনায়।

গৃহ কর্ম্ম।

নারিকেলের পরমান্ন।

প্রথমতঃ একটী নারিকেল উপর উপর কুরিয়া লইয়া (এমন ভাবে কুরিতে হইবে যেন তলার খোলা না বাহির হয়) উহা পরিষ্কার শিলে মিহি করিয়া বাঁটিয়া লও, অর্দ্ধ পোয়া ছানা বাঁটিয়া পৃথক রাখ, অর্দ্ধ ছটাক বাদাম, এক ছটাক কিস্‌মিস ঘৃতে অল্প ভাজিয়া লইয়া, বাদাম ভাজাগুলিকে কুচাও, তৎপরে এক সের দুগ্ধ এক পোয়া চিনি মিশ্রিত করিয়া ঘন করিয়া জ্বাল দাও। অল্প ঘন হইয়া আসিলে সেই দুগ্ধে ভাজা বাদামের কুচি ও কিস্‌মিস্‌গুলি ফেলিয়া দিয়া একবার ফুটিয়া উঠিলে তাহাতে ছানা বাটাটী ফেলিয়া দিয়া হাতা দ্বারা মিশাইয়া দাও। ছানা বেশ মিশিয়া যাইলে পর নারিকেল ফেলিয়া দিয়া নাড়িতে থাক। যখন দেখিবে উহা ঘন আটার ন্যায় হইয়াছে তখন নামাইয়া লইয়া তাহাতে আরও অর্দ্ধ ছটাক বাদাম বাটা মিশ্রিত করিবে। পরে উহাতে দুইটি বড় এলাইচের গুঁড়া ও অল্প পরিমাণে কর্পূর ছড়াইয়া দিবে। কর্পূর বেশী দিলে তিক্ত হইয়া যাইবে।

যে পরিমাণে দুগ্ধ লওয়া হইবে, সেই পরিমাণে অন্যান্য জিনিষগুলিও লইতে হইবে।

চোষির পরমান্ন।

এক ছটাক ময়দা জল দিয়া মাখিয়া ছোট ছোট ধানের ন্যায় পুলির আকারে পাকাইতে হইবে, তৎপরে সেইগুলি রৌদ্রে শুকাইবে। এই শুষ্ক ময়দার পুলি গুলিকে চোষি বলে। চোষি গুলিকে ঘৃতে ভাজিয়া রাখিবে, এমন ভাবে ভাজিতে হইবে যেন লাল না হইয়া যায়। এদিকে এক সের দুগ্ধ আগুণে চড়াইয়া তাহাতে চিনি তিন ছটাক ও কিস্‌মিস্ এক ছটাক দিয়া দিবে। দুগ্ধ যখন মরিয়া তিন পোয়া আন্দাজ হইবে তখন চোষিগুলি তাহাতে ফেলিয়া দিবে। চোষিগুলি দুগ্ধের সহিত ফুটিয়া ফুটিয়া যখন দুগ্ধ ঘন আটার ন্যায় হইবে তখন নামাইয়া গরম থাকিতে থাকিতে বাদাম অর্দ্ধ ছটাক, পেস্তা সিকি ছটাক কুচাইয়া ফেলিয়া দিবে। শেষ কালে অল্প পরিমাণে গোলাপ জল উপরে ছড়াইয়া দিলেই অতি উপাদেয় রসনার তৃপ্তিকর পরমান্ন প্রস্তুত হইবে।

এক সের দুধের পরমান্নের অন্যান্য জিনিষের পরিমাণ উপরে যেরূপ লিখিত হইয়াছে তদনুযায়ী হইবে।

প্রবীনা গৃহিণী শ্রীনৃ—স।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর।

১। মনুষ্য। ২। চিন্তা।

সমালোচনা।

বঙ্গ মহিলা—বৈশাখ ১৩২২ সাল, ১ম সংখ্যা, ১ম বর্ষ—স্ত্রীপাঠ্য মাসিক পত্রিকা। শ্রীঅভিলাষ চন্দ্র সার্ব্বভৌম কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

প্রবন্ধগুলি মহিলাদিগের উপযুক্ত। পত্রিকা খানি স্থায়ী হইলে নারীগণের সেবা করিতে সক্ষম হইবে আশা করা যায়।

নূতন সংবাদ।

স্বর্গীয় এ, শ্রীনিবাস রাও মহোদয়ের পত্নী শ্রীমতী শকুন্তলা বাই স্বামীর স্মৃতি চিহ্ন স্থাপনার্থ মহীশূর রাজ্যে নিরন্ন পিতৃ-মাতৃহীনদিগের জন্য একটী বাটী নির্ম্মাণ করিয়া তাহাদের প্রতিপালনের জন্য অর্থ দান করিয়াছেন।

২। গত বৎসরের ৪ঠা আগষ্ট তারিখে ইংলণ্ড জর্ম্মণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে এ বৎসর ৪ঠা আগষ্ট সমগ্র দেশময় মঙ্গলানুষ্ঠান হইয়াছে।

৩। সম্প্রতি পাতিয়ালায় মার্ব্বেল প্রস্তরের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। আধুনিক ইউরোপীয় পদ্ধতি অনুসারে খনি হইতে প্রস্তর তুলিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই খনি হইতে নানারূপ বিচিত্রবর্ণ প্রস্তর পাওয়া যাইতেছে।

৪। বালেশ্বর, পটুয়াখালি প্রভৃতি ভারতের নানাস্থানে অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। অনেক স্থান জল প্লাবনে ভাসিয়া গিয়াছে। এই সকল স্থানের লোকদিগের কষ্ট দূরীকরণার্থ গবর্ণমেণ্ট ও সদাশয় জমীদারবর্গ যথা সাধ্য চেষ্টা করিতেছেন।

৫। বঙ্গেশ্বর লর্ড কারমাইকেল ঢাকার সেবাশ্রমে ২৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

৬। গোলা নির্ম্মাণের নিমিত্ত বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট গবর্ণমেণ্টকে কতকগুলি যন্ত্র দিয়াছেন।

৭। কুমারী নাইটিঙ্গেল ইউরোপে যে সেবাধর্ম্মের মহান আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, সম্প্রতি রাজকুলের মহিলারাও

সেই মহান আদর্শের অনুসরণ করিয়া সেবা ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছেন। রুষ সম্রাজ্ঞী ও তাঁহার কন্যাগণ যুদ্ধে আহত সৈনক দিগের সেবা করিতেছেন। ইংলণ্ডের রাজপরিবারস্থ মহিলাগণও এই কার্য্যে যোগ দিয়াছেন।

ভুত না মানুষ

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

চন্দনী—বন্দিনী।

চন্দনী বন্দিনী হইয়া এই অপরিচিত স্থানে আনিত হইয়াছেন। কতক্ষণ তিনি বন্ধন দশায় ছিলেন ও অজ্ঞান হইয়া ছিলেন তাহা তিনি বলিতে পারেন না। কিন্তু চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়াই দেখিলেন, তিনি বন্ধনমুক্ত হইয়াছেন। অতঃপর তিনি উঠিয়া বসিলেন। তিনি একখানি ক্ষুদ্র ঘরের মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র পালঙ্কে শায়িতা ছিলেন। ঘরখানি নিতান্ত অপরিষ্কার নহে। শয্যাতে কাঠিণ্যতা অথবা দুর্গন্ধ ছিল না। তিনি উপবেশন করিয়াই আহারের উপযুক্ত নানাবিধ সামগ্রী দেখিতে পাইলেন। কিন্তু ক্ষুধা ও পিপাসা উপলব্ধি করা সত্বেও তিনি পানাহার না করিয়া চারিদিক দেখিতে দেখিতে গৃহ হইতে বহির্গমনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি শীঘ্রই গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গৃহের পশ্চাৎদিকে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং তথাকার নির্জ্জন প্রকৃতির অপরূপ শোভা দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইলেন। প্রকৃতির নির্জ্জনতার অংশটুকু বিধাতা কি স্বর্গীয় মধুরতা দিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন! এই স্থানের নির্জ্জন সৌন্দর্য্য সত্য সত্যই মনে প্রাণে ঈশ্বরের সত্বা জাগাইয়া তোলে। তদ্দর্শনে চন্দনীর প্রাণে ঈশ্বর ভক্তি জাগিয়া উঠিল। তিনি ভগবানের নিকট এইরূপে নিবেদন করিতে লাগিলেন।

যদি তুমি না দেও দেখা
তাতে কোন ক্ষতি নাই।
দান করি নাম সুধা
বিনাশ করেছ ক্ষুধা
অধম অধমাধম
ধন্য হইয়াছি তাই।
পাপ পরিশুন্য হয়ে
গাহিব আনন্দ ভরে
নিরজনে নিরিবিলি
প্রেমাশ্রু পড়িবে গলি।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

তাহার নয়ন বহিয়া প্রেমাশ্রু পড়িতে লাগিল। ইহার একটু দূরবর্ত্তী স্থান দিয়া একটি স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হইতেছিল। চন্দনীর দৃষ্টিপথে তাহা পতিত হইল। তিনি ধীরে ধীরে সেই নদীর তীরাভিমুখে চলিলেন। কেহই তাঁহার গমনে বাধা দিল না সত্য কিন্তু

একজন বলবান বলিষ্ঠকায় যুবা পুরুষ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। চন্দনী সেই পশ্চাৎবর্ত্তী যুবকের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই আপনার দুরবস্থার বিষয় সম্যক বুঝিতে পারিলেন। তিনি আপন বস্ত্রাভ্যন্তরে লুক্কায়িত তীক্ষ্ণ ছুরিখানি বাহির করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু তাহাতে তিনি কৃতকার্য্য হইলেন না, কারণ ইতিপূর্ব্বেই অপর ব্যক্তি কর্ত্তৃক ইহা অপহৃত হইয়াছিল। তিনি নিরাশ হইলেন।

তথা হইতে নদীর সৈকত ভূমি পরিস্ফুত ভাবে দৃষ্ট হইতেছিল। তিনি সেই দিকে চলিলেন। স্থানে স্থানে কুঞ্জ কাননের মধ্যস্থিত পুষ্প-বিথিকাগুলি দিক দিগন্তের শোভা বর্দ্ধিত করিয়া দিতেছিল। চন্দনী চলিলেন—দ্রুতবেগে নদী তীরাভিমুখে চলিলেন যখন তিনি নদীর সৈকত ভূমিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন তখন তিনি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত বোধ করিতে লাগিলেন এবং ঘর্ম্মজলে তাঁহার বসনাদি অত্যধিক পরিমাণে সিক্ত হইতেছিল। তখনও সেই কল্লোলমুখরিত বেলাভূমি পশ্চিমাকাশস্থ রবির অপরিসীম আলোক সাগরে একেবারে ডুবিয়া যায় নাই। চন্দনী ঘর্ম্মাক্ত শরীরে একটি ছায়াযুক্ত স্থানে গিয়া উপবেশন করিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন পাঁচজন অতিশয় বলিষ্ঠকায় ব্যক্তি তাঁহার কুড়ি হাত দূরে অবস্থান করিতেছে।

চন্দনী আশ্চর্য্য হইলেন ইতিপূর্ব্বে একজন বলিষ্ঠকায় পুরুষই তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। অতিরিক্ত চারিজনের আগমন তাঁহার সম্পূর্ণ অবিদিত ছিল এই সব দর্শন করিয়া তিনি ভালরূপেই বুঝিতে পারিলেন যে তিনি বন্ধন মুক্ত হইলেও এই লোকদিগের দ্বারা প্রকারান্তরে বন্দিনী হইয়াছেন। চন্দনী নদী সৈকতে উপবেশন পূর্ব্বক নীরব নিস্পন্দ হইয়া সময় যাপন করিতে লাগিলেন। পলাইবার একটুও চেষ্টা তাঁহার মনে উদয় হইল না। কারণ তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার পলাইবার চেষ্টা সম্যকরূপে বৃথা হইবে তিনি পলাইতে চেষ্টা করিলেই ঐ বলবান যুবকগুলি আসিয়া তাঁহাকে ধৃত করিবে। যখন সূর্য্যালোক সম্যকরূপে তেজপ্রাপ্ত হইল, বেলাস্থিত বালুকাগুলি উজ্জ্বল রজত খণ্ডের ন্যায় চক্‌চক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল, তখনও পর্য্যন্ত চন্দনী উপবিষ্টা রহিলেন একবারও উঠিলেন না অথবা পানাহারের চেষ্টা করিলেন না। চিন্তায় তখনও তাহার শরীর বহিয়া ঘর্ম্মজল পড়িতেছিল। এই ভাবে মধ্যাহ্ন অতীত হইল। সায়াহ্ন আসিতেছে তথাপি চন্দনীর চৈতন্য নাই। সম্পূর্ণ বিদেশ, অতি নির্জ্জন নদীর সৈকত, শত্রু কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিতা, সম্মুখে অন্ধকার রজনী, তিনি একাকিনী।

বামারচনা।

তুমি।

তুমি যে আমার জীবন কাননে
মধুর বসন্ত হেন,
তুমি যে আমার হৃদয়-গগনে
শারদ চন্দ্রমা যেন।

২

তুমি যে আমার মরম বীণায়
উষার পূরবী তান।
তুমি যে আমার অন্তর রাজ
প্রাণের হৃদয়ে প্রাণ।

তুমি যে আমার নয়নে নয়ন
লক্ষ্য পথে ধ্রুব তারা,
তুমি যে আমার হরষ আরাম
কিবা স্নিগ্ধ সুধা-ধারা!

৪

তুমি যে আমার সাধনার ধন
স্বর্গ, মোক্ষ, ধ্যান, জ্ঞান।
তোমারি মূরতি ধরিয়া হৃদয়ে
লভিব যে নিরবাণ।

"শিশির" রচয়িত্রী

শশ্মান।

মরতের ধুলা খেলা এখানে ফুরায়।
মানবের দিন শেষে,
উপনীত হেথা এসে,
জীবন স্বপন সুখ যবে ভেঙ্গে যায়।
যবে দেহ অচেতন।
অবস ইন্দ্রিয়গণ।
মায়ার দৃঢ় বন্ধন বাঁধেনা হিয়ায়।
ভবলীলা অবসানে,
সেই দিন এই স্থানে,
অন্তিম শয়ানে লভে অনন্ত নিদ্রায়,
লুকায় মানব নাম শশ্মান ছায়ায়।
কে বলে শশ্মান তুমি ভীষণ দর্শন।
উন্মুক্ত তোমার দ্বার।
অবারিত অনিবার।
পশিছে মানব নিত্য মুদিত নয়ন।
জীবনের শেষ দিনে,
ত্যজিয়া স্বজনগণে,
তোমার ভবনে করে আশ্রয় গ্রহন।
তুমি প্রিয় বন্ধুবর,
দিয়া সূক্ষ্ম কলেবর,
পাঠাও মানবে সেই শান্তি নিকেতন।
শশ্মান! তোমার মত বন্ধু কে এমন।
তুমি চির শান্তিময় সুখের আগার।
নাহি হেথা কোলাহল,
অশান্তির দাবানল,
নাহি হিংসা, অভিমান, মিছা অহঙ্কার।
নিস্তব্ধ নির্জ্জন স্থান,
কি শান্ত তোমার প্রাণ,
কি শান্ত হৃদয় তব অনন্ত উদার।
না থাক কুসুম বন,

না থাক সে সমীরণ,
না থাক ফুটন্ত ফুলে মধুপ ঝঙ্কার।
শশ্মান! তুমিই তব শোভার ভাণ্ডার।
থাকনা শশ্মান মাঝে পিশাচের দল,
শৃগাল গৃধিনীগণ,
থাকুক না অগনন,
জুড়িয়া শশ্মান বক্ষ করি কোলাহল।
মানব গৃধিনী লয়ে,
সংসার শশ্মান চেয়ে,
শত গুণে ভাল এই শশ্মানের স্থল।
শশ্মান বিধৌত করি,
পতিতে হৃদয়ে ধরি,
জননী জাহ্নবী বহে পবিত্র নির্ম্মল।
কে বলে শশ্মান তুমি ভীষণ কেবল

শ্রীমতী উষা প্রমোদিনী বসু

পূর্ণিমা নিশিথে।

অয়ি হাসিভরা শশী,
অনন্ত গগন তলে,
আনন্দে যেতেছ ভাসি
কি পেয়ে ও হৃদিতলে?

২

এত হাসি হেসে কেন
সবারে ভুলাতে চাও?
কি পেয়ে মজেছে হিয়ে
কারে না বুঝিতে দাও?

৩

এই কি তোমার শশী,—
এই কি উচিত ভাই?
নিজে কি আনন্দে ভাস
কারে কি জানাতে নাই?

৪

বল শশী বল মোরে
নীরবে রয়েছ কেন?
আমারে জানায়ে কিগো
ব্যথিত হইবে প্রাণ?

হেরিলে তোমার কায়
সকলি ভুলিয়া যাই,
মনে হয় এ জগতে
দুঃখ বলি কিছু নাই।

৬

চকোর চকোরি সদা
মিশিয়ে তোমার সনে,
কত সুখে ভাসে তারা
তোমারে লভিয়ে প্রাণে।

৭

শরতের শশী তোরে
ক্ষণেক হেরিতে গিয়ে,
জানি না কি ভাবে কোথা
হৃদি যায় মিশাইয়ে

৮

অনন্ত গগনে থাক
অনন্তের ভাবে মিশে,
আমার প্রাণের কথা
তুমি কি শুনিবে এসে?

৯

(এ) হৃদয়ের মর্ম্মে মর্ম্মে
সবি তো লুকান আছে,
কাহারে বলি না যদি—
'পাগলিনী' বলে পাছে।

১০

তাই আজি মনে হয়
(তোরে) জানায়ে প্রাণের আশা,
কি আনন্দ পাব তায়—
লিখিতে নাহিক ভাষা।

১১

(তবে) তুমি যদি নাহি শুন
আর কারে নাহি ক'ব,
নীরবে এসেছি হেথা
নীরবেই স'য়ে র'ব।

১২

ইহাতেও এক বিন্দু
নাহি মোর দুঃখ লেশ,
(তবে) তোমার সৌন্দর্য্য হেরে
(যেন) এ জীবন হয় শেষ।

১৩

ইহা ছাড়া অন্য সাধ
আর কিছু নাহি চিতে,
(তবু) তোমারি মতন যেন
পারি প্রেম বিলাইতে।

১৪

বল শশী ত্বরা করি
বড় অভাগিনী আমি,
তব ওই পদ ছায়ে,
মোরে কি রাখিবে তুমি?

১৫

নাহি যদি রাখ কথা
চ'লে যাও পায়ে দ'লে,
(আমি তো) সহিতে এসেছি ভবে
সহিয়া যাব চ'লে।

১৬

কিছু যদি নাহি থাকে
আছে তো গো অশ্রু-জল?
(কিন্তু) আমারে কাঁদায়ে শশী,
কি বা তব হবে ফল?

১৭

(আমি তো) কাঁদিতে এসেছি ভবে
কাঁদিয়া জনম যাবে,
আমাকে কাঁদায়ে শশী,
কিবা তব ফল হবে?

১৮

আর মোর নাহি ভয়
কিবা ভয় অশ্রুজলে!
(এই) অশ্রুতে ফোটে যে ফুল
নিভৃতে হৃদয় তলে!

১৯

তাই সদা অশ্রুজল
বড় ভালবাসি আমি,
কেন যে বেসেছি ভাল,
সবি তো গো জান তুমি!

২০

অশ্রু মোর চির বন্ধু
তাই যেন বাসি ভালো,
ফেলিতে ফেলিতে অশ্রু
(যেন) হৃদে জাগে তব আলো।

২১

(আজি) তার কিছু নাহি সাধ
আর কিছু নাহি চিতে,
(শুধু) তোমারি মতন যেন
পারি 'প্রেম' বিলাইতে।

শ্রীপ্রি।

৩৭ নং মধুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষ কুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯নং আন্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

৫৩ বর্ষ।

বামাবোধিনী পত্রিকা

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি. এ. কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

ভাদ্র, ১৩২২। সেপ্টেম্বর ১৯১৫।

সূচী।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২।৵০ ; অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১৷৴০ ; প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।০ (চারি আনা মাত্র।)

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 625. September, 1915.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা, উমেশচন্দ্র দত্ত, বি. এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৩ বর্ষ। ৬২৫ সংখ্যা। | ভাদ্র, ১৩২২। সেপ্টেম্বর, ১৯১৫। | ১০ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

প্রার্থনা।

হে সর্ব্বলোক-মহেশ্বর-অখিল-বিধাতা! তুমি চিরকালের পিতা-মাতা ও রক্ষাকর্ত্তা। তোমার প্রসাদে এই সুদীর্ঘকাল সঙ্কটময় পথ অতিক্রান্ত হইয়াছে। ৫২ বৎসর পর্য্যন্ত তোমারই আশ্রয়ে এ প্রাণ রক্ষিত হইয়াছে; ইহার জন্য কৃতজ্ঞতা-সহকারে তোমাকে প্রণিপাত করিতেছি এবং তোমার হস্তে জীবন সমর্পণ করিতেছি। তুমি মাতার ন্যায় সর্ব্বদা রক্ষা কর, সকল প্রকার শ্রীসৌন্দর্য্যে ও সদ্‌গুণে বিভূষিত কর। হে বিশ্ববিধাতা, তোমার চরণে এই প্রার্থনা।

ওঁ ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

ইষ্ট-লিন।*

প্রথম পরিচ্ছেদ।

লেডী ইজাবেল।

একখানি আরাম কেদারায় মাউণ্ট-স্যাভারিণের আর্ল, উইলিয়াম তাঁহার নবরক্ষিত বাটীর সুসজ্জিত পুস্তকাগারে বসিয়াছিলেন। তাঁহার কেশগুলি সমস্ত শুভ্র, ললাটের চর্ম্ম সকল কুঞ্চিত হওয়ায় মুখখানি অত্যন্ত মলিন দেখাইতে ছিল। তাঁহার একখানি পা কাপড় দিয়া জড়ান, সেই পাখানি একটি ভেল্‌ভেটের আসনের উপর স্থাপিত ছিল, তাঁহার ঐ পাখানিতে বাত আশ্রয় করিয়াছে বলিতেন। তাঁহাকে দেখিলে মনে হয় যে তিনি অকাল বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। বাস্তবিক

* মিসেস হেনরী উডের রচিত "ইষ্টলিন" নামক উপন্যাস অবলম্বনে লিখিত।

তাহাই। তাঁহার বয়ঃক্রম ৪৯শের অধিক নয়, তথাপি তাঁহাকে দেখিলে অত্যন্ত বৃদ্ধ বলিয়া মনে হয়।

আর্ল অফ মাউন্ট সাভারিণের চরিত্র ভাল বলিয়া খ্যাত ছিল না। কিন্তু তিনি অসাবধান অপব্যয়ী, জুয়াড়ী বলিয়া সকলের নিকট পরিচিত ছিলেন। বুদ্ধির দোষে তাঁহার হৃদয়ের সমুদয় মহৎ গুণগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তিনি যদি পূর্ব্বের অবস্থায় থাকিতেন তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহার পক্ষে ভাল হইত।

তিনি ২৫ বৎসর (বয়স অবধি) অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, শৈশব ও পাঠ্যাবস্থা পর্য্যন্ত তাঁহার স্বভাব চরিত্র খুব ভাল ছিল। তিনি ব্যারিষ্টার হইবার জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিয়া জর্জ্জ ভেন বলিয়া ডাকিত. তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে উইলিয়াম ভেন কালে একজন খুব বড় লোক হইবেন, কারণ তিনি পরিশ্রমী, মেধাবী ও অধ্যবসায়ী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু বৃদ্ধ মাউন্ট সাভারিণের আর্ল তাঁহার একজন আত্মীয় ছিলেন। উইলিয়ম ভেনের আর্ল হইবার সম্ভাবনা কখন ছিল না, কারণ বৃদ্ধ আর্লের তিনজন সবল সুস্থকায় উত্তরাধিকারী বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু উইলিয়মের সৌভাগ্যক্রমে তাহারা বেশী দিন জীবিত রহিল না। তাহাদের একজন মৃগী রোগে, একজন আফ্রিকার জ্বরে ও তৃতীয় জন অক্সফোর্ডের নৌকায় প্রাণ ত্যাগ করে এবং আইন অধ্যয়নকারী ছাত্র যুবক উইলিয়ম, হঠাৎ দেখিলেন তিনি মাউন্ট সাভারিণের আর্ল হইয়াছেন, এবং বৎসরে ৬০ হাজার টাকায় আইন সঙ্গত অধিকারী হইয়াছেন।

আর্ল উপাধি লাভ করিয়া উইলিয়মের প্রথম মনের ভাব এইরূপ ছিল যে তিনি কখনও অর্থ অপব্যয় করিতে শিখিবেন না। কিন্তু তাঁহার এ সঙ্কল্প অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারে নাই। বৎসরের পর বৎসর কিছু কাল এই ভাবে কাটিয়া গেল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বাহিরের লোকের শত তোষামোদেও তাঁহার সঙ্কল্প পরিবর্ত্তিত করিতে পারিল না। তিনি সকল শ্রেণীর লোকদিগের সঙ্গে মিশিতেন ও সকলের নিকট আদৃত হইতেন। এই সময় তাঁহার নূতন স্বাধীন অবস্থা, ধন ও উপাধির জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া ছিলেন, সর্ব্বোপরি তাঁহার মনমুগ্ধকর আচরণ ও সৌম্যমূর্ত্তি বিশেষরূপে আকর্ষনীয় ছিল। দুর্ভাগা, পরিণামদর্শী, সহিষ্ণু, দরিদ্র আইন অধ্যয়নকারী ছাত্র উইলিয়ম ভেন তাঁহার সেই নিভৃত বাস স্থানের মধ্য হইতে অকস্মাৎ আর্ল অফ মাউন্ট সাভারিণ হইয়া পূর্ব্বের সঙ্কল্প রক্ষা করিতে অক্ষম হইলেন। ক্রমে তাঁর ব্যয় এত বৃদ্ধি হইতে লাগিল যে দেশস্থ সমগ্র লোকে বলিত তিনি শীঘ্রই ধ্বংস প্রাপ্ত হইবেন। আর্লের এই বিপুল সম্পত্তি কখনও এক দিনে নিঃশেষ হওয়া সম্ভব নহে। যাঁর বৎসরে ষাট হাজার

টাকা আয় তাঁহাকে কখন একদিনে দরিদ্র করিতে পারে না। আর্ল তাঁহার পুস্তকাগারে বসিয়া আছেন, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে তাঁহার বয়স এখন ৪৯ বৎসর। এখনও তিনি সর্ব্বস্বান্ত হন নাই। এদিকে দৈন বিষে যে তাঁহার দেহ জর্জ্জরিত, বাহিরের কে তাঁহার সে অবস্থা ভেদ করিবে? সাধারণে জানে তাঁহার অবস্থা ভালই আছে, কিন্তু ঋণের করালগ্রাসে তাঁহাকে ধ্বংসের পথে লইয়া আসিয়াছে।

পুস্তকাগারের টেবিলের উপর তাড়া বাঁধা যে সকল কাগজ ছিল তাহার নিকট বসিয়া আর্ল অতীতের কথা ভাবিতে ছিলেন। তাঁহার সেই নির্ব্বোধের ন্যায় বিবাহ। গ্রেট্না গ্রীনকে সেই ভালবাসা, যতদূর নির্ব্বোধের কাজ হইবার তা হইয়া ছিল। কিন্তু তাঁর সেই হতশ্রদ্ধা, অপ্রেম সত্বেও কাউণ্টেস তাঁহার পতিপ্রাণা প্রেমময়ী স্ত্রী ছিলেন। সাধ্বী একটীমাত্র সন্তানের জননী হইয়াছিলেন। আজ ১৩ বৎসর হইল কাউণ্টেস সেই একটী মাত্র সন্তান রাখিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। যদি এই সন্তানটী তাঁহার কন্যা না হইয়া পুত্র হইত তাহা হইলে আজ তাঁহাকে এত চিন্তায় অভিভূত হইতে হইত না। বালক বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহার পথ দেখিয়া লইত, এবং—(চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল)।

একজন ভৃত্য গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল "প্রভু, একজন ভদ্রলোক আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চান"।

আর্ল কর্কশ কণ্ঠে বলিলেন "তিনি কে? তাঁহার নাম লিখাইয়া আন নাই"? তাঁহার পাওনাদারদিগের সম্বন্ধে ভৃত্যদের সাবধান হইয়া চলিবার জন্য শিখান ছিল।

ভৃত্য পুনরায় প্রবেশ করিয়া বলিল "প্রভু", এই তাঁর নাম। ইনি "ওয়েষ্টলিনের মিষ্টার কার্লাইল"।

"ওয়েষ্টলিনের মিষ্টার কার্লাইল—" আর্ল গোঁয়াতে গোঁয়াতে এই কথা বলিলেন, কারণ এই সময় তাঁর পায়ের যন্ত্রণা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া ছিল। "তিনি কি চান? তাঁহাকে উপরে লইয়া আইস।" ভৃত্য আজ্ঞা পাইয়া তাঁহাকে লইয়া আসিল, এবং মিঃ কার্লাইলের সহিত আর্লের আলাপ হইল। কার্লাইল দেখিতে দীর্ঘাকার বয়স অনুমান ২৭ বৎসর, তাঁহার আকৃতি দেখিলেই তাঁহাকে সৎ লোক বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। তিনি মস্তক অবনত করিয়া নম্রতার সহিত ধীরে ধীরে কথা বলিতেছিলেন। তাঁর স্বভাব একটু স্বতন্ত্র রকমের ছিল, সকলে তাঁহাকে অত্যন্ত অমায়িক বলিত। তিনি তাঁর পিতার স্বভাব পাইয়াছেন লোকে যখন এই কথা বলিত তিনি হাস্য করিয়া বলিতেন তিনি যাহা করেন তাঁহার অজ্ঞাত ভাবেই করেন। তাঁহার আকৃতি অতি সুন্দর, রং একটু ফ্যাকাসে ধরণের, চুলগুলি কাল, সুদীর্ঘ আঁখিপল্লব ও নীল চক্ষু। স্ত্রীলোক এবং পুরুষ সকলেই তাঁহাকে ভাল বাসিত। তিনি একজন

আইন ব্যবসায়ীর পুত্র, পিতার সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও তিনি ভদ্র সন্তানের উপযোগী শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। রাগ্‌বিতে শিক্ষা পাইয়া অক্সফোর্ড হইতে উপাধি লাভ করিয়াছেন। এখন আর্লের নিকট একটী প্রয়োজনে আসিয়াছেন।

আর্ল,—মিষ্টার কার্লাইল, আপনার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় সুখী হইলাম। আমি পায়ের ব্যথার জন্য উঠিতে পারি না, এই বাত শত্রু আমাকে একেবারে উত্থান শক্তি রহিত করিয়াছে। বসুন! আপনি কি সহরে থাকেন?

কার্লাইল,—আমি এখন ওয়েষ্টলিন হইতে আসিতেছি। আপনার সাক্ষাৎ লাভই আমার এখানে আসিবার প্রধান উদ্দেশ্য।

"আমার নিকট আপনার কি প্রয়োজন?" আর্ল অপসন্ন ভাবে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁর মনে হইল কার্লাইল বুঝি পাওনাদারদিগের প্রতিনিধি হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।

মিষ্টার কার্লাইল তাঁহার কেদারা আর্লের নিকট টানিয়া আনিয়া আস্তে আস্তে বলিতে লাগিলেন।

"মহাশয়, এইরূপ একটি জনরব শুনিতেছি, যে আপনি ইষ্টলিন বিক্রয় করিবেন।"

"মহাশয় এক মুহূর্ত্ত থামুন," আর্ল চীৎকার করিয়া বলিলেন, এবং নিজেও নীরব হইলেন, কারণ তাঁহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। তৎপরে উত্তেজিত ভাবে বলিলেন "আপনার কি লোকের সম্মানে আঘাত করা রূপ কোন গুপ্ত অভিপ্রায় আছে, অথবা আপনার প্রশ্নের পশ্চাতে অন্য কোনও উদ্দেশ্য আছে?"

মিষ্টার কার্লাইল বলিলেন "আপনার কথা আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।"

আর্ল "একটী কথা - ক্ষমা করিবেন মহাশয়, আমি সহজ ভাবেই বলিতেছি আমি মনে করিতেছি যে মহাশয়, আমার পাওনাদারদিগের প্রতিনিধি হইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন"।

অভ্যাগত উত্তর করিলেন "মহাশয়, আমি জানি উকীলদিগের যাহা কিছু প্রয়োজন পাওনাদারদিগের জন্যই, কারণ তাহাদের জাতীয় ব্যবসাই তাই, কিন্তু আপনি জানিবেন আমি আপনার নিকট সে দোষে দোষী নই। আমার জীবনে এরূপ অপরাধ কখনও হয় নাই এবং আমি মনে করি কখন হইবেও না"।

আর্ল,—মিষ্টার কার্লাইল, আমাকে ক্ষমা করিবেন। আপনি যদি জানিতেন যে এই সকল লোক আমাকে কিরূপ উত্ত্যক্ত করিয়াছে, তাহা হইলে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের লোককে সন্দেহ করিলেও আপনি আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন না। আপনার কি প্রয়োজন এখন বলুন।"

কার্লাইল,—"আমি শুনিলাম ইষ্টলিন গোপনে বিক্রীত হইবে আপনার দালাল এইরূপ অসম্পূর্ণ কথা আমাকে

বলিয়াছিল যদি তাহা হয়, আমি ক্রয় করিতে ইচ্ছা করি।”

“কাহার জন্য?” আর্ল জিজ্ঞাসা করিলেন।

কার্লাইল,—“আমার নিজের জন্য।”

“আপনার জন্য!” আর্ল হাস্য করিয়া উঠিলেন। “আপনার ওকালতীর আয় তাহা হইলে মন্দ নয়, মিঃ কার্লাইল।”

কার্লাইল বলিলেন “তাহা নহে,” “আমি আমার মাতুলের ও পিতার অনেক সম্পত্তি পাইয়াছি।”

আর্ল,—এ সমস্ত সম্পত্তি ওকালতীর দ্বারা উপার্জ্জন কিনা আমি জানিতে ইচ্ছা করি।

কার্লাইল—না, সব নয়। আমার মাতা তাঁহার বিবাহের সময় কতক টাকা পাইয়াছিলেন এবং আমার পিতা ব্যবসা দ্বারা তাহার বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ইষ্টলিন আমার অত্যন্ত পছন্দ হইয়াছে, উপযুক্ত মূল্য হইলে আমি ইহা ক্রয় করিতে পারি।

লর্ড মাউণ্ট সাভারিণ ক্ষণকাল মৌন হইয়া রহিলেন। পরে পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন, “মিঃ কার্লাইল আমার বর্ত্তমান অবস্থা অত্যন্ত মন্দ হইয়াছে, আমার সমুদয় সঞ্চিত অর্থ নিঃশেষ হইয়াছে। এখন ইষ্টলিন খানি কেবল অবশিষ্ট, এখানি আজিও বন্ধক পড়ে নাই। ইহার মত সুন্দর বাড়ী আর কোথাও দেখা যায় না। আপনিও বোধ হয় তাহাই মনে করেন।

আমার স্মরণ হইতেছে ১৮ বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন এই বাড়ী ক্রয় করি আপনি তখন ইহার পক্ষে বিক্রেতাদিগের উকিল ছিলেন”।

সে আমি নই, “আমার পিতা”, মিঃ কার্লাইল হাসিতে হাসিতে বলিলেন। “আমি সে সময় অত্যন্ত ছোট ছিলাম”।

“তাহাই হইবে, আমি আপনার পিতার কথাই বলিতে ছিলাম নগদ কয়েক হাজার টাকা আমার হস্তগত হইলেই আমি ইহা বিক্রয় করিতে পারি, যখন ইহা আমার হস্ত হইতে যাইবেই। কিন্তু এখন বুঝিতে পারিতেছেন, যদি আমার পাওনাদারগণ জানিতে পারে যে ইষ্টলিন আমি বিক্রয় করিতেছি, তাহা হইলে তাহারা আমাকে অস্থির করিয়া তুলিবে। আপনি এরূপ ভাবে ইহা লইবেন যেন এ বিষয় সকলের অজ্ঞাত থাকে। আমার কথা বুঝিতে পারিলেন ত”?

মিষ্টার কার্লাইল উত্তর করিলেন “হাঁ”।

কার্লাইল—আপনার এই সম্পত্তির জন্য কত টাকা দর দিয়াছেন?

আর্ল,—আমার কর্ম্মচারী ওয়ারবর্টনকে না জিজ্ঞাসা করিয়া আমি আপনাকে ঠিক দাম বলিতে পারি না। তবে ৭০ হাজার পাউণ্ডের কম ত নয়ই।

মিষ্টার কার্লাইল “অত্যন্ত বেশী”, বলিলেন।

আর্ল উত্তর করিলেন,—“এ মূল্যও তার উপযুক্ত নয়”।

কার্লাইল,—দায়ে পড়িয়া বিক্রয় করিলে ইহার মূল্য এত অধিক হইতেই পারে না। আমি এইরূপ মনে করিয়াছিলাম, বিচাম্পের নিকট হইতেও এইরূপ আভাস পাইয়াছিলাম যে ইষ্টলিন আপনি আপনার কন্যাকে দিবেন।

আর্ল,—আমি তাহাকে কিছুই দিয়া যাইতে পারিব না।

এইসময় তাঁহার সেই অপরিণামদর্শী বিবাহের কথা উত্থাপন করিয়া বলিলেন—"জেনার্ল কনওয়ের কন্যার ভালবাসায় আমি পতিত হই, এবং সেও নির্ব্বোধের মত আমার পথানুসরণ করে। পরে দুই জনেই আমরা এই বুদ্ধি হীনতার জন্য দুঃখ পাইয়াছি। জেনার্ল আমার সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিতে আপত্তি করিয়াছিলেন,আমিও বলেছিলাম যে আমি অবশ্য তাঁহাকে দেখাব আমি তাঁর মেয়েকে বিবাহ করিতে পারি কি না। এইরূপে আমি তাঁর কন্যা গ্রেটনাগ্রীনকে লাভ করি, এবং সে কাউণ্টেস অফ মাউণ্ট সাভারিণ বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত হয়। এই বিবাহের অপরাধেই সমস্ত নষ্ট হইল। জেনারল যখন তাঁহার কন্যার পলায়নের কথা জানিতে পারিলেন, তখনই তাঁহাকে হত্যা করা হইল"।

"তাঁহাকে হত্যা করা হইল"? মিষ্টার কার্লাইল বিস্মিত ভাবে বলিয়া উঠিলেন। "হাঁ" তাহাই। তাঁহার হৃদ্ রোগ ছিল, এবং হঠাৎ এই সংবাদে চিত্তের উত্তেজনায় তিনি মারা পড়েন। আমার হতভাগিনী স্ত্রী এ সময় কি কষ্টই না পাইয়াছিলেন। তাহার পিতার মৃত্যুর জন্য সেই সম্পূর্ণ দোষী। এবং আমি বিশ্বাস করি তাঁহার নিজের মৃত্যুও এই কারণেই হয়। এক বৎসরের মধ্যে সে পীড়িত হইয়া পড়ে। ডাক্তারেরা বলেন যে তাঁহার ক্ষয়কাশ হইয়াছিল। বাস্তবিক এ রোগ হইবার আর কোন কারণ ছিল না, তাঁহাদের বংশেও এ রোগ কাহার ছিল না। এরূপ বিবাহে কোনও সুখ পাওয়া যায় না। আমি অনেক স্থলে অনেক লোককে দেখিয়াছি যে এই অপরাধের জন্য তাহাদের পরে দুঃখ পাইতে হইয়াছে"। মিঃ কার্লাইল দেখিলেন, আর্ল নীরব হইয়া সেই চিন্তাতে একেবারে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছেন।

আর্ল,—আমি কন্যার জন্য যে কিছু রাখিতে হইবে জানিতাম, কিন্তু রাখি নাই। আমার স্ত্রীর কোন বিষয় সম্পত্তি ছিল না। আমিও অত্যন্ত ব্যয় করিতাম। আমরা তখন আমাদের ভাবি সন্তানের জন্য ভাবি নাই ও কিছুই সঞ্চয় করিয়া রাখি নাই। মিঃ কার্লাইল, একটা প্রবচন আছে, সেটা এই যে, যে কাজটা যখন হ'ক করা যাইতে পারে, এরূপ যদি হয় সে কাজ কখনও সম্পন্ন হয় না"।

কার্লাইল মস্তক অবনত করিয়া বলিলেন "এ কথা সত্য"।

আর্ল দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "এই কারণেই আজ আমার কন্যা কপর্দ্দক হীনা। তার জন্যই আমার এখন ভাবনা। আমি এমন মূঢ়, আজ যদি আমি মারা যাই, আমার কন্যা কোথায় দাঁড়াইবে তাহার ঠিক নাই। তবে আমার এই একমাত্র আশা আছে যে, সে ভাল পাত্রে বিবাহিতা হইবে, কারণ সে ইংরাজ মহিলাদের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান সুন্দরী বলিয়া খ্যাত। সে সুশিক্ষিতা, তার মার নিকট হইতেও সে সংশিক্ষা পাইয়াছে, তাহার মা অতি শান্ত ও নির্ম্মল অন্তঃকরণ ছিলেন। পরে একজন সুশিক্ষিতা শিক্ষয়িত্রীর নিকটও শিক্ষা পাইতেছে। সে যে গ্রেটনা গ্রীণের মত হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই"।

আগন্তুক বলিলেন "সে ছোট বেলায় অতি সুন্দর দেখিতেছিল, আমার যেন এই রকম স্মরণ হচ্চে"।

আর্ল,—"হাঁ, আপনি তাহাকে ইষ্টলীনে দেখিয়াছেন, তাহার মা তখন জীবিত ছিলেন"। তৎপরে তিনি বাড়ীর কথা পাড়িলেন। "মিঃ কার্লাইল, আপনি যদি ইষ্টলিন ক্রয় করেন তাহা হইলে টাকা আনিবেন, এবং দেখিবেন ইষ্টলিন হস্তান্তর হইয়াছে একথা যেন কেহ না জানিতে পারে। লর্ড মাউন্ট ভাসারিণ এখনও ইষ্টলিনের অধিকারী এ যেন সাধারণে জানে—অবশ্য ইহা অল্প দিনই গোপন রাখিতে হইবে। ইহাতে আপনার কোনও আপত্তি নাই ত"?

মিষ্টার কার্লাইল তাহাতে সম্মত আছেন বলিলেন। কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া উঠিতে অনেক বেলা হইয়া গেল। আর্ল বলিলেন, "আপনি যদি আমাদের সঙ্গে আহার করিয়া যান, তাহা হইলে সুখী হইব"।

মিষ্টার কার্লাইল দ্বিধার মধ্যে পড়িয়া নিজের পোষাকের দিকে তাকাইলেন। তাঁহার পরিধানে ভদ্রলোকের উপযোগী সাদাসিধা সকাল বেলার পরিচ্ছদ ছিল। তিনি মধ্যাহ্ন ভোজনের উপযোগী পরিচ্ছদের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না।

আর্ল বলিলেন "ওঃ, সেজন্য কিছু মনে করিবেন না, এ বাটীতে আমি ও আমার কন্যা ব্যতীত আর কেহ নাই। কাসল মারলিংয়ের মিসেস ভেন, এক আমাদের এখানে আছেন, তা তিনি এখন শেষের দিককার বসিবার ঘরে আমার মেয়ের সঙ্গে রহিয়াছেন। আমি শুনছিলাম তাঁহার আজ অন্যত্র নিমন্ত্রণ আছে। যদি তাহা না হয় আমরা এইখানেই আহার করিব। মিষ্টার কার্লাইল, অনুগ্রহ করিয়া ঘণ্টাটা বাজাইয়া দিলে বাধিত হইব।

ভৃত্য প্রবেশ করিল"।

আর্ল জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিসেস্ ভেন কোথায় আহার করিবেন"। ভৃত্য উত্তর দিল, "মিসেস্ ভেনের অন্যত্র নিমন্ত্রণ আছে মহাশয়। তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য দরজায় গাড়ী অপেক্ষা করিতেছে"।

"ভাল হইয়াছে। মিষ্টার কার্লাইল আপনি তাহা হইলে থাকুন"। সাড়েটার সময় আহার প্রস্তুত হইল। আর্ল ও মিঃ কার্লাইল আহার গৃহে যেমন প্রবেশ করিলেন, ঠিক সেই সময় অপর দিককার দ্বার দিয়া আর একজন প্রবেশ করিল। কে—এ কোথায় ছিল? মিঃ কার্লাইল চাহিয়া রহিলেন, ইহাকে মানুষ বলেত মনে হচ্ছে না, তিনি মনে করিতেছিলেন এ যেন একটি পরী।

একটি সুন্দরী বালিকা, মুখখানি অতুলনীয় সুন্দর, এরূপ সৌন্দর্য্য প্রায় দেখা যায় না ঠিক যেন তুলি দিয়া আঁকা। কাল কুচকুচে কোঁকড়া কোঁকড়া চুল স্কন্ধের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েচে, শিশুর মত সরল মুখ, সুন্দর হাত দুইখানি মুক্তার অলঙ্কারে শোভিত, পরিধানে সাদা লেসের পোষাক। উকীল মহাশয়ের মনে হইল তিনি যেন পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরীকে স্বপ্নে দেখিতেছেন।

আর্ল—"মিষ্টার কার্লাইল,এইটী আমার কন্যা লেডী ইজাবেল"। ইজাবেল তাঁহার আসনে উপবেশন করিলেন। প্রথমে লর্ড মাউন্ট সাভারিণ বাতগ্রস্ত পাটী একটি টুলের উপর রাখিয়া বসিলেন, যুবতী লেডী ইজাবেল ও মিঃ কার্লাইল দুইজনে সম্মুখ সম্মুখী বসিলেন। মিষ্টার কার্লাইল নিজেকে রমণীদিগের সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী মনে করিতেন না, কিন্তু আজ এই যৌবনোন্মুখ বলিকার সৌন্দর্য্যের সুখ্যাতি না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। সরলতাপূর্ণ সুন্দর মুখ, কোমল গোলাপী আভাযুক্ত গণ্ডস্থল, কুঞ্চিত কেশ নধর ছিপছিপে গঠন, এই সকলের জন্য তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী দেখাইতেছিল। তার সেই কমনতাপূর্ণ কৃষ্ণতার চক্ষু দুটি সর্ব্বাপেক্ষা নয়ন মনমুগ্ধকর। তাঁহার জীবনে এমন সুন্দর চক্ষু তিনি কখন দেখেন নাই। তিনি একাগ্রচিত্তে তাহার প্রতি চাহিয়াছিলেন। তাঁহার বোধ হইতেছিল তাহার মুখে যেন দুঃখের ছায়া পতিত হইয়াছে, তাহার দৃষ্টিও যেন দুঃখপূর্ণ। কিন্তু সকল সময় তাহা বুঝা যায় না। যখন সে স্থির ভাবে চাহিতেছিল তখনই ইহা প্রতীয়মান হইতেছিল; কিন্তু মিঃ কার্লাইল বুঝিতে পারিলেন না এই সরল নির্দ্দোষী সুন্দরী ইজাবেলের দুঃখের কারণ কি?

আর্ল জিজ্ঞাসা করিলেন "ইজাবেল, তুমি কি বাহিরে যাইবার পোষাক পরিয়াছ"?

ইজাবেল,—হাঁ বাবা। বৃদ্ধা মিসেস্ লিভসনের চা খাবার দেরী করিতে ইচ্ছা করি না। তিনি সকাল সকাল চা খাইতে ভাল বাসেন, এবং আমি জানি মিসেস্ ভেনও তাঁহার আহার লইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি যখন এখান হইতে যান তখন ছয়টা বাজিয়া গিয়াছিল।

আর্ল—ইজাবেল, আমি আশা করি তুমি আজ রাত্রিতে ফিরিতে অধিক বিলম্ব করিবে না।

ইজাবেল,—ইহা মিসেস্ ভেনের উপর

নির্ভর করিতেছে।

আর্ল তুমি কি করিবে তা আমি ঠিক বুঝেছি। যখন এই যুবতীদের রাত্রি দিন ফ্যাসানের পশ্চাতে ঘোরার কথা মনে হয় তখন মন বড় চিন্তাকুল হয়। মিঃ কার্লাইল, আপনি কি বলেন?

মিঃ কার্লাইল তখন অপর দিকে সুন্দরীর রক্তিম গণ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনি দেখিলেন তাহার প্রস্ফুটিত উজ্জ্বল মুখে একটি ম্লান ছায়া পতিত হইয়াছে।

আহার শেষ হইতেই একজন পরিচারিকা একখানি শ্বেতবর্ণ কাশ্মিরী শাল আবরণ লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। যুবতীর স্কন্ধে সেই খানি রাখিয়া বলিল, গাড়ী অপেক্ষা করিতেছে।

লেডী ইজাবেল অগ্রসর হইয়া পিতাকে নমস্কার করিল।

আর্ল তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া তাহার সুন্দর মুখখানিতে চুম্বন করিয়া বলিলেন, 'প্রাণাধিকে কন্যে! তোমার মঙ্গল হউক।'

"মিসেস্ ভেনকে বলিও আমি সকাল পর্য্যন্ত তোমাকে সেখানে রাখিতে পারিব না, তুমি আমার একমাত্র সন্তান। মিঃ কার্লাইল, অনুগ্রহ করিয়া ঘণ্টাটা বাজাইয়া দিবেন? আমার মেয়েকে কেহ গাড়ীতে তুলিয়া দিতে না গেলে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না।

আপনি যদি অনুমতি করেন এবং লেডী ইজাবেল যদ ইচ্ছা করেন তাহা হইলে আমি তাঁহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি, এই বলিয়া মিঃ কার্লাইল ঘণ্টা বাজাইয়া দিলেন।

আর্ল তাঁহার এই সৌজন্যের জন্য ধন্যবাদ দিলেন, যুবতীও হাসি মুখে তাঁহার দিকে তাকাইলেন। কার্লাইল তখন তাহার সহিত সোপান-শ্রেণী অতিক্রম করিয়া অবতরণ করিলেন। বাহিরে মাথা খোলা একখানি সুন্দর চেরেট দাঁড়াইয়া ছিল। যুবতী তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া ও অভিবাদন করিয়া গাড়িতে উঠিলেন। গাড়ী গন্তব্য পথে অগ্রসর হইল, কার্লাইল আর্লের নিকট ফিরিয়া আসিলেন।

আর্ল বলিলেন, কেমন আমার কন্যা —কি সুন্দরী নয়?

কার্লাইল আস্তে আস্তে বলিলেন, ইঁহার মত সুন্দরী বোধ হয় আর নাই। ইঁহার সৌন্দর্য্যের অর্দ্ধেকও আমি কোথাও দেখি নাই।

আর্ল—শুনিলাম গত সপ্তাহের এক সভাতে সে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই সন্নিবেশে বাতের জন্য আমি তথায় উপস্থিত থাকিতে পারি নাই। সে যেমন সুন্দরী তেমনি গুণবতী।

আর্ল নিজের মেয়ে বলিয়া যে এত প্রশংসা করিতেছেন তাহা নহে। লেডী ইজাবেলের স্বভাব বাস্তবিক আশ্চর্য্য রূপ

মধুর ছিল। কেবল যে তাহার মন ভাল ও দেখিতে সুন্দরী, তাহা নহে, তাহার অন্তঃকরণ ও অতি মহৎ। সে তাহার সৎশিক্ষা ও পল্লীগ্রামে বাসের জন্য নগরবাসিনী বালিকাদিগের ন্যায় ভোগ বিলাসী হয় নাই। তাহার মাতা যখন জীবিত ছিলেন তখন সে কখন কখন ইষ্টলিনে থাকিত, কিন্তু অধিকাংশ সময়ই আর্লের নিকট মাউণ্ট সাভারিনে থাকিত। তাহার মাতার মৃত্যুর পর হইতে একজন অভিজ্ঞ শিক্ষয়িত্রীর অধীনে মাউণ্ট সাভারিনেই বাস করিতেছে। এখানে তাহাদের জন্য অতি সামান্য তৈজস পত্র ছিল। আর্ল মাঝে মাঝে তাহাদের কাছে আসিয়া থাকিতেন। ইজাবেল মহৎ হৃদয়, পরোপকারী, লজ্জাশীলা, বিবেচক, শান্ত ও গম্ভীরপ্রকৃতি ছিল। পাঠিকাগণ তাহাকে প্রশংসা করিতে বারণ করিও না, যতক্ষণ পার তাহাকে প্রশংসা কর, কারণ এই নিষ্কলঙ্ক বালিকা এখন প্রশংসার যোগ্য। অবশ্য এমন সময় আসিবে যখন আর তাহাকে এরূপ প্রশংসা করা যাইবে না। আর্ল পূর্ব্বে যদি তাঁহার প্রিয়তমা কন্যার পরিণাম জানিতে পারিতেন তাহা হইলে শৈশবেই তাহাকে ইহলোক হইতে অপসারিত করিতেন।

বামাবোধিনী পত্রিকার ত্রিপঞ্চাশত্তম জন্মোৎসব উপলক্ষে রচিত।

তুমি গো "বামাবোধিনী, পত্রিকা"-ব্রত
চারিণী,
তোমার জীবনে দেখি করুণা অপার;
ভক্তের মানসী কন্যা, আজ তুমি হ'লে
ধন্যা,
তোমার এ জন্মোৎসবে স্মরি শত-বার।
বাহান্ন বৎসর হেন, জীবিত রয়েছ কেন?
কার তরে প্রেম-অশ্রু ঝরে অনিবার;
কোথা পিতা প্রেমময়? দাও তাঁর পরি-
চয়,
চির-কল্যাণ-দায়িনি ভগিনি আমার!

ব্রহ্মচর্য্য ব্রত তব, এ যে দেখি অভিনব,
তোমার নির্জীব প্রাণে খেলে চমৎকার;
নহ তুমি আশা-হত, সদা প্রেমে হও রত,
খুলে এই বিশ্বময় প্রেমের ভাণ্ডার।
শিখায়েছ কত তুমি, আত্মার-প্রতিষ্ঠা
ভূমি,
জ্ঞানের বিকাশ এই মানব অন্তরে;
যাঁহার পূজার অর্ঘ্য, আনে সবে প্রজাবর্গ,
লয়ে তাই সাজাইছ অতি সমাদরে।
লইয়া বরণ ডালা, পরাও যতনে মালা,
আর ত নাহিক হেরি দীনাবঙ্গভাষা;

সোদর-সোদরা তব, মোরা আজি কিবা কব!
শুভ দিনে জাগে প্রাণে এই নব আশা—
প্রাণের ভগিনী তোরে, চিরদিন থাকি ধরে,
সতত পুণ্যের পথে চলে যাই সোজা;
অনন্ত করুণাধার, বিশ্বপতি বিশ্বাধার।
তাঁরে যেন হয় সত্য এ জীবনে বোঝা।
হও তুমি আয়ুষ্মতী, ভগিনি গো পুণ্যবতি,
দেব আশীর্ব্বাদ তুমি লভিয়ে গো আজ,
তোমার জীবন-ব্রত, সার্থক করিবে কত,
ধন্য কৃতকৃত্য হবে রমণী-সমাজ।

আমাদের কথা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সরলা

কি ঘৃণার কথা! দাদা আমার আবার বিবাহের সম্বন্ধ করিতেছেন! প্রথমে একবার বাবার কাছে বকুনী খাইয়া চুপ করিয়াছিলেন। এখন বাবা ও মা স্বর্গারোহন করিয়াছেন, দাদার ঘাড়ে সংসার, সে'দিকে দৃক্পাত নাই, হাতে কত রোগী, সেজন্য দেখি এক বিন্দু চিন্তা নাই, এখন কিনা কোথাকার সব পণ্ডিতদের কাছ থেকে ব্যবস্থা আনাইয়াছেন, কত হাঁটাহাঁটি, ছুটাছুটি, ঝটাপটি আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁর খেয়ে দেয়ে আর কাজ নাই! ছি, ছি, ছি, ঘৃণায় মরি। যমরাজ! এত লোকের সর্ব্বনাশ করিতেছ, এ হতভাগিনীর দিকে একবার ফিরিয়া চাও না কেন? ধিক্ আমার জীবনে, গলায় দড়ি আমার!

মনের এই ভাব, এমন সময় বিবাহের কথাটা চাপা পড়িল——বাঁচিলাম।

এখন কি করি? কোথায় যাই? আমার কি কোন কর্ত্তব্য নাই? আমি সংসারে কি করিতে আসিয়াছিলাম? কি বা করিতেছি? মেজদিদি ও দাদার কাছে কিঞ্চিৎ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিখিয়াছি, নিজ গ্রামের ও ভিন্ন গ্রামের মেয়েরা আসিলে ঔষধ দিয়া থাকি, আর দাসীর মত সংসারের সমস্ত কার্য্য করি জীবন পাত করিয়া তিন বৎসর বৌ দিদির কাজ করিতেছি—তবুও বৌ-দিদির মন পাইলাম না!—সদাই মুখ ভার করিয়া থাকেন, আমি দুটা খাই তাও যেন তাঁর গায় সয় না। ঈশ্বর! যদি সবই লইলে, পোড়া পেটটা কেন রাখিলে? দুপরে ও সন্ধ্যার পরে মেজদিদির কাছে গিয়া একটু পড়িতাম শুনিতাম, তাহাও বৌ-দিদির সহ্য হইল না। তিনি দাদাকে বলিলেন আমি রাত্রিদিন পাড়ায় পাড়ায় বেড়াই। দাদা আমার সহোদর, আমায় চিনেন, তবু বৌ-দিদির মান রাখিবার জন্য তাঁহাকে বলিলেন, আচ্ছা আমি বারণ করিয়া দিব।

দাদা গো! আমায় বারণ করিতে হইবে না, আমি আর তোমার বাড়ীর বাহির হইব না। সেই অবধি আমি আর মেজদিদির কাছেও যাইতাম না। মেজদিদি ও দাদা বাবু এক দিন না যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলাম, "সময় পাই না আর আমি না থাকিলে খুকী (দাদার একটী মেয়ে হইয়াছে) বৌ দিদিকে জ্বালাতন করে, তাঁর কষ্ট হয়।" তাঁহারা সব বুঝিতে পারিয়াছিলেন, বলিলেন "আচ্ছা"

বৌদিদি কোন কাজ কর্ম্ম করিতে পারেন না। তিনি তাঁর মায়ের ছোট মেয়ে, এজন্য কাজ কর্ম্ম করিতে দিয়া তাহা অভ্যাস করান উচিত মনে করেন নাই। এখানে বিধবা ননদ আছে—কোন চিন্তা নাই।

পাড়ায়, গ্রামে, কোন প্রতিবেশীর বাড়ীতে, কোন মাঙ্গলিক ক্রিয়ার সময় আমি উপস্থিত থাকি না—কি জানি, যদি এ অভাগিনীর উপস্থিতি কোন অমঙ্গল ডাকিয়া আনে! পোড়ার মুখ করিয়া, চুপটি করিয়া, বাড়ীতে বসিয়া থাকি। বাড়ীতে কেহ আসিলে একটু শুষ্ক আপ্যায়িত করি। কাহারো কষ্টের কথা শুনিলে, কাহারো ছেলে মরিয়াছে শুনিলে, কাহারো মেয়ে বিধবা হইয়াছে শুনিলে, মন দিয়া শুনি, বুঝিতে পারি, দুঃখ হয়, কিন্তু প্রকাশ করিয়া বলিয়া বড় একটা সমবেদনা জানাই না। কি জানি, যদি কেহ মনে করে 'এর বুঝি আপনার বৈধব্যে বড় দুঃখ হইয়াছে, বুঝি সুখী হইতে মনে বাসনা ছিল; ছিঃ, সে বড় লজ্জার কথা। আমি যে বিধবা, আমার আবার সুখ দুঃখ? ধিক্! হাসির কথা হইলে একটু হাসি, নহিলে বেয়াদবী হয়; কিন্তু আমার সে হাসি মেঘাবৃত চন্দ্র কিরণের মত—ক্ষীণ, ম্লান। সুখের কথা উঠিলে, আনন্দের কথা উঠিলে, উৎসব-সম্ভোগের কথা উঠিলে, প্রায়ই ছুতা নাতা করিয়া সেখান হইতে উঠিয়া যাই,—এ সকল প্রসঙ্গ যে সংক্রামক। এ সকল শুনিলে যে কত পূর্ব্ব স্মৃতি আবার মনে জাগিয়া উঠিতে চাহে, কত বিসর্জ্জিত আশা আবার যে মাথা ভাসাইয়া উঠিতে চাহে, কত কাল্পনিক সুখের কল্পনা আবার যে বিরক্ত করিতে আসিতে চাহে। আমাকে যে ইন্দ্রিয় জয় করিতে হইবে, আমি যে দুর্ব্বল, আমি যে কলিকালের সামান্যা, রক্ত মাংস গঠিতা, অন্নগতা-প্রাণা নারী। আমার কতটুকু বল? শত্রুর সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ করা আমার সাধ্য নহে, তাই পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করি। যদি কখনও বল সঞ্চয় করিতে পারি, তখন নির্ভয়ে শত্রু সম্মুখীন হইব। তাই এখন সুখের প্রসঙ্গ হইতে দূরে থাকিতে চাই। আমি "কিছুই না" "কেহই না" হইয়া থাকিতে চাই। পৃথিবীতে সুখ দুঃখ দুইই আছে জানি, কিন্তু আমি যে বিধবা,—আমার যে দুঃখ জীবনের সঙ্গী, দুঃখই যে আমার দুঃখের পরিণাম, দুঃখেই যে আমার সুখ, দুঃখেই যে আমার অধিকার। তাই সুখ দেখিলে, সুখের

কথা শুনিলে ভয় হয়, পালাইতে ইচ্ছা হয়। সুখ আছে জানি,--কিন্তু তার রাজ্যে আমার স্থান কোথায়?—আমি তার কে?

(২)

এক বেলা হবিষ্যান্ন আহার করি, হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম করি, স্বাস্থ্যের প্রতি যতদুর পারি অবহেলা করি, তবুও পোড়া শরীর যেন দিন দিন হাতীর মত হইতেছে, এ বালাই চুলের বোঝাও আর বহিতে পারি না। সে দিন কাঁচি লইয়া বসিলাম, ভাবিলাম বৌদিদির মাথায় একেতো চুল ছিলই না, তার উপর খুকী হওয়ার পর থেকে যে কয়টা ছিল তাহাও উঠিয়া গিয়াছে—চুল বাঁধিতে গিয়া কান্না পায়, ঐজন্য মেজদিদি বৌ-দিদির মাথায় হাতই দিতে চান না, বলেন "ঐ শিয়ালের ল্যাজ তুই পারিস্ বাঁধ, আমি ও পারবোনা।"—ভাবিলাম আমার চুলগুলা কাটিয়া তাঁর জন্য গুছি করিয়া দিব, এ ছাই চুল লইয়া আমি আর কি করিব? আমার মাথায় চড়িয়া বসিয়া থাকিয়া এরা কি করিবে? তার চেয়ে বরং সদ্ব্যবহার হউক। এই ভাবিয়া বসিয়াছি, পোঁচ লাগাইব বলিয়া এক গোছা ধরিয়া কাঁচির গালের ভিতর পুরিয়াছি, এমন সময় হঠাৎ কোথা হইতে দাদা আসিয়া উপস্থিত। দাদা দেখিয়া সবই বুঝিলেন। তিনি বারণ করিলেন, বলিলেন "আমার কথা শুন্‌বি না সরলা?" —আমার সাধ্য কি? আমার দাদা বলিলে আমি অম্লান-বদনে তুষানলে দগ্ধ হইতে পারি—আমার যে দাদা।—চুল কাটা হইল না।

কিন্তু বৌদিদি রাত্রিদিন আমায় অমন করেন কেন? আমি তাঁর কি করিয়াছি? সে দিন দুপর বেলা বৌদিদি খুকীকে লইয়া খাটের উপর ঘুমাইতেছেন, আমি নিচে শুইয়া "প্রভাস" খানা লইয়া একটু পড়িতেছি, পড়িতে পড়িতে বইখানা বুকে করিয়া একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছি, খুকী উঠিয়া গিয়া বাহিরে ক্রন্দনা করিতেছে। দাদা অপরাধের মধ্যে আসিয়া বৌদিদিকে বিনীত ভাবে বলিলেন, "নিজের ছেলে পুলেকে একটু নিজে দেখা ভাল," আর যাবে কোথায়? যত রাগ আমার উপর। অর্থাৎ আমার উচিত ছিল, না ঘুমানো, এবং যদিও বা দুর্ভাগ্যক্রমে ঘুম আসে, তবে কোন অনৈসর্গিক ক্ষমতা বলে ঠিক খুকীর ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে জাগ্রত হওয়া। তাহা যদি না পারিব তবে বিধবা হওয়াই বা কেন, আর যদি বা বিধবা হওয়া, তবে তাঁর সংসারে থাকিতে আসাই বা কেন?

আবার সেদিন কাদার মা আসিয়া কাঁদিয়া বলিল, তার কাদীর কাপড় নাই, লজ্জা নিবারণ হয় না, যদি একটু ছেঁড়া-কুটা কাপড় পায়, পরিয়া বাঁচে। আমি দুঃখ বুঝিতে পারি, আমার থান কাপড় দিলাই বা কি করিব? এইজন্য বৌদিদির একখানি জীর্ণ বস্ত্র তাঁর বিনা অনুমতিতে তাকে দিয়া ফেলিলাম। তাঁর অনুমতি লই নাই, অন্যায় করিয়াছিলাম, কিন্তু ক্ষমা কি নাই? তা না, বৌদিদি ঠেস্

দিয়া ঠেস্ দিয়া কত কথা না বলিলেন? তিনি বল্লেন "বেশতো, বেশতো, নিজের ভাইয়ের সংসার, বাপের সংসার, যাহা ইচ্ছা তাই করিবেই তো—ভাইয়ের আদুরে বোন, সুন্দরী বোন, আমি শালী ভাসিয়া আসিয়াছি"—ইত্যাদি ইত্যাদি। মাঝে মাঝে আমাকে সুন্দরী 'রূপসী' ইত্যাদি বলিয়া বিদ্রূপ করিয়া যেন তাঁর কি তৃপ্তি হইত। তাঁর ঐ কথা শুনিয়া মনে হইত এক দিন কড়ার তপ্ত তৈল দিয়া এ মুখ খানা পোড়াইয়া ফেলি, তাহ'লে আর বৌদিদির বিদ্রূপ বুঝি সহিতে হইবে না। ইহাতে মনে বড় দুঃখ হইল, কান্না আসিল, বৌদিদির পা দুই খানি ধরিয়া বলিলাম—"বৌদিদি! কখনও দুঃখ পাও নাই, তাই বুঝি অন্যের দুঃখ বুঝিতে পার না? আমি যে বড় দুঃখিনী, আমায় আশ্রয় দিলে তোমার পুণ্য হইবে, আমি হতভাগিনী, চিরদুঃখিনী, পথের কাঙ্গালিনী, ভিখারিনী। আমি তোমার ছোট, আমায় তুমি ক্ষমা কর, তুমি আমায় যা বলিবে আমি তাই করিব, আমার প্রতি আর মুখ ভার করিও না, আমার বড় কান্না আসে—আমার যে আর কেহ নাই বৌদিদি—"। বৌদিদি আমার কথা শুনিলেন না, "থাক্—মায়া কান্নায় আর কাজ নাই"—বলিয়া উঠিয়া গেলেন।

আমিতো জানি না, কিন্তু আমার বোধ হয়, যাঁরা সুখী, তাঁদের সুখের মাঝখানে দুঃখের চিন্তাও বুঝি স্থান পায় না, দুঃখীর দুঃখ তাঁদের বুঝিবারও বুঝি অবকাশ নাই, দুঃখীর কাতর ক্রন্দন শুনিলে বোধ হয় তাঁহাদের বিরক্তি বোধ হয়, রাগ হয়।

বৌদিদি রাত্রিদিন খিট্ খিট্ করেন, এ কথা আমি দাদা বা মেজদিদিকে কখনও বলি নাই—বলিতে ইচ্ছাও করি নাই, বুঝিবা বলিতে সাহস ও হয় নাই। আজ কাল মেজদিদি বড় একটা আমাদের বাড়ীতে আসেন না। দাদাবাবু তো আসেনই না—যদি বা আসেন, তা বাহিরে ডিস্পেন্সরিতেই বসেন, বাড়ীর ভিতরে আসেন না। আমি যখন যে পুস্তক চাহিয়া পাঠাই, তিনি তাহা পাঠাইয়া দেন। দাদাতো সর্ব্বদাই রোগী দেখিয়া বেড়ান।

৩

সংসারের কায কর্ম্ম তো করি, মেজ দিদির লাইব্রেরী হইতে পুস্তকাদি আনিয়া যখন সময় পাই পড়ি, ইংরাজি পড়া ছাড়িয়াছি, ইংরাজি পড়িয়া আর কি হইবে? ও সব এখন ভুলিয়া যাওয়াই মঙ্গল। বাংলাই পড়ি, রাত্রিতে সকলে ঘুমাইলে আপনার ঘরে শুইয়া শুইয়া পড়ি। আদুরী আমার ঘরে শোয়, শুইতে না শুইতেই তার নাসিকা গর্জ্জন আরম্ভ হয়, আমার শীঘ্র ঘুম আসে না,—আমি পড়ি।

এক দিন মেজদিদির আল্মারি খুঁজিতে খুঁজিতে এক খানি পুস্তক পাইলাম—"বিধবা-বিবাহ!" ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত। কি সর্ব্বনাশ! বি—ধ—বা—র বি—বা—হ? এ পুস্তক পড়িবার জন্য

যত উৎকণ্ঠা হইল, তত উৎকণ্ঠা বোধ আর কখনও আমার হয় নাই। কিন্তু আশঙ্কা—দাদা বা মেজদিদি পাছে জানিতে পারেন। শেষে উৎকণ্ঠা ও আগ্রহ ভয়কে দূরে নিক্ষেপ করিল। বইখানি লুকাইয়া আনিয়া বিছানার নীচে লুকাইয়া রাখিলাম। পূর্ণ এক সপ্তাহে তাহাকে সমাপ্ত করিলাম। চক্ষু ফুটিল। কি রকম ফুটিল? বলিব না—

আজ চারি দিবস মেজদিদির বাড়ীতেই আছি। আমার সত্য সত্যই বিবাহ। দাদা এবং মেজদিদি অনেক বুঝাইলেন, আমি পড়িয়াছি তাহা না জানায় আমায় আবার "বিধবা-বিবাহ" পড়াইলেন, দত্ত মহাশয় লেক্‌চার দিয়া তাহা ব্যাখ্যা করিয়া আমায় সব বুঝাইলেন—তথাপি আমি রাজি হইলাম না। আমি বেশ বুঝিয়াছিলাম, মেজদিদির বিবাহে আন্তরিক মত ছিল না, কিন্তু দাদা ও দাদাবাবুর মনক্ষুণ্ণ করিবার ভয়েই তিনি আমাকে প্ররোচিত করিতেছেন। দাদাবাবু সমাজ-সৃষ্টি, সমাজরক্ষা এবং শাস্ত্র এ সকলের সম্বন্ধ আমায় বিশদরূপে বুঝাইলেন—তথাপি আমি রাজি নহি। তখন দাদা কাঁদিয়া বলিয়া ফেলিলেন তিনি হয় আত্মঘাতী হইবেন নয়তো সংসার ছাড়িয়া যাইবেন। আমি—কি জানি কেন—"মৌনং সম্মতি-লক্ষণং" প্রকাশ করিয়া ফেলিলাম। তখন বিবাহের আয়োজন চলিতে লাগিল। শুনিলাম আমাদের গ্রামের ও সমাজের প্রত্যেক শিক্ষিত যুবক বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন, দাদাকে সমাজে রাখিবেন। দাদাকে সকলেই ভাল বাসেন; ব্রাহ্মণের মধ্যে প্রত্যেক যুবক তো দাদার পক্ষে আছেনই,—উপরন্তু অনেক বয়স্ক ব্রাহ্মণ-কায়স্থও ইহাতে সম্মতি দিয়াছেন। অপরাপর লোকেদের এঁরা 'কেয়ার' করিবেন না। বুঝিলাম দাদা এতদূর করিয়া তুলিয়া তবে আমায় জানিতে দিয়াছেন, তাই সেদিন আমার চুল কাটিতে দেন নাই। বৌদিদির আমার প্রতি ব্যবহার এঁরা জানিতেন, তথাপি সব চুপ চাপ ছিলেন, সব দিক বাঁধিয়া লইয়া এখন আমার মত জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

একটা কথা মনে পড়িল। যখন বাবার মৃত্যু হয়, তাহার মাস দুই পরে কে এক জন কতকগুলা নিমন্ত্রণ পত্র ছাপাইয়া গ্রাম-ময় বিলি করিয়াছিল "প্রফুল্লর বিধবা মায়ের বিয়ে" অর্থাৎ দাদা প্রথমে সেই যে আমার বিবাহের প্রস্তাব করিয়া বাবার কাছে বকুনি খান, তারই উপর বিদ্রূপ। দাদা তখন কলিকাতায় গিয়াছিলেন। দাদা বাবু তাড়াতাড়ি সমস্ত পত্রগুলি সংগ্রহ করিয়া পোড়াইয়া ফেলিয়াছিলেন এবং গ্রামের প্রত্যেককে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন যে "প্রফুল্ল বাড়ী আসিয়া এর নাম ও না শুনিতে পায়, তাহা হইলে কোন নিরপরাধ প্রাণ হারাইবে, কারণ তাহার যারই উপর সন্দেহ হইবে, তাকেই সে হত্যা করিবে—তা তিনি যত বড়ই আমীর লোক হোটন।

সে কাপুরুষ নহে—ফাঁসির ভয় রাখে না।” এই করিয়া রাখিয়া তারপর একদিন তিনি বন্ধু বান্ধবদের কাছে বলিলেন আমি বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দিতে পারি যে যে এই বিদ্রূপ করিতে পারিয়াছে, সে নিশ্চয়ই Bastard (বেজাত্মক) কথনই সুজাতক নহে—সুজন্মার কথনও এমন মতি গতি, এমন একটা বিদ্রূপ মনে আসিতেই পারে না।” অনেক অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, এ আমাদের গ্রামের নায়েব মহাশয়ের কাজ। দাদা বাবুর কি আশ্চর্য্য বুদ্ধি! বাস্তবিকই নায়েব মহাশয়ের মাতার কলঙ্ক থাকায় তিনি তাঁদের সমাজে একঘরে ছিলেন, অনেক দিন তাঁর বিবাহ হয় নাই, শেষে অনেক টাকা খরচ করিয়া জাতে উঠেন (টাকায় সব হয়)। তারপর বিবাহ হয় দাদা বাবু এ সমস্ত সন্ধানে জানিতে পারেন। তিনি দাদাকে এ সব কিছু জানিতে দেন নাই, তাহা হইলে ব্রহ্মহত্যা হইত—নায়েব মহাশয় ব্রাহ্মণ। আমি মেজদিদির চাকরানী হিমীর কাছে এসব শুনিয়াছিলাম।

৪

আমার কথা বলিব?—অবশ্য বলিব, হৃদয়ের কপাট তো খুলিয়াছি, কেন না বলিব? শুনিয়াছি নিজের পাপের কথা লোক সমক্ষে ব্যক্ত করিলে পাপ ক্ষয় হয়,—তাহাই হউক তাই আজ আমার জীবন কাহিনী লিখিয়া যাইতেছি।—নহিলে কি আবশ্যক?

মেজদিদির বাড়ীতে আসা অবধি আমার বাহ্যিক ও আন্তরিক সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে।—সম্পূর্ণ ভাবান্তর হইয়াছে। অন্তরের ভাবের কথা কেহ বুঝিবে না। সে অবস্থায় আমাদের সমাজের কাহাকেও বুঝি আজিও পড়িতে হয় নাই লোকে কেমন করিয়া বুঝিবে? সে ভাবের মধ্যে নাই কি? এমন কি দুঃখও যেন একটু রূপান্তরিত হইয়া আছে;—আর আছে, আশা, আহ্লাদ, সুখ-কল্পনা, সুখ-স্পৃহা, আছে একটু ভয়, একটু ত্রাস, একটু সঙ্কোচ; আরও আছে খানিকটা কি হবে কি হবে ভাব, কি হলো কি হলো ভাব, একটু না হলেও বুঝি ছিল ভাল ভাব; আর আছে সর্ব্বোপরি, সর্ব্বব্যাপী, তীব্র লজ্জা। এই ভাবগুলির মধ্যে যেন অনবরত লড়াই চলিয়াছে,—কে উপরে উঠিবে, এ লড়াইয়ের কারণ কি, বুঝিতে চেষ্টা করিলাম—বুঝি সংস্কার। মনের উপর সংস্কারের যত প্রভুত্ব, এত আর কাহার?

লজ্জা করিব না, সব বলিব—পাপ ক্ষয় হউক। আমি এখন সর্ব্বদা বেশ সাজ সজ্জা করিয়াই থাকি, মেজদিদি সর্ব্বদা আমায় ফিটফাট রাখিতে ব্যস্ত, কিন্তু একটী বারও বাড়ীর বাহির হইতে দেন না, বাড়ীতে কেহ আসিলে আমায় লুকাইয়া রাখেন, কাহারও সহিত সাক্ষাৎ একেবারে নিষেধ। সকাল সন্ধ্যা খিড়কীর বাগানে পুকুর পাড়ে গিয়া একটু বসি,

বাড়ীতে বসিয়া এটা ওটা পড়ি, আর মাঝে মাঝে (এখন মনে হইলে গা শিহরিয়া উঠে, ঘৃণায় আত্মঘাতিনী হইতে ইচ্ছা হয়,) দর্পনের সম্মুখে যাইয়া আপনার রূপ দেখিয়া অহঙ্কারে ফাটিয়া যাই। কত রকম অঙ্গ-ভঙ্গি করি, কত কায়দায় অঙ্গ সঞ্চালন করিয়া রূপের সাগরে ঢেউ তুলি, —বৃহৎ দর্পণে তাহা প্রতিবিম্বিত হয়, আমি তাহা দেখি, আর গা উল্‌সে ওঠে।

যাঁর সঙ্গে বিবাহ হইবে (রামঃ রামঃ) তাঁকেও দেখিয়াছি—দাদাবাবুর কাছে আসিয়াছিলেন। প্রায় দাদার বয়সী, পরম-সুন্দর-দেহকান্তি, অল্পদিন হইল স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে এবং একটী শিশু পুত্র আছে। মন্দের ভাল, তখন আমার আহ্লাদ কত !! তিন দিন পরে বিবাহ—— আমায় পায় কে !!

তখন বৈশাখের প্রারম্ভ। সেই দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে আবার গিয়া পুকুর পাড়ে বসিলাম, সন্ধ্যার ফিরফিরে বাতাস মাঝে মাঝে গায় লাগিয়া প্রাণে যেন মদিরা ঢালিতে লাগিল। সেই সময়ে মনের সেই অবস্থায়, সেই নিদাঘের সান্ধ্য-সমীরণ, আমার মত মানুষের কি সর্ব্বনাশ না করিতে পারে? মন যেন সেই বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া, নেশার ঘোরে, সেই বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে উড়িতে লাগিল। পাঁচীলের ধারের গুপারি গাছের পাতাগুলি সাঁই সাঁই, সর্ সর্ করিয়া হাত পা নাচাইয়া, আমায় যেন কত সুখের কথা বলিতে লাগিল। রজনী-গন্ধা ফুলগুলি দল বাঁধিয়া, লম্বা শীষের উপর চড়িয়া, দুলিয়া দুলিয়া, ঘাড় নাড়িয়া নাড়িয়া, হাসিয়া হাসিয়া, আমায় যেন কত সুখের খেলাই দেখাইতে লাগিল; চোখের সাম্‌নে পুষ্করিণীর কালো জল, বাতাসের সঙ্গে গলাগলি করিয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ তুলিয়া, আমার হৃদয় সরোবরে যেন কত সুখের তরঙ্গই উঠাইল। একটা কোকিল মেজদিদির বকুল গাছে বসিয়া রোজই ডাকিত, এতদিন তাহা কানেই উঠিত না ছোট বেলা তাকে অনেক ভেঙচাইয়াছি, আজও সে সেই ডালটিতে বসিয়া তেমনি একঘেয়ে চীৎকার করিতেছে, কিন্তু আজ যেন সে কোথায় কি শিখিয়া আসিয়াছে। আজ যেন আমার প্রাণের বাঁশীর সহিত সে গলার সুর বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। আজ যেন তাহার প্রতি ঝঙ্কারে আমার তৃষিত মরমের গালে সহস্র সোহাগ-চুম্বন বাজিয়া উঠিতেছে! পৃথিবী সুখময়, সুখেরই জন্য —কে বলে হেথায় দুঃখ আছে? মিথ্যা কথা —নহিলে এ সব কি? আমি কি?—সুখ, সুখের জন্যই আমি, (আত্মবিস্মৃত হইয়া) ভাবে বিভোরা হইলাম—সবই সুখ, দুঃখও! সুখ, সুখও সুখ, সবই সুখ—কেবলই সুখ !!—

——বটে ? –চমক্ ভাঙ্গিল! পেছন দিক হইতে, আমার সুখের ছবি ফুঁড়িয়া চাপা হাসির ঝিলিক্ যেন কানে গেল। গায়ে ডোল্ দিয়া উঠিল, সর্ব্ব শরীর ভারহইয়া উঠিল, গায়ের রক্ত যেন জল হইয়া গেল—যেটুকু বাকি রহিল তাহা যেন সব গিয়া মুখে উঠিল, কান

ফাটিয়া কান দিয়া বাহির হইতে চাহিল। খুবই ভয়ে ভয়ে পেছন দিকে চাহিলাম। চক্ষে সরিষার ফুল দেখিতে লাগিলাম; আর তা'র মধ্য দিয়া দেখিলাম,—স্বপ্নের মত দেখিলাম—গুটচা'র পাঁচ যুবতী স্ত্রী-লোক. সব কয়টিই আমাদের পাড়ার—আমার সহিত চখো চখি হইতেই হুট্‌পাট্‌ করিয়া মেজদিদির বাটীর মধ্যে ঢুকিল; সঙ্গে বাল-বিধবা খুদী-ঠান্‌দিদি।

মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, দর দর করিয়া ঘাম ছুটিতে লাগিল; ত্রিভুবন আঁধার। মাথা আর উঁচু করিয়া রাখিতে পারিলাম না, দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিলাম, যেন সংজ্ঞা লোপ পাইতে চাহিল। কিছুক্ষণ নিজের অবস্থা ঠাওর করিতেই পারিলাম না;—কোথায় আমি? কে আমি? কি আমি? ব্যাপার কি?—

—গুরুতর! আপনার নাম ধরিয়া আপনি ডাকিলাম—"সরলা! কোথায় এখন তোমার সুখ-বাসরের সম্ভোগ-শয্যা? কোথায় তোমার সুখ-স্বপনের রঙ্গ-রাজ্য? কোথায় তোমার বিলাস-কল্পনার নন্দন-কাননের স্বপ্ন-পারিজাত? বড় সুখের সাধ; —কেমন? কালামুখী! তোমার শাস্ত্রের বিচার, ন্যায়ের বিচার, সমাজ তত্ত্বগুলি এইবার একবার সামনে আনিয়া দেখাও দেখি? বড় পণ্ডিত হইয়াছ,—বড় সুখ চিনিয়াছ,—এখন?"—এখন আর কি?

।, অন্ধকার প্রায় ঘনাইয়া আসিয়াছে, কাল জলের উপর কাল ছায়া পড়িয়া আরও কাল হইয়াছে,—তারই দিকে—ধীরে—দৃঢ়পদে—অগ্রসর হইলাম। কিন্তু পায়ের কফি-পাতা খুনর দেওয়া মলের শব্দে মন চমকিল, থমকিয়া দাঁড়াইলাম। এসব খুলিয়া, কাপড়ের পাড় ছিঁড়িয়া, তাই দিয়া বাঁধিয়া আগে জলে নিক্ষেপ করিব, তারপর——। আজ বিকালে বড় ভাবনা করিয়া আল্‌বার্ট-ফ্যাসান কাটিয়া চুল বাঁধিয়াছি, সর্ব্বাঙ্গে গহনা পরিয়াছি, গোলাপী সিল্কের সেমিজের উপর কাল পাছাপেড়ে ফিন্‌ফিনে ঢাকাই কোঁচাইয়া পরিয়াছি, দশ মিনিট ধরিয়া টার্কিশ্‌ তোয়ালে দিয়া মুখ ঘসিয়াছি;—আসিবার সময় মেজ-দিদির ঘরের বড় আয়নার সম্মুখে গিয়া একবার আপাদমস্তক আপনার রূপ দেখিয়া আপনি মজিয়া আসিয়াছি; আপনার গায়ে আপনি হাত বুলাইয়া, মনে মনে কত কি—কত কি ভাবিয়া, গা দোলাইতে দোলাইতে, বাগানে আসিয়া বসিয়াছি। এর প্রায়শ্চিত্ত তুষানল, এমন গ্রীষ্মের দিনে, অমন শীতল কাল জলের মধ্যে, আরাম করিয়া মরিলে আর কি হইল? কিন্তু উপস্থিত সুযোগের লোভ অসম্বরণীয়, কপালের কাঁচ-পোকার টিপটী খুঁটিয়া ফেলিয়া দিয়া, হাতের সোণার চুড়া খুলিব বলিয়া টানিয়াছি—

—পেছন হইতে মেজদিদির গলার শব্দ হইল"সরলা"! দেখিতে দেখিতে তিনি একেবারে কাছে আসিয়া পড়িলেন। বড় রাগ হইল, সঙ্গে সঙ্গে—কি জানি

কেন—মনের দৃঢ়তাও যেন একটু কমিল, যেন কেমন হইয়া গেলাম, মেজদিদি বলিলেন "অন্ধকার হ'য়ে আসচে, এখনো জলের ধারে দাঁড়িয়ে কি ক'রছিস্—চল্ বাড়ী চল্"। কেমন বোকার মত বলিলাম "চল যাচ্ছি।" চলিলাম বাড়ী আসিলাম, কিছুই হইল না, কি করিলাম? —কি হইল?—কিছুই যে হইল না! এখন তবে উপায়?

ঘরে আসিয়া মেঝেয় বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিলাম, এক প্রকার স্থির করিলাম, গহনা কাপড় কিছুই খুলিলাম না, সবই যেমন তেমনি রহিল।

হিমীকে আস্তে আস্তে ডাকিলাম, ঘরের দরজা বন্ধ করিলাম। মেজদিদি গৃহ-কর্ম্মে ব্যস্ত ছিলেন, দাদাবাবু বাহিরে ছিলেন। হিমীর হাত ধরিলাম, কাঁদিয়া বলিলাম "হিমী! আমার মা নাই, তুই আমার মা, আজ আমার একটী উপকার করিতে হইবে,—আজীবন তোর কাছে ঋণী থাকিব, তোর পুণ্য হইবে।" আড়ম্বর দেখিয়া হিমী অবাক হইয়া আমার পানে চাহিয়া রহিল, তাকে আদ্যোপান্ত সব বুঝাইয়া বলিলাম। সে বুঝিল, আমার কথা তার ভাল লাগিল। সে গোয়ালার মেয়ে, নিজে বিধবা, কিন্তু "বিধবা-বিবাহ" পড়ে নাই, বা দাদাবাবুর লেক্‌চারের মর্ম্মও বুঝে নাই। তার চৌদ্দ পুরুষ যাহা বুঝিয়া আসিয়াছে, সেও তাহাই বুঝিয়াছিল। আমার "বিবাহের" কথা শুনিয়া অবধি তার আক্কেল লোপ পাইয়াছিল,—তাই সে আজ আমার অবস্থা বুঝিল, আমার কথা তার ভাল লাগিল ও শেষে বলিল "এখন কি করিতে বল?" আমি বলিলাম "আজ রাত্রিতে লুকাইয়া বারটার মেলে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে, আমাকে শ্বশুরবাড়ী রাখিয়া তুই ফিরিয়া আসবি। তারপর আমি বুঝিব।"

সে বলিল "তারপর আমার দশা?" আমি বলিলাম "আমি তোর হাতে পত্র দিব,—তোর কোন ভয় নাই, কেহ কিছু বলিবেন না।" এ ছাড়া তাহাকে উপহার দিবার প্রস্তাবও করিলাম, তাহাতে সে জিব কাটিল। হিমী কিছুক্ষণ আপন মনে ভাবিয়া শেষে রাজি হইল। বাঁচিলাম, নির্ভাবনা হইলাম।

আহারান্তে আমার নির্দ্দিষ্ট ঘরে গিয়া শয়ন করিলাম, হিমী আমার ঘরেই শুইত। বাড়ীর সকলে নিদ্রিত হইলে দুজনে নিঃশব্দে বাড়ীর খিড়কির দরজা খুলিয়া বাগানে আসিয়া পড়িলাম। ইতোমধ্যেই গাত্রের সমস্ত খুলিয়া তোরঙ্গে রাখিয়া, আমার পুরাতন পান কাপড় এক খানি বাহির করিয়া পরিধান করিয়াছি, বিছানার মোটা চাদর গায়ে দিয়া লইয়াছি, চুল খুলিয়া পূর্ব্বের মত করিয়াছি, পায়ের আলতা সাবান দিয়া উত্তম করিয়া ধুইয়া ফেলিয়াছি। অবশিষ্ট কএক খানি পান কাপড় এবং দশটী মাত্র টাকা বাহির করিয়া সঙ্গে লইয়াছি।

অতি কষ্টে বাগানের ফটক খুলিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িলাম, তখন একটু

একটু জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। হিমী ঝম্মু মেয়ে মানুষ, অনেক বার কত লোকের তত্ত্ব লইয়া কত জায়গায় রেলপথে যাওয়া আসা করিয়াছে, তথাপি সেই গভীর রাত্রিতে তার সঙ্গে যাইতে ভয় করিতে লাগিল, অনাথের নাথকে স্মরণ করিয়া চলিলাম। বাড়ী হইতে ষ্টেসন এক মাইল মাত্র।

যথাসময়ে, নিরাপদে, পরদিন প্রাতে আসিয়া শ্বশুর বাড়ী যাইবার ষ্টেসনে পৌঁছিলাম, তথা হইতে ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া শ্বশুরালয়ে রওনা হইলাম।

(ক্রমশঃ)

সেখ-ফরিদ্

সেখ-ফরিদ একজন বিখ্যাত মুসলমান পীর। তিনি সুফি সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এবং লাহোরের অনতিদূরে বাস করিতেন। তাঁহার পন্থাবলম্বী ফকিরদিগকে সেখ্ ফরিদী ফকির কহে। তিনি নানকের সমসাময়িক ছিলেন; গুরু নানকের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল এবং উভয়ের মধ্যে যে সকল ধর্ম্মালোচনা হইয়াছিল তাহার অনেক অংশ নানক-পন্থী-ধর্ম্মশাস্ত্র গ্রন্থ-সাহেবের মধ্যে এবং গুরু নানকের জীবনচরিত জন্মসাক্ষী পুস্তকের মধ্যে সন্নিবেশিত আছে।

সেখ-ফরিদের মাতা অতিশয় ধর্ম্মানুরাগিণী নারী ছিলেন। মাতার গুণে যে অনেক পুত্রের ভবিষ্যৎ জীবন গঠিত হয়, তাহার এই এক দৃষ্টান্ত। সেখ ফরিদের মাতা পুত্রকে বলিলেন, "বৎস! ফরিদ, সংসার করিয়া কি লাভ হইবে? তুমি সন্ন্যাসী হইয়া ভগবদ্-ভজন কর, ভগবানকে লাভ করিতে চেষ্টা কর; তাহা হইলে তুমি নিত্য সুখের অধিকারী হইবে। অনিত্য সুখের অভিলাষী তুমি হইও না। নির্জ্জন স্থানে গমন করিয়া তুমি সাধন ভজনে রত হও, কাহারও নিকট প্রার্থী হইও না।" সেখ-ফরিদ মাতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া সংসার পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বনে গমন করিলেন। সেখানে বন্য ফল, বৃক্ষের পত্র, মূল প্রভৃতি ভোজন করিয়া ভগবৎ-চিন্তায় রত থাকিতেন। কয়েক বৎসর এইরূপ সাধন-ভজনের পর একবার মাতৃ চরণ দর্শনের অভিলাষে গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। মাতার দর্শন পাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। মাতা আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করি-লেন "বৎস, কি আহার করিয়া এতদিন কাটাইলে?" ফরিদ বলিলেন, "বৃক্ষের পত্র, ফল এই সকল লইয়া আহার করিতাম"। মাতা কিছু না বলিয়া পুত্রের গাত্রে হাত বুলাইলেন এবং তৎপরে তাঁহার মস্তকের কেশ ধরিয়া সজোরে

টানিলেন। ফরিদ তাহাতে অত্যন্ত ব্যথা পাইয়া মাতাকে বলিলেন, "মস্তকে অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছে, আপনি এরূপ করিলেন কেন?" মাতা বলিলেন "বৎস, তুমি বৃক্ষের পত্র, ফল ছিঁড়িয়া খাইয়াছ; তোমার কেশ উৎপাটিত হয় নাই, তাহাতেই তুমি কত কষ্ট পাইলে, মনে কর বৃক্ষদের কত কষ্ট হইয়াছে। তুমি এখনও নির্ভরের ভাব শিখিতে পার নাই। পুনরায় তুমি বনে গিয়া সাধন-ভজনে প্রবৃত্ত হও।"

ফরিদ পুনরায় বনে গমন করিলেন এবং ভাবিলেন "কাহারো নিকট প্রার্থনা করাও নিষেধ এবং বৃক্ষদিগকে কষ্ট দেওয়াও নিষেধ। সুতরাং এক খণ্ড কাঠের টুকরা লইয়া রুটীর আকার করিয়া লইলেন এবং আপনার উদরের উপর তাহা রাখিয়া বায়ু সেবন করিয়া সাধন-ভজন করিতে লাগিলেন। অনন্তর, বহুকাল এইরূপে অতিবাহিত হইলে, পুনরায় তাঁহার মাতৃ-চরণ দর্শনের অভিলাষ হইল। তিনি পুনরায় মাতার নিকট উপস্থিত হইলেন। মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, কি আহার করিয়া এতদিন কাটাইলে?" তিনি বলিলেন, "একখণ্ড কাষ্ঠ উদরে বাধিয়া রাখিয়াছি, অপর কিছু আহার করি না।" মাতা বলিলেন, "ইহাকে যথার্থ নির্ভর বলে না; তোমার এখনও সাবলম্বন-ভাব যায় নাই। একেবারে ভগবানের হস্তে নিজকে অর্পণ করিতে না পারিলে তাঁহাকে লাভ করিতে পারা যায় না। তুমি পুনরায় গিয়া সাধন ভজন কর।" ফরিদ পুনরায় অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। ভাবিলেন 'সম্পূর্ণ নির্ভরের ভাব না আসিলেত কিছুই হইবে না।' অনন্তর একখণ্ড শিকলের এক প্রান্তে আপনাকে বাঁধিয়া তাহার অপর প্রান্তে একখানি কাষ্ঠ-খণ্ড সংলগ্ন করিয়া আপনাকে একটী কূপ মধ্যে ঝুলাইলেন এবং অধোমুখে নত হইয়া ভগবানকে প্রাণ মন সমর্পণ করিলেন। কিছুদিন এইরূপে অতিবাহিত হইলে এক মেষ-পালক জলপানের অভিলাষে কূপের নিকট উপস্থিত হইলেন। জল সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত কূপের নিকট গিয়া ফরিদকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি এরূপ ভাবে আপনাকে কূপ-মধ্যে ঝুলাইয়া রাখিয়াছ কেন?" ফরিদ বলিলেন, "ভগবানকে লাভ করিবার জন্য।" মেষ-পালক জিজ্ঞাসা করিল, "এইরূপ করিলে ভগবানকে পাওয়া যায়?" ফরিদ উত্তর করিলেন, "হাঁ—পাওয়া যায়।" মেষপালক তাহা শুনিয়া মেষ সকলকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কিছু তৃণ সংগ্রহ করিয়া তাহার দ্বারা একখণ্ড দড়ি পাকাইলেন এবং সেই দড়িতে নিজেকে বাধিয়া সেই কূপ-মধ্যে ঝুলাইলেন এবং পাছে সাধুর উপরে থাকিলে তাঁহাকে অপমান করা হয়, এই ভাবিয়া ফরিদ অপেক্ষা আরও নিম্নভাগে ঝুলিয়া রহিলেন। তাঁহারা উভয়ে এইরূপ ভাবে ঝুলিতে লাগিলেন। এদিকে তাঁহাদের উভয়ের অবস্থা দেখিয়া

ভগবান ভাবিলেন, "ফরিদের ত লোহার শিকল রহিয়াছে, শীঘ্র ছিঁড়িবেনা, কিন্তু এই মেষ-পালকের দড়ি এখনই ছিঁড়িয়া যাইবে এবং আমার আশায় সাধন করিতে গিয়া এখনই পতিত হইয়া নষ্ট হইবে। সুতরাং আর বিলম্ব করা হয় না, ইহাদিগকে কৃপা বিতরণ করি। ভগবান কৃপা করিলেন, ফরিদ ও মেষ-পালককে দর্শন দিলেন। মেষ-পালক দর্শন পাইয়া কৃতার্থ হইল, কিন্তু ফরিদের বিশ্বাস হইল না। ফরিদ বলিলেন, "আমি কিরূপে জানিব যে আপনি ভগবান।" ভগবান বলিলেন, "সন্দেহ হইয়া থাকে ত আমাকে পরীক্ষা কর।" ফরিদ বলিলেন, "এই যে পক্ষীটী কূপের প্রান্তে বসিয়া রহিয়াছে, ইহা যদি এখনি মরিয়া যায় তবে জানিব আপনি ভগবান।" পাখীটী মরিয়া গেল। ফরিদ বলিলেন, "আবার যদি ইহাকে জীবিত করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি বিশ্বাস করিতে পারি।" পক্ষীটা পুনরায় জীবিত হইল। ফরিদের তখন বিশ্বাস জন্মিল। ভগবান তখন ফরিদ ও মেষ-পালককে কৃপা করিলেন। কিন্তু ফরিদকে যে অবস্থা দিলেন, মেষ-পালককে তাহা অপেক্ষা অনেক উচ্চতর অবস্থা প্রদান করিলেন এবং উভয়কে কূপ হইতে উত্তোলন করাইলেন। মেষ-পালক ভগবদ্-দর্শনে আত্মহারা হইয়া সমাধি-অবস্থায় অরণ্যে রহিলেন, কিন্তু সেখ ফরিদ ভগবচ্ছক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া ভগবন্নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে দেশ-ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

ফরিদ তপস্যা-বলে শক্তিমান হইয়া নানা-দেশ ভ্রমণ করিলেন। এক দিবস তিনি পিপাসার্ত্ত হইয়া একটী কূপের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন যে একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক সেই কূপ হইতে জল উত্তোলন করিতেছেন ও পুনরায় তাহা কূপ-প্রান্তে নিক্ষেপ করিতেছেন। তিনি সেই স্ত্রীলোকের নিকট জল প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু স্ত্রীলোকটী তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া পূর্ব্ববৎ জল উত্তোলন ও নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ফরিদ একবার বলিলেন, দুইবার বলিলেন, তিনবার বলিলেন, কিন্তু স্ত্রীলোকটী তাঁহার কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। অবশেষে ফরিদ রুষ্ট হইয়া স্ত্রীলোকটীকে বলিলেন, "জান, আমি তোমাকে এখনই শাপ দিয়া মারিয়া ফেলিতে পারি?" তখন স্ত্রীলোকটী বলিলেন, "যাও যাও, একটী পাখী পাও নাই যে, ভগবানকে বলিয়া মারিয়া ফেলিবে।" ফরিদ চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এ বিষয় কেমন করিয়া জানিলে? তুমি কে? কেনই বা এরূপ ভাবে জল উত্তোলন করিয়া নিক্ষেপ করিতেছ?" স্ত্রীলোকটী বলিলেন, "আমার ভগীর গৃহে আগুন লাগিয়াছে, সে আমায় স্মরণ করায় আমি এখান হইতে জল দিয়া সে অগ্নি নির্ব্বাণ করিলাম।" ফরিদ সবিস্ময়ে বলিলেন,

"এখান হইতে আপনি অপর দেশের অগ্নি নির্ব্বাণ করিলেন, এত শক্তি আপনার !! আমার পাখী মারিয়া ভগবানকে পরীক্ষা করার বিষয়ই বা আপনি কি শক্তিতে জানিলেন ? এ শক্তি আপনি কি-প্রকারে লাভ করিলেন ?"

স্ত্রীলোক উত্তর করিলেন, "কিরূপে যে আমি এই শক্তি পাইলাম, তাহা আমিও জানি না; সকলই ভগবানের কৃপা। তবে এইমাত্র আমি আপনাকে বলিতেছি যে, আমার স্বামী রাত্রিতে শয়নকালে দুগ্ধ পান করিতেন এবং আমি প্রতিদিন দুগ্ধ-পাত্র লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতাম। এক দিবস আমি দুগ্ধ লইয়া গিয়া দেখিলাম আমার স্বামী নিদ্রিত হইয়াছেন। তাঁহার সেই সুখের নিদ্রা ভঙ্গ করিতে আমার ইচ্ছা হইল না। নীরবে তাঁহার শয্যা-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিয়া রহিলাম, নিদ্রা-ভঙ্গ হইলেই দুগ্ধ পান করাইব। আমি দাঁড়াইয়া আছি, কিন্তু তাঁহার নিদ্রা-ভঙ্গ হইল না, এইরূপে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল। অনন্তর রাত্রি-শেষে যখন পক্ষিগণ ভগবানের নাম গান করিতে লাগিল, তখন আমার স্বামীর নিদ্রা-ভঙ্গ হইল; তিনি জাগিয়াই আমার দিকে প্রফুল্ল দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিলেন, "রাম কহ, রাম কহ।" আমি যে সমস্ত রাত্রি স্বামীর চিন্তায় রত ছিলাম, তাঁহাকে দেবতা-জ্ঞানে তাঁহারই সেবাভিলাষিণী হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলাম, সেই তপস্যা-গুণে শুদ্ধ চিত্ত লাভ করার পর, যখন আমার স্বামী বলিলেন, "রাম কহ, রাম কহ," অমনি আমি চারিদিক রামময় দেখিলাম, আমার অন্তরে বাহিরে তখন ভগবান পূর্ণরূপে বিরাজমান হইয়া আমাকে দর্শন দিলেন। সেই হইতে আমি এই শক্তি লাভ করিয়াছি।"

ফরিদ সেই সাধ্বী এবং ভগবৎ-কৃপা-প্রাপ্তা রমণীর কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া রহিলেন; তাঁহার অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া গেল। তিনি তাঁহাকে বার বার প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। সেই স্ত্রীলোকটী বলিলেন, "ফরিদ, তুমি অতি সাধু পুরুষ, ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিয়া বেড়াও, তাঁহারই মহিমা প্রচার কর। তোমার কোন অপরাধ হয় নাই।"

এক সময়ে গুরু নানকের সহিত সেখ ফরিদের সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। সেখ ফরিদ তখন আশা-দেশের এক জঙ্গলে তপস্যা করিতেন। গুরু নানক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার করিবার অভিপ্রায়ে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। সেখ ফরিদ গুরু-নানককে দেখিবা-মাত্র সসম্ভ্রমে উঠিয়া অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "আল্লা, আল্লা, হে দরবেশ!" নানক বলিলেন—"আল্লাই আমার উদ্দেশ্য, হে ফরিদ, এস, আল্লাই আমার উদ্দেশ্য।" নানকের হাত ধরিয়া ফরিদ বসাইয়া বলিলেন—"সংসারের সুখ চাও, অথবা আল্লাকে চাও; দুই নৌকায় পা দিওনা, তাহা হইলে

তোমার মাল নিশ্চয়ই ডুবিয়া যাইতে পারে।”

নানক বলিলেন—“তুমি দুই নৌকাতে পা দাও, দুই নৌকাতে তোমার মাল বোঝাই কর। একটী নৌকা ডুবিলেও অপরটীতে পার হইতে পারিবে। এই নামরূপ মাল জল বা নৌকার অপেক্ষা করে না, ইহা জলে ডোবে না বা নষ্ট হয় না, এই মালই প্রকৃত সম্পদ, ইহা সেই পরমাত্মাতে অবস্থিত।”

ফরিদ বলিলেন—“এই সংসাররূপ পিশাচীর সহিত কে ভালবাসা স্থাপন করিবে? হে নানক, ইহার দৃষ্টি-মাত্রেই উর্ব্বরা ক্ষেত্র মরু-সদৃশ হয়।”

নানক বলিলেন—“সংসারের প্রতি ভালবাসা স্বভাবতঃই আসে। যদি ক্ষেত্রোস্বামী মনযোগী থাকেন, তাহা হইলে ক্ষেত্র নষ্ট হয় না।”

ফরিদ বলিলেন—“শরীরের বল গিয়াছে, হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এখন আমার প্রিয়তম আমার বৈদ্য হইয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতেছেন।”

নানক বলিলেন—“আপনার শরীরের মধ্যে প্রকৃত বন্ধুকে লক্ষ্য কর। কথায় বলা অজ্ঞানতা, হৃদয়ে অনুভব কর। সেই বন্ধু দূরে নহেন, আপনারই মধ্যে রহিয়াছেন।”

ফরিদ এবং নানক এক রাত্রি সেই বনে এক সঙ্গে বাস করিলেন।

ফরিদ বলিলেন—“রাত্রিতে যে সকল সাধক, জাগরিত থাকিয়া তাঁহার নাম করেন, তাঁহারা প্রভুর কৃপা প্রাপ্ত হয়েন। প্রথম রাত্রিতে পুষ্প, শেষ রাত্রিতে ফল ভোগ হয়।”

নানক বলিলেন—“প্রভু নিজেই কৃপা করেন, তাঁহাকে শুধু সাধন করিয়া কেহ পাইতে পারেনা। কত ব্যক্তি জাগিয়া থাকিয়াও তাঁহাকে পায় না; আবার কেহ কেহ ঘুমাইয়া থাকিলেও তিনি তাহাকে জাগাইয়া দর্শন দিয়া যান।”

পরদিন প্রাতে এক ব্যক্তি ফরিদ ও নানককে সেখানে দেখিয়া তাঁহাদের সেবার নিমিত্ত একটী পাত্রে দুগ্ধ এবং তাহার মধ্যে চারি খানি মোহর দিয়া লইয়া আসিল। ফরিদ দুগ্ধের কতক অংশ ঢালিয়া লইয়া অবশিষ্ট অংশ নানকের জন্য রাখিলেন। নানক বলিলেন, “ফরিদ, দুগ্ধের মধ্যে হাত দিয়া দেখ কি আছে।” ফরিদ দেখিলেন তাহার মধ্যে মোহর রহিয়াছে; দেখিবা-মাত্র সমস্ত ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন।

অতঃপর উভয়ে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলে যে ব্যক্তি তাঁহাদিগের জন্য দুগ্ধ ও মোহর যে পাত্রে আনিয়াছিল, সেই পাত্রটী উঠাইতে গিয়া দেখিল পাত্র সোণা হইয়া গিয়াছে এবং তাহা মোহরে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে! সে তাহা লইয়া গেল, কিন্তু মনে মনে এই আক্ষেপ করিতে লাগিল, যদি আমি ধর্ম্ম দিতাম তাহা হইলে ধর্ম্ম প্রতিদান পাইতাম; আমি হতভাগ্য তাই এই ফকীরদিগের জন্য স্বর্ণ আনিয়াছিলাম।”

ফরিদ ও নানক অতঃপর আশা দেশের রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। সে দেশের লোক সকলেই সত্যবাদী। এই সত্যের প্রভাপে তাহারা দিবসে ক্ষেতে বীজ বপন করিত এবং রাত্রিতে শস্য সংগ্রহ করিত। তাহাদের রাজা এক সময়ে কোন মিথ্যা কথা বলায় তাহার মৃতদেহের সমস্ত অংশ দগ্ধ হইয়া কেবল মস্তক দগ্ধ হইতে ছিল না। অবশেষে জানা গেল মিথ্যা কথা বলার জন্য এইরূপ হইয়াছে যখন ঐ মস্তকে কোন সাধুর পদস্পর্শ হইবে তখন তাহা দগ্ধ হইবে। নগরবাসী সকলে সেই জন্য সাধুর অপেক্ষা করিতেছিল। সাধু উপস্থিত হইলে জানিতে পারা যাইবে এজন্য নগরের সকল দ্বার রুদ্ধ করিয়া কেবল মাত্র একটী দ্বার খুলিয়া রাখা হইয়াছিল। এমন সময়ে ফরিদ ও নানক তথায় উপস্থিত হইলেন। তাহাদিগকে দেখিয়া নগরবাসিগণ শবের মস্তকে পদ রক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। নানক ফরিদকে বলিলেন "ফরিদ তুমি তোমার পদ দ্বারা শবের মস্তক স্পর্শ কর। ফরিদ বলিলেন, আমার কি গুণ আছে যে আমি এই কার্য্য করিব? আপনিই ইহাকে উদ্ধার করুন।" গুরু নানক শবের মস্তকে পদ রক্ষা করিলেন, তাঁহার পদস্পর্শ মাত্র শবের মস্তক ভস্মীভূত হইয়া গেল।

সেই নগরবাসিগণ তখন নানক ও ফরিদের পদে পতিত হইলেন ও ভক্তি সহকারে তাঁহাদের যথেষ্ট সৎকার করিলেন। নগরবাসিগণ রুটী আনিয়া তাঁহাদিগকে আহার করিতে বলিলেন। ফরিদ বলিলেন, আমি আহার করিয়াছি। তাহাতে এক জন নগরবাসী বলিলেন "তুমি কি সেখ ফরিদের দেশের লোক, সে খানে ফরিদ মিথ্যা ভান করিয়া পেটে কাঠের রুটি বাঁধিয়া রাখিত?" ফরিদ শুনিয়া অবাক হইলেন, বুঝিলেন সত্যের আদরে সেই নগরবাসীগণ কত উন্নত ও কি প্রকার শক্তি লাভ করিয়াছে। তাঁহার অহঙ্কার চূর্ণ হইল। তিনি আপনাকে নিজ সাধন গুণে শক্তিশালী মনে করিতেন; কিন্তু যখন দেখিলেন আশা নগরের প্রত্যেক ব্যক্তিই শক্তিশালী ও সত্যনিষ্ঠ, তখন তিনি বুঝিলেন যে ভগবানের কৃপাতেই মানুষ সব লাভ করিতে পারে, অহঙ্কার করিবার কিছু নাই।

নানক বলিলেন, ফরিদ তুমিই প্রকৃত সাধু। তোমার মধ্যে ভগবানের আবির্ভাব হইয়াছে। তুমি গুরুকরণ কর, পীরের আশ্রয় গ্রহণ কর।" ফরিদ বলিলেন, আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য, এই বলিয়া পুনরায় বনে প্রবেশ করিলেন।

সেখ ফরিদ সিদ্ধ অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম মুসলমানদিগের মধ্যে বিখ্যাত।

সেখ ফরিদী পন্থায় অনেক ফকীর মুসলমানদিগের মধ্যে আছেন।

গ্রন্থ সাহেব হইতে ফরিদের দুইটী শ্লোক নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

কবণ সুঅক্ষর কবণ গুণ, কবণ সুমণিয়া মন্ত।
কবণ সুবেশো হৌ করি চিতু বশিয়া বৈং-কতু॥

সেই সুঅক্ষর কি, সেই গুণ কি সেই রত্ন মন্ত্র কি, সেই বেশই বা কি, যাহা দ্বারা বিভূষিত হইলে সেই প্রিয়তমকে পাওয়া যায়?

নিবণু সুঅক্ষর, খবণ গুন্, জিহবা মণিয়া মন্ত।
ইয়েতৈ ভৈণে বে গুকরি তা বশিয়া বীকন্ত॥

বিনয়ই সেই সুঅক্ষর, ধৈর্য্যই সেই গুণ, জিহ্বাই সেই রত্ন যাহা দ্বারা মন্ত্র উচ্চারিত হয়।

হে ভগিনী, এই তিন দ্বারা তুমি সুশোভিত হইলেই সেই প্রিয়তম তোমার বশে আসিবেন।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র মোহন দত্ত।

৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জীবনী। তাঁহার লিখিত ডায়েরী হইতে।

১। ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতে গেলে অনেক ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়— এই জন্য লোকে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে চায় না। অনেক লোকে ধর্ম্মের পথে চলিতে চলিতে এক একটী ত্যাগের স্থানে স্থগিত হইয়া দাঁড়ান ও ফিরিবার পথ দেখেন।

২। সংসারে কি মানুষের ত্যাগ স্বীকার করিতে হয় না—মানুষ ধনের আশায়, মানের আশায়, সুখের আশায় কত ত্যাগ স্বীকার করে। সেইগুলি রক্ষা করিতে কত কষ্ট পায়। অবশেষে সেগুলি রক্ষা হয়। কতক আপনার নির্ব্বোধতাতে কতক দস্যু তস্কর ও হিংস্র লোকের অত্যাচারে যায়, অবশিষ্ট যা থাকে, তাহা মৃত্যুকে দিয়া যাইতে হয়। পৃথিবীর হাটে বিনিময় এইরূপ।

৩। ধর্ম্মের জন্য কষ্ট স্বীকারে অক্ষয় ধন লাভ হয়, যে ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়, তাহা নশ্বর। ঈশ্বরের কাছে বিনিময় কেবল লাভের।

৪। ধর্ম্মের জন্য লোকে ভ্রান্ত হইয়া অনেক বৃথা কষ্ট করেন, অনর্থক ত্যাগ স্বীকার করেন। সন্ন্যাসী বৈরাগীরা ইহার দৃষ্টান্ত, ইহা ধর্ম্মের আদেশ নহে।

৫। ধর্ম্মের জন্য সর্ব্ব প্রধান ত্যাগ স্বার্থ ত্যাগ। আমার যাহা কিছু—আমার জন্য নয়,—কিন্তু মালিকের জন্য। তাঁর দেওয়া ধন অকাতরে তাঁকে দিব, আপনার নির্ব্বোধতায়, তস্কর, দস্যু, মৃত্যুর

অত্যাচারে যাহা হারাইতে হয়, তাহা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাঁকে দেওয়া প্রশস্ত।

৬। এই দেওয়া প্রেম হইতে হইলেই স্বাভাবিক ও সহজ হয়। প্রেমের আশ্চর্য্য-শক্তি সংসারে দেখিতে পাই। মাতা পুত্রের, স্ত্রী স্বামীর, বন্ধু বন্ধুর জন্য কত ত্যাগ স্বীকার করেন আর তাহাতে আনন্দিত হন ও আপনাকে ধন্য মনে করেন।

৭। অন্তরে ঈশ্বর প্রেম হইলে তাঁহার জন্য অদেয় কি থাকে? একেত তাঁর দেওয়া ধন, তাতে তাঁর কার্য্যের জন্য সর্ব্বস্ব সমর্পণে কি দুঃখ?

৮। প্রেমিক ব্যক্তি তাঁহাতে আত্ম-সমর্পণ করিয়া থাকেন। তাঁর জন্য সবই অকাতরে দেন, দিয়া আনন্দ লাভ করেন। প্রেমেতে লোককে ত্যাগী করায়, সেই ত্যাগেই ভোগ। ভোগীর ভোগ স্বার্থপূর্ণ তাহা কুক্কুরের উচ্ছিষ্ট—ঈশ্বরে প্রেমিকের ত্যাগই ভোগ। বিশ্বপ্রাণে যাঁর আত্ম ক্ষুদ্র প্রাণ সমর্পিত—বিশ্বপ্রেমে যাঁর আত্মপ্রেম বিসর্জ্জিত তিনি সেই আনন্দময়ের সহিত কামনার বিষয় সকল উপভোগ করেন।

বারাণসী-তত্ত্ব।

সেবের মোরব্বা এক টাকায় এক সের পাওয়া যায়। উহা প্রস্তুত করিতে হইলে ৬টা সেব এবং অর্দ্ধ সের উত্তম খাঁড় (চিনির) আবশ্যক। ৬টা সেবের দাম ছয় আনা এবং অর্দ্ধসের চিনির দাম তিন আনা, লেবু দুই পয়সা, কেওড়া এক পয়সা ও জ্বালানি কাষ্ঠ এক আনা। সর্ব্ব শুদ্ধ এক সের মোরব্বার খরচ দশ আনা নয় পাই কিন্তু বিক্রয় কালে ইহা টাকায় এক সের দরে বিক্রয় হইবে।

আমলকির মোরব্বা সস্তা দরে পাওয়া যায়। ইহা আট আনায় এক সের। ইহা প্রস্তুত করিতে হইলে অর্দ্ধ সের চিনির আবশ্যক। ইহার দাম আড়াই আনা। তাজা আমলকি অর্দ্ধ সেরের দাম দুই পয়সা কেওড়ার ভাগ আমলকিতে অধিক দিতে হয় কারণ আমলকি কষায় সুতরাং এক পয়সা স্থানে দুই পয়সা খরচ করিলেই যথেষ্ট। জ্বালানি কাষ্ঠ এক আনা। একুনে সাড়ে চারি আনা খরচ কিন্তু বিক্রয় হইবে আট আনায়।

আচার ছয় আনা ও আট আনায় সের পাওয়া যায়। আমের আচার খাইতে সুস্বাদু। দেশী লোকে আমের আচার-কেই আদরের চক্ষুতে দেখে। ইহা প্রস্তুত করিবার উপাদান যথা :—

সির্কা ৩ পোয়া	১ পয়সা।
আম (শুষ্ক) ২ ছটাক	১ "
চিনি ঐ	১ "
লঙ্কা ১ ছটাক	১ "

কলোঞ্জি (কেলে জিরে)	১ „
আদা	১ „
পুদিনা	১ „
লবণ	১½ „
অন্যান্য ক্ষুদ্র ফল	১ আনা

মোট ৩ আনা ১½ পয়সা

উপরোক্ত তালিকাটি ১ সের আচার প্রস্তুতের জন্য। কিন্তু ইহা বিক্রয় হইবে ছয় আনায়।

আচার ও মোরব্বার ক্রেতা খুবই কম। সেই জন্যই বোধ হয় কিছু চড়া দামে বিক্রয় হইয়া থাকে। কারণ বিক্রয় না হইলে আচার বিক্রেতার ক্ষতি। অতএব ক্ষতি পূরণ করিবার জন্যই তাহারা চড়া দরে বিক্রয় করে।

হিন্দু ও মুসলমান জাতি নির্ব্বিশেষে সকলেই পান ব্যবহার করিয়া থাকে। পান ছয় প্রকারের যথা কর্পূর, মাকর, বাঙ্গালা, কোমী, দেশাওয়ারী এবং কল্‌কাতিয়া। কর্পূরী পানের দুই ঢুলির দাম সাড়ে দশ আনা। পান তৈয়ার করিয়া দিলে তাহাকে "গিলোরী" কহে। "গিলৌরীর" উপাদান খয়ের, চুণ, সুপারী এবং এলাচ। একটা গিলোরী তৈয়ার করিতে হইলে দেড়টা পানের আবশ্যক। তিন শত গিলোরী তৈয়ার করিলে পান বিক্রেতার তিন আনা লাভ হইয়া থাকে। শ্বেত বর্ণের পানের আদর অধিক। সুতরাং খুব চড়া দামে বিক্রয় হইয়া থাকে।

সুপারী বিক্রেতা অবশ্য তাম্বোলী (বারুই জাতি) নহে। যে সে জাতিতে গুবাক বিক্রয় করিয়া থাকে। সুপারী দুই প্রকারের যথা —(১) চিকনি ডালি এবং (২) নিম চিকনি। পূর্ব্বোক্তটী অমরাবতী হইতে এবং দ্বিতীয়টী বোম্বাই হইতে আইসে। চিক্‌নি ডালির মণকরা দর ৩৪ টাকা হইতে ৪২ টাকা এবং নিম চিকনির ২৫ টাকা হইতে ২৮ টাকা পর্য্যন্ত। যাহারা চিকনি ডালী তৈয়ার করে তাহারা মারওয়াড়ীদিগের নিকট হইতে থোকে ক্রয় করে এবং সুপারী গুলিকে কাটিয়া ফুটকরা দরে বিক্রয় করে। সুপারীর দুইদিক হইতে কথঞ্চিৎ কাটিয়া ফেলা হয়। তৎপরে সুপারিটার দুই দিক গর্ত্ত করা হয়। পরে ধারগুলি কাটিয়া ফেলা হয়। এই সুপারিকে "দোরুখি" বলে। কর্ত্তিত টুকরা গুলি "চুরা" নামে খ্যাত। মারওয়াড়ীগণ এক মণ ৪০ সের বিক্রয় করে। যদি দশ সের সুপারি ৩৪ টাকায় মণ দরে ক্রয় করা হয় তাহা হইলে ৮ টাকা ৪ আনায় ১২ পক্কী সের পাওয়া যায়। এক সের চিক্‌নি ডালি এক দিনে এবং এক জনের পরিশ্রমে তৈয়ার হইতে পারে। সুতরাং তজ্জন্য ১ টাকা ১৪ আনা আরও যোগ করা উচিত চিক্‌নি ডালীওয়ালার লাভ প্রত্যেক সেরে প্রায় ১০ আনা হইয়া থাকে। সুপারীর মধ্যে নিম চিকনি অধম বলিয়া গণ্য সুতরাং তাহার লাভ সের প্রতি সাড়ে পাঁচ আনা।

(ক্রমশঃ)

শিল্প শিক্ষা।

পাঠিকা ভগিনীগণ আজ আপনাদের জন্য একটী ক্ষুদ্র ফ্রকের কাট লইয়া আসিয়াছি। পূজা আসিতেছে প্রত্যেক ঘরে ঘরে এখন সন্তান, সন্ততি, আত্মীয় স্বজনের জন্য নূতন বসন ভূষণের ক্রয় বিক্রয় চলিতেছে। যাঁহার যেরূপ অবস্থা তিনি তদনুযায়ী আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত এবং পরিজনগণও তাহাই পাইয়া সন্তুষ্ট। এই আনন্দের দিনে স্বহস্তে প্রস্তুত বসনে সন্তান ও প্রিয়জনকে সজ্জিত করিতে পারিলে এই আনন্দ আরও শতগুণ বর্দ্ধিত হয়। এই পূজার আনন্দ সর্ব্বাপেক্ষা শিশু দিগেরই অধিক, কারণ তাহারা আর কিছুই জানে না কেবল খাইতে ও নূতন বসন ভূষণে সজ্জিত হইতে পারিলেই আনন্দে আটখানা। শিশুদের এই আনন্দ দেখিয়া পিতা মাতা আত্মীয়গণও সকল দুঃখ কষ্ট বিস্মৃত হন।

আজ তাই শিশুদের উপযোগী জিনিষই ভগিনীদিগের জন্য আনিয়াছি। এই ফ্রকটীর বাঙ্গালা নাম কি তাহা আমি জানি না, কারণ ইহা এদেশের আমদানী নহে বিদেশ হইতে আমদানী। ইংরাজীতে ইহাকে "poplu frock" বলে। ইহার কাট খুবই সহজ সেলাইও বেশী নয়, এক কথায় ইহা খুব শীঘ্র তৈয়ার হইয়া যায়, দেখিতেও বেশ সুন্দর। এই ফ্রক একটু মোটা কাপড়ে তৈয়ার করিতে হয়। কারণ তলায় যে ঘের দেওয়া হয় সেই ঘেরটী কুচাইয়া দিবার পরিবর্ত্তে পাটে পাটে দিতে হয়, সেই জন্য পাতলা কাপড়ে সুবিধা হয় না। আর একটা কারণ মোটা কাপড়ে করিলে কাপড়ও কম লাগে।

নিম্নে ইহার প্রস্তুত প্রণালী প্রদত্ত হইল।

কাট—প্রথমতঃ একখানি কাপড় পাট করিয়া লইয়া এই নমুনার কাটটী দেখুন। ইহাতে যেরূপ আছে সেইরূপে বুক পিট এক সঙ্গে কাটিয়া লউন (ইহার কাঁধের উপর সেলাই পড়িবে না, হাতও সতন্ত্র কাটিতে হইবে না)।

হাত, বুক ও পিঠ এক সঙ্গেই কাটা হইয়া যাইবে। তৎপরে নিম্নের ঘের একখণ্ড কাপড় কাটিয়া লইয়া শেষে গলার কলারটী কাগজের নমুনা দেখিয়া কাটিয়া লউন (এই নমুনাটী ফ্রকের অর্দ্ধেকের কাট। আধখানা বুক, পিঠ, গলা, কলার ও তলার ঘেরটী চার ভাগের এক ভাগ।)

সেলাই—

উপরের অংশের দুই ধার সেলাই করিয়া, (১ চিহ্নিত স্থান) ঘের সেলাই করুন, (২ চিহ্নিত স্থান) ঘেরের তলায় চওড়া করিয়া মুড়িয়া সেলাই দিয়া, হাতের মুখ সেলাই করুন, হাতের মুখে কচি

অনুযায়ী পাড় ফিতা বা অন্য কিছু দিতে পারা যায়। তৎপরে (৩ চিহ্নিত স্থান) গলা ও কলারে ৪, ৫, ৬, চিহ্নিত স্থান সেলাই করুন। গলার সম্মুখ দিক (৩ চিহ্নিত) অন্য এক টুকরা কাপড় দিয়া খুব সরু করিয়া সেলাই করিয়া লউন। গলার কলারে ও হাতের ন্যায় পাড় কিম্বা অন্য কিছু বসাইয়া লইলেই একটী অতি সুন্দর ফ্রক তৈয়ার হইবে। কোমরে একটী ঐ কাপড়ের কোমর বন্ধ দিবেন। ইহার বোতাম সম্মুখ দিকে থাকিবে।

সংবাদ।

১। লর্ড কারমাইকেল মহোদয় নবদ্বীপ গমন করিলে তথাকার পণ্ডিত মণ্ডলী তাঁহাকে "নীতিরঞ্জন" উপাধী প্রদান করেন। লর্ড কারমাইকেল মহোদয় এই সভায় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।

"সমবেত নবদ্বীপবাসী পণ্ডিত মহাশয়গণ! আপনাদের সাদর অভিনন্দনে পরম প্রীতিলাভ করিলাম, প্রতিদানস্বরূপ আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব। বহুদিন হইতে বঙ্গদেশের সংস্কৃত শিক্ষাবিস্তারের কেন্দ্রস্থল দর্শন করিবার বাসনা ছিল, আজ তাহা ফলবতী হইল। পণ্ডিতগণের এই পবিত্র ও রমণীয় আবাস ভূমিতে উপস্থিত হইয়া এবং তাঁহাদের সহিত সদালাপ করিয়া বিপুল আনন্দ উপভোগ করিলাম। টোল কেবল সংস্কৃত অধ্যাপনার স্থল নহে স্বল্পভোগ ও উচ্চচিন্তা, সংযম, ধৈর্য্য পবিত্রতা এবং অপরাপর সদগুণের শিক্ষামন্দির বলিয়া আদরণীয়। আজ সেই টোল পরিদর্শন করিয়া আমি ধন্য হইলাম। বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ আয়ত্ব না থাকায় আপনাদের যথোচিত সম্ভাষণ করিতে অক্ষম হইলাম ক্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।"

২। বরোদার মহারাণীমহোদয়া দিল্লীর মহিলা কলেজে ২৫ হাজার টাকা ও বরোদার চিমন বাই হাই স্কুলে ৬ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। আরও শুনা যাইতেছে যে হিন্দু মহিলাদিগের শিক্ষার জন্য বৃত্তি স্থাপন কল্পে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা এতৎসঙ্গে দান করিয়াছেন।

৩। মহীশূর রাজ্যে এক দেশলাইয়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এই কারখানার স্থায়ীকরণার্থ রাজ সরকার হইতে অর্থ সাহায্য করা হইবে।

৪। ইংলণ্ড প্রবাসী ১৮০ জন ভারতীয় ছাত্র কেহ আহত সৈনিকদের হাসপাতালে, কেহবা হাসপাতাল জাহাজে ডাক্তার, ড্রেসার, অনুবাদক প্রভৃতি নানা কার্য্য করিতেছেন। যাঁহারা ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে

ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ব্বিসে নিযুক্ত করা হইয়াছে। তাঁহাদের ৪ জন ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে কার্য্য করিতেছেন। ৩ জন ফ্রান্সে দোভাষীর কর্ম্ম করিতেছেন। ব্যারিষ্টার মিঃ পি, এল, রায়ের পুত্র মিঃ পরেশলাল রায় গোলন্দাজ সৈন্য শ্রেণীভুক্ত হইয়া যুদ্ধ করিতেছেন। তিনি অনেক যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। এঞ্জিনিয়ারিং বি, এস সি উপাধীধারী মিঃ রামলিঙ্গম রয়াল ফিউজিলিয়ার্স সৈন্যদলভুক্ত হইয়াছেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মিঃ পদমজী মিডলসেক্স সৈন্যদলে সামান্য পদাতিক সেনার কর্ম্ম করিতেছেন। অন্যান্য ভারতবাসীদের কেহ টেরিটোরিয়েল কেহবা লর্ড কিচেনারের নূতন সৈন্যদলে যোগদান করিয়াছেন।

৫। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বিদ্যাপতি ও "চণ্ডীদাস" ইংরাজীতে অনুবাদ করিতেছেন এইরূপ শুনা যাইতেছে। কতক গুলি বাউল সঙ্গীত ও ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছেন।

মুষ্টিযোগ

মুখক্ষত রোগে—প্রত্যহ ক্ষেৎপাপড়ার রস অর্দ্ধ ছটাক মধুর সহিত খাইলে সকল প্রকার মুখরোগ আরোগ্য হয়।

২। গরল আরোগ্যের উপায়—কাঁচা হলুদ দুধে বেটে গায়ে মাখিলে গরল আরোগ্য হয়।

৩। মাকড়সার গরল—দাড়িমের শেকড় ও গোল মরিচ একত্রে শ্বেত চন্দনের সহিত বাটিয়া ঘায়ে লাগাইলে ঘা শুকাইয়া যায়।

কাঁচ কলার আটা দিনে ২।৩ বার লাগাইলে উপকার হয়।

৪। আফিমের নেশা কমাইবার উপায়—আতার পাতা বাটিয়া খাওয়াইলে আফিমের নেশা কমিয়া যায়। অতি শিশুকে দেশীয় কাগজের টুকরা ভিজাইয়া খাওয়াইলে নেশা কমিয়া যাইবে।

৫। গলার স্বর পরিষ্কার করিবার উপায়—প্রত্যহ ঘিয়ে গোলমরীচ ভাজিয়া গরম থাকিতে খাইলে গলার স্বর পরিষ্কার হয়, ইহাতে দেহ বলিষ্ঠ হয়।

৬। কুইনাইনের দোষ নিবারণের উপায়—চিরেতার জলে চিনি মিশাইয়া খাইলে কুইনাইনের দোষ নিবারণ হয়।

৭। সুবাসিত নারিকেল তৈল—

লচি ২ ড্রাম।
এলকানিন রুট ২ ড্রাম।
গোলাপের পাতা ১ আউন্স।
অয়েল স্যান্‌থাল ফ্ল্যাভা ১ আউন্স।
ক্যাষ্টর অয়েল ১ আউন্স।
অটোডি রোজ ১২ ফোঁটা।
নারিকেল তৈল ১ বোতল।

৮। মুখের আরি ঘা—শিশুদের মুখে ঘা হইলে তেড়ার দুগ্ধ দুই বা চারি ফোঁটা

২।৪ বার লাগাইলে মুখের, জিহ্বায় ও ঠোঁটের ঘা আরাম হয়।

৯। ছুলির ঔষধ খুব পুরাতন মূলার বীচি এক ছটাক, ও দুই তিন দিনের দৈয়ের সহিত বাটিয়া কিছুক্ষণ রৌদ্রে রাখিবে, পরে উক্ত ঔষধ ছুলিতে অনেকক্ষণ ধরিয়া মর্দ্দন করিলে এক দিবসেই ছুলি আরোগ্য হয়।

১০। দাদের ঔষধ—গন্ধক, গেটেকড়ি ভস্ম ও গর্জ্জন তৈল একত্রে মিশাইয়া দাদে মালিস করিলে সর্ব্ব প্রকার দাদ আরোগ্য হয়। ইহাতে জ্বালা করে না। (পরীক্ষিত)।

ডাঃ শ্রীসত্যপ্রিয় দত্ত।

বামারচনা

অন্তর তম।

তুমি র'য়েছ হৃদে কেন বা দূরে তে যাই,
বারেক নয়ন মুদে তোমারে দেখিতে চাই।
জীবন-মুকুরে মোর, কালিমা প্রচুর—তায়
নিভৃতে দরশ দিলে নয়ন জুড়াই হায়।

শ্রীমতী—হে—ন্দ—দেবী।

চলে গেছ!

যে দিন বরিণু তোমা পুত্র পরিচয়ে,
জন্ম জন্মান্তরে যেন কারুণ্য সঞ্চয়ে
ভরিল রমণী হিয়া, স্নেহের আবেশ,
জন্মাল মমতা প্রীতি অন্তরে অশেষ।
আপন নন্দনবৎ আনন্দে নয়ান
হেরিতে লাগিল তব ও বিধু বয়ান,
আত্মজেরি মত কল্যাণ কামনা
করিতে লাগিল হিয়া ভাবিল ভাবনা।
আজ তুমি চলে গেছ লোক লোকান্তরে,
পুত্র শোকাতুরা আমি অন্তরে অন্তরে!
ঝরিছে শোকের উৎস, চোখে স্নেহনীর,
মুছে ফেলি তাও ভাবি করুণা বিধির।

শ্রীমতী ক্ষীরোদ কুমারী ঘোষ।

ভ্রম সংশোধন—আষাঢ় মাসের পত্রিকায় ৮১ পৃষ্ঠায় ঝিল্লিকা জাঁক স্থানে ঝিল্লিকা আঁক হইবে।

৩১ নং মধুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

আশ্বিন, ১৩২২। অক্টোবর, ১৯১৫।

সূচী।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২।৵০ ; অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১।৵০ ; প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।৵ (চারি আনা মাত্র)।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 626. — October, 1915.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৩ বর্ষ। ৬২৬ সংখ্যা।	আশ্বিন, ১৩২২। অক্টোবর, ১৯১৫।	১০ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

আমাদের কথা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রফুল্লকুমার।

(১)

সব মাটি! আমার এত যত্ন, এত পরিশ্রম, সব পণ্ড! ভূতের বেগার খাটিলাম! কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্! এর মানেটা কি? সরলা তো রাজি হইয়াছিল, আমি বেশ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, তাহার মুখেও বেশ প্রফুল্লতা প্রতিভাত হইয়াছিল, তবে বড় লজ্জায় যেন মরিয়া থাকিত, আমার সম্মুখে এ কয়দিন আদৌ আসিতে চাহিত না, তা লজ্জা হইবারই কথা, কিন্তু হঠাৎ এ পলায়নের অর্থ কি? মেজদিদির কল টেপা নহে তো? তাই বা কেন হবে? তিনি তো রাজি হইয়াছিলেন, আর তাঁর দ্বারা এরূপ লুকাচুরি খেলা তো সম্ভবেনা, তাঁর যদি আন্তরিক অমতই থাকিত, তবে তিনি প্রকাশ্যে তাহা বজায় রাখিতেন,—তাহা হইলে আমাদেরও এ সব আয়োজন করিবার সাধ্য হইত না।

তবে? তবে সরলার মনে হঠাৎ কোন ভাবান্তর হওয়াই বা অসম্ভব কিসে? তা হউক এখন কি করি? জোর করিয়া আনিয়া তো বিবাহ দেওয়া চলে না,—শেষে একটা কাণ্ড করিয়া বসিবে!

আচ্ছা ভাবান্তরই বা কেন হইল? যাই, শুনিলাম [illegible] ফিরিয়া আসিয়াছে.

তার কাছে যদি কিছু কথা পাই, পাওয়াই সম্ভব, সরলা তো বিছানায় একখানা সামান্য কাগজে লিখিয়া ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছে "আমি শ্বশুরবাড়ী চলিলাম, পৌঁছিয়া সংবাদ দিব, চিন্তিত হইও না।"

মেজদিদির বাড়ী যাইলাম, মেজদিদির মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তাঁহার মুখে বিশেষ দুঃখের বা ভগ্নোৎসাহের লক্ষণ দেখিলাম না। আমি যাইতেই তিনি ঘরের ভিতর হইতে এক খানা পত্র আনিয়া আমার হাতে দিলেন, বুঝিতে বাকি রহিল না। একখানা সোফার উপর আড় হইয়া পড়িয়া পত্রখানি খুলিলাম, বলা বাহুল্য সরলার হাতের লেখা —মেজদিকে সম্বোধন করিয়া লেখা :—

পরম পূজনীয়া

শ্রীযুক্তা মেজদিদি-ঠাকুরাণী—

শ্রীচরণ-কমলেষু—

মেজদিদি!

বোধ হয় সবই বুঝিতে পারিয়াছ, এবং তুমি বোধ হয় এজন্য আমার উপর খুব রাগও করবে না। তবে একলাটী হিমীকে সঙ্গে করিয়া এবং কাউকে না বলিয়া চলিয়া আসাতে একটু রাগ হইবার কথা, কিন্তু আমি নিরাপদে পৌঁছিয়াছি শুনিয়া তোমার সে রাগ আর থাকিবে না। কি করিব? এরূপ করা ভিন্ন উপায়ান্তর দেখিলাম না।

বিকাল বেলা যখন সাজিয়া গুজিয়া (ধিক আমার পাপ জীবনে) পুকুরপাড়ে বসিয়াছিলাম, তখন বামুনদের হেমা, টুনী, আর ঘোষেদের শৈল ও তাদের মেজ-বৌ এবং খুদী ঠানদিদি লুকাইয়া আমায় দেখিতে আসিয়াছিলেন, আমার সাজ-গোজ দেখিয়া, আমার ভাবন দেখিয়া, তাঁদের সাতপুরুষে যাহা স্বপ্নেও ভাবে নাই—তাই স্বচক্ষে দেখিয়া, হাসিয়া পলাইয়া গেল। আমার বোধ হইতেছে, পাড়ার এবং গ্রামের সকলেরই আমায় দেখিবার জন্য ঐরূপ উৎকণ্ঠা হইয়াছিল, কেবল তোমার কড়া-কড়িতে পারিয়া উঠে নাই। তাই আজ বুঝি কি ছুতা নাতা করিয়া, কোন সুযোগে আসিয়া, তোমার চক্ষে ধুলা দিয়া, বিনা পয়সায় সং দেখিয়া, গেল। আশা করি আমার বর্ণনা এতক্ষণ বিলক্ষণ ডাল পালা সমেত গ্রামে রাষ্ট্র হইতেছে। যেখানে দুটি পাঁচটি মেয়েমানুষ জড়ো হইতেছে, সেই খানেই আমারই কথা হইতেছে—চিরকালই হইবে, যতদিন গ্রাম থাকিবে ততদিন হইবে, আরও কিছু চাও?

আমি জানি তোমার আন্তরিক মত ছিল না, কেবল দাদা ও দাদাবাবুর মনক্ষুণ্ণ করিবার ভয়েই তুমি সায় দিয়াছিলে, আর তিন জনে মিলিয়া আমার শুকনো খড়ে আগুন ধরাইয়া আমার সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছিলে, আমার ইহকাল পরকালের মাথা খাইতে বসিয়াছিলে, আমার অলস্ত যৌবনে ঘৃতের আহুতি দিয়া আমায় নরকাগ্নিতে পোড়াইতে বসিয়াছিলে। কোন্ হিঁদুর মেয়ের না একথা শুনিলে গা শিহরিবে? তোমার যুক্তি,

তর্ক, শাস্ত্রের নজির, ধর্ম্মের নজির সব জাহ্নবীর জলে নিক্ষেপ করিও,—তাহারাও পবিত্র হইবে।

এ পাপ জীবনে আর জন্মভূমি দর্শন করিব না, যাহার সম্মুখে পড়িব, সেই আঙ্গুল দিয়া দেখাইবে—তাহা কেমন করিয়া সহ্য করিব, মেজদিদি? যতদিন এ পাপ জীবন না যাইবে, ততদিন নারীর মহাতীর্থ স্থান শ্বশুরালয়েই থাকিব, বাপের বাড়ী এই পর্য্যন্ত। বুঝি এ জীবনে আর তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে না—মেজদিদি—মেজদিদি গো—

দাদাকে বলিও, আমাকে যেন ক্ষমা করেন। দাদাবাবু যেন রাগ না করেন, তাঁদের পত্র লিখিতে আমি সাহস করিলাম না, তুমি আমার হইয়া বুঝাইয়া বলিও। তোমার কথা উভয়েই শিরোধার্য্য করিয়া থাকেন—আজিও করিবেন, আর কি লিখিব? তোমায় মধ্যে মধ্যে পত্র দিব, উত্তর দিও। আর কি চাহিব? অনেক চাহিয়াছি,—যখন যাহা চাহিয়াছি, পাইয়াছি। আজ তোমরা তিন জনে প্রাণ ভরিয়া তোমাদের অভাগিনী জন্মদুঃখিনী বোনকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন অচিরে তাহার মৃত্যু হয়, যত দিন আমার চিতাভস্ম জাহ্নবী বারিতে বিধৌত না হইবে, ততদিন এ পাপের দাহ বুঝি নিবিবে না। হায় অদৃষ্টে তাও কি হইবে? তোমরা আমার প্রণাম গ্রহণ কর—ইতি

তোমাদের হতভাগিনী
সরলা।

২

এত কষ্ট করিয়া, আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, যে ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ করিয়াছি, তাহার একটু আভাষ দিয়া রাখি।

বলিয়াছি তো, সরলার অকাল বৈধব্য আমার পক্ষে অসহ্য হইয়া পড়িয়াছিল। আমি জানিতাম, বালবিধবার পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা সব সমাজে, সব শাস্ত্রে, আছে—আমাদেরও শাস্ত্রে আছে। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় অনেক পরিশ্রম করিয়া, শাস্ত্রের সার মন্থন করিয়া, নজির বাহির করিয়াছেন, এবং অকাট্য প্রমাণ ও যুক্তির দ্বারা প্রতিপক্ষের মত খণ্ডন করিয়াছেন। অতএব শাস্ত্র সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার নাই। এখন লোকাচার এবং বর্ত্তমান সমাজসমস্যা ইহার প্রতিবন্ধকতা করিতেছে। সরলার এমন না হইলে একথা আমার মনেও উদয় হইত না, এমন কি অন্যে এ সকল প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে, ঘৃণায় নাক সিঁট্‌কাইতাম এবং কত শত মিঠে কড়া বিদ্রূপ করিয়া লোকের কাছে রসিকতার বাহবা লইতাম। আজ নিজের গায়ে সাপের কামড় খাইয়া বেশ বুঝিতে পারিয়াছি, তাই এ বিষয়ে পরামর্শ করিবার জন্য দত্ত মহাশয় ও মেজদিদির কাছে যাইলাম। আগে একবার বাবার কাছে এ কথা তুলিয়া খোঁটা খাইয়াছিলাম। গ্রামের অনেকে আমায় ছি ছি করিয়াছিলেন, সেই থেকে আজ তিন বৎসর চুপ করিয়াছিলাম, মনে ভাবিলাম এখন আবার একবার সব নাড়া চাড়া দিয়া দেখিব—

দেখি সত্যেন্দ্রনাথ (দত্ত মহাশয়) কি বলেন, মেজদিদি বা কি বলেন।

সত্যেন্দ্র নাথ পাঠ্যাবস্থায় পুরা সাহেব ছিলেন। ব্রাহ্ম-সমাজে যাইতেন পৌত্তলিকতাকে ঘৃণা করিতেন, স্ত্রী স্বাধীনতার জন্য তর্ক করিতেন এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এম্ এ পরীক্ষায় প্রথম হইয়া বিলাতে যাইবার জন্যও একবার নাচিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদা সাহেবী পোষাকে থাকিতেন—সাহেবী পোষাকে তাঁর চেয়ে ভাল দেখাইতে আমি খুব কম ভারতবাসিকেই দেখিয়াছি। হঠাৎ তাঁকে দেখিয়া পার্শী অথবা কাশ্মিরী বলিয়া ভ্রম হয়। কিন্তু আমার দেবী-প্রতীমা মেজদিদির পবিত্র স্নিগ্ধ সাহচর্য্যে তাঁহার এ সব ভাব এখন অনেকটা গিয়াছে। (যাক্ সে সব কথায় আমার কাজ নাই)। মেজদিদি আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী-রূপিণী, তাঁর সহোদর হইয়া আজ আমিও ধন্য।

সত্যেন্দ্রবাবু মেজ'দিদিকে উচ্চ শিক্ষা দিয়াছেন, আবার মেজদিদিও তাঁহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। যেন সত্যেন্দ্র নাথ অগ্নি, মেজদিদি তুষার—দুইয়ের সংস্পর্শে জীবনী-শক্তি-দাত্রী স্নিগ্ধ স্রোতস্বতী বহিয়াছে। মেজদিদি প্রথমে ভারি গোঁড়া ছিলেন, সত্য বাবু একদম্ সাহেব ছিলেন, এখন দুটীতে মিশিয়া দুজনেই সহজ পথে চলিতে শিখিয়াছেন। এই সামঞ্জস্য সুন্দর ও স্বাভাবিক—দেখিয়াও সুখ।

আমার পরামর্শ লইবার এমন স্থান আর আমি কোথায় পাইব? তাই এখানে আসিলাম, মেজদিদির কাছে গিয়া আমার উদ্দেশ্য জানাইলাম, কিন্তু তিনি আমায় অত্যন্ত তিরস্কার করিয়া বলিলেন "তুই আজ কাল বড় বেহায়া হয়েছিস্, বছর কএক ক'লকাতায় থেকে একেবারে উৎসন্ন গেছিস্, বড় মুড়ুলী করিতে শিখেছিস্, আমার সামনে দাঁড়াইয়া ওসব কথা বলিতে একটু লজ্জাও করে না? আগে যে ক'লকতা থেকে বাড়ী এলে 'বৌ কেমন আছে'—জিজ্ঞাসা কর্‌লে লজ্জায় কান লাল হ'য়ে উঠ্‌তো সাম্‌নে দাঁড়াতে পার্‌তিস্ না! আর আজ বাবা নাই ব'লে, সংসারের কর্ত্তা সেজে বড়——" আর বলিতে পারিলেন না, বাবার নাম করিতে কোমল-হৃদয়া মেজদিদির চক্ষে ঝর্ ঝর্ করিয়া জল বহিয়া আসিল, আমি বেকুব হইয়া ফিরিবার চেষ্টা দেখিলাম, তখন অর্দ্ধ রুদ্ধ কণ্ঠে চক্ষু মুছিতে মুছিতে আমায় ডাকিয়া বলিলেন "এখন বাড়ী যাস্‌নে, আমার ঘরে গিয়া বোস্, খাবার নিয়ে যাচ্ছি।" আমি তাঁহার ঘরে না গিয়া, তাঁহার অনুমতি লইয়া, বাহিরে সত্যেন্দ্র নাথের কাছেই আসিলাম।

মেজদিদি আমার চেয়ে চারি বৎসরের মাত্র বড়। কিন্তু তাঁহার চেয়ে অধিক ভয় ও ভক্তি করি, এমন কেহ আপাততঃ পৃথিবীতে জীবিত নাই। আমি যে ঠিক হিসাব করিয়া বা বিচার করিয়া কর্ত্তব্যবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া এরূপ করি তাহা

নহে। তাঁহার সেই আদর মাখানো বীণাধ্বনিবৎ কণ্ঠস্বরে, আর সর্ব্বোপরি তাঁহার সেই বাসন্তী প্রতীমার মত স্নিগ্ধোজ্জ্বল দেবী-মূর্ত্তিতে কি যে শক্তি লুক্কাইত আছে, তাহা আমি বুঝিতে পারি না, যেন তাঁর কাছে আমি কতক্ষুদ্র, বয়সে কত ছোট, জ্ঞানে কত মূঢ়। বুঝিয়াছি, এ শক্তি কেবল সেই মহা-শক্তির সাক্ষাৎ সজীব প্রতিমূর্ত্তি নারীতেই সম্ভবে,—আর কোথাও নহে—How divine a thing a woman can be! কেন, কে না দেখিয়াছ, চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া তরুণী, কেমন গৃহিণী সাজিয়া, একটি বৃহৎ সংসারের "মা" হইয়া বসিতে পারেন? নারী যে মায়ের জাতি, এই মায়ের জাতির প্রতিও যে নরাধম অধর্ম্মাচরণ করিতে পারে, সে নরকের কুক্কুর? আর এই পবিত্র নারী-জন্ম গ্রহণ করিয়া যাহার মা হইবার শক্তি নাই, পুরুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণের শক্তি নাই, তাহাকে কি বলিব? থাক—

(৩)

বৈঠকখানায় গিয়া সত্যেন্দ্রনাথের কাছে এ কথা পাড়িতেই তিনি বলিলেন, "তোমার আগে থেকেই সে ভাবনা আমার মনে আসিয়াছে, কা'ল রাত্রিতে এ কথা লইয়া তোমার মেজদিদির সঙ্গে আমার ভয়ানক ঝগড়া হইয়া গিয়াছে, তিনি তো রাগিয়াই অস্থির। এখন কি করি বল দেখি?"

আমি। মেজদিদির অমত থাকিলে, এ প্রসঙ্গ লইয়া অগ্রসর হওয়া কতদূর সম্ভব ও উচিত হইবে বলিয়া বিবেচনা কর?

স। এক বিন্দুও নহে, আমার সাধ্য কি? তুমি তো অজ্ঞান নও, তাঁকে বিলক্ষণ জান তো।

আ। কিন্তু ভবিষ্যতে তাঁহাকে যুক্তি দ্বারা বুঝাইতে পারিবে বলিয়া বোধ হয় কি?

স। বোধ তো হয়। আবার ইহাও জানি, আমার মত থাকিলে অবশেষে তাঁর মত হইবেই—তিনি ইচ্ছা করিয়া আপনার মত আমার মতে ডুবাইয়া ফেলিবেন। কিন্তু কেবল আমার জিদ্ রক্ষার জন্য তাঁহার স্বাধীন স্বতঃ উদ্ভুত মতকে আমার মতের অনুবর্ত্তী করিতে আমার প্রবৃত্তি হইবে না—সত্যেন্দ্রনাথের তাহা সাধ্যাতীত—

সত্যেন্দ্রনাথের চক্ষু ছল ছল হইল, কণ্ঠস্বর ভারী হইল। স্বর্গ আর কোথায়?—আমিও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম। সত্যেন্দ্রনাথ অতি কষ্টে দুই তিন বার ঢোক্ গিলিলেন, চক্ষু দুইটি আবার একটু শুক-ইয়া আসিল, মুখের অন্যমনস্কতার ভাব গিয়া একটু সাধারণ ভাব আসিল, তখন আমি নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—"এখন তবে উপায়"?

স। তোমার মেজদিদির প্রবল ভগ্নী-স্নেহ এবং তাঁহার কুশাগ্র বুদ্ধি আমায় সাহায্য করিবে, এই ভরসায় আশা করি-তেছি যে, অবশেষে তাঁহার মত হইবে। এখন

হঠাৎ বড় ঘা লাগিয়াছে—এত পুরুষের বংশপরম্পরাগত সংস্কার কোথায় যাইবে ?

আ। তারপর—সরলা ?—

স। সে তখন আমি বুঝিয়া লইব—সে ভার আমার।

আ। পাত্র ? পুরোহিত ?

স। সেজন্যও তোমাকে ভাবিতে হইবে না—সে সকল ভারও আমার।

আ। এখন সমাজ।

স। সেইটাই প্রধান কথা। দেখি, কতদূর কি করিয়া তুলিতে পারি। সর্ব্বপ্রথমে চন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়কে পাড়িতে হইবে। তিনিই গ্রামের ও সমাজের নেতা, প্রবীণ, জমিদার, আবার এম্-এ, বি-এল্. কিন্তু তিনি বড় গোঁড়া। তাঁকে এ বিষয়ে পাড়িতে পারিলে আর ডরাই না। তাঁর প্রতি আমার অটল শ্রদ্ধা, তাঁর অনভিমতে আমি কিছুই করিতে পারিব না। অন্য লোকের জন্য বড় ভাবি না, সব ঠাণ্ডা করিতে পারিব। অধিকন্তু, গ্রামে ও সমাজে এতগুলি নব্য ও শিক্ষিত যুবক আছে, তাহারা প্রত্যেকেই আমাকে বিলক্ষণ মান্য করে, এবং প্রত্যেককেই বুঝাইলে বুঝিবে। কারণ, আমি জানি, তাহাদের মধ্যে কেহই স্ত্রীলোককে কেবল পুরুষের সুখের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে করে না, পরন্তু স্ত্রীজাতিকে বিলক্ষণ শ্রদ্ধা করে। তাহারাও এ সৎ-কার্য্যে উদ্যোগী হইয়া আমার ও ভবিষ্যৎ সমাজের সাহায্য করিবে। এখন বাকি রহিলেন তর্ক-রত্ন মহাশয়।

আ। হাঁ, তিনি তো এ কথা শুনিলে আমাদের আর মুখদর্শন করিবেন না, তাঁকে লইয়াই সমস্যা। স্বর্গীয় বিদ্যা-রত্ন মহাশয় আমাদের সঙ্গে মিশিতেন, আমাদের কাছে পাশ্চাত্য দর্শন-শাস্ত্র শুনিতেন, আর হাসিয়া হাসিয়া আমাদের সব 'ইংলিশম্যান' বলিতেন। তিনি আমাদের সঙ্গে সরল ভাবে কত কৌতুক করিতেন, কত বেদান্তের কথা বলিয়া আমাদের কিশোর প্রাণে অমৃত বর্ষণ করিতেন। এ সব দেখিয়া তর্ক-রত্ন ঠাকুরদাদা জ্বলিয়া যাইতেন, বলিতেন "বিদ্যারত্ন ভায়াও দেখ্‌ছি গোল্লায় গেলে"।

স। তিনি আমার উপরেও সম্প্রতি একটু চটিয়াছেন। সে দিন সকাল বেলা আমার এখানে বেড়াইতে আসিয়া হঠাৎ বিশ্বপ্রেমে অভিভূত হইয়া আমার পিণ্ডের যোগাড় করিতেছিলেন, কিন্তু আমার পিণ্ডের লোভ কম দেখিয়া বড় হতাশ হইয়াছেন, একটু রাগও করিয়াছেন।

আ। তা'র কারণ ?

স। তার কারণ,—যেহেতু তোমার মেজদিদি-রূপ বৃক্ষে আজিও ফল ধরিল না, সেই হেতু, তাঁহার ন্যায়শাস্ত্রের উপদেশ অনুসারে, আমাকে এতদিন বৃক্ষান্তর অবলম্বন করা অর্থাৎ আর একটী স্ত্রীরত্ন সংগ্রহ করা উচিত ছিল। এতদিন যে করি নাই, ইহা অপেক্ষা আমার বোকামীর প্রমাণ আর হইতে পারে না। তাঁর সন্ধানে যে একটী ভাল পাত্রী আছে, সে প্রলোভনও সম্মুখে ধরিয়া

ন্যায়ের যুক্তির অঙ্গ-পূরণ করিতে ক্রটী করেন নাই।

আ। তারপর?

স। আমি বলিলাম "সাধু, সাধু!!"

আ। তারপর?

স। তারপর আমাকে এ বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিবার জন্য অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন।

আ। চিন্তা করিয়াছিলে বোধ হয়?

স। আল্‌বৎ। গভীর চিন্তা-সাগরে নিমগ্ন হইয়া, পাক্কা ছয় ঘণ্টা হাবুডুবু খাইয়া, যে সিদ্ধান্ত-রত্নের উদ্ধার করিয়াছি, তাহা সংক্ষেপে এই যে,—বুড়া বয়সে কে আবার এপ্রেণ্টিস্ খাটিতে বসিবে?

আমি বলিলাম "এখন বাজে কথা রাখ, কাজের কথা বল।'

স। কাজের কথা আর কি, যেমন করিয়া হৌক তর্ক-রত্ন মহাশয়কে তো চাই। যা হৌক, সমাজে যখন তাঁর এতদূর পসার প্রতিপত্তি যখন তিনি খবরের কাগজে মধ্যে মধ্যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে আর্টিকেল্ লেখেন, তাঁকে চাই বৈ কি। নগত কিছু বেশী করিয়া ঝাড়িলেই "মাকড় মারিলে ধোকড়" হইবে। দেখা যাক্। তুমি একবার তাঁর ওখানে যাও, তোমার সঙ্গে বনে ভাল। আমি ততক্ষণ চন্দ্রনাথ বাবুর কাছ থেকে হ'য়ে আসি এ ব্যাপারে ঝাঁটা লাথি অনেক খাইতে হইবে, মেজাজ ঠিক রাখিও—তোমার তো যে মুখ।

আ। আমার মুখের জন্য আর ভাবিতে হইবে না। শ্রীমতীর কল্যাণে এখন এ মুখ অনেক নরম হইয়া আসিয়াছে। তবে মাঝে মাঝে ছুট্ ছাট্ বাহির হইয়া পড়ে—সেটা আগেকার অভ্যাস দোষে।

স। চিরকাল কি পাগল থা'কতে আছে? ছোট বেলায় তোকে সকলে পাগলই বলিত, যাকে যা ইচ্ছা বল্‌তিস্—কেউ কিছু মনে ক'রত না। দেখ্ দেখি, তর্ক-রত্ন মহাশয় ব্রাহ্মণ, আর তুই তাঁকে কি না বলিস্, কিন্তু তিনিও তোকে কিছু বলেন না। এখন বড় হয়ে'ছস্ একটু বুঝে চল্‌তে হবে।

আ। যে আজ্ঞা প্রভু—যে আজ্ঞা।

(৪)

মেজদিদি যে খাবার আনিয়াছিলেন, তাহা গো-গ্রাসে উদরস্থ করিয়া প্রকৃতিস্থ হইলাম এবং তর্ক-রত্ন ঠাকুরদাদার রাশ-মন্দিরাভিমুখে চলিলাম। তখনো বেশ বেলা আছে।

শিষ্য, সেবক ও যজমানদের কল্যাণে এবং মোটা মোটা শ্রাদ্ধের বিদায়ের দৌলতে তর্ক-রত্নমহাশয়ের অবস্থা বেশ ভালই। পাঁচ ছয়টা কুঠারী, দরদালান, পূজার দালান, একটি ফুলবাগান ইত্যাদি সবই আছে, কোন অভাব নাই। বামুন কায়েতের ঘরে মেয়েরও অভাব নাই, দুটা খাইতে দিতে পারিলেই যখন ইচ্ছা, যেমনটী ইচ্ছা, যত গুলি ইচ্ছা পাওয়া যায়। এক গৃহিণীর একটু বয়স বেশী হওয়াতেই গৃহিণ্যন্তর গ্রহণ করিয়াছেন। তবে দুঃখের বিষয়, শুনিয়াছি তাঁহার শেষ

গৃহিণী কিছু প্রখরা—তেমন good boy টীর মত পোষ মানিতেছেন না। বলা বাহুল্য তর্ক-রত্ন মহাশয় কুলীন বংশ সম্ভূত। তাঁহার পিতামহের আমল হইতেই "ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের" ব্যবসা আরম্ভ হইয়াছে। বর্ত্তমানে ইনিও সেই পথাবলম্বন পূর্ব্বক চারিটী গৃহিণী পরিবেষ্টিত হইয়া চতুর্ব্বর্গ-ফল-লাভ করিতেছেন। যেহেতু শাস্ত্রে বলে "সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ," এবং তিনি খোদ এক জন হিন্দু ধর্ম্মের স্তম্ভস্বরূপ, এজন্য চারিটী জীবন্ত মেয়েমানুষকে, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ, যথাক্রমে এই চারিটী সোপান-রূপে নিয়োজিত করিয়া, তার উপর দিয়া স্বর্গে উঠিবার আয়োজন করিতেছেন।

আমি গিয়া বরাবর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলাম। যাহারা সহর-বাসী তাহারা হয়ত এ কথা শুনিয়া শিহরিবে, কিন্তু আমরা পাড়াগাঁয়ের লোক আমাদের অতশত নাই। গিয়া দেখি ছোট ঠান্‌দিদি দালানে বসিয়া মেজ-ঠানদিদিকে দিয়া চুল বাঁধাইতেছেন। তিনি বাঁ হাতে চুলের গোড়ার সরু ফিতার দুই অগ্রভাগ মুখের দুই পাশ দিয়া আনিয়া, টানিয়া ধরিয়া আছেন, এবং ডা'ন হাতে দো ঠেঙ্গো আয়না খানিকে অনেক রকম করিয়া একা'ত ওকা'ত করিয়া ধরিয়া, অতি মনোযোগের সহিত তাহার পেটের মধ্যে চাপিয়া আছেন। তাঁর মুখে আনন্দের সঙ্গেও যেন একটু বিরক্তির ভাব মাখান, —বোধ হয় আয়নাখানিকে কোন রকম করিয়া ধরিয়া মুখ খানা এর চেয়ে কেন ভাল দেখাইতেছে না, ইহাই বিরক্তির কারণ। আশে পাশে চিরুণী,কাঁটা, ফিতা, গুছি, তেলের বাটি, সিঁদুর কৌটা, তরল আল্‌তার শিশি, একখানি রঙ্গিন আধ্-ভিজা গামছা ইত্যাদি ছড়ান রহিয়াছে। আমার চটি জুতার শব্দ নিকটস্থ হইতেই ছোট-ঠান্‌দিদি একটু সাম্‌লাইয়া বসিলেন। মেজ ঠান্‌দিদি আহ্লাদ সহকারে আমাকে সম্ভাষণ করিলেন "এস দাদা এস, বলি আজকাল না'তবৌকে ফেলে বুঝি বাড়ী থেকে বেরুতে পারিস্ নে? আগে যখন ক'ল্‌কেতা থেকে বাড়ী আস্‌তিস্, তখন যে সকলের আগে এ'সে আমাদের সঙ্গে দেখা কর্‌তিস্, সমস্ত গাঁ রৈ রৈ ক'রে বেড়াতিস্, এখন বুঝি না'ত বৌ আর বেরুতে দেয় না?" আমি বলিলাম "হাঁ গো হাঁ, এখন ঠাকুর দাদা কোথায়?" তিনি বলিলেন "কেন?" আমি বলিলাম "তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করা ছাড়া আমার আর কি কাজ থাকে?— কোথায় তিনি?" মেজ ঠান্‌দিদি ঠোঁট দুটী দাঁতে একটু চাপিয়া, ভ্রু-দুটী টান করিয়া, সেই সঙ্গে চখের তারা দুটি উপরে তুলিয়া ঘাড় উঁচু করিয়া ইসারা করিলেন "উপরে" অর্থাৎ ছাদে।

ছোটঠান্‌দিদি এতক্ষণ আঁচলে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া আছেন। তাঁর মাথা অবশ্য খোলা, যেহেতু মেজ ঠানদিদির হাত চলিয়াছে, বিউনি প্রায় শেষ হইয়াছে। আমার মুখ চুলকাইয়া উঠিল, বলিয়া ফেলিলাম ছোটঠান্‌দিদি! মুখত ঢাকিলে,

মাথা যে খোলা, আমার তো খুব মান রাখিলে দেখ্‌ছি”। বলিতে বলিতে ছোট ঠান্‌দিদির অঙ্গ-যষ্টি থাকিয়া থাকিয়া সামান্য ঝাঁকিয়া উঠিতে লাগিল, বুঝিলাম নাভিকুণ্ড হইতে হাসির কতকগুলি ক্ষুদ্র বুদ্বুদ ক্রমে উপর পানে উঠিতেছে। মেজ-ঠান্‌দিদি আমায় বলিলেন “তুই শালা আবার মানুষ”, আমি বলিলাম “উহুঁ”। এতক্ষণে হাসির বুদ্বুদ গুলি ছোট ঠান্‌দিদির গলা ছাড়াইয়া উপরে উঠিয়া গিয়াছিল, এবং তাঁহার অধরোষ্ঠ দাঁতে চাপা দেখিয়া পথ না পাইয়া, নাসিকা দ্বারা বাহির হইতে লাগিল। সেই চাপা শব্দের সঙ্গে সঙ্গে মেজ ঠান্‌দিদির একটি চাপা চড় চপাট শব্দে তাঁর পিঠের উপর পড়িল, আমিও সময় নষ্ট করা অন্যায় বিবেচনায় চটির পট্ পট্ শব্দ করিয়া সিঁড়ির ঘরের দিকে চলিলাম। দেখিলাম তর্করত্নের ভ্রাতুষ্পুত্র-রত্ন শ্রীমান বিভূতি ভূষণ আল্‌-বার্ট ফ্যাসনে কেশ বিন্যাস করিয়া পার্শ্বের ঘর হইতে বাহির হইয়া আমায় বলিলেন “কিহে—বাবাজি যে?” আমি একটা ‘হুঁ’ দিয়া পট্ পট্ করিয়া বীর দর্পে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম। ইদানীং তর্করত্ন মহাশয়কে দেখিয়া আমার বড় হাসি পাইত, কারণ তাঁর দিকে চাহিলেই “অলিভার টুইষ্টের” গোড়ায় যে এক “বীডলের” ছবি আছে, আমার তাই মনে পড়িত। ঠিক তেমনি তাঁর কান্তি-পুষ্টি। এজন্য সিঁড়িতে একটু দাঁড়াইয়া মুখ গম্ভীর করিয়া লইলাম। বলিয়া রাখি,—বিভূতি ভূষণ আমারই বয়সী।

উপরে গিয়া দেখি তর্করত্ন ঠাকুরদাদা আলিসার উপর একটী নেড়া সেজির টবের পার্শ্বে বসিয়া আকাশের পানে চাহিয়া আছেন। বাম হস্তে ভুঁড়ীতে হাত বুলাইতেছেন এবং দক্ষিণ হস্তে এক খানি ঝালর দেওয়া পাখা, মধ্যে মধ্যে নাড়িতেছেন। বেলা অধিক নাই, গাছের মাথায় কোথাও একটু আধটু ভাঙ্গা চুরা রৌদ্র আছে, গরমও বিলক্ষণ পড়িয়াছে। আমায় দেখিয়াই একটু থতমত হইয়া বসিলেন, বলিলেন “কিরে পাগ্‌লা! তোকে আর আজ কা’ল দেখি না কেন?”

“আজ্ঞে না দেখ্‌লে আর কি করিব? আমিতো পালিয়ে থাকি না। বলি এখানে বসিয়া আকাশ পানে চাহিয়া আছেন কেন? সেজ ঠানদিদিতো আজ এক মাস বাপের বাড়ী গিয়াছেন, এতেই এত?”

তর্ক—দুর শালা উল্লুক! কেবল পাগ্‌লামী ক’রেই রাত্রিদিন বেড়াবি।—ওরে তোর নাকি বৌ পছন্দ হয় নাই? তোর দিদি বলে “ঘরে এক অলক্ষ্মী ঢুকে অলক্ষণ হ’য়েছে।” তুইও নাকি বিয়ের পর থেকে কেমন তর হ’য়ে গেছিস্? তুইতো বরাবরই পাগল, নইলে আর আমার সঙ্গে ইয়ার্কি দিস্? কলিকাল কি না! আমি আরও যাতে তোর ভবিষ্যতে ভাল হয়, সেই জন্য বেছে

বেছে এই মেয়ে ঠিক ক'রলাম, এমন কুলীনের মেয়ে, তারা বনিয়াদি ঘর—

আ—সেজন্য চিরবাধিত আছি।

তর্ক—তবে তোর বোন অমন কথা কেন বলে? আবার ছুঁড়ী বলে কি না "শ্রী-হীনা স্ত্রীলোক লক্ষ্মী-ছাড়া—কারণ শ্রী অর্থেই লক্ষ্মী—শাস্ত্রের বচন", সরোজিনী আজ কাল ভারী পণ্ডিত হ'য়েছে! আমায় আবার সব পুরাণ থেকে নজির শুনায়। বিদ্যারত্ন ভায়া আরও ওকে মাটি ক'রে গিয়েছেন। এদিকে সরোজিনী খুব সাহেবী কায়দায় ঘরদুয়ার সাজিয়ে রাখে। বোধ হয় সত্য নিজে পর্য্যন্ত কখনও তাকে একটা চুরুট এনে দিতে অনুরোধ করে না। সে নাকি বাড়ী থেকে এক পা গাড়ী ভিন্ন যায় না, সিল্কের পোষাক না প'রে বাড়ী থেকে বেরোয় না। আবার শুনেছি বিদ্যারত্নকে সে নিজে হাতে তামাক সেজে এনে দিয়েছে। নল তৈয়ার করিবার জন্য পাতা পেড়ে এনে দিয়েছে—এদিকে তো বাড়িতে এত চাকর চাকরাণী। সে আমায় কি না বলে "আপনার কি প্রফুল্লর প্রতি একটু দয়াও হয় নাই?" আরে গেলরে—

আ—সে সব কথায় কি কান দিতে আছে?

তর্করত্ন মহাশয় হঠাৎ বলিলেন "তোর মুখখানি বেশ। তবে তোর পেটে পেটে অত নষ্টামি কেন?"

আমি বলিলাম, "জন্মলগ্নের দোষ। বলি সে কথা যাক্, এখন একটু ভক্তি রসে মন দিলেই তো বেশ ভাল দেখায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ নিসৃত সেই গীতামৃতখানি কি এ বয়সে পছন্দ হয় না?

তর্ক—আমার হয় না, তোর নাকি হয়? তোরা ত ঘোর নাস্তিক। আমি যে গীতার অনুবাদ ক'রে রেখেছি, শীঘ্রই ছাপতে যাবে, আহা! ঠাকুর কি লীলাটাই করেছেন!

(ক্রমশঃ)

বারাণসী-তত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ভদ্রলোকের বাটীতে দুধের আবশ্যক। দুগ্ধ ভিন্ন গৃহস্থের চলে না। সন্তান সন্ততি সকল বাটীতেই আছে। লক্ষ্মীর কৃপা যত হউক না হউক ষষ্ঠীর কৃপা বিলক্ষণ। সুতরাং দুধ লোকমাত্রেরই নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু। দুগ্ধবিক্রেতা "ঘোষী" ও গোয়ালা নামে খ্যাত। তন্মধ্যে ঘোষীগণ হিন্দু। তাহারা কেবল মাত্র মহিষ পুষিয়া থাকে। মহিষের দুগ্ধ বিক্রয় ব্যতীত তাহাদের অন্য কোন পেষা নাই। তাহারা হালোয়াইকে (ময়রাকে) দুধ বিক্রয় করে এবং খোয়া (ক্ষীর) প্রস্তুত করিয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশে ক্ষীর পাতলা

হইয়া থাকে কিন্তু এদেশের ক্ষীর গাঢ়। গোয়ালারা আহীর বা গাড়ারিয়া জাতি ভুক্ত। তাহারা গরু ও মহিষ পুষিয়া থাকে। ইহারা দুগ্ধ প্রায় বিক্রয় করে না। তবে কেহ ফরমাইস করিলে তাহা যোগাইয়া থাকে। তাহারা বাটীতে আবশ্যক মত দুধ দেয় এবং গাভী লইয়া লোকের দুয়ারে দোহন করিয়া দেয়।

উত্তম শ্রেণীর মহিষের মূল্য ৭০ বা ৮০ টাকা। এ সকল মহিষ ১২ হইতে ১৬ সের পর্য্যন্ত দৈনিক দুগ্ধ দিয়া থাকে। এই দুগ্ধ হইতে সের করা এক বা দেড় ছটাক নবনীত অথবা ঘৃত প্রস্তুত হইয়া থাকে। সাধারণ শ্রেণীর মহিষের মূল্য ২০ হইতে ৩০ টাকা। এ সকল মহিষ ৭ হইতে ১২ সের পর্য্যন্ত দুগ্ধ দিয়া থাকে। উত্তম শ্রেণীর গাভীর মূল্য ২০ হইতে ৪০ টাকা। ৮ হইতে ১৪ সের দুগ্ধ উত্তম শ্রেণীর গাভী হইতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর গাভীর দর ৪ হইতে ১০ টাকা। সে সকল গাভী ২ হইতে ৫ সের পর্য্যন্ত দুগ্ধ দিয়া থাকে।

প্রথম শ্রেণীর মহিষ পুষিতে দিন ॥৵০ দশ আনা খরচ পড়ে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ঐ ঐ ।৵০ আনা।
প্রথম শ্রেণীর গাভী ঐ ॥০ আনা।
দ্বিতীয় ঐ ঐ ঐ ৶০ আনা।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মহিষের গোবর হইতে দিন দুই পয়সা এবং গাভীর গোবর হইতে সওয়া দুই পয়সা লাভ হইয়া থাকে।

আজকাল টাকায় দুগ্ধ ৮ সের এবং ঘৃত ১৩ ছটাক। নবনীত টাকায় এক সের। ঘোষী বা গোয়ালারা ধর্ম্মত কার্য্য করে না। সুতরাং তাহাদিগের উপর বিশ্বাস রাখা যায় না। তাহারা প্রত্যেক তিন সের দুগ্ধে এক পোয়া ঘোল মিশাইয়া দেয়। মহিষ বৎসরে ১০ মাস এবং গাভী আট মাস দুগ্ধ দিয়া থাকে। মহিষ বা গাভীর দুধ ৬ মাস কাল পর্য্যন্ত পূর্ণ মাত্রায় থাকে পরে এক তৃতীয়াংশ এবং তৎপরে দেড় ভাগ কমিয়া যায়।

মহিষ হইতে কিরূপ লাভ হইয়া থাকে তাহা বলিতেছি :—

ষোল সের দুধ হইতে ৬ মাস পর্য্যন্ত নবনীত ৪ ছটাক, ঘোল ৩৷৷ সের, খাঁটি দুধ ১২ সের পাওয়া যায়। ইহার দাম যথাক্রমে চারি আনা, সাড়ে পনের আনা এবং ঘুঁটের দাম দুই পয়সা। একুনে ১ টাকা ।০ চারি আনা ৬ পাই।

মোট কথা খরচ খরচা বাদ দুগ্ধ বিক্রেতার বৎসরে ১০৩ টাকা পর্য্যন্ত লাভ হয়।

(ক্রমশঃ)

রাজা রাম মোহন রায়ের স্মৃতিসভা।

৮২ বৎসর পূর্ব্বে ২৭এ সেপ্টেম্বর তারিখে ইংলণ্ডের বৃষ্টল নগরে নবাবঙ্গের জন্মদাতা মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় দেহত্যাগ করেন। তিনি তাঁহার জন্ম দ্বারা পূর্ব্ব এবং মৃত্যুদ্বারা পশ্চিমকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের সুধীসমাজ বঙ্গের এই মহাপুরুষকে বৎসর বৎসর এই দিনে শ্রদ্ধার অঞ্জলি প্রদান করেন।

গত সোমবার বেলা সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় রামমোহন লাইব্রেরী গৃহে এই মহাপুরুষের স্মৃতি সভার অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন।

রাজার স্বরচিত "ভাব সেই একে" সঙ্গীতে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সঙ্গীতান্তে পূজনীয় আচার্য্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় অতি সংক্ষিপ্ত সময়োচিত প্রার্থনা করেন। অতঃপর আর একটী সঙ্গীত হয়। তৎপর শ্রীযুক্ত প্রশান্তকুমার সেন মহাশয় রাজার বিশেষত্ব বর্ণনা করিয়া একটি বক্তৃতা করেন। রাজার সমাধি দর্শন করিয়া তাঁহার হৃদয়ে যুগপৎ যে বিস্ময় ও আনন্দের সঞ্চার হইয়াছিল, তিনি তাহার আবেগ পূর্ণ ভাষায় উল্লেখ করিয়াছিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা করেন।

আমরা সেই সুদীর্ঘ বক্তৃতার মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশ করিলাম—

সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতা।

আপনারা আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তার মুখে শুনেছেন যে রাজা রামমোহনের কর্ম্মজীবনের বৈচিত্র্য নানাদিকে প্রকাশ পেয়েছিল। তাঁর জীবনের এই কর্ম্ম-বৈচিত্র্য বর্ণনায় আমি অসমর্থ। আমি কেবল তাঁর জীবনের একটি কথা আপনাদের নিকটে বলিব। এতাবৎ কাল আমরা তাঁর স্মৃতি সভায় কেউ তাঁহার রাজনীতি কেউ শিক্ষা বিস্তার কেউ সমাজ সংস্কার এইরূপে খণ্ড খণ্ড করে তাঁর জীবনের এক একটা দিক আলোচনা করেছি। এমন টুক্‌রা টুক্‌রা করে কোন মহৎ-চরিত্র আলোচনা করা আমি অন্যায় বলে মনে করি, ইহাতে সম্মান না করে অপমান করা হয়। ঠিক আসল যে শক্তিটি তাঁর জীবনে সঙ্গীতের মত বেজে উঠেছিল তার দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়ে না। বিশেষতঃ যে খানে রাজা রাম মোহনের মহত্ত্ব, তাঁর সেই দিকটা বাদ দিয়ে আমরা যদি তাঁকে কেউ আট আনা, কেউ বারো আনা স্বীকার করি তা'হলে তাঁর অপমানই করা হবে। যাঁরা মহাপুরুষ তাঁদের হয় সম্মান করে ষোল আনা স্বীকার করতে হবে, না হয় অস্বীকার ক'রে অপমানিত করতে হবে,

এর মাঝামাঝি অন্য পথ নেই। আমি মনে করি, সত্যকে আশ্রয় করে, রামমোহন তাঁর দেশবাসীর নিকটে তখন যে নিন্দা ও অসম্মান পেয়েছিলেন, সেই নিন্দা ও অপমানই তাঁর মহত্ত্ব বিশেষভাবে প্রকাশ করে। তিনি যে নিন্দা লাভ করেছিলেন সেই নিন্দাই তাঁর গৌরবের মুকুট। লোকে গোপনে তাঁহার প্রাণবধেরও চেষ্টা করেছিল।

বৈদিক যুগে ঋষিরা এক সময়ে সূর্য্যকেই দেবতা বলে পূজা করিতেন। আবার উপনিষদে ঋষি সেই সূর্য্যকেই বলেছেন "হে সূর্য্য, তুমি তোমার আবরণ অনাবৃত কর, তোমার মধ্যে আমরা সেই জ্যোতির্ম্ময় সত্যদেবতাকে দেখি।" সেকালে যতই পূজা, হোম, ক্রিয়া, অনুষ্ঠান থাকুক না কেন, সেই সকলের আবরণ ভেদ করে ঋষিরা সত্যকে দেখেছিলেন। যে ঈশোপনিষদে ঋষি সূর্য্যকে অনাবৃত হতে আহ্বান করেছেন সেই উপনিষদেরই প্রথম শ্লোক হচ্চে—

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ
জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা, মা গৃধঃ
কস্যস্বিদ্ধনং॥

সকলই সেই ঈশ্বরকে দিয়া আচ্ছন্ন করা, দেখ্‌তে হবে এবং তাঁর দান ভোগ করতে হবে।

রাজা রামমোহন এই এক অবিনাশীকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই এককেই তিনি দেশাচার প্রভৃতির জঞ্জাল হতে অনাবৃত করে, কেবল বাঙ্গালীকে নয়, ভারতবাসীকে নয়, পৃথিবীবাসী সকলকে দেখালেন। তিনি তাঁকে জেনে প্রাচীন ঋষির মত বল্লেন—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥

এই খানেই তাঁর বিশেষত্ব। তিনি সমস্ত আবরণের মধ্য হতে এককে আবিষ্কার করেছেন। তিনি একদিকে প্রাচীন ঋষি, আবার অন্যদিকে তিনি একেবারে আধুনিক, যতদূর পর্য্যন্ত আধুনিক হওয়া যায় তিনি তাই আগে এই বিশ্বাস ছিল, এই ব্রহ্মকে সকলে জানতে পারে না। রামমোহন তাহা স্বীকার করলেন না, তিনি সকলকেই বল্লেন—"ভাব সেই একে।"

আজকার সভার এই প্রারম্ভ সঙ্গীত—"ভাব সেই একে" ইহাই রামমোহনের হৃদয়ের অন্তর্নিহিত কথা।

যিনি যাহাতে বড়, তাঁকে সেই দিক দিয়ে সম্মান দেখাতে হয়। বিদ্যায় বড় যিনি, তিনি বিদ্বান বলে সম্মান পান। রামমোহনকে সেই সকল দিক দিয়া দেখলে চল্‌বে না, তিনি এককে, সত্যকে লাভ করেছেন, সেই সত্যই তাঁর জীবনের সকলের চেয়ে বড় জিনিষ। তাঁকে স্বীকার করেই তিনি নিন্দার মুকুট উপহার পেয়েছেন।

পৃথিবীর অন্য সব মহাপুরুষের মত তিনি টাকা কড়ি, বিদ্যা, খ্যাতি কিছুর দিকে দৃষ্টিপাত করেন নি, তিনি তাঁর

সমস্ত জীবন দিয়ে সেই এক সত্যকেই চেয়েছিলেন।

ভীষণ মরুভূমির মধ্যে হঠাৎ এক জায়গায় একটা প্রস্রবণ প্রকাশ পায়। হো'ক না সেটা মরুভূমি, তথাপি সেখানেও ধরিত্রীর বুকের ভিতরে প্রাণের রসধারা আছে। এই ধারা সর্ব্বত্রই আছে। চারিদিকের শুষ্ক নির্জ্জীব সমতল বালুর ক্ষেত্রের মধ্যে এই প্রস্রবণ একান্ত খাপছাড়া বলে মনে হবে সন্দেহ নাই। হয়তো চারিদিক বলবে, "বেশ জড় নির্জ্জীব শান্ত ছিলাম আমরা, হঠাৎ কোত্থেকে এল এই শ্যামলতা ও জলধারার কলধ্বনি।"

এই শুষ্ক নির্জ্জীব দেশে মুক্তির বাণী, ও জীবনের শ্যামলতা নিয়ে রামমোহন এসেছিলেন। আমরা জোর করে তাঁকে অস্বীকার করতে চাই কিন্তু সাধ্য কি তাঁকে অস্বীকার করি। যে দিকে তাকাই সেই দিকেই তাঁর জীবনধারা দেখতে পাই। আমরা এখন ফল পাচ্চি তাই অনায়াসে গাছের গোড়ার কথা অস্বীকার করচি। রামমোহন আমাদের কাছে আত্মার মুক্তির সংবাদ নিয়ে এসেছিলেন। আমরা এখন বিদেশী কলকব্জা শিখতে চাই, পশ্চিমের অনুকরণে বাইরে থেকে অপকৃষ্ট উপায়ে স্বাধীনতা চাই, সে অসম্ভব। সকল শক্তির যেখানে মধ্যবিন্দু ও প্রাণের যেখানে কেন্দ্র, সেখান থেকে আমরা জীবনধারা লাভ করতে না পারলে, আমরা বাইরের চেষ্টায় মুক্তি পাব না।

অনেকের এই ধারণা আছে পশ্চিমে আধ্যাত্মিকতা নেই, তারা বস্তুতেই বড় হয়ে উঠেছে। আমি তা স্বীকার করি না। আধ্যাত্মিকতায় বড় না হয়ে মানুষ কিছুতেই বড় হতে পারে না। তাদের সেবা, তাদের প্রেম, তাদের ত্যাগের ইতিহাস যাঁরা জানেন তাঁরা একথা কিছুতেই বলতে পারেন না যে পশ্চিমে আধ্যাত্মিকতা নেই।

রামমোহনকে সম্মান করতে হলে তাঁর জীবনের এই শ্রেষ্ঠ সত্যকে বরণ করতে হবে।

তাঁর জীবনের এই আসল কথাটিই আমার বক্তব্য। আর কিছু বলার সাধ্য আমার নেই।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়। উদ্ধৃত

জাপানে স্ত্রীশিক্ষা ও আমাদের কর্ত্তব্য।

আজকার সম্মিলনে কেহ বা আমার পূজনীয় কেহ বা সমবয়স্ক—যাহাদের সহিত একত্রে ব্রাহ্মসমাজের উদার আদর্শে বর্দ্ধিত হইয়াছি—কিন্তু অধিকাংশই আমার কনিষ্ঠ—তাঁহাদেরই বিশেষভাবে আজ সম্বোধন করিতেছি। আমি বক্তা নহি। এ পর্য্যন্ত কোথাও প্রকাশ্য সভায় কিছু বলি নাই—তবে আজ কেন

সম্মত হইলাম। দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিয়া আমার যে অভিজ্ঞতা হইয়াছে, তাহা আপনাদের নিকট প্রকাশ না করিলে আমার কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইবে, তাই স্বাভাবিক সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া আজ দু চারটী কথা বলিব। যদি আমার হৃদয়ের আশা ও উৎসাহের কণামাত্র আপনাদের নিকট প্রকাশ করিতে পারি, তাহা হইলে সুখী হইব।

আমারা যে জিনিস প্রত্যহ দেখি এবং যাহা অনায়াসে পাই, তাহার মূল্য বুঝি না, এমন কি তাহা অবজ্ঞার চক্ষে দেখি। আবার এক সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে কাজ করিতে করিতে আমাদের চক্ষে অভাবগুলিই প্রতিনিয়ত প্রতিভাত হয়, আমরা বড় করিয়া দেখিবার শক্তি হারাই।

এজন্যই আমাদের মাঝে মাঝে দেশভ্রমণে বাহির হওয়া উচিত মনে করি। প্রবাসে গেলেই আমরা প্রতিদিনের বিরক্তিকর ক্ষুদ্র ঘটনাগুলি ভুলিয়া যাই, যেগুলি আমাদের অগোচরে প্রচ্ছন্ন ভাবে আমাদের আনন্দ দিয়াছে, সেগুলিই মনে আসে। দেশের প্রতি ভালবাসা জাগিয়া উঠে এবং দেশের সামান্য জিনিষের সৌন্দর্য্য ও মহিমা দেখিতে পাই। তাহা ছাড়া নূতন স্থানে আমাদের আত্মনির্ভর ও আত্মশক্তি বাড়িয়া যায়। পাশ্চাত্য দেশের রীতি নীতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান পুস্তক হইতেই—পুস্তকে আমরা কেবল আদর্শটাই জানি এবং সেই আদর্শের সহিত আমাদের দুর্ব্বলতার তুলনা করি। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে ভ্রমণ করিয়া তাহাদেরও নৈদন্দিন জীবন দেখিলে তখনই আমরা প্রকৃত বুঝিতে পারি কোনটা ভাল কোনটা মন্দ, কোনটাতে আমরা ছোট, কোনটাতে আমরা বড়। বিদেশে সব চেয়ে আমাদের মনে হয়, সব দেশেই স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ উন্নতি হইতেছে, আমাদের দেশই কেবল সকলের পশ্চাতে পড়িয়া আছে।

পাশ্চাত্য দেশে যাওয়ার আর এক সুফল এই যে, সেখানে আমরা বুঝিতে পারি যে, আমরা এক দেশের সন্তান। সেখানে ভারত সন্তানের মধ্যে হিন্দু মুসলমান নাই, বাঙ্গালী পাঞ্জাবী নাই, ব্রাহ্মণ শূদ্র নাই, সকলেই ভারতের—ভারতবাসীরা আমেরিকাতে হিন্দু অথবা হিন্দুস্থানী নামে খ্যাত। ভারতবর্ষে যাহা সাধন কষ্টসাধ্য, বিদেশে তাহা অনায়াসে সাধিত হইতেছে। বিদেশে যাওয়ামাত্র সকলে ভাই ভাই বলিয়া পরস্পরকে চিনেন—এ এক অদ্ভুত ব্যাপার। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ৮।১০টী প্রদেশে গিয়াছি, প্রত্যেক স্থানেই এই একতার ভাব দেখিয়াছি—এক স্থানে ছাত্রবাসে নিমন্ত্রিত হইয়া দেখিলাম ছাত্রটী রন্ধন ও পরিবেশন করিলেন, নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ পাঞ্জাবী ব্রাহ্মণ ও বাঙ্গালী কায়স্থ সকলে এক সঙ্গে বসিয়া আহার করিলেন, তাঁহারা সকলেই একতাসূত্রে আবদ্ধ।

আমেরিকাতে অধিকাংশ ছাত্রই

অর্থোপার্জ্জন করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করেন। ইহা যে কতদূর শ্রমসাধ্য তাহা আপনারা জানেন। আমাদের দেশের কত দরিদ্র ছাত্র পাচকের কার্য্য করিয়া লেখাপড়া শিখিয়াছেন। আমেরিকাতে এই সব ছাত্রদের মধ্যে পরস্পরকে সাহায্য করিবার প্রবৃত্তি দেখিয়া পুলকিত হইয়াছি—ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীয় যে সব ছাত্র এক নগরে অর্থোপার্জ্জন করিয়া বিদ্যা-শিক্ষা করিতেছেন, তাঁহারা যে সব সময়ে অর্থোপার্জ্জন করিতে পারেন তাহা নহে, কিন্তু তাঁহারা এক সাধারণ ফণ্ড করিয়া যিনি যখন যাহা উপার্জ্জন করেন, তাহা ভাগ করিয়া একে অন্যকে সাহায্য করেন। কঠিন পরিশ্রমে নিযুক্ত কপর্দ্দক-শূন্য এই যুবকদের যেখানেই দেখিয়াছি, কাহারও মুখে নিরাশা বা ম্লানভাব দেখি নাই। আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহে তাঁহাদের হৃদয় পূর্ণ—সকলেরই উদ্দেশ্য জ্ঞানরত্ন আহরণ করিয়া উন্নতি করা। সকলেই দিন গণিতেছেন, কবে কর্ম্মক্ষম হইয়া দেশে ফিরিবেন।

আমাদের ভ্রমণকালে আমেরিকা, চীন, জাপান যেখানেই গিয়াছি, ভারতীয় ছাত্র বা ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে।

পৃথিবীতে এমন স্থান নাই যেখানে ভারতবাসী কোন না কোন কার্য্যোপলক্ষে বাস না করিতেছেন এবং আমরা যতদূর দেখিয়াছি, তাহাতে তাঁহাদের কৃতিত্ব দ্বারা তাঁহারা ভারতের গৌরবই বৃদ্ধি করিতেছেন—ইহা কি কম আনন্দের বিষয়?

আমরা যেখানে গিয়াছি, ভারতীয় ভদ্রলোক ও যুবকদের আতিথ্য ও সেবা পাইয়া ধন্য হইয়াছি। ধন্য হইয়াছি এজন্য যে ভারতবাসীর এখন আত্মমর্য্যাদা বোধ ও আত্মজ্ঞান হইয়াছে—এক সময় ছিল যখন আমরা পরস্পরকে হিংসা করিতাম—এখন আর সে দিন নাই, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমাদের সেবা ও যত্ন যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহারা মাতৃ-ভূমির সেবা করিতেছেন, এইরূপ অনুভব করিয়াছি। যাঁহাদের জীবনে কখন দেখি নাই অথবা আর কখন দেখা হইবার সম্ভাবনা নাই, কি ভারতে কি বিদেশে সেই সকল ভারতবাসী প্রশংসা বা কৃতজ্ঞতার জন্য অপেক্ষা না করিয়া আমাদের অতি আত্মীয়ভাবে সেবা ও যত্ন করিয়াছেন—ঘরের লোকের মতন ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা হইতেই বেশ বুঝা যায় যে, আমাদের মধ্যে আত্মজ্ঞানের উদয় হইয়াছে।

আজ আপনাদের নিকট নারীজাতির পক্ষ হইতে আমার একটী নিবেদন আছে।

এ সম্মিলনে স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে কিছু বলিবার দরকার নাই, কিন্তু ভ্রমণকালে বিভিন্ন দেশের নারীজাতির অবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম স্ত্রী স্বাধীনতা ও স্ত্রীশিক্ষা ব্যতীত কোন দেশের উন্নতি হইতে পারে না। এ কথা

আপনারা সকলেই জানেন, ইহা কিছু নূতন কথা নহে। কিন্তু আপনারা যে জানিয়াও জানিতেছেন না—আপনারা যদি সত্যই তাহা বিশ্বাস করিতেন, তবে কি এরূপ নিশ্চেষ্ট থাকিতেন? কেবল স্ব স্ব কন্যাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইলেই কি আপনাদের কর্ত্তব্য শেষ হইল?

দেশময় নারীজাতি অশিক্ষিত রহিয়াছে, অজ্ঞানান্ধকারে ডুবিয়া রহিয়াছে, তাহার জন্য আমরা কি করিতেছি? স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ পড়িয়াছি, অনেক কবিতা দেখিয়াছি, কিন্তু কায কি হইতেছে?

আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষা-প্রণালী কিরূপ হওয়া উচিত তৎসম্বন্ধেই বা ক'জন চিন্তা করিতেছেন! আমাদের ছাত্রদের শিক্ষা-প্রণালী ইংলণ্ডের শিক্ষাপ্রণালী হইতে অনেক পুরাতন, আবার আমাদের স্ত্রী-শিক্ষাপ্রণালীও তাহারই অনুকরণে গঠিত। আমাদের দেশের স্ত্রীশিক্ষা-প্রণালীর পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছে। আমরা যে শিক্ষা বিষয়ে একেবারে পাশ্চাত্যের অনুকরণ করিব তাহার কোন কারণ দেখি না। আমি স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা চাই, কিন্তু যে শিক্ষাতে ভারতনারী তাঁহার নম্রতা, বিনয় ও কোমলতা হারাইবেন সে শিক্ষা চাই না। আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে হইবে, সঙ্কীর্ণতা দূর করিতে হইবে, প্রাদেশিকতা ছাড়াইয়া আমাদের দেশকেও বড় করিয়া দেখিতে হইবে এবং তদর্থে নারীজাতিকে প্রকৃতরূপে শিক্ষা দিতে হইবে।

এখন আমরা ছোটখাট বিষয় লইয়া দিন কাটাইতেছি, কিন্তু এমন দিন ছিল, যখন আমাদের নারীর জ্ঞান আহরণ করিয়া জগতের জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ হইয়াছিল। সে সব দিনের কথা স্মরণ করিয়া আমাদের এই সঙ্কল্প হউক যে ভারতে আবার সে দিন আনিতে হইবে, এবং আপনারা আমাদের সাহায্য করিতে অগ্রসর হউন। আমাদের দেশে নারীশিক্ষা বিস্তারের মূলে কয়েকটী উৎসাহী যুবক ছিলেন জাপানে স্ত্রীশিক্ষার ইতিহাস পড়িলেও তাহাই দেখি। জাপানের যখন প্রথম চেতনা হইল তখন সকলেই পাশ্চাত্য অনুকরণে প্রবৃত্ত ছিলেন। এই পাশ্চাত্য অনুকরণ যাহাতে বন্ধ হয়, যাহাতে জাপানী আচার ব্যবহার সুরক্ষিত হয়, জাপানী স্ত্রীশিক্ষা সেই উদ্দেশ্যে প্রচলিত হইল। জাপানে কোনও দিন অবরোধ প্রথা প্রচলিত ছিল না, কিন্তু তাহাদের সামাজিক প্রণালী ইউরোপীয় নহে। যদিও জাপানী নারী অসঙ্কোচে রাস্তায় বাহির হন, কিন্তু পুরুষদের সহিত তাঁহাদের অবাধে মেশামিশী নাই। স্কুলের বালিকা, বিবাহিত ও অবিবাহিত নারীগণ, ট্রামে, গাড়ীতে পুরুষদের সঙ্গে যাতায়াত করেন বটে, কিন্তু উভয়ের মধ্যে সর্ব্বদাই একটু ব্যবধান থাকে। কয়েকটী জাপানী যুবক, ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করিয়া স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তাঁহারা কি করিয়া জাপানে উচ্চশিক্ষার প্রচলন করিবেন, রাত্রিদিন

এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহারা এক এক নগরে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া নিজেরাই তাহাতে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সকল বিদ্যালয় যখন দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, তখন তাহার ভার যোগ্য ব্যক্তির উপর দিয় তাঁহারা অন্য নগরে বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। এইরূপে তাঁহাদের বিদ্যালয় সমূহ দেশের গণ্যমান্য পদস্থ ব্যক্তিদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, এবং তাঁহারা স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা বুঝিতে লাগিলেন। তাঁহাদের উৎসাহে ও অর্থে বর্ত্তমান স্ত্রীবিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, আমি সেটী দেখিতে গিয়াছিলাম। টোকিও নগরের প্রান্তে একটী ছোটখাট গ্রামের মতন ইহার বিস্তৃতি। প্রাথমিক হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যন্ত উচ্চশিক্ষার বন্দোবস্ত আছে। লেখাপড়ার সহিত গৃহস্থলী, এমন কি আদব কায়দা পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। তাহাতে কেবল যে সুকুমার বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয় এমন নহে, গো-পালন, পশুপক্ষী পালন, কৃষিকার্য্য শিক্ষা দেওয়াও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভূত। জাপানীরা তাহাদের দেশের উপযোগী শিক্ষা-প্রণালী নির্দ্ধারণ করিয়াছে। তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের আড়ম্বরহীনতা দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি। তাহারা নিজেদের আবশ্যকতা অনুসারে গৃহকার্য্য ও জীবন-ধারণ-প্রণালী গঠন করিয়া লইয়াছে। আর আমাদের জীবনধারণ প্রণালী দিন দিন আরও জটিল ও বিলাসিতাপূর্ণ হইতেছে। এই বিলাসিতা হইতে দেশকে রক্ষা করিতে হইলে নারীর উচ্চশিক্ষা ছাড়া আর উপায় নাই।

জাপান দেশ সব দেশ হইতে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। দেশটী যেন ছবির মতন গোছান। বাড়ী, ঘর, রাস্তা, গলি কোথাও আমি কোন অপরিষ্কার জিনিষ দেখি নাই।

জাপান তাহার দৈনন্দিন জীবনের সকল কার্য্যে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আধুনিক ও নব আবিষ্কৃত সব নিয়ম পালন করিতেছে কন? স্ত্রীশিক্ষার ফলে। প্রাচ্য প্রতীচ্য সব দেশেই স্ত্রীশিক্ষার বিস্তৃতি হইতেছে, পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমাদের দেশেই কি কেবল পিশ্চাতে রহিবে? আমাদের নিজেদের চেষ্টা করিতে হইবে। কাহারও মুখাপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না— আমাদের মধ্যে চিন্তাশীল ও মেধাবী ব্যক্তিগণ ইউরোপে, আমেরিকাতে ও জাপানে গিয়া পাশ্চাত্য দেশের স্ত্রীশিক্ষা-প্রণালী আলোচনা করিয়া আমাদের দেশের জন্য কিরূপ শিক্ষা চাই, তাহা নির্দ্ধারণ করিবেন।

আমি যতদূর দেখিয়াছি, তাহাতে আমাদের দেশের স্ত্রীশিক্ষা-প্রণালী প্রাণহীন ও শুষ্ক বলিয়া মনে হয়। আমরা নারীদিগকে এরূপ কতকগুলি বিষয় শিখাইতেছি, তাহার সহিত জীবনের কোন সম্বন্ধ নাই। জাপানে দেখিলাম নারীগণ বিবাহিতা হইয়াও কায করে! ইহা কিরূপে সম্ভব? আমাদের শিক্ষিত বালিকাদের

বিবাহ হইলে তাহারা কার্য্যক্ষেত্র হইতে অদৃশ্য হইয়া পড়ে তাহাদের আর লেখা-পড়ার সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকে না। তাহার কারণ আমাদের সংসার গঠন সরল ও সহজ নহে। যত দেশে বেড়াইলাম, জাপান পর্য্যন্ত সকল স্থানেই গৃহিণীরা গৃহ-কার্য্য ও সন্তান পালন প্রভৃতি করিয়া অবসর মত লেখাপড়ার চর্চ্চা ও সামাজিক কর্ত্তব্য সবই পালন করেন—কেবল আমাদের দেশেই আমরা দিন রাত আহারাদি গৃহকার্য্য লইয়া বিব্রত থাকি। ইহার কারণ বাহির করিয়া তাহার প্রতিকার করা আবশ্যক হইয়াছে। আমাদের স্ত্রীশিক্ষা-প্রণালী পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। জাপানে যে সকল মহিলা আমেরিকা ও জর্ম্মাণী হইতে শিক্ষিতা হইয়া শিক্ষয়িত্রীর কায করিতেছেন, তাঁহাদের বেতন ৭৫্ টাকা মাত্র, ইহার কারণ কি জিজ্ঞাসা করাতে উত্তর পাইলাম যে আমাদের গরীব দেশ, তাহাতে শিক্ষা বিস্তার করিতে হইবে, সে জন্য আমরা শিক্ষা প্রচার ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছি। ৫০ বৎসরেরও কম হইবে জাপানে স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার হইয়াছে, তাহার ফলে এইরূপ নারী চরিত্র গঠিত হইয়াছে, আর আমাদের মধ্যে ক'জনের কাছে এইরূপ কথা শুনিতে পাই? আমরা শিক্ষালাভ করিয়া নিজের সুখসচ্ছন্দতা ও সংসার লইয়া আছি—ক'জনের বা দেশের কথা মনে হয়—কয়জন শিক্ষা প্রচার-ব্রতরূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি? যত দিন এই ভাবে আমাদের নারীগণ অনুপ্রাণিত না হইবেন, ততদিন শিক্ষা বিফল হইবে। আমার ধ্রুব বিশ্বাস যে সত্যপথ অনুসরণ করিলে অবিলম্বে আমাদের মধ্যে এই ভাব প্রবেশ করিবে। সে জন্য আমাদের ব্রতধারিণী ২।১টি মহিলাকে ইউরোপে পাঠাইয়া শিক্ষাপ্রণালী শিখাইয়া আনিতে হইবে। যতদিন তাহা না হয়, ততদিন পাশ্চাত্যদেশ হইতে আমাদের কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য ২।১টি মহিলাকে আনা আবশ্যক। ইহাতে কয়েকটী বিপদ আছে। পাশ্চাত্য রমণীর ব্যক্তিত্ব এত অধিক যে প্রচরাচর তাঁহাদের সহিত আমাদের মিলন হয় না এবং তাঁহারা আমাদের উপর আধিপত্য করিতে চান।

ভগিনী নিবেদিতার ন্যায় স্বার্থশূন্য শিক্ষা-ব্রতধারিণী নারী সব সময়ে সব দেশে দেখা যায় না। আমার সৌভাগ্য-বশতঃ খুঁজিতে খুঁজিতে দুইটি উদার হৃদয়া নারীর সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি, তাঁহারা এদেশে আসিয়া আমাদেরই অধীনে থাকিয়া আমাদের কার্য্যে সহায়তা করিতে প্রস্তুত, কিন্তু ইহা অর্থ সাপেক্ষ।

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন আমাদের দেশে শিক্ষার কোন বন্দোবস্তই ছিল না, তখন একটী দরিদ্র অজ্ঞাত পণ্ডিতের প্রাণ নারীজাতির দুঃখে কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। তিনি নারীজাতির উন্নতিসাধন তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য করিয়াছিলেন—বাধা বিপত্তি না মানিয়া প্রবল উৎসাহে তিনি নারীজাতির উন্নতির সহায় হইয়া-

ছিলেন। সেই অবলা-বান্ধব কর্ম্মবীরের নাম কাহারও অবিদিত নাই। আজি তবে কি এই বঙ্গভূমিতে শত দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের আবির্ভাব অসম্ভব।*

শ্রীঅবলা বসু।

ইষ্টলিন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ক্রুশভঙ্গ।

লেডী ইসাবেলের শকট বরাবর মিসেস লেভিসনের বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। এখন মিসেস্ লেভিসনের একটু পরিচয় দিই। মিসেস্ লেভিসনের বয়স প্রায় ৮০র কাছাকাছি, এবং তাঁহার স্বভাবটী অত্যন্ত খিটখিটে ও কঠোর। মিসেস ভেন যেমন তাঁহাকে কষ্ট দিতেন ও কর্কশ ব্যবহার করিতেন তিনিও অনেকটা সেইরূপ ব্যবহার করিতেন।

ইসাবেল যখন গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল তখন বৃদ্ধা লেভিসন অত্যন্ত অধীর ভাবে মাথার টুপী খুলিয়া, গাউন টানিয়া, গৃহের চারিদিকে চাহিয়া তাঁহার জন্য রক্ষিত আহারীয় দ্রব্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অত্যন্ত বিরক্তির চিহ্ন প্রকাশ করিতেছিলেন। "আমি অত্যন্ত ভীত হইতেছি, আমার বিলম্বে আসিয়া পৌছানর জন্য," এই বলিতে বলিতে লেডী ইজাবেল মিসেস্ লেভিসনের দিকে অগ্রসর হইল। "কিন্তু কি করিব বাবা আজ একজন ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণে আহার করিতে বলিয়াছিলেন সেই কারণে আমাদের আহারের বিলম্ব হইয়া যাইল।"

বৃদ্ধা একটু কর্কশ কণ্ঠে বলিলেন "যে সময় তোমার আসিবার কথা ছিল তুমি তাহার ২৫ মিনিট বিলম্বে আসিয়াছ, যা হউক এসমা—এখন আমার চা আনিতে বল"।

মিসেস্ ভেন চা আনিতে আদেশ করিলেন। মিসেস্ ভেন দেখিতে ছোট খাট মানুষটী, বয়স ২৬ বৎসর, মুখখানি সাধারণের ন্যায় কিন্তু গঠনটী অতি সুন্দর। তিনি ভয়ানক গর্ব্বিতা স্ত্রীলোক, তিনি মাতৃহীনা। মিসেস্ লেভিসন তাঁর মাতামহী, এবং মি বেম ও ভেন, তাঁহার স্বামী। তিনি আর্ল অফ্ মাউন্ট সভারিণের দূর সম্পর্কীয় ভ্রাতা।

মিসেস্ লেভিসন জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎসে ইসাবেল্, তুমি কি তোমার গায়ের কাপড় খানি খুলিয়া রাখিবে না? তোমাদের এই নিত্য নূতন ফ্যাসানের পোষাকের নাম কি তা আমি জানি না।"

---

* ৭ই আগষ্ট সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্গত ছাত্র সমাজ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধন সভায় পঠিত।

ইসাবেল গাত্রাবরণ খানি খুলিয়া তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিল।

"দিদি মা এখনও চা প্রস্তুত হয় নাই!" মিসেস্ ভেন আশ্চর্য্য হইয়া এই কথা বলিলেন, এমন সময় একজন ভৃত্য ট্রে এবং রূপার চা পানের পাত্র সকল লইয়া প্রবেশ করিল। "তুমি কখনও এ ঘরে চা প্রস্তুত করিও না!"

মিসেস্ লোভিসন বলিলেন, "কোথায় তবে চা প্রস্তুত হইবে?"

মিসেস্ ভেন বলিলেন "একেবারে প্রস্তুত করিয়া আনিলেই ত হইত, এখানে আবার কষ্ট করে চা প্রস্তুত করিতে আমি ভাল বাসি না।"

বৃদ্ধা বলিলেন "যা বলিয়াছ! ঠাণ্ডা দুগ্ধের ন্যায় বিস্বাদ হইয়া যাউক! এম-মা—তুমি সকল সময়ই ভয়ানক কুঁড়ে।"

দিদিমার পশ্চাতে ইসাবেলের প্রতি ঘৃণা পূর্ণ বিদ্বেষ দৃষ্টিতে তাকাইয়া, মিসেস্ ভেন বলিলেন "কে তোমার জন্য সকল সময়ে চা প্রস্তুত করিবে?" কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি ইসাবেলের প্রতি পতিত হওয়ায় ইসাবেলের গণ্ডস্থল লজ্জায় লাল হইয়া যাইল। সে ইহাদের আচরণ ভাল, না তাহার পিতার অন্যকার অতিথির আচরণ ভাল তাহা বুঝিতে পারিতেছিল না, কিন্তু তাহার মন এই বৃদ্ধাদের চিন্তা ত্যাগ করিতে চাহিতেছিল।

"ফ্যান্সিট এস আমার জন্য ইহা প্রস্তুত কর," মিসেস্ লেভিসন বলিলেন, "হাঁ, ব'স, আমার সঙ্গে প্রস্তুত কর, আমি একা এমমা তুমি কি বল?"

"দাদিমা তোমার যেমন ইচ্ছা সেইরূপ কর।"

"এমমা তোমার হাতের কনুয়ের কাছে চা'র পাত্র রহিয়াছে টানিয়া লইয়া প্রস্তুত করিতে আরম্ভ কর। যদি তুমি আজ রাত্রিতে চা খাইতে ইচ্ছা কর, ভালয় ভালয় এই বেলা প্রস্তুত করিয়া ফেল", মিসেস্ লোভিসন বলিলেন।

পাছে হাতের দস্তানা খুলিতে হয় এই ভয়ে মিসেস্ ভেন বক্ বক্ করিতে করিতে বলিলেন "আমি চা প্রস্তুত করিতে জানি না।

উৎসাহের সহিত উঠিয়া দাঁড়াইয়া ইস-বেল বলিল, "আমি প্রস্তুত করিব, আমি বাটীতে বাবার জন্য নিজ হাতে চা প্রস্তুত করি।"

বৃদ্ধা বলিলেন, "কর মা," "তুমি উহা হইতে দশগুণ ভাল প্রস্তুত করিবে।"

ইসাবেল আনন্দে হাসিয়া উঠিল, এবং তাহার হস্তের দস্তানা টানিয়া খুলিয়া ফেলিয়া চা প্রস্তুত করিতে বসিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে একজন সুন্দর যুবক গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এই যুবকটী দেখিতে অতি সুন্দর। কৃষ্ণতার তাহার চক্ষু, কাক বিনিন্দিত কেশ কলাপ, শুভ্র দন্তপাতি ও সুগঠিত দেহ। কিন্তু তীক্ষ্ণদর্শী কেহ ইহাঁকে মোটেই পছন্দ করিতেন না। ইনি গৃহ-কর্ত্রী বৃদ্ধা মিসেস্ লেভিসনের পৌত্র, এবং মিসেস্ ভেনের মাতুল পুত্র। (ক্রমশঃ)

একাদশী

স্থানটা সমুদ্রের ধারে—ওয়ালটেয়ার। পূর্ব্বদিন সারারাত জাগিয়া—নাচ তামাসা দেখিয়া, একাদশী সমুদ্রের তীরে বালীর উপর একটা পাথরে মাথা রাখিয়া অগাধে ঘুমাইতেছে, সময় তখন মধ্যাহ্ন অতীত। স্নানার্থির বেশে একদল মেম ও সাহেব—ছোট বড় ছেলে মেয়ে সঙ্গে, ললিত-চপল হাঁসির লহরী তুলিয়া ছুটাছুটী লাফালাফি করিতে করিতে নিদ্রিত একাদশীর পাশ দিয়া, স্নানের জন্য সমুদ্রে গিয়া নামিল।

বহুক্ষণ গাঢ় নিদ্রার পর একাদশীর ঘুমটা তখন পাতলা হইয়া আসিয়াছিল, কাযেই স্নানার্থিগণের কৌতুক-উল্লাসিত সেই মধুর হাস্য ঝঙ্কারে নিজের আবেশ জড়তাটী রাখিয়া, নিদ্রা মহাশয় নিঃশব্দে পিটুটান দিলেন, একাদশী উঠিয়া বসিল।

তাহার উষ্ণ মস্তিষ্কের ভিতর তখনও গত রাত্রির সেই নাচ তামাসার গোলমালের জের চলিতেছিল, সুতরাং প্রথমটা নিদ্রোত্থিতের বারম্বার বিস্ফারিত-চক্ষে এদিক ওদিক চাহিয়া অবসাদ ঘোর কাটাইবার চেষ্টা করিল, চারিদিকের দৃশ্যটা ভাল বোধগম্য হইল না, মনে হইল রঙ্গভূমিতে এক দল সং আসিল বুঝি!—হাই তুলিয়া গা ভাঙ্গিয়া, চোখ রগড়াইয়া ভাল করিয়া চাহিল,—নাঃ সং নয় সমুদ্র বটে!

তাইত—এত বেলা পর্য্যন্ত সে এখানে ঘুমাইতেছে!

ধড়্ ফড় করিয়া একাদশী উঠিয়া পড়িল! কোমর হইতে গামছা খুলিয়া, তাড়াতাড়ি সমুদ্রের জলে নামিয়া, গা, হাত, পা, মাজিতে লাগিল, অনেক বেলা পর্য্যন্ত রৌদ্রে পড়িয়া ঘুমানয় তাহার কণ্ঠা পর্য্যন্ত শুকাইয়া উঠিয়াছে, রাত জাগিয়া তামাসা দেখা কি নিগ্রহ!

ওদিকে সেই গেঞ্জি পরা, পায়জামা আঁটা সাহেব মেমের দল, সমুদ্রের দেদার ঢেউয়ে নাকানি চুপানি খাইয়া, ঢেউয়ের তোড়ে, ছিট্‌কাইয়া হেথা হোথা ছড়াইয়া পড়িয়াছে,—ছেলেরা শুদ্ধ ছত্র ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে! সমুদ্রের এক একটা ঢেউ দুরন্ত আবেগে উছলিয়া আসিতেছে, আর উলট্ পালট্ পরায়ণ স্নানার্থিবৃন্দের উচ্ছ্বসিত তরল হাঁসির ঢেউ বায়ু স্তর ছাপাইয়া উঠিতেছে! কি আমোদ! কি আমোদ!

তাড়াতাড়ি গামছা কাচিয়া, গোটা দুই ঢেউ খাইয়া, একাদশী জলে দাঁড়াইয়াই মাথা মুছিতে লাগিল, উষ্ণ মস্তিষ্কের রক্ত ঠাণ্ডা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এক নূতন ভাবনা জুটিল এত বেলায় বাড়ী যাইলে দাদা কি বলিবে?

যাহা বলিবে তাহাত স্পষ্ট পরিষ্কার বুঝিতে পারা যাইতেছে, অতএব সেটুকু বরদাস্ত করা ভিন্ন উপায় নাই, সুতরাং সেই জন্যে মনটা পূর্ব্ব হইতে চাঙ্গা করিয়া লওয়াই বুদ্ধিমানের কায!—

একাদশী গামছা পরিয়া জলে খেলাইয়া খেলাইয়া কাপড় খানা কাচিতেছে, এমন সময় একটা মস্ত ঢেউ আসিল, একাদশী হেঁট হইয়াছিল,—যেমন তাড়াতাড়ি সোজা হইয়া দাঁড়াইবে—অমনি পশ্চাৎ হইতে দুই শুভ্র কোমল ক্ষুদ্র বাহু আসিয়া, তাহার কোমর জড়াইয়া ধরিল! সঙ্গে সঙ্গে কচি কণ্ঠ নিঃসৃত—বিকৃত উচ্চারণে ব্যগ্র মধুর অনুরোধ "ওগো আমায় ঢেউ পাওয়াও না!"

বিস্মিত একাদশী ফিরিয়া চাহিল. সাত আট বৎসরের একটী সাহেব সন্তান!—কি সুন্দর ছেলে! স্নিগ্ধ প্রীতিতে একাদশীর মুখ উজ্জল হইয়া উঠিল!

উন্মত্ত সিন্ধুর তটাভিহত ঢেউ আবার নামিয়া চলিল, পায়ের তলা হইতে বালী গুলো পর্য্যন্ত সরাইয়া!—ক্ষিপ্র হস্তে ছেলেটীকে আটকাইয়া ধরিয়া একাদশী ঢেউয়ের প্রখর বেগ ঠেলিয়া, লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া তীরে উঠিল, জলসিক্ত কাপড়খানা ঠিক্‌ঠাক করিয়া গুটাইয়া সুটাইয়া কোমরে কসিল।

ফুটফুটে সুন্দর শীর্ণ কলেবর ছেলেটী মুখ চোখের লবণাক্ত জল, হস্ত দ্বারা মুছিতে মুছিতে বিস্ময়োজ্জল নীল চোখ দুটী তুলিয়া ব্যগ্র কৌতুকে, একাদশীকে দেখিতে লাগিল,—অদূরে তাহার সঙ্গীরা জলের ভিতর লাফালাফি করিয়া উচ্চ উচ্ছসিত কণ্ঠে হাঁসিতেছে,—হা-হা-হা-হা-হাঃ!

বেলা ঢের হইয়াছে, একাদশী এখনো কিছু খাইতে পায় নাই, তবু এই অপরিচিত ছোট বালকটীর অনুরোধ এড়াইতে পারিল না, বুঝি এড়াইবার ইচ্ছাও ছিল না। এই ছোট ছেলেটীর জন্য সে আবার জলে নামিতে প্রস্তুত হইল, এবার নামিলে যে শীঘ্র উঠা হইবে না, তাহা সে বেশ বুঝিল, তথাপি কিছুমাত্র দমিতে রাজী হইল না! এই কোমল কচি ছেলেটীকে খুসী করিবার জন্য সে কোন মুখে নিজে একটু দুর্ভোগ স্বীকার করিতে পিছাইবে? সে কি এমনি হৃদয়হীন—না!

ভাইত যাহা বলিবার তাহা বলিবেই, না হয় আর একটু বেশী করিয়া বকিবে, তা বলিয়া—নাঃ।

একাদশীর মুখে নির্ভীক উৎসাহের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল, কোমরে গামছা বাঁধিয়া প্রিয় দর্শন বালকটীকে পিঠে লইয়া, সে ঝপাৎ করিয়া সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িল,—"চল সাহেব সাঁতার দিয়ে তোমায় ঢেউ খাইয়ে আনি!"

ছোট বালকের স্ফূর্ত্তি দেখে কে! এমন করিয়া এ পর্য্যন্ত কেউ তাহাকে ঢেউ খাওয়াইতে পারে নাই! আহা এই লোকটী কি ভাল! কি অদ্ভুত ইহার সাহস!—উল্লাস আবেগে বালক প্রাণপণে একাদশীকে আঁক্‌ড়াইয়া ধরিল!

ডিগ্‌বাজী ও সাঁতারের নানাবিধ কস্‌রতের সহিত প্রায় আধ ঘণ্টা ধরিয়া, জলরাশির সহিত ঘোরতর কুস্তি করিয়া ছেলেটীকে পিঠে লইয়া একাদশী সাঁতার কাটিয়া বেড়াইল! তাহার পর সাহেব গোষ্ঠীর সকলকে একে একে তীরে উঠিতে

দেখিয়া একাদশীও তীরে উঠিল, ছেলে-টীকে পিঠ হইতে নামাইয়া দিয়া নিজের কাপড় গামছা নিঙ্‌ড়াইয়া পরিতে লাগিল।

শীস্ দিয়া লাফাইতে লাফাইতে বালক আত্মীয়দের দিকে ছুটিল "বাবা বাবা, খুব মজা হয়েছে, আমি এক অপরিচিত বন্ধু পেয়েছি!"

পিতা সবে জল হইতে উঠিয়া হাঁটুর পাজামা গুটাইতেছিলেন, অন্যমনে বলিলেন "কি হয়েছে ফ্লরিণ, কি পেয়েছ?"

"বন্ধু বাবা, অপরিচিত বন্ধু, ভারি ভাল!"

বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে তাহার দিদি ফিরিয়া দাঁড়াইলেন "কোথায়?"

"ঐ যে ঐ কাপড় পর্‌ছে!"

"আরে বাঃ! ও আমাদের মেহর আলী নয়? আমরা মনে করিছিলুম তুমি বুঝি মেহর আলীর পিঠে আছ, ও কে?

"ডেকে আন দেখি—"

আচ্ছা আনছি," বালক সোৎসাহে ছুটিল। গামছা মাথায় জড়াইয়া একাদশী তখন ঘর মুখো হইবার উদ্যোগ করিতেছে—এমন সময় ফ্লরিণ গিয়া একেবারে তাহার হাত চাপিয়া ধরিল, আগ্রহান্বিত কণ্ঠে ডাকিল "আরে এস এস, তোমায় আমার বাবা ডাক্‌ছেন!"

কি বিপদ! আবার ডাক!—মিনতির স্বরে একাদশী বলিল "কাল হবে সাহেব আজ ঢের বেলা হয়েছে, আর বেশী দেরী হলে বাড়ীতে বকৃবে।"

"তোমায় বকৃবে? চোখ দুটা যথাসাধ্য বিস্ফারিত করিয়া, অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া বালক বলিল "তোমায় বকৃবে?"

যেন একাদশীকে তিরস্কার করিতে পারে এমন লোক পৃথিবীতে থাকাটা ভারি অসম্ভব!

একাদশী মৃদু হাঁসিল—"চল সাহেব বেলা তো হয়েছে, আর একটু হোক্, চল দেখা করে আসি।"

"এস এস"—খুব ব্যগ্রভাবে তাহার হাত ধরিয়া ছেলেটী টানিয়া লইয়া চলিল দলবলের কাছাকাছি হইয়া একেবারে উচ্চ কণ্ঠে অভিযোগ ঘোষণা করিল, "বাবা দেরি করে গেলে বন্ধুকে বাড়ীতে বকৃবে। শীগ্‌গী ছেড়ে দিও।"

ছেলেটীর অযাচিত ওকালতীতে একাদশী ভারি লজ্জায় পড়িয়া গেল, তাড়াতাড়ি আরক্ত মুখে সাহেবকে অভিবাদন করিয়া, ভিজা গামছা খানা গায়ে জড়াইয়া সসঙ্কোচে এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইল।

সাহেব দেখিলেন পুত্রের বন্ধু এক ষোল সতের বছরের তরুণ বালক, তাহার রংটী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মুখখানি বেশ সুশ্রী, চোখ দুটী স্বচ্ছ সরলতায় গঠিত, মোটের উপর ছেলেটী বেশ কমনীয় বটে! হটাৎ দেখিলেই যেন ছেলেটীর উপর ভারি মমতার উদ্রেক হয়, সাহেব স্নেহময় স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার নাম কি বাছা?"

"একাদশী"

"কি জাত"

মান্দ্রাজী ব্রাহ্মণ"

তোমার বাপ মা কে আছে ?

"কেউ নাই সাহেব, শুধু ভাই আছেন"

উপর্য্যুপরি প্রশ্ন করিয়া সাহেব জানিলেন তাহাদের বাড়ী এখান হইতে আধ ক্রোশ তফাতে, তাহার দাদার এক দোকান আছে, সেই দোকানেই সে কাজ করে, লেখা পড়া সামান্যই জানে, তাহার এখনও বিবাহ হয় নাই।

"বেশ ঐ দেখ আমার হলদে রংএর কুঠী, আজ বৈকালে ঐ খানে আমার সঙ্গে দেখা কোরো, বুঝলে ?"

"বহুত আচ্ছা সাহেব।"

(২)

দিন পনের পরে—সাহেবদের অনেক জেদাজেদী ও একাদশীর আগ্রহাতিশয্যে, অবশেষে বাধ্য হইয়া একাদশীর দাদা, ভাইকে সাহেববাড়ী চাকরী করিতে দিতে সম্মত হইল।

সিদ্ধ-মনোরথ একাদশী প্রফুল্ল মুখে আসিয়া কাযে লাগিল, কাজ কেবল সাহেবের ছোট ছেলে রোগগ্রস্ত ফ্লরিণের সাহচর্য্য। ফ্লরিণকে লইয়া চারিদিকে বেড়ান, নানা উপায়ে তাহাকে খুসী রাখাই, একাদশীর কায,—অথবা রীতিমত খেলাও বলা যাইতে পারে!

ফ্লরিণ যক্ষ্মাকাশ রোগগ্রস্ত, তাহাকে বায়ু পরিবর্ত্তন করাইবার জন্যই সাহেব পরিবার এ অঞ্চলে আসিয়াছেন। সাহেব বঙ্গ দেশের কোন উচ্চ পদস্থ রাজ কর্ম্মচারী, আপাতত ছুটিতে আছেন।

দূষিত রোগ বলিয়া পিতামাতা চিকিৎসকের মতানুসারে ফ্লরিণকে একাকী স্বতন্ত্র কক্ষে নিদ্রা যাইতে দিতেন, এতদিন পর্য্যন্ত বালক এ নিয়ম নির্ব্বিবাদে পালন করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু এত দিনের পর একাদশীকে পাইয়া তাহার মত বিগড়াইয়া গেল, বাড়ীর লোকে ব্যবস্থা করিল ফ্লরিণের শয়ন কক্ষের পাশের ঘরে একাদশী শুইবে, কিন্তু একাদশী ও ফ্লরিণ গোপনে যড়যন্ত্র করিয়া সে নিয়ম একেবারে উল্টাইয়া ফেলিল।

সকলের সংসর্গ হইতে ফ্লরিণকে যে একটু স্বতন্ত্র রাখা হয়, এটা একাদশীর নিকট অমার্জ্জনীয় অন্যায়! কেনরে বাপু, এতটুকু কোমল সোণার শিশু, সে কি এমন গুরুতর অপরাধ করিয়াছে যে তাহাকে এমন নিদারুণ শাস্তিভোগ করিতে হইবে? সে কাহারও সহিত ইচ্ছামত মিশিতে, খেলিতে পাইবে না,—অস্পৃশ্য প্রাণীর মত দূরে দূরে থাকিবে, কেন—একি অন্যায়? না, যে পারে সে এ ব্যবস্থা মানিয়া চলুক, একাদশী ইহা সহ্য করিতে পারিবে না, কিছুতেই না!

তীব্র বিষাদ তাহার মনের মধ্যে ক্রমশঃই ঘনীভূত হইয়া উঠিতে লাগিল, এমন নিষ্ঠুর অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাহার মনটা অত্যন্ত বিরূপ হইয়া দাঁড়াইল! না, সে একলাই ইহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবে, না থাক সাহায্য, নাথাক সম্বল, সমস্ত ধাক্কা সে একলাই সাম্‌লাইবে।

(ক্রমশঃ)

ভূত না মানুষ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

এই সব চিন্তা ও যন্ত্রণা না সহ্য করিতে না পারিয়া চন্দনী অবসন্ন দেহে একমাত্র ব্রহ্মাণ্ডপতিরই শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহাকে ডাকিতে না ডাকিতেই তাঁহার চিন্তা জনিত অবসন্নতা অনেকটা হ্রাস প্রাপ্ত হইল। তিনি দেখিতে লাগিলেন চারি দিকেই তাঁহার নিজের বস্তু, নিজের জন। মস্তকের উপর উজ্জ্বল চন্দ্রাতপ, সম্মুখে কলনাদিনী নদী, পার্শ্বে ও পশ্চাতে নানা-বিধ উদ্ভিজ্জ বস্তু, ফল,ফুল,বৃক্ষ,লতা, পাতা ইত্যাদি। এ সমুদয়ই তাঁহার মনোস্তুষ্টির জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, আর এই সকলের মধ্যে কে একজন দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার মনে সান্ত্বনা প্রদান করিতেছেন। অনেক-ক্ষণ পরে চন্দনী স্থির হইলেন,অঞ্চল দ্বারা ঘর্ম্ম জল মুছিয়া ফেলিলেন এবং সন্ধ্যা সমাগতা দর্শন করিয়া হস্তপদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক সন্ধ্যাহ্নিকে মনোনিবেশ করি-লেন। সন্ধ্যাহ্নিক করিতে করিতে অনশনা চন্দনী কখন যে নিদ্রাতুরা হইয়া নদীতীরে ঢলিয়া পড়িলেন তাহা তিনিও বুঝিতে পারিলেন না।

যখন তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল তখন রজনী প্রভাত হইয়া গিয়াছে। তিনি দেখিলেন তিনি একটী কুসুমিত বনে দূর্ব্বা আস্তরণের উপরে শায়িতা রহিয়াছেন।

নিদ্রাভঙ্গ হওয়া মাত্রই চন্দনী উঠিয়া বসিলেন। এ স্থান যে তাঁহার অপরিচিত নহে, যে কুসুমিত বনের মধ্যে দেবদত্ত লুক্কায়িত ছিলেন এবং যে বনের মধ্যে দেবদত্ত দুই জনের শব দেহ ও শব-দেহ বহনকারীদিগকে দেখিয়াছিলেন এ সেই বন।

চন্দনী উঠিয়া বন হইতে বহির্গতা হইলেন। সম্মুখেই সেই চণ্ডদেবের গৃহ, তিনি যতদূর সম্ভব দ্রুতপাদবিক্ষেপে সেই গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কেন যে তিনি এরূপ ভাবে মুক্তিলাভ করিতে পারিলেন তাহা তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু তাঁহার অধিক ভাবিবার সময় অথবা শক্তি ছিল না। তিনি অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া চণ্ডদেবের শয়ন কক্ষের সম্মুখে আসিলেন। চণ্ড-দেবের শয়ন কক্ষের দ্বার মুক্ত ছিল তদ্দর্শনে চন্দনী আশ্চর্য্যান্বিতা হইলেন। কারণ "ফকিরের ফন্দি" ও "মৃত ব্যক্তির বক্তৃতা"র পর সে কখনও দ্বার মুক্ত করিয়া শয়ন করে না।

সমস্ত দেহ আবরণ করিয়া চণ্ডদেব শয্যার উপর শয়ন করিয়া গভীর নিদ্রাভি-

ভূত রহিয়াছে এ ঘটনাও চন্দনীর মনে আশ্চর্য্যের ভাব আনয়ন করিল, কারণ ইদানীং চণ্ডদেবের গাঢ় নিদ্রার অভাব দৃষ্ট হইত এবং সে দেহ বস্ত্রাবৃত করিতে ভাল বাসিত না।

চন্দনীর ইচ্ছা হইল চণ্ডদেবকে জাগাইয়া বাক্যালাপ করেন কিন্তু তাঁহার সাহস হইল না। তিনি তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মাতার কক্ষে গমন করিলেন, তিনি কিন্তু সেখানে মাতাকে দেখিলেন না। একজন দ্বার রক্ষককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে গত কল্য নন্দকের সঙ্গে নন্দকের মাতা তাঁহার ও চণ্ডদেবের অনুসন্ধানে বহির্গতা হইয়া গিয়াছেন। চণ্ডদেবও চন্দনীর মতই শত্রু কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছিল এবং চন্দনীর আগমনের অল্পক্ষণ অগ্রে মুক্তিলাভ পূর্ব্বক গৃহে আসিয়া নিদ্রাগত হইয়াছে।

তখন চন্দনী বুঝিতে পারিলেন যে চণ্ডদেবও তাঁহার মতন শত্রু কর্ত্তৃক বন্দী হইয়াছিল এবং তাঁহার মত দৈব অনুগ্রহে মুক্তি লাভ করিয়া আসিয়াছে। গত রাত্রিতে নন্দক মাতাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহাদেরই অনুসন্ধানার্থ বাহির হইয়াছে। তিনি তখন শত্রু কর্ত্তৃক বিশৃঙ্খলিত নিজ গৃহটী পুনরুদ্ধার করিতে বসিলেন এবং সে কার্য্য সংক্ষেপেই সমাধা করিয়া স্নান ও তৎপরে পানাহার পূর্ব্বক নিজ গৃহে উপবেশন পূর্ব্বক গীতা অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিলেন। তখন প্রায় মধ্যাহ্ন। সহসা চন্দনীর অধ্যয়ন কার্য্যে বাধা প্রদান করিয়া ৩০ জন লোক আসিয়া চন্দনীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। চন্দনী তাহাদিগকে দেখিবা মাত্র চিনিতে পারিলেন। কারণ শৈশবাবধিই তিনি তাহাদিগকে দেখিতেছেন, তাহারা সকলেই চণ্ডদেবের বিশ্বস্ত ও প্রাচীন ভৃত্য ও গৃহ-রক্ষক।

তাহারা চন্দনীকে কহিল "কর্ত্তা আমাদিগকে কায হইতে কেন যে বর্‌খাস্ত করিলেন তাহা কিছুই বুঝিলাম না।"

চন্দনী অতীব বিস্ময় সহকারে কহিলেন "তোমাদিগকে জবাব দিলেন তবে অতঃপর কে তাঁহার কায ও বাড়ী রক্ষা করিবে?"

তাহারা কহিল "তিনি নূতন লোক রাখিলেন।"

চন্দনী ভীতা ও চকিতা হইয়া চণ্ডদেবের নিকট যাইতে চাহিলেন। কিন্তু অনেক নূতন লোক চণ্ডদেবের নিকট আসিয়াছে জানিতে পারিয়া তাহাতে বিরত হইলেন, কিন্তু এই সব প্রাচীন ও বিশ্বস্ত লোকদিগকে চণ্ডদেব বরখাস্ত না করেন এইরূপ অনুরোধ করিয়া তাহার নিকট একখণ্ড পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু তাহাতে কোন সুফল ফলিল না। চন্দনীর চিঠির উত্তরে চণ্ডদেব এইরূপ পত্র লিখিয়াছিল।

"আমি যে শত্রু কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছিলাম তাহা তুমি জান। এই সব ঘটনায় আমি আমার পুরাতন সমুদয় লোকের উপরই বিশ্বাস হারাইয়াছি এবং ইহাদিগকে বিতাড়িত করার এই প্রধান

কারণ। অতএব এ বিষয়ে তুমি আর অধিক অনুরোধ করিবে না এই আমার অনুরোধ।"

চন্দনী ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িলেন। আগন্তুকগণ চণ্ডদেবের গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

সংবাদ।

১। গুজরাটে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা হইয়াছে। এতদিন গুজরাট হইতে বোম্বাইয়ে গবাদির ঘাস, খড় চালান হইত। এক্ষণে গুজরাটের দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে উহা পাঠান হইতেছে।

২। বরোদা গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষের সূত্রপাতেই প্রজা সমূহের প্রাণ রক্ষার্থ যে আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহা অতীব প্রশংসনীয়। বরোদা রাজ্যের আমরেলি নামক স্থানের রাজস্ব সচীব প্রজাদের অন্নক্লেশ দূর করিবার জন্য সরকার হইতে ৬০ হাজার টাকা পার্থনা করিয়াছেন। সরকার হইতে আহার্য্য দ্রব্য সকল সস্তাদরে বিক্রয়ের নিমিত্ত অনেকগুলি দোকান খুলিবার জন্য একটী সমিতি গঠিত হইয়াছে। বরোদা ষ্টেট বোম্বাই হইতে ৬০ হাজার টাকার খড় কিনিয়া রাখিয়াছেন। বরদা রাজ রাজ্যের গৃহ পালিত পশুগুলিকেও অনাহারে মরিতে দিবেন না।

৩। বিহার ও উড়িষ্যার ছোট লাট স্যার চার্লস বেলি মহোদয় ১৯শে নবেম্বর স্যার এডওয়ার্ড গেইট্‌কে তাঁহার কার্য্যভার বুঝাইয়া দিয়া স্বদেশ যাত্রা করিবেন।

৪। কলিকাতার পাটের কলে এক্ষণে প্রচুর পরিমাণে থলিয়া প্রস্তুত হইতেছে। গত মাসে ৫ কোটী ৮৩ লক্ষ থলিয়া বিদেশে প্রেরিত হইয়াছে। গত বৎসর ঐ সময় ইহার অর্দ্ধেকও প্রেরিত হয় নাই।

৫। মিঃ কেয়ার হার্ডি।—গত ২৬শে সেপ্টেম্বর মহাত্মা কেয়ার হার্ডির মৃত্যু হইয়াছে। তিনি ভারতবাসিদিগের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন, পার্লেমেণ্ট মহাসভায় ভারতবাসিদিগের পক্ষ হইয়া অনেক প্রশ্ন উত্থাপন ও আলোচনা করিতেন। ১৯০৭ সনে তিনি ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন। এতদ্দেশীয় জননায়কগণের সহিত তিনি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অনেক প্রশ্নের আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি এক গরীব সূত্রধরের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামাতা দুই জনেই স্কচ। ১৮৫৬ সনের ১৫ই আগষ্ট স্কটল্যাণ্ডে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি লেবার-লিডার নামক এক পত্রের প্রতিষ্ঠাতা ও স্বাধীন শ্রমজীবী দলের নেতা ছিলেন। পার্লেমেণ্ট মহাসভায় এই দলের মুখপত্র হইয়া আন্দোলন করিতেন। এই স্বদেশ প্রেমিক, অক্লান্তকর্ম্মী, উদার-হৃদয় মহাত্মার মৃত্যুতে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি।

৬। সুইজারল্যাণ্ডে আজকাল যে

ঘড়ির প্রচলন হইয়াছে তাহাতে কাঁটা নাই, একটী বোতাম টিপিলেই যখন যে সময় হইয়াছে তাহা মানুষের কথার ন্যায় বলিয়া দেয়।

গৃহকর্ম্ম

পেস্তা ও বাদামের মোহনভোগ।

দ্রব্যের পরিমাণ—পেস্তা ও বাদাম বাটা এক পোয়া, চিনি দেড় পোয়া, ঘৃত দেড় পোয়া।

প্রস্তুত প্রণালী—পেস্তা ও বাদাম পরিষ্কার সিলে ভাল করিয়া বাটিয়া লইয়া চিনির একতার বন্ধ রসে পেস্তা ও বাদাম বাটা দিয়া হাতা দ্বারা নাড়িতে থাক। গাঢ় হইয়া আসিলে তাহাতে ঘৃত ঢালিয়া দিয়া পুনরায় হাতা দ্বারা নাড়িতে থাক। খুব ঘন কাইয়ের মত হইয়া আসিলে অল্প একটু কর্পূর ছড়াইয়া দিয়া নামিয়া রাখ। তাহা হইলেই পেস্তা বা বাদামের মোহন ভোগ প্রস্তুত হইল।

মুগের বরফি।

দ্রব্যের পরিমাণ—মুগ বাটা এক সের, ঘৃত তিন পোয়া, চিনির রস একসের, জাফরাণ আট আনা, ধনে বাটা আধ ভরি, মরীচ গুড়া এক তোলা।

প্রস্তুত প্রণালী—ঘৃতকে ফেনাইয়া সাদা করিবে পরে ঐ ঘৃতের সহিত মুগ বাটা, ধনে বাটা, মরীচ গুঁড়া ও জাফরাণ মিশাইবে। উত্তমরূপে মিশ্রিত হইলে ঐ মুগকে অল্প জালে ভাজিয়া লাল করিয়া লইবে। পরে সাড়ে তিনতার বন্ধ চিনির রস প্রস্তুত করিয়া নামাইয়া নাড়িতে থাকিবে। নাড়িতে নাড়িতে সাদা হইলে ঐ ভাজা মুগ তাহাতে দিয়া ভাল করিয়া মিশ্রিত করিয়া কানা উচু থালে ঢালিয়া রাখিবে। অল্প শুষ্ক হইয়া আসিলে ছুরী দ্বারা বরফির আকারে কাটিয়া লইবে।

আদার মোহনভোগ।

দ্রব্যের পরিমাণ—এক সের আদা, আধ সের ঘৃত, চিনি দেড় সের, ময়দা এক ছটাক।

প্রস্তুত প্রণালী—আদা ছাড়াইয়া জলে সিদ্ধ করিয়া বাটিয়া লইবে। পরে আদাবাটার সহিত ময়দা মিশাইয়া ঘৃতে ভাজিয়া এক তার বন্ধ চিনির রসে মৃদু জালে পাক করিলেই উৎকৃষ্ট মোহনভোগ প্রস্তুত হইবে। গুরুতর আহারের পর ইহা অতি সুপথ্য। পূর্ব্বদিন গুরু আহার হেতু পেট ভারি থাকিলে ও দাস্ত খোলসা না হইলে এই মোহন ভোগ আধ ছটাক খাইলে সকল অসুখ সারিয়া যায়।

ডিমের জিলাপী।

দ্রব্যের পরিমাণ হংসডিম্ব বারটী, ঘৃত দুই ছটাক, চিনির রস দেড় পোয়া,

লেবুর রস একপোয়া, লবণ এক আনা, জাফরাণ এক আনা, দারুচিনি দুই আনা, ছোট এলাইচ চূর্ণ দুই আনা, লবঙ্গ চূর্ণ দুই আনা।

প্রস্তুত প্রণালী—অগ্রে লেবুর রসের সহিত চিনির দুইতার বদ্ধ রস প্রস্তুত করিবে। রস উনানে থাকিতে থাকিতে ডিম্বের হরিদ্রাংশ বাহির করিয়া তাহাতে লবণ ও মসলা মিশাইয়া হস্ত দ্বারা খুব ঘাঁটিবে। তৎপরে রস উনান হইতে নামাইয়া ঘৃত উনানে চড়াইবে, ঘৃতপাক হইলে ঐ প্রস্তুত ডিম্ব একখানি মোটা নেকড়ায় ঢালিয়া পুঁটলী বাঁধিয়া তাহার তলায় অল্প একটু ফুটা করিয়া কড়ার ঘৃতে জিলাপীর আকারে ছাড়িবে। বেশ লাল মত ভাজা হইলে পূর্ব্ব প্রস্তুত গরম রসে ছাড়িবে। অধিক ভাজা হইলে চুঁইয়া যাইবে স্তুতরাং সাবধান হইয়া ভাজিবে।

বামারচনা।

তাজমহল।

প্রেমের গৌরব স্মৃতি তুমি এই ভূমণ্ডলে।
মহিয়সী মমতাজে ধরি চারু বক্ষস্থলে॥
পত্নীর সম্মান তরে বাদশাহ সাজাহান।
অপূর্ব্ব গঠনে তোমায় করেছে নিরমান॥
পৃথিবীর নরনারী নিরখি বিস্মিত হয়।
এ শিল্প প্রণালী যেন ইহ জগতের নয়॥
ধন্য সাজাহান তব পত্নী-প্রেম চমৎকার।
রাখিলে অক্ষয়কীর্ত্তি ভরিয়ে সংসার॥
অদম্য উৎসাহে ভরে অজস্র অর্থের ব্যয়ে।
এ হেন প্রণয় স্মৃতি রাখেছ যে জাগাইয়ে॥
পরলোক হ'তে তব প্রেমময়ী মমতাজ।
না জানি কি প্রীতি নেত্রে নিরখিছে তোমা আজ॥
ধন্য সেই গরীয়সী মহিলা জগৎমাঝ।
ধন্য পত্নী পরায়ণ! তুমি গো যবনরাজ॥
পবিত্র প্রেমের তার লভি হেন প্রতিদান।
শ্রেষ্ঠ নারীকুল মাঝে লভিলা নব আসন॥
সাজাহান সম প্রেমে সমগ্র ধরণীতলে।
ধরি যত নর সবে পবিত্র স্মৃতির বলে॥
নিজেরে করিয়ে ধন্য তাহারেও ধন্য করে।
পরলোকগতা সেই অর্দ্ধ অঙ্গ ভাগিনীরে॥

জীবন সমস্যা।

দুটী আত্মা দুই স্থানে,
পরস্পরে নাহি জানে;
একীকৃত এ জীবনে,
শুভ প্রেম সম্মিলনে!
কেবা করে এ মিলন,
কোথা হ'তে এ বন্ধন?

আকাঙ্ক্ষা।

খুলি হৃদয়ের দ্বার　অনন্ত সৌন্দর্য্য সার
অধিষ্ঠিত যে দেবতা অন্তর মাঝার।
নিন্দি চারু কোকনদ　তাঁহার যুগল পদ
জাগাতে মানসে মম সাধ অনিবার॥
সতত বাসনা জাগে প্রেম ভক্তি অনুরাগে
দিবানিশি ধরি সেই অমল চরণ।
মানস মন্দিরে রাখি　সতত জুড়াই আঁখি
উপাস্য দেবতা মম সুন্দর গঠন॥
সুশীতল করি চিত্ত নেহারি তাঁহারে নিত্য
প্রেম অনুরাগে দীপ্ত অতুল আনন।
আমি যে গো জ্ঞানহীনা পাপ তাপে বিমলিনা
তথাপি হৃদয়ে কেন বাসনা এমন॥
যে মূর্ত্তি হৃদয়ে জাগে তাঁহারে আঁখির আগে
জীবনে মরণে মম করিতে দর্শন।
হে বাসনা পূর্ণকারী　হৃদয় বিহারী হরি
পুরাও গো! অধিনীর এই আকিঞ্চন॥
শুধু দরশনে চিত্ত　নাহি হয় পরিতৃপ্ত
রমণী হৃদয়ে প্রভু অনন্ত পিপাসা।
পরাণে মিশাতে　চাহে আপনাতে
ধরে হৃদি তলে এ হেন দুরাশা॥
দাও হৃদয়েতে বল　নারী জনম সফল
হয় যেন দয়াময় তোমার কৃপাতে।
পতিরূপে বিশ্বভূপে　লভি যেন পূর্ণরূপে
এই নিবেদন প্রভু করি চরণেতে॥
লভি সে পরশমণি　সম রাজ রাজেন্দ্রাণী
উজলিয়ে রাখি মানস-মনিতে।
শূন্য নাহি হয় যেন　এই হৃদি সিংহাসন
পরিপূর্ণ করি সদা তোমার প্রেমেতে॥
জীবন কুসুম মম　প্রফুল্ল মন্দার সম
না ঝরে ফুটিয়া থাকে এ হৃদি মরুতে।
লাগিয়া ধরার বায়　যেন ম্লান নাহি হয়
তব স্নেহ ছায়াদানে কর প্রস্ফুটিত॥

মঙ্গলালয়!

যাহা কর তুমি মঙ্গলেরি তরে,
হে মঙ্গলালয়, এ ধরার পরে
ফোটে ফুল পুনঃ ঝরে বসুধায়
কেবা জানে কেন তোমারি ইচ্ছায়
জাগে রবি, তারা আঁধার ঘনায়,
নিদাঘের পর ঘন বরিষায়
ভরি দাও তুমি ধরণীর বুকে
রাখ পাশাপাশি সুখ আর দুঃখে!
নহে ব্যর্থ তাহা নহে অর্থহীন
ফুটাও আঁধারে আলোক নবীন
মরণের মাঝে সাজাও অমৃত
মানবের সখা, মানবে বিস্মৃত
হও নাকো কভু রাখ বুকে বুকে
জীবনে মরণে, শোকে দুঃখে সুখে!

শ্রীমতী ক্ষীরোদ কুমারী ঘোষ।

অন্নপূর্ণা মাহাত্ম্য।

ভিখারী শঙ্কর ভ্রমি চরাচর
অন্ন বিনা অনাহারে।
যেই অমৃতান্ন পানে হ'লে ধন্য
জগন্মাতার করে॥
সেই অন্ন-বারি পরিপূর্ণা করি,
সদা এ জগত মাঝ।
রক্ষি নিজগুণে অন্নপূর্ণা সনে
সতত কর বিরাজ॥
সতীর পাদান্ত রাখিতে অক্ষুন্ন
হের আজি কিবা প্রভু পরমেশ।
অন্নদা নিকটে যাচি করপুটে
ধরি অকপটে ভিক্ষুকের বেশ॥
সরম সম্ভ্রম অবলীলা ক্রমে
করি পরিহার আনন্দিত মনে।
ভিক্ষালব্ধ ধনে পরিতৃপ্ত প্রাণে
ধরিয়া যে শোভা করুণ নয়নে॥
বসুধা মাঝায় হইল প্রচার
যে অপার কৃপা করুণার বলে।
কভু কদাচিত সে কৃপা বঞ্চিত
নাহি করি হীন পাতকী নরে।
ওই উদারতা ও উচ্চ প্রাণতা
করি শিক্ষাদান বিশ্ব চরাচরে॥

অপরাধী।

ওগো প্রভু! ওগো প্রিয়তম! হে মহান্ দেবতা আমার!
নিরন্তর অপরাধী দাসী মার্জ্জনা নাহিক জানি তার।
জানিয়া শুনিয়া করি পাপ না করিলে চলেনা ভাবিয়া,
তোমার প্রীতির ভাগে নাপ! প্রলোভনে মজি'ছে এ হিয়া।
কে রাখে এ দারুণ সংগ্রামে রক্ষা কর্ত্তা কেবা আছে আর
তোমা বিনা হে মহা সম্রাট! বন্ধুহীন বিপুল সংসার!
কোন দিন করি নাই নাথ! তোমার আদেশ মত কাজ,
বিপদে তোমারে ডাকিতেছি মনে মনে এই বড় লাজ।
কোন কিছু পারি না করিতে তোমার প্রীতির অনুষ্ঠান,
অথচ পাইনি তোমা, ব'লে দিবানিশি করি অভিমান।
তুমি যে বিশ্বের অধিপতি, তব যোগ্য কি আছে আমার,
অর্চনা করিতে পদযুগে প্রদানিতে পূজা উপচার।
করিনি কিছুই তব তরে অনায়াসে শুধু চাই,
জ্ঞানকৃত এ পাপ দাসীর জন্মে জন্মে এর ক্ষমা নাই।

শ্রী—র্ম।

৩৭ নং মথুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

৫৩ বর্ষ।

বামাবোধিনী পত্রিকা

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্তৃক প্রবর্ত্তিত।

কার্ত্তিক, ১৩২২। নভেম্বর, ১৯১৫।

সূচী।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২।৵০; অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১।৵০; প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।০ (চারি আনা মাত্র)।

বামাবোধিনী পত্রিকা

No. 627. November, 1915.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৩ বর্ষ। ৬২৭ সংখ্যা। { কার্ত্তিক, ১৩২২। নভেম্বর, ১৯১৫। } ১০ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

বারাণসী-তত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পঞ্চদশ অধ্যায়।

উপাসক সম্প্রদায়।

হিন্দুধর্ম্ম।

অচিন্ত্য অব্যয় পরমাত্মা হইতে এই অদ্ভুত বিশ্ব সংসার-রূপী-বৃক্ষ সৃষ্ট হইয়াছে। ইহা ঊর্দ্ধমূল এবং অধঃশাখ (ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখং বৃক্ষাকারং কলেবরং ইতিতন্ত্রং)। এজন্য ইহা অশ্বত্থ বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। এই সংসারকে যিনি জানিয়াছেন তিনিই বেদবিৎ। অশ্বত্থ শব্দে নশ্বর, যথা (নশ্বঃ স্থাস্যতীতি অশ্বত্থঃ) যাহা কল্য থাকে না তাহাই অশ্বত্থ। একারণ সংসারকে অশ্বত্থ বলিয়া বৃক্ষাকারে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই বৃক্ষের ঊর্দ্ধে মূল অর্থাৎ ইহা পরমাত্মা হইতে সৃষ্ট। এই আত্মা হইতে প্রকৃতি, প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহংতত্ত্ব, অহংতত্ত্ব হইতে তমঃ, তমঃ হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী। এই পঞ্চভূত সমবেত হইয়া স্থাবর জঙ্গমাদি চরাচর বস্তু সকল উৎপাদন করিয়াছে, সুতরাং ঊর্দ্ধমূল অধঃশাখ বৃক্ষাকার সংসারের মূলত্রয় সত্ত্বরজস্তম অব্যক্ত। ইহার প্রধান শাখাদ্বয় ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম। দশ দশ বিভাগে শাখাদ্বয়ের বিংশতি প্রকার উপশাখা আছে। (ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ। ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং) ইতি মনুঃ। অর্থাৎ ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধীঃ, বিদ্যা সত্য এবং অক্রোধ — এই দশপ্রকার ধর্ম্মশাখার উপশাখা

অজিতেন্দ্রিয়তা, শাঠ্য, অক্ষমা, অসদ্বুদ্ধি, স্তেয়, অসদাচার, ক্রোধ, পৌশুণ্য, নাস্তিকতা, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা ইত্যাদি দশ প্রকার অধর্ম্মশাখার উপশাখা। সংসার-রূপ বৃক্ষের পুষ্প বিদ্যা ও, অবিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান ও অজ্ঞান, এবং ফল—স্বর্গ ও নরক। অর্থাৎ বিষ অমৃত তুল্য সুখ এবং দুঃখ। এই ধর্ম্মাধর্ম্মময় সংসার স্বরূপ বৃক্ষের ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ শাখাতেই মানবগণ সমারূঢ় হইয়া পরস্পর ধর্ম্মাধর্ম্মীরূপে এক বৃক্ষারোহণ করিয়া রহিয়াছে। হিন্দুগণ ধর্ম্মকেই পরম মঙ্গল বলিয়া জানেন। হিন্দুরা ধর্ম্মার্থে দারপরিগ্রহ করেন—ইন্দ্রিয় সুখের জন্য নহে, ধর্ম্মার্থেই পুত্রোৎপাদন করিয়া থাকেন—অপত্য-পোষণের নিমিত্ত নহে। হিন্দুরা আপনার নিবাসার্থে নহে পরন্তু ধর্ম্মার্থেই গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। মানবেতর জন্তু মাত্রেই স্ত্রীপুত্র গৃহাদি করিয়া বাস করে কিন্তু হিন্দুরা দৈবপৈত্র কর্ম্মে এবং অতিথি সেবা পরায়ণ হইবার জন্যই গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন—ইহাই হিন্দুদিগের বিশেষত্ব। আত্মায়াসে আত্মোদর পূরণ করিবার জন্য নহে পরন্তু ধর্ম্মার্থেই হিন্দুরা ধন সঞ্চয় করিয়া থাকেন। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগার্থ তাঁহারা দেহ ধারণ করেন না, পরন্তু ধর্ম্মার্থেই তাঁহারা দেহ ধারণ করেন (১)। তাঁহারা জানেন জীব মাত্রেই একা জন্মে, একাই বিনাশকে প্রাপ্ত হয় এবং একাই সুকৃত দুষ্কৃত ভোগ করে (২)। পরলোকে সহায়ার্থ মাতা পিতা, পুত্র, কলত্র, জ্ঞাতি কেহই থাকেন না, কেবল এক ধর্ম্মই তৎকালে সাহায্যার্থ অবস্থিতি করেন (৩)। কাষ্ঠ লোষ্ট্রবৎ মৃত শরীরকে মহীতলে নিক্ষিপ্ত করিয়া বন্ধুবান্ধবেরা বিমুখ হইয়া গমন করে, কিন্তু পরম করুণাময় ধর্ম্ম তৎকালে পরিত্যাগ করেন না (৪)। এই জন্যই হিন্দুর নিকট ধর্ম্মের এত আদর। কাম, ক্রোধ, লোভ, দম্ভ, কৌটিল্য এই পঞ্চকে বশ করাই ধর্ম্ম বলিয়া হিন্দুরা জানে (৫)। কাম, ক্রোধ সমাসক্ত ব্যক্তির অনন্ত দুর্গতি হয় বলিয়া মনু হিন্দুগণকে কামজ ও ক্রোধজ ব্যসন হইতে দূরে অবস্থিত হইবার আদেশ দিয়াছেন। কামজ ব্যসন দশবিধ এবং ক্রোধজ অষ্টবিধ। মৃগয়া, জুয়া, দিবা নিদ্রা, পরদোষ কথন, স্ত্রীলোকে আসক্তি,

(১) ধর্ম্মার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা ধর্ম্মার্থে ক্রিয়তে সুতঃ। ধর্ম্মার্থে ক্রিয়তে গেহং ধর্ম্মার্থে ক্রিয়তে ধনং। ধর্ম্মার্থে ধ্রিয়তে দেহো ধর্ম্মার্থে সুস্থিরা মহী। ধর্ম্মার্থে নর্ম্মতীর্থোপি ধর্ম্মার্থে তপ্যতে রবিঃ। (বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণং)।

(২) একঃ প্রজায়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে একোহনুভুঙ্‌ক্তে সুকৃত মেক এবতু দুষ্কৃতং।

(৩) নামুত্র হি সহায়ার্থং পিতা মাতা চ তিষ্ঠতি। ন পুত্র দারাঃ ন জ্ঞাতি র্ধর্ম্ম স্তিষ্ঠতি কেবলঃ। মনু ৪ অ।

(৪) মৃতং শরীর মুৎসৃজ্য কাষ্ঠ লোষ্ট্রসমং ক্ষিতৌ। বিমুখাঃবান্ধবা যান্তি ধর্ম্মস্তমনুগচ্ছতি।

(৫) কামক্রোধৌ বশেকৃত্বা দম্ভং লোভমনার্জ্জবং। ধর্ম্মইত্যেব সন্তুষ্টা স্তেশিষ্টাঃ শিষ্টসম্মতাঃ। বনপর্ব্বং।

মদ্যপান জনিত মত্ততা, বাদ্য, নৃত্য, গীত এবং বৃথা-পর্যাটন এই দশটী কামজ দোষ মধ্যে পরিগণিত। পিশুনতা (না জানিয়া অন্যের দোষ কথন), দুঃসাহস (কুকার্য্যে সাহস), দ্রোহ (পরোপকার করা), ঈর্ষা, অসূয়া (দোষে গুণ এবং গুণে দোষারোপ করা) অর্থ দূষণ (পরস্বাপহরণ বা অবশ্য দেয় ধন না দেওয়া) বাক্‌ পারুষ্য এবং অত্যন্ত তাড়না—এই অষ্টবিধ ক্রোধজ দোষ (৬)। এই গুলিকে পরিহার করিয়া হিন্দু সংযত হন। হিন্দুর দয়া, অহিংসা, সত্য ও শান্তিই ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। কেবল হিংসা না করিলেই দয়া হয় তাহা নহে। হিন্দুর দয়ার ষড় অঙ্গ, যথা প্রথম পরোপকার করণ, দ্বিতীয় সাধ্যানুসারে দান, তৃতীয় হাস্যযুক্ত বাক্য কথন, চতুর্থ বিনয়, পঞ্চম নম্রভাব, ষষ্ঠ স্বীকারের সমাধা করণ। (ক) পৃথিবীর অন্যান্য যে সকল ধর্ম্মে অহিংসা ধর্ম্মের বিধি আছে তাহাতে প্রাণীবধ না করাই অহিংসা নামে কীর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু হিন্দুর অহিংসা জ্ঞান অষ্টবিধ যথা (১) কোন জীবের জীবনের ব্যাঘাত করিবে না, (২) জিতাসন হইবে অর্থাৎ ধারাবাহিক ধর্ম্মের ব্যাঘাত করিবে না, (৩) পর পীড়াদায়ক হইবে না, (৪) শ্রদ্ধা অর্থাৎ গুরু এবং শাস্ত্রে বিশ্বাস রাখিবে, (৫) অতিথি সেবা পরায়ণ হইবে, (৬) শান্তরূপ প্রদর্শন করিবে অর্থাৎ জীবের ভয়প্রদ হইবে না, (৭) সকলের সহিত আত্মীয়তা করিবে এবং (৮) আপনি যেমন পরকেও সেইরূপ দেখিবে (খ) হিন্দু মাত্রেই সত্যের ঘোর পক্ষপাতী। হিন্দু জানে কেবল সত্য কথা কহিলেই সত্য ধর্ম্ম রক্ষা হয় না। সত্যের দ্বাদশাঙ্গ (১) মিথ্যা বাক্যের উপরতি (২) অঙ্গীকারের প্রতিপালন (৩ প্রিয়বাক্য কথন (৪) গুরু সেবা করণ (৫) প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা (৬) ব্রতানুষ্ঠান করণ (৭) আস্তিকতা (৮) সৎসঙ্গ (৯) মাতা পিতার প্রিয়কর্ম্ম সাধন (১০) ত্রিবিধ প্রকার শৌচকরণ অর্থাৎ কায় মন এবং বাক্য শুদ্ধি (১১) লজ্জাবুদ্ধিযুক্ত অর্থাৎ কুলোচিত কর্ম্মের ব্যাঘাত না করণ এবং (১২) অসঞ্চয়তা অর্থাৎ কৃপণতার ন্যূনতা।

হিন্দু ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করেন।

হিন্দু পরমেশ্বরের উপাসক। শ্রুতি স্মৃতি এবং পুরাণ সকলেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র রুদ্রাদি দেবতা পরমেশ্বরের রূপ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। ইহাঁরা ঈশ্বরেতর অন্য দেবতা নহেন, অনেক হইয়াও এক। ইহাঁদিগের মধ্যে যে কোন রূপের

(৬) মনু ৭ম অধ্যায় শ্লোক ৪৭—৪৮।

(ক) পরোপকার দানঞ্চ সর্ব্বদাস্মিতভাষণং। বিনয়ো ন্যূনতাভাবঃ স্বীকার সমতামতিঃ। ষড়্‌বিধেয়ং দয়া প্রোক্তা শৃণুশান্তিরথো মুনে। বৃহদ্ধর্ম্ম

(খ) অহিংসাত্মাসনজয়ঃ পর পীড়া বিবর্জনং। শ্রদ্ধাচাতিথি সেবাচ শান্তিরূপ প্রদর্শনং। আত্মীয়তাচ সর্ব্বত্র আত্মবুদ্ধিঃ পরাত্মসু। ইতি নানাবিধাঃ প্রোক্তা অহিংসেতি মহামুনে। বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণং॥

উপাসনা কর তাহাতেই পরমেশ্বরের উপাসনা হয়। পৃথিবীতে অনেক জীব, অনেক পদার্থ, অনেক জাতি, অনেক গুণ, অনেক সংযোগ, অনেক প্রকার, অনেক বিশেষত্ব আছে, সুতরাং উপাসনা অনেক প্রকার হওয়া আশ্চর্য্য নহে। এই সকল দেবতা এক ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহেন, ইহাঁদিগের একের প্রশংসাতে সকলের প্রশংসা হয় ও একের নিন্দায় সকলের নিন্দা হয়। হিন্দুদিগের ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ যে এক তাহা মৈত্রেয়োপনিষদের নিম্নলিখিত শ্লোকে জানিতে পারা যায় যথাঃ—

ত্বংব্রহ্মাত্বঞ্চবৈ বিষ্ণু স্তং রুদ্র স্তং প্রজাপতিঃ। ত্বমগ্নির্বরুণোবায়ু স্তমিন্দ্র স্তং নিশাকরঃ। স্তং মনস্ত্বং যমশ্চ স্তং পৃথিবী ত্বমথাচ্যুত॥ স্বার্থে স্বাভাবিকেহর্থে চ বহুধা তিষ্ঠসে দিবি॥

অর্থাৎ তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি রুদ্র, তুমি প্রজাপতি, তুমি অগ্নি, তুমি বরুণ, তুমি বায়ু, তুমি ইন্দ্র, তুমি চন্দ্র, তুমি মন, তুমি যম, তুমি পৃথিবী, এই বিশ্বকার্য্য সাধনার্থ বা উপসনার্থ বহুরূপে স্বর্গাদি লোকে অবস্থিতি করিতেছ।

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী লিখিত।

হোসন্ বসোরীর বৈরাগ্য।

মহাত্মা বুদ্ধের ন্যায় এই মুসলমান সাধু হোসনের বৈরাগ্য জীবনের কাহিনীও অপূর্ব্ব। হোসন্ বসোরী একজন বিখ্যাত মুসলমান তাপস। প্রথম জীবনে ইনি মণিমাণিক্যের ব্যবসায়ী ছিলেন।

মহাত্মা গৌতম বুদ্ধের যে কারণে বৈরাগ্যের উদয় হইয়া তাঁহাকে বোদ্ধত্বে স্থাপন করিয়াছিল, এই মণিকার হোসন্ বসোরীর জীবনও সেই কারণেই পরিবর্ত্তিত হইয়া ঋষিত্ব লাভ করে।

একদা হোসন্ বসোরী বাণিজ্য উপলক্ষে রোম নগরে যান এবং তথাকার মন্ত্রীর নিকট উপস্থিত হন। মন্ত্রীর সহিত তাঁহার বিশেষ প্রণয় হয়। এক দিন হোসন্ মন্ত্রীর সহিত অশ্বারোহণে নগরের অনতিদূরে এক প্রান্তরে গমন করেন। তথায় যাইয়া তিনি মণিমুক্তা খচিত পট্টবস্ত্রের এক বৃহৎ পট্টমণ্ডপ দেখিতে পান। তিনি দেখিলেন একদল সুসজ্জিত সৈনিক পুরুষ সেই পট্টমণ্ডপ প্রদক্ষিণ করিয়া রোমীয় ভাষায় কিছু বলিয়া চলিয়া যাইল। তদনন্তর তিনি দেখেন যে কতিপয় উজ্জ্বল বেশধারী বর্ষীয়ান পুরুষ মহা ঘটা করিয়া আসিয়া তদ্রূপ আচরণ করিলেন। তৎপরে শত শত পণ্ডিত আসিয়া পট্টমণ্ডপ প্রদক্ষিণ করিয়া ও কিছু বলিয়া প্রস্থান করিলেন, পরে একদল শুভ্রকেশ সুভ্রশ্মশ্রু বিশিষ্ট বৃদ্ধ আসিয়া ঐরূপ আচরণ করিলেন। তাহার পর একদল রূপবতী রমণী মণিমুক্তা পূর্ণ সুবর্ণ পাত্র

লইয়া পট্টমণ্ডপ প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক কিছু বলিয়া চলিয়া যাইল। অবশেষে সম্রাট সচিব বৃন্দসহ সেই বস্ত্র গৃহে প্রবেশ করিলেন ও কিয়ৎক্ষণ পরে বহির্গত হইয়া চলিয়া যাইলেন। হোসেন এই ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিত হইয়া মন্ত্রীকে বলিলেন বন্ধু, এই ব্যাপারের মর্ম্ম আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, তুমি যদি জান ত আমাকে বুঝাইয়া দাও। মন্ত্রী বলিলেন, অত্রত্য সম্রাটের অশেষ গুণসম্পন্ন এক পুত্র ছিল, সম্রাট তাহাকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিতেন। সেই রাজকুমার অকস্মাৎ মহারাজকে শোক সাগরে নিমগ্ন করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই পট্টমণ্ডপের ভিতরে সেই রাজপুত্রেরই সমাধি রহিয়াছে। প্রতি বৎসর পুত্রের মৃত্যু দিনে নরপতি সসৈন্যে অমাত্য-বন্ধু-পরিজন সমভিব্যাহারে এস্থানে উপস্থিত হন ও নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করিয়া সেই সর্ব্ব শক্তিমানের ইচ্ছার নিকট নিজ শক্তি তুচ্ছ জানিয়া পুত্রকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া ভগ্ন প্রাণে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

তুমি প্রথমে যে সৈন্যদলকে পট্টমণ্ডপ প্রদক্ষিণ করিয়া কিছু বলিতে দেখিলে তাহারা সম্রাটের মহা পরাক্রমশালী যোদ্ধা। তাহারা আসিয়া বলিল, রাজকুমার! আমাদের বাহুবলে যদি তোমাকে জীবিত রাখিবার সাধ্য থাকিত তাহা হইলে স্ব স্ব প্রাণ উৎসর্গ করিয়া শমনের হস্ত হইতে তোমাকে পুনঃগ্রহণ করিতাম, কিন্তু যিনি তোমার এই অবস্থা সংঘটন করিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে কোনরূপ সংগ্রাম চলে না, এজন্য আমরা সম্পূর্ণ অক্ষম। তৎপরে অভিজ্ঞ চিকিৎসকবৃন্দ আসিয়া পট্টমণ্ডপ প্রদক্ষিণ করণান্তর বলিলেন রাজকুমার! আমাদের চিকিৎসা শাস্ত্রের সমুদয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার দ্বারা যদি তোমাকে রক্ষা করিবার শক্তি থাকিত, তাহা হইলে আজ তোমাকে মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার করিয়া আমরা অক্ষয় যশ লাভ করিতাম, কিন্তু বিধাতা পুরুষের উপর আমাদের বিদ্যা ও জ্ঞান খাটে না, তাঁর শক্তির নিকট আমরা সম্পূর্ণ পরাজিত। তৎপরে বিদ্বন্মণ্ডলী আসিয়া বলিলেন, রাজতনয়, যদি জ্ঞান বিজ্ঞান ও পাণ্ডিত্য বলে মহারাজের এ দুঃখ দূর করিতে পারা যাইত তাহা হইলে আমরা তাহা করিতাম। অনন্তর সম্মানিত বৃদ্ধগণ আসিয়া বলিলেন, নৃপনন্দন! যদি আমাদের আশীর্ব্বাদ বলে ও শোক প্রকাশে তোমার জীবন রক্ষা করিতে সক্ষম হইতাম তাহা হইলে আমরা তাহা হইতে কখন বিমুখ থাকিতাম না। পরে সুন্দরীগণ রত্নপূর্ণ থালা হস্তে করিয়া আসিয়া বলিল, হে কুমার! যদি ধন, সম্পদ ও সৌন্দর্য্য বলে তোমাকে জীবিত করিতে পারিতাম তাহা হইলে তোমার জন্য সমুদয় উৎসর্গ করিতাম, কিন্তু যিনি এই ঘটনার প্রবর্ত্তক তাঁহার নিকট ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, রূপ ও যৌবনের কোনও মূল্য নাই। সর্ব্বশেষে সম্রাট আসিয়া বলিলেন, হে আমার প্রাণাধিক

পুত্র! তোমার পিতার হস্তে যে আর কোনও ক্ষমতা নাই!! আমি তোমার জন্য বৃহৎ সৈন্যদল আনয়ন করিয়াছি, সুবিখ্যাত অভিজ্ঞ চিকিৎসক, পণ্ডিতমণ্ডলী, সম্মানিত বৃদ্ধগণ ও রূপযৌবন-সম্পন্না স্নেহময়ী রমণী এবং অতুল ধন সম্পদ যাহা কিছু আমার আছে সকলি লইয়া আমি স্বয়ং আসিয়াছি। এ সকল দ্বারা যদি আমার প্রিয়তম পুত্র! এ বিপদের নিরাকরণ হইত তাহা হইলে সমস্ত দিয়া যতদূর সাধ্য তাহার চেষ্টা করিতাম, কিন্তু যিনি এই ঘটনা সংঘটন করিয়াছেন, হে পুত্র! তোমার পিতা এবং সমুদয় জগৎ তাঁহার শক্তিপূর্ণ বাহুর নিকট অত্যন্ত দুর্ব্বল। অতএব সর্ব্বোপরি সেই মহা শক্তিমান পুরুষের ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। এই বলিয়া সম্রাট চলিয়া যাইলেন।

মন্ত্রীর এই সকল কথায় হোসন বসোরীর অন্তরে অনুতাপ ও প্রবল বৈরাগ্য আনয়ন করিল। তিনি বলিলেন, হায়! আমি প্রাণপণ শক্তিতে সংসারের যে সকল সুখ অর্জ্জন করিতে নিযুক্ত আছি তাহার মূল্য কিছুই নয়? হোসন অস্থির হইয়া পড়িলেন। তৎক্ষণাৎ বাণিজ্য হইতে বিরত হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন। বিষয় বৈরাগ্য ও অনুতাপের অগ্নি তাঁহার অন্তরে সর্ব্বদা জ্বলিতে লাগিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, জীবনে পাপ বিকারসত্বে আর সংসারের হাস্যামোদে যোগ দিব না। তৎপরে এরূপ কঠোর সাধনাতে নিযুক্ত হইলেন যে ঈশ্বর দর্শন লাভ না করিয়া উঠিবেন না। পরে এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলেন এবং তাপসশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত হইলেন। তাঁহার জীবনচরিতে এইরূপ লিখিত আছে যে তিনি যখন কোন স্থানে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন সেইস্থলে তপস্বিনী রাবেয়া যদি উপস্থিত না থাকিতেন তাহা হইলে তাঁহার উপদেশ দেওয়া হইত না। ইহার কারণ কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন সত্য শ্রবণের জন্য অনুতপ্ত ব্যাকুল আত্মার নিকটই ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া স্বার্থক হয়, অন্যের নিকট তাহা বিফল, এজন্য তৃষিত ব্যক্তি আছে কি না, না দেখিয়া উপদেশ দেওয়া উচিত নয়। তপস্বিনী রাবেয়া আসিলে সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকি।

ইষ্টলিন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ক্রুশভঙ্গ।

যুবক লেভিসন কথাবার্ত্তা আচার ব্যবহার কাহার প্রতি কিরূপ করিতে হয় তাহা বেশ জানিতেন, অতি অল্প লোকেই ইহার ন্যায় শ্রোতার মন হরণ করিতে পারে, আবার অতি অল্প লোককেই ইহার ন্যায় হৃদয়হীন পাযণ্ড পশু প্রকৃতি দেখা যায়। কিন্তু হায় তথাপি পৃথিবীতে ইহার স্থান ছিল, সমাজের

লোকে ইহাকে সম্মান করিত, কারণ তাহারা জানিত যে কালে এই যুবকই বৃদ্ধ ধনী স্যার পিটার লেভিসনের (মিসেস্ লেভিসনের) বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইবে।

বৃদ্ধা বলিলেন, "ক্যাপ্টেন লেভিসন! ইনি লেডী ইসাবেল ভেন"। তিনি তাহাদের দুইজনের পরিচয় করাইয়া দিলেন। এবং সেই সময় কুটিল সংসার পথের নূতন যাত্রী সংসার জ্ঞানানভিজ্ঞ শিশু ইসাবেল, নিজের প্রতি যুবক লেভিসনের প্রশংসাপূর্ণ আগ্রহ দৃষ্টি দেখিয়া লজ্জায় অভিভূত হইতেছিল। আশ্চর্য্য—আশ্চর্য্য সে যে দুই ব্যক্তির সঙ্গে একদিনে একসময়ে পরিচিত হইল এই দুই ব্যক্তিই তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের সঙ্গি হইবে ও তাহার উপর আধিপত্য করিবে।

চা পান সমাপ্ত করিয়া ইসাবেল মিসেস্ ভেনের সহিত সান্ধ্য-ভ্রমণে যাইবার জন্য দণ্ডায়মান হইলে মিসেস্ লেভিসন বলিয়া উঠিলেন, "এ যে অতি সুন্দর ক্রুশ মা", ইসাবেলের গলদেশে যে স্বর্ণনির্ম্মিত সাতটী মণিযুক্ত ক্রুশ ছিল তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। সে গুলি অতি সুন্দর সূক্ষ্ম স্বর্ণহারে গ্রথিত ছিল।

ইসাবেল বলিল, "ইহা কি সুন্দর নয়?" আমার স্নেহময়ী জননী মৃত্যুর সময়ে ইহা আমাকে দিয়া গিয়াছেন। দাঁড়ান এটী আমি আপনার হাতে দিতেছি। কোন বিশেষ সমারোহের দিনে আমি ইহা গলায় পরি।

পাঠিকাগণ পল্লী গ্রামবাসী সংসার জ্ঞানাভিজ্ঞ বালিকা, ডিঙ্কের বাড়ীর এই সামান্য আয়োজনকেই মহাসমারোহ ব্যাপার বলিয়া মনে করিয়াছিল। সে তাহার ক্রুশযুক্ত স্বর্ণহার গলা হইতে খুলিয়া মিসেস্ লেভিসনের হস্তে দিল।

মিসেস্ ভেন এই সময় বলিয়া উঠিলেন, ইসাবেল, "এই সামান্য ক্রুশ ও কতক-গুলা মুক্তা দেওয়া সেকালের ব্রেসলেট্ ব্যতীত তোমার কি আর কোনও গহনা নাই?" আমিত তোমাকে ইহা ব্যতীত অন্য গহনা পরিতে কখন দেখি নাই।

ইসাবেল বলিলেন, "আমার মা এই দুইটী গহনা আমাকে দিয়াছেন। এই দুইটীই তিনি সর্ব্বদা ব্যবহার করিতেন।

মিসেস্ ভেন সে কথা চাপা দিয়া বলি-লেন, "তুমি সে কেলে ধরণের মেয়ে! কারণ তোমার মা যখন ইহা পরিতেন সে দিন চলে গিয়াছে, এখনও কি তুমি তাই পরিবে? "তুমি তোমার হীরার গহনা পরনা কেন?

ইসাবেল থতমত খাইয়া উত্তর দিল "আমি—হীরার গহনাও পরি; কিন্তু সকল সময় তাহা পরিতে ভালবাসি না।

মিসেস্ ভেন—"কিসের জন্য পর না?"

ইসাবেল সলজ্জভাবে বলিল, "আমি হীরা মুক্তার গহনা পরিয়া জমকাল ভাব দেখাইতে ভালবাসি না। ঐ সব গহনা এত জলজলে যে আমার ভয় হয়

পাছে কেহ ভাবে ঐ সব গহনা পরে আমি সুন্দরী দেখাতে চাই।”

ঘৃণা সূচক দৃষ্টিতে তাকাইয়া মিসেস ভেন বলিলেন, “ওঃ! আমি দেখচি তুমি যে নিজেকে খুব ভোগবিলাসহীন ও গহনা প্রিয় নও বলিয়া দেখাতে চাও? লেডী ইসাবেল! এ ভাল দেখাবার একটা বেশ ছল।”

মিসেস্ ভেন এইকথা যে ভাবেই বলুন না কেন, ইসাবেল মনে করিল হয়ত কোনও কারণে আজ মিসেস্ ভেনের মেজাজ ঠিক নাই, সেই জন্য তিনি এরূপ ব্যবহার করিতেছেন। সত্য সত্যই ইহার কারণ ছিল, এবং সে কারণ আর কিছুই নহে, ক্যাপ্তেন লেভিসন তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া সৌন্দর্য্য প্রতিমা ইসাবেলের প্রতি মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন ইহা তাঁহার পক্ষে বড়ই অপমানজনক।

বৃদ্ধা বলিলেন, “বৎসে! এই নাও তোমার ক্রুশ”, এটী বাস্তবিকই বড় সুন্দর, তোমার গলায় ইহা হীরা মুক্তা অপেক্ষা ভাল দেখাইবে। আর তোমার মিছে সাজসজ্জার দরকার নাই তোমার যেরূপ আছে তাহাই যথেষ্ট। মা! তুমি এম্মার কথায় কিছু মনে করিও না। ফ্রান্সিস লেভিসন লেডী ইসাবেলকে দিবেন বলিয়া বৃদ্ধার হাত হইতে ক্রুশটী লইলেন। দিবার সময় তাঁহার ইচ্ছাকৃত দোষেই হউক অথবা লেডী ইসাবেলের হস্তে দস্তানা প্রভৃতি থাকায় ঠিকমত ধরিতে না পারার দোষেই হউক ক্রুশটী মাটিতে পড়িয়া যাইল, এবং যুবক লেভিসন তাড়াতাড়ি সেইটী তুলিতে যাইয়া পা দিয়া মাড়াইয়া ফেলায় ক্রুশখানি ভাঙ্গিয়া দুখণ্ড হইয়া গেল।

মিসেস্ লেভিসন চেঁচিয়ে উঠিলেন আঁা! “কার দোষে এ ভাঙ্গিল?”

ইসাবেল কোন উত্তর দিল না, তখন তার ভয়ানক কষ্ট হইতেছিল। ভাঙ্গা ক্রুশটী হাতে নিয়ে দেখ্‌তে দেখ্‌তে তার চোখ দিয়ে জল পড়িতে লাগিল। সে চোখের জল কিছুতেই বন্ধ করিতে পারিল না। কাপ্তেন লেভিসন নিজ অশিষ্টতার জন্য অনুতাপের ভান করিতেছিলেন, এমন সময় মিসেস্ ভেন্ তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন “কেন আমি এই সামান্য একটা ক্রুশের জন্য কাঁদিব!” মিসেস্ লেভিসন বলিলেন, “তুমি] এটা সারিয়ে নিতে পারিবে না?” লেডী ইসাবেল এই কথায় চোক্ষের জল মুছিয়া প্রফুল্ল মুখে কাপ্তেন লেভিসনের প্রতি চাহিয়া বলিল এর জন্য আপনি একা দোষী ইহা মনে করিবেন না, আমাদের দুজনেরই সমান দোষ হইয়াছে।” আর মিসেস্ লেভিসন যখন বলছেন সারিয়ে নেওয়া যাইবে তখন আর দুঃখ কি। সে ভাঙ্গা ক্রুশের অর্দ্ধেকটা শুদ্ধ হারটী যেমন গলায় পরিল, মিসেস্ ভেন অমনি বলিয়া উঠিলেন “তুমি এই সরু হারটী কেবল গলায় দিয়ে যাবে? তোমার কি আর কোনও গহনা নাই?”

ইসাবেল বলিল “কেন যাব না?”

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, আমি বলিব "ক্রশটী হঠাৎ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।"

মিসেস ভেন বিদ্রূপের সহিত হোহো শব্দে হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন 'যদি তোমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করে!' "বাছা কেউ তোমাকে এমন কথা জিজ্ঞাসা করিবে না, কিন্তু তারা মনে করিবে যে মাউণ্ট সভারিণের মেয়ের একখানিও হীরা মুক্তার গহনা নাই।"

ইসাবেল ঈষৎ হাস্য করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, তাহারা সে দিনকার সভায় আমার হীরার গহনা দেখিয়াছে।

বৃদ্ধা এই সময় বলিয়া উঠিলেন, "ফ্রান্সিস লেভিসন, যদি তুমি আমার এই রকম কোনও জিনিস নষ্ট করিতে, তাহা হইলে আমি তোমাকে ছমাস এ বাড়ীতে ঢুকিতে দিতাম না। এখন এসমা তোমরা যাও, তোমাদের নাচ ত রাত দশটার সময় আরম্ভ হবে! আমাদের সময় সন্ধ্যা সাতটার সময় আরম্ভ হইত, কিন্তু এখন সে সব রীতি বদ্‌লে গেছে।"

ক্যাপ্টেন বিদ্রূপের সহিত বলিল, তাহা হইলে আমি মিসেস্ ভেন অপেক্ষা ঠাকুরমাকে অধিক ভক্তি করিতাম। তৃতীয় জর্জ্জের সময় ত একটার সময় ভেড়ার মাংস সিদ্ধ ও সালগমেতেই ভোজন ব্যাপার শেষ হইত।"

তৎপরে তিনি ইসাবেলের হস্ত ধারণ করিয়া সিঁড়ি দিয়া অবতরণ করিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন।

এই রাত্রিতে পুনরায় আর একজন অপরিচিত ব্যক্তি তাহার গাড়িতে উঠিবার সাহায্য করিল। মিসেস্ ভেন তাহারই সহিতই নীচে আসিলেন, তাঁর ব্যবহার তখনও পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল ছিল না।

ইসাবেল, ক্যাপ্টেনকে "ধন্যবাদ দিয়া বিদায় সম্ভাষণ জানাইল। ক্যাপ্টেন বলিলেন, "আমি কিন্তু আপনাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাইতে পারিব না, কারণ এখনি আবার আপনার সহিত আমার দেখা হইবে।"

মিসেস্ ভেন বলিলেন, "তুমি না আমাকে বলিলে 'আমি যাইতে পারিব না, আর এক সভায় যাইব।"

"হাঁ, কিন্তু এখন আমি আমার মতের পরিবর্ত্তন করেছি। লেডী ইসাবেল তবে এখন বিদায়।"

গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিবামাত্র মিসেস্ ভেন পুনরায় বলে উঠিলেন, স্কুলের মেয়েদের মত এই সামান্য সরু হারটী বই তোমার আর কিছু নাই! তোমাকে এতে কি রকম দেখাবে?"

ইসাবেল বলিল, "ও মিসেস্ ভেন! বার বার ঐ কথা কেন বলচেন? আমি কেবল আমার ক্রুশ ভাঙ্গার কথাই ভাবছি। আমার নিশ্চয় বোধ হচ্ছে ইহা অবশ্য কোন বিপদের চিহ্ন।"

"বিপদ—কেন?"

"ইহা বিপদেরই চিহ্ন। মা মৃত্যুর সময় এইটী আমাকে দিয়া বলেছিলেন, ইহা ভৌতিক কবচের ন্যায়, এটাকে সর্ব্বদা সাবধানে রাখিও। যখন কোন অসুবিধায়

পড়িবে, কিম্বা পরামর্শের দরকার হইবে তখন এই ক্রুশটীর প্রতি স্থির দৃষ্টি করিয়া কি কর্ত্তব্য চিন্তা করিও, এবং তাহার আদেশ যা হবে, সেই অনুসারে কায করিও। সেই ক্রুশটী আজ আমার ভাঙ্গিয়া গেল—হায় ভাঙ্গিয়া গেল!"

একটা গ্যাসের আলো গাড়ীর মধ্যে ইসাবেলের মুখের উপর আসিয়া পড়িল। মিসেস্ ভেন বলিলেন, "তুমি আবার কাঁদিতেছ? ইসাবেল! আমি বলিতেছি তুমি যদি এরকম কর ত এই লাল চক্ষু সঙ্গে করে ডার্টফোর্ড্সের ডাচেসের বাড়ীতে আমি যাব না। তুমি যদি কান্না থামাতে না পার, আমি গাড়ী ঘুরাইয়া বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য আদেশ করিব। ইচ্ছা কর তুমি একা যাইও।"

ইসাবেল আস্তে আস্তে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া চক্ষু মুছিতে বলিল "আমি এই ভাঙ্গা টুক্‌রাগুল জুড়িয়া লইতে পারিব স্বীকার করি কিন্তু ইহা কিছুতেই আর আগেকার মত হইবে না।"

মিসেস্ ভেন ঘৃণার সহিত বলিলেন, "তুমি সে টুক্‌রাগুলি কি করিলে?"

ইসাবেল তার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া বলিল যে "ভাঙ্গা টুক্‌রাগুলি আমাকে মিসেস্ লেভিসন দিয়েছিলেন, সেই গুলি পাতলা কাগজে মুড়ে আমার ফ্রকের ভিতরকার পকেটে রাখিয়াছি। আমার উপরের পকেট নাই।"

মিসেস্ ভেন তার এই কথায় বিরক্ত হইয়া বলিলেন "অতি শিশু-ভাবাপন্ন ও দুর্ব্বল হওয়া ভাল নয়। আমি কখন এরূপ ছিলাম না, দশবৎসর বয়স হইতেই আমি বেশ বড় হয়েছিলাম। তিনি অবজ্ঞার সহিত ইসাবেলের কথার পুনরুক্তি করিয়া বলিলেন, 'আমার ফ্রকের ভিতরের পকেটে রাখিয়াছি!' 'তোমার বয়স এখন আঠার বৎসর হইয়াছে তুমি এখনও 'ফ্রক' পর! আমি বলি তুমি যখন ধাত্রীর কাছ ছেড়েছিলে তখনই তোমার 'ফ্রক' ছাড়া উচিত ছিল।"

ইসাবেল তার ভ্রম সংশোধন করিয়া বলিল, "আমি পোষাকই বলেছি, বুঝে-ছিলাম।"

"মিসেস্ ভেন মনে মনে বলিলেন, তুমি হাবা মেয়ে তাই এরূপ বুঝিয়াছিলে!"

নবযৌবনের সজীবতায় পরিপূর্ণ প্রাণে দুঃখের কথা কি অধিক্ষণ স্থান পাইতে পারে? কিছুক্ষণ পরেই ইসাবেল সব দুঃখ ভুলে গেল। সভা গৃহের সাজসজ্জা ও উজ্জ্বলতা তার মনে যেন স্বপ্নরাজ্যের মনোহর দৃশ্যের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। কারণ পল্লীগ্রামে বাস হেতু এই সকল স্থানের অভিজ্ঞতা তাহার আদৌ ছিল না। তাহার উপর তৎপ্রতি সভাগৃহের সমাগত লোকদিগের প্রশংসা বাক্য ও কথা বার্ত্তার মধ্যে সে তাহার ক্রুশ ভাঙ্গার কথা কি করিয়া মনে রাখিবে?

একজন অক্সফোর্ডের ছাত্র অদূরে প্রাচীরের অন্তরালে যে বক্তি ছিল

তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া উঠিল কিহে!" আমি বিবেচনা করি এই নৃত্য গৃহই জীবনের সর্ব্ব প্রধান পতনের স্থান।"

"আমি মনে করে ছিলাম তুমি এসব স্থানে আসা ছেড়ে দিয়েছ।" সেই ব্যক্তি উত্তর করিল "হাঁ। তাই দিয়াছিলাম বটে, কিন্তু কোন কিছু দেখবার জন্য পুনরায় এসেছি।"

"কি দেখবার জন্য এখানে এসেছেন?"

"একটী স্ত্রী। আমার অভিভাবক প্রতিজ্ঞা করেছেন আমি যদি আমার চরিত্র সংশোধন না করি এবং বিবাহ না করি তাহা হইলে এক পয়সাও আমাকে দিবেন না। কারণ আমি ক্রমেই অধঃপতিত হইতেছি। সেই জন্য আমি এক স্ত্রী পছন্দ করিবার চেষ্টা করিতেছি।"

"এই অভিনব সুন্দরীকে তুমি গ্রহণ কর না।"

"এ কে?"

"ইনি লেডী ইসাবেল ভেন।"

ঐ যুবক জমিদার বলিলেন, তোমার এই মত প্রকাশের জন্য আমি তোমার কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ রহিলাম। কিন্তু লোকে গণ্যমান্য শ্বশুর চায়। মাউন্টসভারিণ ও আমি দুই জনেই এক শ্রেণীর লোক। আমার বোধ হয় আমরা দুই জনেই সমস্ত বিষয় সম্পত্তি হারাব।"

"দেখ এক সঙ্গে সব পাওয়া যায় না। ঐ মেয়েটী কিন্তু অসাধারণ সৌন্দর্য্যশালী। হায়! আমি সেই হতভাগ্য চরিত্র হীন লেভিসনকে তার কাছে যাইতে দেখ্‌লাম। সে হতভাগা সুন্দরী পত্নী লাভের জন্য সব করিতে পারে।"

"হাঁ। সে এরকম করিতে পারে তা আমি বিশ্বাস করি।"

"আমি এই সকল লোককে ঘৃণা করি! হতভাগা কোঁকড়ান চুল, পরিষ্কার দাঁতও ধব্‌ধবে সুন্দর হাত নিয়ে মনে করে আমি বড় রূপবান। হতভাগা একটা পশুর মত হৃদয়হীন। কুমারী চাটারিসের কি হইল?"

"তা কে জানে? লেভিসনটাত তার ভিতর থেকে বাণ মাছের মত বেরিয়ে এল, এবং ঐ হতভাগিনী স্ত্রীলোকের উপরই সব দোষ পড়িল। পৃথিবীর তৃ-চতুর্থাংশ লোকে তাহাকে বিশ্বাস করে। এই যে সে এদিকে আসিতেছে। তাহার সঙ্গে মাউন্ট সভারিনের মেয়েও আছে।"

সেই মুহূর্ত্তে ফ্রান্সিস লেভিসন ও ইসাবেল তাহাদের কাছে আসিয়া পড়িল। ক্যাপ্টেন তখন মৃদু মধুর স্বরে ইসাবেলের কর্ণে বচনামৃত বর্ষণ করিয়া বলিতেছিলেন 'আমার অনিচ্ছাকৃত এই ক্রুশ ভাঙ্গার জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি, আমার সমস্ত জীবনব্যাপী পূজা দ্বারাও ইহার পূরণ হইবে না।' কিন্তু হায় মুখ এত মধুর হইলে কি হইবে? তাহার হৃদয় অতি ভয়ঙ্কর পশুর সমান।"

লেডী ইসাবেল মুখ তুলিয়া তাহার

প্রতি চাহিয়া দেখিল, যুবক গভীর প্রেম পূরিত দৃষ্টিতে তাহার প্রতি চাহিয়া আছে; তাহার মুখ হইতে একটী বাক্যও নিঃসৃত হইল না। ভয়ানক লজ্জায় পুনরায় তার গণ্ডস্থল লাল হইয়া উঠিল, সে নীরবে আঁখি পল্লব নত করিল।

"সাবধান—সাবধান, তরুণী ইসাবেল! এই লোকটীকে বাহিরে যেমন সুন্দর দেখিতেছ ভিতরে এ তেমনি মহাপাপী পশু।" তাহারা অনুচ্চস্বরে তাহার পার্শ্ব দিয়া যাইবার সময় এই কথা বলিয়া গেল।

যুবক জমীদার বলিলেন, "আমি মনে করি ও একটা অতি নীচ হতভাগ্য লোক।"

"হাঁ আমিও ওকে সেই রকমই জানি, কেন না আমি জানি ও অনেক বার স্ত্রী লোক ঘটিত অতি গর্হিত কায করেছে, এবং অবশেষে সেই হতভাগিনীদের রসাতলে দিয়ে নিজে বীরদর্পে বেড়িয়ে বেড়াচ্চে। ওটা অতি হতভাগা। আহা ঐ মেয়েটী বাস্তবিকই বড় সুন্দরী।

একাদশী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

একাদশীর যতই মনে হইতে লাগিল ফ্লরিন সকলের নিকট হইতে পৃথক, অদৃষ্ট দেবতা তাহাকে সকলের সাহচর্য্য হইতে তফাৎ থাকিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই কড়াকড় হুকুম জারী করিয়া অসহায় শিশুকে এমন ভাবে জব্দ করিতেছেন, —ততই ফ্লরিণের প্রতি তাহার সহানুভূতিতাহার আরও জাগিতে লাগিল। না না সে একলাই এই সব অন্যায়ের প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিবে, একলাই সকল ক্ষতিপূরণ করিবে!

কিন্তু তাহার জেদের বাড়াবাড়ীতে আবার উল্টা উৎপত্তি হইয়া দাঁড়াইল, পরের ছেলেটীর শুভাশুভের চিন্তায় বাড়ীর সবাই অতিমাত্রায় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। একদিন স্বয়ং সাহেব,—ফ্লরিণের অজ্ঞাতসারে—তাহাকে ডাকিয়া ফ্লরিণের রোগের সংক্রামকতা সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা বুঝাইয়া বলিয়া তাহাকে সতর্ক হইতে উপদেশ দিলেন। আপনার সন্তান হইলে কি হয়,—ন্যায়নিষ্ঠ সাহেব তাহাকে স্পষ্টাক্ষরে অনুরোধ করিলেন, "সাবধান হতে পার ভাল না হয় তুমি ছুটী নিয়ে বাড়ী যাও বাছা!"

একাদশী সে কথার কোন জবাব দিল না, মুখ ফিরাইয়া তাড়াতাড়ি সাহেবের কামরা হইতে বাহিরে আসিল। কুঠীর সামনে মাঠে ফ্লরিণ একলা ছুটাছুটী খেলিতেছিল, হঠাৎ ব্যগ্রভাবে একাদশী সেখানে আসিয়া আচম্কা তাহাকে

জড়াইয়া ধরিল!—"দাদা ফুরিণ ভাই আমার!"

একাদশী সবলে তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিল, তাহার চোখ দিয়া হু হু করিয়া জল পড়িতে লাগিল, ফুরিণ অবাক্!

ফুরিণের কাছ হইতে তাহাকে ছিনাইয়া লইবে? কে লইতে পারে লউক! সে কিছুতেই ফুরিণকে তফাৎ করিবে না, ফুরিণ যদি রোগগ্রস্ত হয়, তবে তাহারই বা সুস্থ থাকিয়া লাভ কি? না সে অমন নির্দ্দয়ভাবে সুস্থ থাকার শাস্তি ভোগ করিতে পারিবে না কিছুতেই না!—

একাদশী দৃঢ়হস্তে ফুরিণকে জড়াইয়া ধরিল, যেন তখনই সত্য সত্যই কে ফুরিণকে তাহার নিকট হইতে ছিনাইয়া লইবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছে!

রক্তের সম্পর্কই দুনীয়ায় সব চেয়ে বড় দাবী, তাহার কাছে মাথা গলাইবার অধিকার আর কাহারও নাই, কেউ যদি প্রসাদ ভিক্ষায় নতশিরে সেখানে আসিয়া দাঁড়ায়,—তবে অমনি চারিদিক হইতে হাজার জোড়া শাসনের রক্তবর্ণ চক্ষু, বজ্র দীপ্তিতে হুঙ্কার করিয়া জ্বলিয়া উঠে! কি উৎপীড়ন! ওগো নিজের ছেলেকে সবাই ভালবাসে, তা বলিয়া পরের কি সেখানে আসিয়া দন্তস্ফুট করিবার ক্ষমতাটুকু দিতেও তোমরা কাতর!—অভিমানে ক্ষোভে একাদশী গোচ্ছোসে কাঁদিয়া ফেলিল।

(৩)

তাহার পর দুইমাস কাটিয়া গিয়াছে, স্থান পরিবর্ত্তনের গুণে, প্রথম দিনকতক ফুরিণ একটু সবল সুস্থ হইয়া উঠিয়াছিল, ওজনেও বাড়িয়াছিল, কিন্তু তাহার পর আবার অবস্থা মন্দ হইতে দেখা গেল। চিকিৎসকগণ উপর্য্যুপরি ঔষধ বদলাইতে লাগিলেন। আত্মীয় স্বজন উদ্বিগ্ন হইলেন। পিতা মাতা হতাশায় আকুলতা বুকে চাপিয়া গণিয়া গণিয়া প্রতি মুহূর্ত্ত কাটাইতে লাগিলেন।

আর একাদশী!—চতুর্দ্দিক হইতে সেই সব অজানা আশঙ্কার অস্ফুট গুঞ্জন, সব বিষন্ন ব্যাকুলতা,—তাহাকে যেন মুহুর্মুহু বিভীষিকার বেষ্টনীতে জড়াইয়া জড়াইয়া বাঁধিতে লাগিল। সেই নিঃশব্দ ঘনীভূত উদ্বিগ্নতার মাঝে একাদশীর অধীর চিত্ত, শত উৎকণ্ঠার সহস্র হস্ত বিস্তার করিয়া, সেই জ্বর তপ্ত রুগ্ন শিশুকে আগ্‌লাইয়া রাখিল। প্রতি মুহূর্ত্ত আশঙ্কায় তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল, বুঝিবা সত্য সত্যই ছাড়াছাড়ি হয়?

আজ এক মাস শিশু শয্যাগত। তাহার উঠিবার শক্তি নাই, একাদশী ম্লান ছায়ার মত এক মাস অহোরাত্র তাহার সঙ্গী। সকলের বকাবকীর জন্য স্নানাহার করিতে একবার করিয়া উঠে, আর রাত্রিতে যখন নিদ্রাভারে চক্ষু দুটো খুলিয়া রাখিবার ক্ষমতা একেবারে লোপ হইয়া যায়, তখন রোগীর শয্যাপ্রান্তে মাথা রাখিয়া সেই খানেই পড়িয়া একটু ঘুমায় মাত্র।

অবস্থা বুঝিয়া সাহেব তাহাকে নানা ছুতায় কার্য্যান্তরে নিযুক্ত করিবার চেষ্টা

করিলেন, কিন্তু তাহাকে নড়ায় কে? সাহেব মাহিনা পত্র হিসাব করিয়া একাদশীকে জবাব দিলেন। একাদশী সাহেবের কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নিনিমেষ নয়নে শীর্ণাকৃতি পাণ্ডুর-কাপল, নিদ্রালস বালকের মুখ পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল!

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া সাহেব উঠিয়া গেলেন। নিজের ছেলেতো বাঁচিবেই না, কিন্তু তাঁহার ছেলের জন্য কি পরের ছেলেও মারা যাইবে? এ যে বড় মুস্কিল!

যত দিন যাইতে লাগিল, একাদশীর উদ্বেগ ততই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। তাহার চক্ষুর সম্মুখ হইতে একে একে সকল আলো নিবিয়া যাইতে লাগিল। সমুদ্রের ঢেউ, তীরের বালী, বাগানের ফুল, মাঠের খেলা—সমস্ত লোভনীয় ব্যাপার গুলোই কোথায় কি নয়—ছয় হইয়া গোলমাল পাকাইয়া গেল! পেটের ক্ষুধা, চোখের ঘুমও ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল। রহিল শুধু সেই একাগ্র চিত্তে রোগীর সেবা, আর উৎকণ্ঠা ব্যাকুল মুখে. রোগীর মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকা!

অষ্ট প্রহর রোগীর পাশে দূষিত হাওয়ায় আবদ্ধ একাদশীকে,—সাহেব, মেম দুজনে আসিয়া বলিলেন "যাও একাদশী, সমুদ্রের ধার দিয়ে একটু বেড়িয়ে এস, আমরা এখানে বসছি।"

একদশী উঠে না, সাহেব হাত ধরিয়া তুলিয়া ঠেলিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া দিলেন, একাদশীর আতঙ্ক বাড়িয়া উঠিল, কোন রকমে পা পা করিয়া কুঠীর ফটক পর্য্যন্ত আসিয়া—তাহার পর সহসা ফিরিয়া,—ছুটিয়া গিয়া আবার ঘরে ঢুকিল —"দোহাই সাহেব, বাইরের হাওয়া আমার সহ্য হচ্ছে না, আমি ঘরে বেশ থাক্‌ব।"

(৪)

ফ্লরিণ সর্ব্বদাই তন্দ্রাচ্ছন্ন, নির্ঝুম। তাহার মুখের রং দিন দিন অত্যন্ত ফ্যাঁকাসে হইয়া আসিতেছে, চামড়া ঠেলিয়া পাজরের হাড় গুলা উঁচু হইয়া উঠিয়াছে, গোলাপের রাশীকৃত পাপড়ীর মত কোমল—তাহার হাত দুখানি এমন শ্লথ ও শীর্ণ—অস্থি কঠিন হইয়াছে, অলস মুদ্রিত চোখে সর্ব্বদাই সে ডান পাশে শুইয়া আছে, কিন্তু ডাকিলেই সাড়া পাওয়া যায়।

সে দিন আকাশে খুব মেঘ করিয়াছিল, কয়দিন হইতেই এমনি গুমট্ হইয়া আছে। সন্ধ্যার পর মেঘ আরো ঘনীভূত হইয়া, বিদ্যুৎ বর্ষণ করিতে করিতে, আকাশ ময় ছুটাছুটী করিয়া খেলিতে লাগিল, তার পর ভয়ঙ্কর ঝড় উঠিল,সকলে বুঝিল ঘূর্ণ বাত্যা।

জানালা সার্শি বন্ধ করিয়া, ঘরে ঘরে আলো জালিয়া কাজ চলিতে লাগিল। বাহিরের ভীষণতায় ভীত, অভিভূত একাদশী, রোগার্ত্ত বালককে বুকে করিয়া উৎকণ্ঠায় আকুল প্রাণে বসিয়া রহিল। ঝড় যত ঘুরিয়া, ঘুরিয়া ফুলিয়া, ফুলিয়া গোঁ গোঁ শব্দে হুঙ্কার করিয়া আসে, সেও তত

আতঙ্কে অধীর হইয়া উঠে! কড়্ কড়্ করিয়া বজ্র ডাকে, ঝড়ের আঘাতে জানালা দুয়ার ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠে, সমস্ত ঘর বাড়ী কাঁপিতে থাকে—আর একাদশী রোগাচ্ছন্ন বালককে দুই বাহুর নীচে আড়াল করিয়া ধরে! তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতিটা,—একটা নিগূঢ় শয়তানীর 'সলা' আঁটিয়া মহা উল্লাস রোলে, তাহাদের দুটী প্রাণীকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছে! চারিদিকেই যেন একটা বিরাট ষড়যন্ত্রের মূর্ত্তি পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে, ওঃ কি বিভীষিকা!

হায়! ওগো কে কোথায় আছ, বলিয়া দাও, কি করিয়া সে এত বিঘ্ন হটাইয়া এই ছোট শিশুটীকে আপনার করিয়া রাখে! চারি দিকের এই সব বিশৃঙ্খলতার উদ্যোগ আয়োজন—প্রকৃতির এই করাল উন্মাদন-সঙ্গীত, এ যেন কেবলই এই নিঃস্ব দরিদ্রের বক্ষ হইতে এই ক্ষুদ্র কপর্দ্দক টুকু লুটিয়া লইবার উৎকট উৎসব রোল বলিয়া মনে হইতেছে! ওগো কে আছ শক্তিমান, সাহায্য কর, বাঁচাও, ওগো রক্ষা কর!

নিষ্পলক নেত্রে বালকের মুখপানে চাহিয়া, নিষ্পন্দ নির্জ্জীবের মত একাদশী প্রলয়ঙ্কর উদ্বেগ বুকে লইয়া, সমান ভাবে বসিয়া রহিল।

(৫)

তিন দিন তিন রাত্রি আকাশের অবস্থা সেইরূপ থাকিয়া চতুর্থ দিনে ঝড় থামিল, মেঘ কাটিয়া গেল, পরিষ্কার সূর্য্য উঠিল। একাদশী মনের উৎকণ্ঠা ঝাড়িয়া স্ফূর্ত্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া নিজেকে বিপদ মুক্ত মনে করিয়া অত্যন্ত স্বস্তি লাভ করিল। হাল্কা বুকে, হাঁসি মুখে ঘর হইতে বাহির হইল। আঃ কি চমৎকার আজ চারিদিকের চেহারা! কি সুন্দর স্বচ্ছ শীতলোজ্জ্বল প্রভাত!

কিন্তু ঘরের ভিতর সে দিন একটু পরেই একটা সন্ত্রস্ত আতঙ্কের ছায়া আসিয়া পড়িল। এতদিন ধরিয়া এত চেষ্টায় যোঝাযুঝি করিয়া যে শঙ্কা ব্যাকুল ভয়াবহ মুহূর্ত্তটা ক্রমাগত পিছাইয়া দিবার আয়োজন করিয়া আসা হইতেছে, আজ বুঝি তাহাকে আর ঠেকাইয়া রাখা যায় না, আজ বুঝি সকল শক্তিকে জয় করিয়া সে সদম্ভে আবির্ভূত হয়!

রোগী আজ ক্রমশঃ বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিল, নিষ্প্রভ চক্ষু দুইটী, যথাসাধ্য বিস্ফারিত করিয়া বারম্বার সে সতৃষ্ণ নয়নে যেন কাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। তাহার দীপ্তি হীন ম্লান মুখের উপর একটা তীব্র অধিরতার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল, ফুরিণ আজ বড় ছট্‌ফট্ করিতেছে, তাহার অস্বস্তি আজ বড় বাড়িয়াছে, বড় বাড়িয়াছে—তাহাকে বুঝি আজ শান্ত করিতে পারা যায় না!

চিকিৎসক আসিলেন পরীক্ষা করিলেন, তার পর গম্ভীর বিষণ্ণ মুখে মাথা নাড়িয়া উঠিয়া গেলেন। মর্ম্মপীড়িত পিতা

হাতের উপর হাত রাখিয়া, নৈরাশ্য কাতর যন্ত্রনা রঞ্জিত মুখে, নীরবে উর্দ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। মাতা অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

ভ্রান্ত আশায় স্ফীত বুকে একাদশী বাগানের বেড়ার কাছে রৌদ্রে দাঁড়াইয়া আলস্য ভাঙ্গিয়া হাই তুলিতেছে, এমন সময় দেখিল ছোট মেম সাহেব, বারেন্দায় টেবিলের কাছে দাঁড়াইয়া চোখে রুমাল দিয়া কাঁদিতেছেন, আর পিতা হাতে মাথা রাখিয়া ভয়ানক নিস্তব্ধ হইয়া, নিকটে চেয়ারে বসিয়া আছেন।

মুহূর্ত্ত মধ্যে একাদশীর মাথা ঘুরিয়া গেল, একটা অজ্ঞাত বিভীষিকা তীক্ষ্ণ শেলের মত অকস্মাৎ তাহার বুকে বিঁধিল, একাদশী ছুটিয়া আসিয়া ফ্লরিণের ঘরে ঢুকিল।

একি চারি দিকেই, গভীর বিষাদময় হৃদয়ভেদী আতঙ্কের করাল ঢেউ! একাদশী কারো মুখপানে চাহিতে সাহস করিল না, কি জানি কি দেখিতে কি দেখিবে!

কঙ্কাল সার দেহে ফ্লরিণ শয্যার উপর ছটফট্ করিতেছে, একাদশী একেবারে গিয়া তাহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল— ফ্লরিণ, ফ্লরিণ, দাদা আমার"

মুহূর্ত্ত মধ্যে ফ্লরিণ স্থির! কষ্টে ফিরিয়া একবার চাহিল, কিন্তু হায় চিনিতে পারিল না, আবার মুখ ফিরাইয়া ছট্ ফট্ করিতে লাগিল।

উঃ এক ঘণ্টা হয় নাই, সে এ ঘর হইতে বাহিরে গিয়াছে, এই অল্প সময়ের মধ্যে একি ভয়ানক অবস্থান্তর! একাদশীর বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল, সে শয্যার প্রান্তে লুটাইয়া পড়িল।

যন্ত্রনাপীড়িত বিকৃত স্বরে ফ্লরিণ ডাকিল "ম—"

"কেন ফ্লরিণ কি বল্‌ছ?" মা মুখের কাছে সরিয়া আসিলেন।

"একদশী কই মা?"

"দাদা ভাই কোথা আমার! এই যে আমি!"—একাদশী মুখের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে আর কি!—পিছন হইতে কে ধরিয়া ফেলিল।

ফ্লরিণের যন্ত্রনাস্তিমিত মুখে একটু ম্লান হাঁসির রেখা ফুটিয়া উঠিল! এইবার সে চিনিয়াছে!—"মা আমার পিস্তল,—সেই পিস্তল, ঐ আলমারীতে আছে মা, একটী বার দাও!"

মা চোখ মুছিতে মুছিতে পিস্তল আনিয়া দিলেন, শীর্ণ দুর্ব্বল হাতে ফ্লরিণ সেটাকে একবার তুলিবার চেষ্টা করিল, পারিল না হাত কাঁপিতে লাগিল, ক্লান্ত ভাবে ডাকিল —"একাদশী, একাদশী।"

উচ্ছসিত কাতরতায় ব্যাকুল একাদশী বলিল কি হয়েছে ফ্লরিণ,—কি কষ্ট হচ্ছে বল না ভাই"

"বুঝ্‌তে পার্‌ছি না একাদশী, বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, কিন্তু—বড় যাতনা!—" ফ্লরিণের চোখ দিয়া দুই ফোটা জল গড়াইয়া পড়িল, একাদশী আর্ত্ত কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল!

(ক্রমশঃ)

স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে দু একটি কথা।*

মানব শিশু জ্ঞানের অঙ্কুর লইয়াই জন্ম গ্রহণ করে, শিক্ষা প্রভাবেই তাহার চিত্তবৃত্তি সমূহ বিকশিত হইয়া পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। শিক্ষার প্রভাবে মানবের সহজাত স্থূল স্থূল জ্ঞান গুলির ধীরে ধীরে বিকাশ হয় বটে কিন্তু তাহার পূর্ণ বিকাশ হওয়া অসম্ভব।

বন্য অসভ্য জাতীয় মনুষ্যেরা স্বভাবের নিয়মে যে জ্ঞান লাভ করে তাহা তাহাদের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ ও আত্মরক্ষার জন্য যথেষ্ট নয়। আদিম বন্য জাতীয় লোকেরা যখন অগ্নি উৎপাদন করিতে ও অগ্নির ব্যবহার করিতে শিখে নাই তখন তাহারা কাঁচা মাংস ভোজন করিত, অস্থি ও প্রস্তর ঘর্ষণ দ্বারা তীক্ষ্ণাগ্র করিয়া অস্ত্র নির্ম্মাণ করিত। সেই অস্ত্রের দ্বারা তাহাদের জীবন ধারণের একমাত্র উপায় স্বরূপ মৃগয়া দ্বারা উদর পূর্ত্তি করিতে তাহাদের কত শ্রম ও আয়াস স্বীকার এবং কত সময় ব্যয় করিতে হইত তাহা এখনকার দিনে সকলেই সহজে উপলব্ধি করিতে পারেন। তাহারা তখন সেই অস্ত্রকেই অপরিবর্ত্তনীয় অত্যুৎকৃষ্ট ও চরম উন্নত অস্ত্র বলিয়াই নিশ্চয় বিশ্বাস করিত। কালে ইহাপেক্ষা উন্নততর অস্ত্রের ধারণা হইলে তাহারা নিজেদের অস্ত্রকে শ্রেষ্ঠ ও সুবিধাজনক বলিয়া নিশ্চয়ই বিশ্বাস করিতে পারে নাই। এই যে অভাব টুকু বোধ করা ইহাই উন্নতি বা শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইবার প্রথম লক্ষণ, আর হয় ত শিক্ষার চেষ্টার আরম্ভও এখান হইতেই। বর্ত্তমান কালে জগতের অন্যান্য সভ্যদেশের তুলনায় আমাদের হীনতা বোধ কি আমাদের শিক্ষার আকাঙ্ক্ষাকে জাগ্রত করিবে না?

দুইটি সমবয়স্ক বন্য অসভ্য শিশুর একটির লালন পালন ও শিক্ষার ভার যদি কোন সভ্য ও শিক্ষিত ব্যক্তির হস্তে দেওয়া যায়, ও অপরটি যদি তাহার বন্য জননীর নিকট পালিত ও শিক্ষিত হয়, তাহা হইলে উভয়ত্র প্রদত্ত ও প্রাপ্ত শিক্ষার ফল যে কিরূপ বিভিন্ন হয় তাহা সহজেই অনুভব করা যাইতে পারে। জ্ঞান ও রুচিভেদে শিক্ষার তারতম্য এখানেই নির্ণীত হইবে। বন্য অসভ্য মনুষ্যের আহারান্বেষণ, আহার, নিদ্রা, সন্তানোৎপাদন ও সন্তান পালন, এবং আবশ্যক হইলে আত্মরক্ষা, ইহাই তাহার সহজাত জ্ঞানের চরম পরিণতি। ইহার কোন একটির অভাব না হইলেই সে সুখী ও সন্তুষ্ট। ইহা অপেক্ষা আর কিছু চিন্তার বিষয় থাকিতে পারে তাহা তাহার জ্ঞানের অগোচর। তাহার চিন্তার সমষ্টি এই কয়টি ব্যাপারেই নিবদ্ধ।

* কৃষ্ণনগর মহিলা সমিতিতে পঠিত।

ঐ অসভ্য মনুষ্যের সমগ্র জীবনের চিন্তা ও কার্য্যের বিভাগ যাহা দেখা গেল তাহা ত ইতর প্রাণীগণেরও আছে। তবে ইতর প্রাণী ও মনুষ্যের মধ্যে প্রভেদ কোথায়? শিক্ষা ও তজ্জাত জ্ঞানই এই প্রভেদ—এই বিভিন্নতা।

শিক্ষাদ্বারা জ্ঞানের বিকাশ হইয়া অনুশীলন দ্বারা তাহা পূর্ণতা লাভ করে। শিক্ষার ফল যে শুধু চরিত্রের বিকাশেই শেষ হয় তাহা নহে, মনুষ্যের সুখ সচ্ছন্দতা বিধানে ও শিক্ষার ফল বিশেষরূপে কার্য্যকরী। ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্তও চক্ষুর উপর রহিয়াছে। এই যে রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, বৈদ্যুতিক পাখা, মোটরকার এত আরাম ও আনন্দ প্রদান করিতেছে। এই যে গ্রামোফোন্ কতই চিত্ত বিনোদন করিতেছে। এই যে ফটোগ্রাফ্ প্রিয় বিচ্ছেদ যাতনা লঘুতর করিতেছে। আর কত নাম করিব? ইহার সকলই শিক্ষা ও তাহার অনুশীলনের ফল। জ্ঞানের দ্বারা অভাব বোধ করা ও জ্ঞানানুশীলন দ্বারা অভাব মোচন করা, ইহাই শিক্ষার পরিণতি।

শিক্ষা নরনারী উভয়ের জীবনেই অন্নজলের মত আবশ্যক। নরনারী এক পরমাত্মা হইতে উদ্ভূত, সুতরাং জ্ঞান লাভে অধিকার ও প্রয়োজনীয়তা উভয়েরই সমান। ঈশ্বর নারী জাতিকে জ্ঞান লাভের অনুপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন—নারীর বুদ্ধি বৃত্তি বা মস্তিষ্কের গঠনের বিশেষ কোন বৈলক্ষণ্য আছে—এমন কথা আজ পর্য্যন্ত ত কেহ স্বীকার করেন নাই। অতি প্রাচীন বৈদিক যুগ হইতে নারী এই ভারতে জ্ঞানে, ধর্ম্মে, তপস্যায়, শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের সমকক্ষ ছিলেন তাহার প্রমাণ এখনও যথেষ্ট পাওয়া যায়। বিশ্ববারা নাম্নী মহিলা ঋক্ বেদের কয়েকটি সুক্ত রচনা করেন, গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি প্রাচীন ভারত-নারীগণ দর্শন শাস্ত্রে যিরূপ অগাধ পাণ্ডিত্য লাভ করেন,তাহা বর্ত্তমান জ্ঞানোন্নত যুগেও অতুলনীয়। এ সমস্তই শিক্ষার ফল। শিক্ষা ও তল্লব্ধ জ্ঞানের জন্যই এই সব মহিলা সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া স্মরণীয়া ও বরনীয়া হইয়া রহিয়াছেন। নারী দুর্ব্বলা ও অধীনা, আবহমানকাল পুরুষের স্বার্থপ্রণোদিত ইচ্ছানুসারে চালিত হইয়া যথোপযুক্ত শিক্ষার অভাবে বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। নারী ইচ্ছা করিলে আত্মচেষ্টায় শিক্ষা ও জ্ঞানালোক দ্বারা সর্ব্বপ্রকার জড়তা ও কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া, জ্ঞানদীপ্ত, পবিত্র, সংযত ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হইয়া আপনার গৌরব-মণ্ডিত আসন অধিকতর উজ্জ্বল করিতে পারেন।

৺স্বামী বিবেকানন্দ লিখিয়া গিয়াছেন শিক্ষাবলে আত্মপ্রত্যয়, আর আত্মপ্রত্যয় বলে অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম জাগিয়া উঠেন, আর আমাদের নিকট তিনি ক্রমেই সঙ্কুচিত হচ্চেন। নিউ ইয়র্কে আমি নিঃসম্বল, বিগতশ্রী, দরিদ্র, মহামূর্খ,—আইরিস কলোনিষ্ট (Irish Colonist) আসিতেছে দেখিতাম। সম্বল এক লাঠি ও তাহার

অগ্রবিলম্বিত একটি ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটলী—তার চলন সভয়, চাউনী সভয়। ছমাস পরে আর এক দৃশ্য—সে সোজা হয়েছে—তার বেশ ভূষা বদলে গেছে—তার চাউনীতে আর চলনে সে ভয় ভাব নাই। কেন এমন হল? তার স্বদেশে সে চারদিকে ঘৃণার মধ্যে ছিল—সমস্ত প্রকৃতি এক বাক্যে বলছিল "Pat তোর আশা নাই, তুই যেমন নীচ হয়ে জন্মেছিস তেমনি থাক্‌বি" আজন্ম এই কথা শুনতে শুনতে Pat এর তাই বিশ্বাস হল, নিজেকে Pat হিপ্নটাইজ (Hypnotize) কর্‌লে যে সে অতি নীচ, তার ব্রহ্ম সঙ্কুচিত হয়ে গেল। আর অমেরিকায় (America) আসিবা মাত্র চারদিক থেকে ধ্বনি উঠিল "Pat তুইও মানুষ, আমরাও মানুষ—মানুষেই ত সব কায কর্‌ছে—তোর আমার মত মানুষ সব কর্‌তে পারে," Pat ঘাড় তুল্লে, দেখলে ঠিক কথাই ত—তার ভিতরের ব্রহ্ম জেগে উঠলেন, স্বয়ং প্রকৃতি যেন বল্লেন "উত্তিষ্ঠ জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত"।

এই উক্তি এখানে বলিবার উদ্দেশ্য এই যে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই অনেক শক্তি ও জ্ঞানের অঙ্কুর নিহিত আছে, প্রভেদ কেবল প্রকাশের তারতম্যে। উপযুক্ত রূপ যত্ন, স্থান ও কাল পাইলেই সেই শক্তির বিকাশ হয়। কিন্তু আমাদের সমাজের নারীরা শক্তি বিকাশের স্থান, কাল, যত্ন পাওয়া দূরে থাক, আরও বিকাশের প্রতিকূল অবস্থা পাইয়া, বিরুদ্ধ উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দেখিয়া তাহাদের সংস্কার এমন বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে তাহা ঠিক্ ঐ Irishman Pat এর অনুরূপ। তাই "নারীর শিক্ষার আবশ্যক নাই" এই কথা নারীর মুখেও শুনিতে পাওয়া যায়। বহুকালের কুসংস্কারার্জ্জিত এই ধারণা দূর করিতে অনেক চেষ্টা ও উজ্জ্বল আদর্শের আবশ্যক। আমাদের বড় দুর্ভাগ্য তাই গার্গী, মৈত্রেয়ী, উভ ভারতী, খনা, লীলা, হঠি বিদ্যালঙ্কার, চন্দ্রমুখী প্রভৃতির ন্যায় প্রাচীন ও আধুনিক বিদুষী মহিলাগণের জন্মভূমিতে স্ত্রী শিক্ষার আবশ্যকতার জন্য বলিতে হয়।

মানব দেহের অর্দ্ধাংশ যদি পক্ষাঘাত গ্রস্ত হইয়া শুষ্ক, অসাড়, অবশ হয়, তবে সেই শরীরে আরামের সম্ভাবনা কোথায়—কিরূপেই বা সম্পূর্ণরূপ সুশৃঙ্খলায় কায চলিতে পারে? একখানি দ্বিচক্র শকটের একটি চক্র যদি জীর্ণ কিম্বা ভগ্ন হয় তবে তদ্দ্বারা সুন্দর রূপে কার্য্য নির্ব্বাহের আশা করা যাইতে পারে কি? বাইবেলে উক্ত হইয়াছে ঈশ্বর আদি পুরুষের দেহের একাংশ হইতে আদি নারীর সৃষ্টি করেন। অনেক দেশে অনেক শাস্ত্রেই নারী পুরুষের অর্দ্ধাংশ ইহা স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। এক অংশের যদি শিক্ষা ও জ্ঞানের আবশ্যকতা থাকে তবে অপর অংশের কেন থাকিবেনা ইহা বুদ্ধির অগম্য। পক্ষাঘাতগ্রস্ত দেহাংশকে বহন করিয়া সুস্থ অংশ কিরূপে আরাম পাইতে পারে ও সম্পূর্ণ কার্য্যক্ষম হইতে

পারে। অশিক্ষিতা স্ত্রী ও শিক্ষিত পুরুষের পক্ষে কতকটা পক্ষাঘাত গ্রস্ত অঙ্গের ন্যায়। দীর্ঘকালের অভ্যাসে রুগ্ন অসক্ত অঙ্গ বহন করা অভ্যস্ত হইলেও নিরবচ্ছিন্ন স্বাস্থ, আনন্দ ও শান্তির আশা করা বাতুলতা। চিররুগ্ন ব্যক্তি চিরাভ্যস্ত রোগ যন্ত্রনা সহিয়া যেমন দৈনিক কর্ত্তব্য কোন প্রকারে সম্পন্ন করে, আমাদের পুরুষদের অবস্থাও প্রায় তদ্রূপ। স্বাস্থ সুখের স্বাদ পাইলে, তখন রুগ্ন অবস্থার যন্ত্রণারূপ পূর্ণ হীনতার বিষয় উপলব্ধি হইবে। আমাদের দেশের নারীরা উচ্চ আশার স্বাদ প্রাপ্ত হন নাই, উচ্চ আদর্শ ও তাঁহাদের চক্ষুর অগোচর, সুতরাং তাঁহারা বর্ত্তমান অবস্থাতেই সন্তুষ্ট। উচ্চ শিক্ষিত পুরুষের সহধর্ম্মিণী সহযোগিনী হওয়া দূরে থাক্ আমাদের মহিলারা কোনও উচ্চ বা সৎ বিষয়ের আলোচনায় স্বামীর তৃপ্তি বা আনন্দ বর্দ্ধন করিতে পারেন? শিক্ষিত স্বামী যখন স্ত্রীর নিকট আসিবেন তখন তাঁহার উচ্চভাব, চিন্তা যা' কিছু বাহিরে রাখিয়া স্ত্রীর উপযুক্ত হইয়া তাঁহার নিকট আসিতে হইল, ইহা সামান্য পরিতাপের বিষয় নয়। ইহাতে স্বামীর তৃপ্তি ও আনন্দ কেমন অক্ষুণ্ণ থাকে তাহা সহজেই অনুমেয়। কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের একটি ব্যঙ্গ কবিতা আছে দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাহা এস্থলে উল্লেখ যোগ্য।

✓ নারীর দায়িত্বপূর্ণ জীবনের প্রত্যেক বিভাগেই শিক্ষার আবশ্যকতা বিদ্যমান আদর্শ মাতা, আদর্শ পত্নী ও সুগৃহিণী হওয়া সকলই শিক্ষা সাপেক্ষ। সন্তান পালন, সন্তানের চরিত্র গঠন, নীতি শিক্ষা, এগুলি সুমাতার হস্তে হইলে যেরূপ সুফল প্রদান করে, অন্যথা সেরূপ হওয়া দুর্ঘট। শিশু সন্তানের উপর মাতার প্রভাব অপরিমেয়। শিশুর কোমল হৃদয়ে মাতার প্রদত্ত শিক্ষা চিরজীবনের জন্য খোদিত হইয়া থাকে। সুমাতার সুশিক্ষায় শিশুর চরিত্রের ভিত্তি কেমন সুন্দর ও দৃঢ়রূপে গঠিত হইতে পারে তাহা বলা বাহুল্য। যে অশিক্ষিতা জননীর নিজের চিত্ত অনুদার ও অগঠিত, তিনি কিরূপে শিশুর চরিত্র গঠনের সহায়তা করিতে পারেন? যে সকল মহাত্মা চরিত্রের বলে পৃথিবীতে যশস্বী ও পূজ্য হইয়াছেন, তাঁহাদিগের চরিত্র অধিকাংশ স্থলে বাল্যকালে তাঁহাদের মাতা কর্ত্তৃক গঠিত হইয়াছিল। জননীর স্তনদুগ্ধ যেমন শিশুর শরীরে ক্রমশঃ রক্ত, মাংস, অস্থি প্রভৃতি গঠন করে, তেমনি জননীর প্রকৃতি ও সংস্কার অলক্ষে শিশুর মনকে গঠিত করিতে থাকে।

সুগৃহিণী হইতে হইলে সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, দয়া, সেবা, নিঃস্বার্থতা, সমদর্শীতা প্রভৃতি যে সকল সদ্‌গুণের আবশ্যক, সুশিক্ষার দ্বারা তাহা অধিকতর উজ্জ্বল ও সহজ হয়। আমাদের একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা গৃহিণীর এই সকল সদ্‌গুণের অভাবে একদিনও তিষ্ঠিতে পারে না। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই সদ্‌বৃত্তি অনুশীলনের ক্ষেত্র স্বরূপ এই প্রাচীন প্রথা, দেশ হইতে প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে।

আমাদের অধুনিক গৃহিণীরা প্রাচীনাদের সদ্‌গুণাবলী ও আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন, এবং নবতর শিক্ষা ও জ্ঞানের দ্বারা চরিত্র গঠন করিতে পরাঙ্মুখ হইয়া স্বার্থপরতা ও সঙ্কীর্ণ-চিত্ততার দৃষ্টান্তের সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত করিতেছেন।

প্রাচীনা গৃহিণীরা লিখন, পঠনাদি শিক্ষা বর্জ্জিতা হইয়া যে উদার অন্তঃকরণের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, নবীনা গৃহিণীরা তাহা পারেন কই? সেই আদর্শ অক্ষুন্ন রাখিতে পারিলেও না হয় সাংসারিক দিক দিয়াও শিক্ষার অনাবশ্যকতা স্বীকার করা যাইত। তাঁহারা দয়ার,সেবার,ক্ষমার,সহিষ্ণুতার ও সহৃদয়তার যে দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন তাহার কোন্‌টা অনুসৃত হইতেছে? তাঁহারা বহুপরিবারেরর মধ্যে বিভিন্ন প্রকৃতির শাশুড়ী, ননদ, জা, পুত্রবধূ, দূর সম্পর্কীয়া আত্মীয়া পভৃতি "পাঁচজনে" পরিবেষ্টিতা হইয়া বাস করিতেন, ও বিভিন্ন প্রকৃতির সংঘর্ষ হাসি-মুখে সহ্য করিয়া তাহাদের সুখ স্বচ্ছন্দতা বিধানে আত্মনিয়োগ করিয়া আন্তরিক সুখ লাভ করিতেন। তাঁহারা দরিদ্র ও রুগ্ন প্রতিবেশীর সাহায্য ও সেবা করিয়া, শোকে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া ও সান্ত্বনা দিয়া কত ভাবে লোকের দুঃখ মোচন করিয়া সুখলাভ করিতেন। তাঁহারা সময় মূল্যবান জ্ঞান করিতেন, সময় নষ্ট করা পাপ বলিয়া জানিতেন, তাই অবসর সময়ে তখনকার প্রচলিত শিল্পচর্চ্চা করিয়া সময়ের সদ্ব্যবহার ও সংসারের ব্যয় সংক্ষেপ এবং অসুবিধা দূর করিতেন। তাঁহাদের কালে অসার উপন্যাসাদির অস্তিত্ব ছিল না, তাঁহারা অবকাশকালে শ্রদ্ধাপূর্ণচিত্তে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদি পাঠ শ্রবণ করিয়া তাহাতে বর্ণিত সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি আদর্শ চরিত্র হইতে আনন্দ, শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ করিতেন এবং ঐ সকল আদর্শ চরিত্রের অনুকরণ করিয়া ধন্য হইতেন। সংসারের প্রত্যেক বিষয়ই তাঁহাদের অভিজ্ঞতা ছিল—তাঁহারা সংসারের সকল বিষয়েই নিজের বুদ্ধি নিয়োগ করিয়া শৃঙ্খলা ও শান্তিবিধান করিতেন। তাঁহারা রোগে শোকে এত অধীর হইতেন না। তাঁহারা কত দ্রব্যগুণ, উদ্ভিদের গুণ অবগত ছিলেন এবং নিজ পরিবারের মধ্যে সামান্য রোগ উহা দ্বারাই আরোগ্য করিতেন। এগুলি কি শিক্ষনীয় নহে? এক্ষণে নবীনাদের মধ্যে কয়জন এই গুণগুলির অধিকারিনী বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতে পারেন?

(কাল পরিবর্ত্তনশীল—দেশ ও কাল ভেদে শিক্ষার পরিবর্ত্তন ও অবশ্যম্ভাবী। লিখন পঠনাক্ষমা হইয়া সে কালের গৃহিণীরা যাহা করিয়া গিয়াছেন, এ কালে তদ্রূপ গুণ ও শক্তির অধিকারিণী হইয়াও লেখা পড়া না জানাতে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয় তাহা নিশ্চিত। সে কালে ডাকবিভাগের অস্তিত্ব ছিল না। তখনকার কালে ছ'মাস ন'মাস অন্তর কাহারও

পিত্রালয় হইতে মিষ্টান্নবাহী ভৃত্যের হস্তে একখানি পত্র আসিত এবং সেই সংবাদে তৃপ্ত হইয়াই দীর্ঘকাল কাটাইতে হইত। তত্ত্ব অর্থাৎ সংবাদ গ্রহণ করা হইত বলিয়াই অদ্যাবধি মিষ্টান্নাদি উপহার পেরণ করা "তত্ত্ব" নামে অভিহিত হইয়াছে। এখনকার কালে দীর্ঘকাল এইরূপ সংবাদ না পাইয়া কেহ তৃপ্ত ও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন কি? সে কালে প্রবাসী স্বামী প্রবাসে বৎসর কাটাইয়া পূজার অবকাশে বৎসরান্তে স্ত্রীর সহিত মিলিত হইতেন। তখন প্রবাসে স্ত্রীকে লইয়া যাওয়ার রীতি ছিল না, বরং লজ্জাকর ও নিন্দনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত। এখনকার কালে সে কালের সেই রীতির সমর্থন কেহ করিতে পারিবেন কি? আমরা কোন কোন প্রাচীনার মুখে শুনিয়াছি, তাঁহারা স্বামীর সঙ্গে তাঁহার কর্ম্মস্থলে যাইবার সুযোগ পাওয়া ও অনুরুদ্ধ হওয়া সত্বেও পরিবার বর্গের প্রতি কর্ত্তব্য ত্যাগ করিয়া যাওয়া স্বার্থপরতা মনে করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহারাই প্রকৃত সহধর্ম্মিণী ছিলেন, নিজের সুখের চেয়ে—এমন কি স্বামীর চেয়েও স্বামীর কর্ত্তব্যকে গুরুতর মনে করিতেন। আমাদের মধ্যে এমন কেহ আছেন কি?

এদেশে প্রায় সমস্ত শিক্ষিত ব্যক্তির ও যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জলতর রত্ন স্বরূপ, তাঁহাদের অধিকাংশেরই জননী অশিক্ষিতা, তবে তাঁহারা কিরূপে শিক্ষা লাভ করিলেন এ প্রশ্ন সহজেই হইতে পারে। আমাদের দেশের প্রচলিত শিক্ষা অর্থ মূলক, জ্ঞান মূলক নহে। বালক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিলাভ করিতে না পারিলে ভবিষ্যতে তাহার "চাকরী" মিলিবার সম্ভাবনা থাকিবে না, এই জন্যই মাতা কিম্বা অভিভাবকেরা বালকের শিক্ষার জন্য অতিরিক্ত যত্ন ও তাড়না করেন। অর্থোপার্জ্জনের সহিত শিক্ষার সম্বন্ধ না থাকিলে বোধহয় বালকদের শিক্ষাও বালিকাদের শিক্ষার অনুরূপ হইত। যে কারণেই হউক বালকদের শিক্ষার জন্য যে যত্ন করা হয় ইহা সৌভাগ্যের বিষয়! অশিক্ষিতা মাতার শিক্ষানুরাগ সন্তানের জ্ঞান লাভের জন্য না হইয়া অর্থোপার্জ্জনের পন্থা সুগম করিতেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। যদি বি, এ, কিম্বা এম্. এ, উপাধিধারী না হইলেও ডেপুটী, মুন্সেফ কিম্বা ঐরূপ উচ্চ রাজ কর্ম্মচারীর পদ প্রাপ্ত হইবার নিয়ম এখন গভর্ণমেণ্ট প্রচলিত করেন তাহা হইলে বালকদের উচ্চশিক্ষা দিবার আগ্রহ ও উৎসাহ কতটা স্থায়ী হয় তাহা বোঝা যায়। যেটুকু শিখিলে চাকরী লাভ সহজ হইবে সেই টুকুই যুবকেরা শেখে এবং যতদিন না তাহা হয় ততদিন তাহাদের শিক্ষার জন্য যত্ন করা হইয়া থাকে। তাহার পর উপাধি লাভ হইলে অধীত বিদ্যা ভুলিয়া যায়। উপাধি মাত্র অবশিষ্ট থাকে। এই সকল উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের শিক্ষার জন্য

প্রশংসা কাহার প্রাপ্য—অশিক্ষিতা জননীর কিম্বা চাকরীর? এ বিষয় বিচার যোগ্য।

বালিকাদের শিক্ষা দিবার প্রতিদানে যদি এইরূপ লাভ বা স্বার্থ সিদ্ধির সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে সকল অশিক্ষিতা মাতাই বালিকাদের শিক্ষার জন্য উৎসাহের সহিত একান্ত চেষ্টা করিতেন। বালিকাদের শিক্ষা দেওয়ায় প্রত্যক্ষভাবে লাভ না থাকিলেও পরোক্ষভাবে দেশ, সমাজ ও জাতিগত লাভ আছে। এই লাভের সম্ভাবনাটুকু অশিক্ষিতা মাতাদের বোঝান দুরূহ। ইহা বুঝিতে হইলে শিক্ষা ও মার্জ্জিত মনের আবশ্যক। আর এই জন্যই ভবিষ্যৎ জননী বালিকাদের শিক্ষায় আবশ্যকতা।

স্ত্রীশিক্ষা ভারতে নূতন আমদানী নহে। অতি প্রাচীন কাল হইতেই একান্ত আবশ্যক জ্ঞান ভারতে নারীদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে। মনুর বচন :—

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ।"

অন্যত্র—

"নারীহি জননী পুংসাং নারী শ্রীরুচ্যতে বুধৈঃ। তস্মাৎ গেহে গৃহস্থানাং নারী শিক্ষা গরীয়সী॥" ইত্যাদি শাস্ত্র প্রমাণ হইতে জানা যায় স্ত্রীশিক্ষা অশেষ কল্যাণ ও গৌরবজনক, একান্ত অপরিহার্য্য জ্ঞান প্রাচীকালে অতি শ্রদ্ধা ও যত্নের সহিত অনুষ্ঠিত হইত। নারীই পুরুষের জননী—যে নারী গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপা সেই নারী অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিলে যে ক্ষতি তাহা শুধু নারীরই একা নহে পুরুষেরও।

নরনারীর কর্ত্তব্য ও কার্য্যক্ষেত্রের বিভিন্নতায় নারীর শিক্ষার একটু বিভিন্নতা আবশ্যক হইতে পারে। মূলতঃ জ্ঞানলাভের জন্য শিক্ষা উভয়েরই সমান আবশ্যক। জননী, পত্নী ও গৃহিণীর কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য যে শিক্ষার আবশ্যক অন্ততঃ পক্ষে সেই টুকু প্রথমে হওয়া আবশ্যক, তাহার পরে আর যত হয় ততই লাভ। মূর্খ স্বার্থপর ও কুটিল স্বভাব স্ত্রীর সংসর্গে কত বিদ্বান পুরুষ অপদার্থ হইয়া গিয়াছে তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

পুরুষের উপর স্ত্রীর এই প্রভাব যদি সুশিক্ষা মার্জ্জিত ও কর্ত্তব্যে অনুপ্রাণিত হইয়া হইত তবে অনেক সংসার শান্তির আগার হইত। ইংরেজ কবি মিল্টন্ লিখিয়াছেন "স্ত্রীজাতির সৌন্দর্য্য গৃহকার্য্যে ও স্বামীকে সাধুপথে স্থিরভাবে রক্ষণে প্রকৃতপক্ষে লক্ষিত হয়।" কবি ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থ স্ত্রীর শ্রেষ্ঠতা বর্ণনাচ্ছলে লিখিয়াছেন যে "স্ত্রী সময়ে চৈতন্য প্রদান, সময়ে সান্ত্বনা প্রদান, সময়ে আদেশ প্রদান করিতে সক্ষম, সেই স্ত্রীই শ্রেষ্ঠ। উন্মত্ত পুরুষকে সচেতন, শোক সন্তপ্ত পুরুষকে শান্ত, দুর্দ্দান্ত পুরুষকে আজ্ঞাধীন করাই স্ত্রীর শ্রেষ্ঠত্বের লক্ষণ।" কিন্তু এই সকল শক্তির অধিকারিণী হওয়া শিক্ষা ও জ্ঞান ব্যতীত সম্ভবপর হয় কি?

বিধাতা নারী হৃদয়ে স্বাভাবিক যে কোমলতা দিয়াছেন,সেই কোমল প্রকৃতির শিক্ষা দ্বারা উৎকর্ষ সাধন করিয়া, কোমল মধুর হৃদয়ে কর্ত্তব্য পালন করিয়া পরিবারের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করেন ও জগতে শান্তি ও প্রেমের রাজ্য বিস্তার করেন ইহাই প্রার্থনীয়।

শ্রীচারুমতি দেবী।

ভুত না মানুষ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

চন্দনী আপনার কক্ষে বসিয়া বসিয়াই সমস্ত দিন যাপন করিলেন। সন্ধ্যাকালে তিনি একটীবার ভ্রমণে বহির্গত হইতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু অপরিচিত প্রহরীগণ তাঁহাকে বাধা প্রদান করিল।

চন্দনী ইহার অর্থ কিছুই উপলব্ধি করিতে সমর্থা হইলেন না। তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ইহার কারণ কি?"

তাহারা বলিল "কর্ত্তৃপক্ষের হুকুম নাই।"

চন্দনী "আমার উপরেও কি তাঁহার সন্দেহ হইয়াছে'' এই বলিয়া মনে মনে কহিলেন "হাঁ আমার উপর ত সন্দেহ হইতেই পারে, আমিত এতকাল তাঁহার শত্রুই ছিলাম এই অল্পকাল হইল মিত্র হইয়াছি। হায়! আমি তাহা বুঝিতে পারি নাই। চন্দনী আর বহির্গমনের চেষ্টা না করিয়া আপনার একটী নির্জ্জন কক্ষে আসিয়া শয়ন করিলেন। রজনী প্রভাত হইয়া গেল, উষা সমাগমে সুন্দরী সরুরুহের ন্যায় চন্দনী দেবীরও নিদ্রা ভঙ্গ হইল। চন্দনী শয্যা ত্যাগ করিয়া কক্ষের বাহির হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে তিনি অসমর্থা হইলেন, কারণ বহু চেষ্টাতেও কক্ষের দ্বার মুক্ত করিতে পারিলেন না। কক্ষের যত দ্বার ছিল সমুদয় গুলি বাহির হইতে বন্ধ রহিয়াছে। চন্দনীর দ্বার খুলিবার জন্য যত চেষ্টা, সমুদয় ব্যর্থ হইল। জানালাগুলিও বন্ধ। ক্রমশ যত বেলা হইতে লাগিল চন্দনীর অধৈর্য্যও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কিছুক্ষণের মধ্যে একজন পরিচারিকা কর্ত্তৃক একটী ক্ষুদ্র গবাক্ষ পথ দিয়া চন্দনীর আহার্য্য আনিত হইল।

চন্দনী পরিচারিকাগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া কোনই তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে পারিলেন না, কিন্তু অনুমানে বুঝিলেন তিনি বন্দিনী হইয়াছেন। অপরাপর পুরাতন ভৃত্যগণ তাড়িত হইল আর তিনি বন্দিনী হইলেন। গৃহ হইতে বহির্গত করিয়া দিলে মাতার সহিত একত্র হইয়া অনর্থ ঘটাইব এই ভাবিয়া চণ্ডদেব আমাকে গৃহ হইতে বাহির হইতে না দিয়া বন্দিনী

করিয়া রাখিল। চন্দনী ভাবিলেন ভালই হইল তথাপি মাতার সন্নিকটে রহিব।

চন্দনী সেই কক্ষের মধ্যেই স্নান করিবার সুবিধা প্রাপ্ত হইলেন এবং স্নানাহার পরিসমাপ্তির পর কক্ষমধ্যে একাকিনী উপবিষ্টা হইয়া ভবিষ্যৎ চিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন।

দিন আসে, দিন যায়, রাত্রি আসে, রাত্রি যায়, এইভাবে দশ পনর দিবস গত হইল।

একদিন গভীর রাত্রিতে চন্দনী অনিদ্রা অবস্থায় গুণগুণ করিয়া এই কবিতাটি আবৃত্তি করিতেছিলেন:—

(১)

এস প্রিয়তম মমহৃদি কুঞ্জাগারে—
(অন্তরের মধ্যস্থলে এ নিভৃত স্থান)
অশরীরি হয়ে মানবের অগোচরে
চিরানন্দে করিব মিলন-সুধাপান।

(২)

গুপ্ত মন-রাজ্য মাঝে প্রেম হ্রদ-নীরে
ডুবিব মৃণাল হয়ে ভাবের কর্দ্দমে
সরারুহ সাজে সখা তিষ্ঠ তদুপরে
নাহি হেথা বাধা বিঘ্ন স্পর্শ আলাপনে।

(৩)

কখনো মানস-রাজ্যে পূত প্রেমাশ্রমে
উপবিষ্ট রব দোঁহে পাতিয়া বকল
(উচ্ছ্বসিত হবে হিয়া আনন্দ প্লাবনে)
তৃণ-বৎ তুচ্ছ করি পাপ ধরাতল।

(৪)

কভু বা মানস-রাজ্যে প্রেম-কুঞ্জবনে
(একটী বরষ যথা একটি পলক)
জগতের অগোচরে সদা সঙ্গোপনে
হেরিব দোঁহারে দোঁহে আঁখি অপলক।

(৫)

কখনও মানস-পটে রহিব চিত্রিত
নব শঙ্খ নবাশাড়ী করি পরিধান
শরৎ ঋতুর রাঙ্গা প্রভাতের মত
হেরিব বঙ্কিম নেত্রে বঁধুর বয়ান।

(৬)

কখনও মানসাকাশে সুখের সমিরে
ভাসি বেড়াইব দোঁহে পরীর মতন
লজ্জা ঘৃণা ভয় ভীতি রবেনা শরীরে
আত্মার মিলন এ যে পবিত্র মিলন।

(৭)

এসহে মানস-রাজ্যে মানস-মোহন!
প্রেম-পারিজাত-ফুলে মহামূল্য হার
গাঁথিয়া পূজিব পদ কেন অকারণ
শারীরিক মিলনেতে পাপের সঞ্চার।

(৮)

করিব অসার দেহ অসার জগৎ
পুণ্যে পরমায়ু বৃদ্ধি পুণ্য স্বর্গ সম
মানসে করিব ভোগ সখা মনোমত
এস হৃদি পুষ্প-বনে এস প্রিয়তম।

(৯)

অশরীরী হয়ে এস সুরভীর মত
জ্যোৎস্নার ছায় এসে কর আলিঙ্গন
বায়ুরূপে স্পর্শ সুখ ভুঞ্জিব নিয়ত
শব্দরূপে কর্ণপুটে কর পরশন।

(১০)

সম্পূর্ণ হৃদয় মম, সর্ব্বস্ব আমার
মানসে হইবে আজ মধুর মিলন

বিরহের মহাভয় রহিবে না আর
ভুঞ্জিব তাবৎ সুখ যাবৎ জীবন।

চন্দনী এইরূপে কবিতাটি আবৃত্তি করিতেছিলেন আর চক্ষুজলে তাঁহার গণ্ড স্থল প্লাবিত হইতেছিল। হঠাৎ কি একটি শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি ব্যস্ত হইয়া শয্যা ত্যাগ করিয়া ভূমিতলে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। শব্দটি ক্রন্দনের, তাহাও আবার একটি স্ত্রীলোকের বলিয়া অনুভব হইল।

এ স্বর তাঁহার সম্পূর্ণ অপরিচিত। এ অপরিচিতা এ বাড়ীতে কোথা হইতে আসিল? কে বা আনিল? নিশান্তে আর কোন শব্দাদি তাঁহার কর্ণে আসিল না, কিন্তু গভীর নিশাকালে পুনরায় তাঁহার পার্শ্বের ঘর হইতেই ক্রন্দনের শব্দ তাঁহার কর্ণে আসিতে লাগিল। অদ্যকার ক্রন্দন ধ্বনি বহুক্ষণব্যাপী ও করুণ। চন্দনী সাবধানে শুনিতে লাগিলেন। অদ্য তাঁহার বোধ হইতে লাগিল এ স্বর যেন তাঁহার পরিচিত। তিনি ভাল বুঝিতে পারিতেছেন না, হাঁ, এইবার যেন বুঝিতে পারিলেন এবং তিনি চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন এ যে প্রতিধ্বনির স্বর। প্রতিধ্বনি ভগ্নি! প্রতিধ্বনি! তুমি কি এখনও জীবিতা আছ? দেবদত্ত! দেবদত্ত! নন্দক! নন্দক! কোথায় তোমরা?—

ক্রমশঃ

অম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্তা
ঢাকা
বখ্‌সিবাজার।

শ্রীভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের ষষ্ঠ মহাধিবেশন।

সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বী সমস্ত হিন্দুগণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হইতেছে যে, হিন্দুজাতির অদ্বিতীয় বিরাট ধর্ম্মসভা শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের ষষ্ঠ মহাধিবেশন আগামী শীতকালে বড়দিনের সময় ২৪শে ডিসেম্বর হইতে ৩০শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীকাশীধামে সম্পাদিত হইবে। ইতি-পূর্ব্বে এই বিরাট ধর্ম্মসভার পাঁচটি মহাধিবেশন সমারোহের সহিত মথুরা, দিল্লী, প্রয়াগ, কাশী ও কলিকাতায় সুসম্পন্ন হইয়াছে এবং সকল স্থানেই ভারতের সুপ্রসিদ্ধ নরপতি ও সভ্যগণ সমবেত হইয়া বিদ্যা, ধর্ম্ম, সমাজাদি বিবিধ বিষয়ে নিজ নিজ মত প্রকাশ পূর্ব্বক ধর্ম্ম ও পুরুষার্থের পবিত্র শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। আবার অতীতের অনন্ত বিপত্তিময় অমানিশা কাটাইয়া ভবিষ্যতের গৌরব-রবিকে আবাহন করিবার নিমিত্ত বর্ত্তমান সময়ে শ্রীমহামণ্ডলের দ্বারা এই মহোৎসবের বিপুল আয়োজন হইতেছে।

অতএব এই বিরাট সভার আহ্বান ধ্বনি প্রত্যেক সহৃদয় হিন্দুর হৃদয়ে কি

প্রতিধ্বনি উৎপন্ন করিবে না ? প্রত্যেক ধার্ম্মিক হিন্দুর এখন কর্ত্তব্য এই যে যাহাতে এই মহাধিবেশন পূর্ব্বের মহাধিবেশন গুলির অপেক্ষা আরও সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হয় এবং ইহাতে বিবেচিত বিদ্যা, ধর্ম্ম ও সমাজ আদি সম্বন্ধীয় বিষয়গুলি সমগ্র হিন্দুজাতির হৃদয়গ্রাহী ও অনুমোদিত হয় সেই বিষয়ে সকলেই যথাসাধ্য প্রযত্ন করেন, এবং সকলের সমবেত শক্তির দিব্যবলে যে হিন্দুর জাতীয় জীবনকে অধিকতর উন্নতির সোপানে আরোহন করাইবে ইহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ হইতে পারেনা।

ত্রিগুণময়ী মায়ার পরিণামশীল প্রবাহে সংসারে নিত্যই নূতন পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইতেছে এবং হিন্দুজাতির জীবনও বর্ত্তমান কালের স্রোতে এক নবীন দশা প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। অতএব এই সময়ে ভারতের সকল সম্প্রদায় ও মতাবলম্বী ধার্ম্মিক হিন্দুগণের একান্ত কর্ত্তব্য এই যে, তাঁহারা সকলে কোন এক পুণ্যক্ষেত্রে সমবেত হইয়া হিন্দু জাতির ধর্ম্ম জীবন সংক্রান্ত সকল বিষয়ে বিচার ও সিদ্ধান্ত নির্ণয় করেন, যাহাতে জাতীয় জীবন প্রবাহিনী কল্যাণবহা হইয়া প্রাচীন মহর্ষিগণের প্রদর্শিত পথাবলম্বন করত সকল জীবের কল্যান সাধন করিতে পারে। এই সকল মহদুদ্দেশ্যের সিদ্ধির জন্যই শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রস্তাবিত মহাধিবেশনের আয়োজন করা হইতেছে।

এতদতিরিক্ত এই মহাধিবেশনের দ্বারা শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল অতীতের অন্ধকার ভেদ করিয়া কিরূপে ভবিষ্যতের উন্নতিময় জীবনে পদার্পণ করিল তাহাই সূচিত হইবে। এই ত্রয়োদশ বৎসরের বিপত্তিময় কঠিন জীবন অতিবাহিত করিয়াও ভারতে ধর্ম্মের অভ্যুন্নতির জন্য শ্রীমহামণ্ডল অনেক কার্য্য করিয়াছে যথা—(১) সাম্প্রদায়িক বিরোধের সমাধান করিয়া ভারতবর্ষের সমস্ত সাম্প্রদায়িক আচার্য্যগণকে সজ্ঞশক্তির ভুবন বিজয়িনী পতাকার নীচে একত্রিত করিয়াছে। (২) ভারতের সমস্ত প্রান্তীয় স্বাধীন নরপতি, ধনবান ও শক্তিশালী রাজাগণ, ধর্ম্মের প্রতি আস্থাসম্পন্ন নেতা ও সভামণ্ডলী এবং দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণকে সনাতন ধর্ম্মের উন্নতিকল্পে উত্তেজিত ও অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে। (৩) উত্তরভারতের ক্ষত্রিয়গণের সহিত রাজপুতানার ক্ষত্রিয়গণের সামাজিক ও বৈবাহিক সম্বন্ধ সংস্থাপিত করিয়াছে। (৪) শত শত ধার্ম্মিক বক্তা ও উপদেষ্টা দ্বারা, গম্ভীর গবেষণাপূর্ণ সিদ্ধান্ত-গ্রন্থ ও পুস্তিকা সমূহের দ্বারা এবং ইংরাজী ও প্রান্তীয় বিবিধ ভাষায় পত্রিকা প্রণয়ণ দ্বারা সনাতন ধর্ম্মের বহুল প্রচার করিয়াছে। (৫) ভারতকে বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন করিয়া প্রত্যেক প্রান্তে প্রান্তীয় মণ্ডল স্থাপন ও তদন্তর্গত শত শত সভা স্থাপন করিয়াছে এবং ধর্ম্মসভা, প্রান্তীয় মণ্ডল ও মহামণ্ডলের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে

একতা স্থাপন করত নিয়মবদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অনুশাসন প্রণালীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। (৬) সাধু ও গৃহস্থ ধর্ম্মবক্তা প্রস্তুত করিবার জন্য কাশীপুরীতে একটি আদর্শ উপদেশক মহাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছে। (৭) ভারতের বিভিন্ন প্রান্তীয় বিদ্যাপীঠ সমূহের উদ্ধার সাধন এবং জোশিমঠের উদ্ধার সাধন কল্পে অনেক পুরুষার্থ করিয়াছে। (৮) যোগ্য ব্যক্তিকে উপাধি ও মানপত্রাদি দ্বারা সম্মানিত করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় প্রদান এবং বিবিধ বিদ্যার উন্নতির নিমিত্ত উত্তেজনা প্রদান করিয়াছে। (৯) সনাতন ধর্ম্মের উদার স্বরূপ জগতের সম্মুখে প্রদর্শন করত সমস্ত সাম্প্রদায়িক বিরোধের পরিহার করাইয়াছে। (১০) অনেক লুপ্ত শাস্ত্রীয় গ্রন্থের উদ্ধার সাধন করিয়াছে। (১১) ধার্ম্মিক স্ত্রী শিক্ষার প্রচারের জন্য বিশেষ উদ্যোগ করিয়াছে। এবং (১২) রাজভক্তির প্রচার করিয়া রাজা প্রজা সম্বন্ধকে বদ্ধমূল করিয়াছে। ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক ধর্ম্মকার্য্য মহামণ্ডলের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে— যাহার উপকারিতা ও জাতীয় ধর্ম্ম জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বুদ্ধিমান্ পাঠক মাত্রই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

শ্রীবিশ্বনাথের কৃপায় প্রারম্ভিক অনেক বাধা ও অসুবিধা অতিক্রম করিয়া এখন শ্রীমহামণ্ডল হিন্দুজাতির স্থায়ী কল্যানের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। বিরুদ্ধ শক্তির সংঘর্ষণ দ্বারা এই বিশাল কল্পতরু নষ্ট না হইয়া বরঞ্চ আরও দৃঢ়মূল হইয়াছে। ইহার স্থায়িত্ব ও ক্রমোন্নতিকে ভবিষ্যৎ বাধাহীন করিবার জন্য মহামণ্ডল ট্রষ্টের স্থাপনা করা হইয়াছে এবং বারাণসীর একটি বিশেষ মনোরম স্থানে প্রধান কার্য্যালয়ের জন্য বিশাল বাটী ক্রয় করা হইয়াছে। কার্য্যাবলীর দৈনন্দিন প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নূতন জমি ক্রয় করত নূতন বাটী প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা হইতেছে, এবং আর্থিক অবস্থারও অনেক সচ্ছলতা হইয়াছে। এখন ভগবানের কৃপায় সকল দিকে সুবিধা হওয়াতে প্রস্তাবিত মহাধিবেশনের উদ্যোগ করা হইতেছে।

মহামণ্ডলের নিয়ম অনুসারে মহাধিবেশন ধার্ম্মিক হিন্দুপ্রজার একটী মহান্ সম্মিলন, পরন্তু এবারে এই মহাসম্মিলনের ধর্ম্মভাবের গভীরতার বিশেষ বৃদ্ধি সাধনের জন্য মহাধিবেশনের সময়ে একটী মহা যজ্ঞেরও অনুষ্ঠান করা হইবে। ইহাতে রাজা, প্রজা, গৃহস্থ, সন্ন্যাসী, বিদ্বান্, কর্ম্মকাণ্ডী আদি সকলেই যোগদান করিবেন। ইহার ফলে সমগ্র হিন্দুজাতির সমবেত প্রার্থনা শক্তিদ্বারা সম্রাট ও সাম্রাজ্যের বিশেষ কল্যাণ সংসাধিত হইবে।

কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বদিন বিশেষ ধুমধামের সহিত নগরসংকীর্ত্তন ও বেদ ভগবানের শোভাযাত্রা (procession) কাশীনগরের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিবে।

এই বিশাল সমারোহে ভারতে অনেক ধার্ম্মিক নেতৃবর্গ ও জনসাধারণ যোগদান করিবেন।

গুণপূজা ও যোগ্য ব্যক্তির পুরস্কার দ্বারাই প্রত্যেক জাতি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে। এই জন্য এই মহাধিবেশনে সমগ্র হিন্দুজাতির প্রতিনিধি স্বরূপ শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের পক্ষ হইতে ভারতে বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিগণকে বিশেষভাবে সম্মানিত করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ধর্ম্ম প্রচার, সাহিত্য, পদার্থ বিদ্যায় পারদর্শিতা, শিল্পকলার নৈপুণ্য, সাধারণের কল্যানকর ধর্ম্মকার্য্য, কর্ম্মকাণ্ডে যোগ্যতা, অপূর্ব্ব দানশীলতা আদি বিশেষ বিশেষ গুণাবলীর জন্য যোগ্য ব্যক্তিকে এই মহাসভা হইতে উক্ত মহাধিবেশনের সময় উপাধি, স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক, মানপত্র, ধন্যবাদপত্র আদি দ্বারা ভূষিত করা হইবে। এপর্য্যন্ত শ্রীমহামণ্ডল হইতে ২৩ জনকে ধর্ম্মোপাধি, ৪১ জনকে বিদ্যোপাধি, ৭ জনকে পদার্থ-বিদ্যোপাধি, ৫ জনকে মহামহোপদেশক পদবী, ২৯ জনকে মহোপদেশক পদবী, ৪৪ জনকে উপদেশক পদবী, ২৬ জনকে মানপত্র, ১৬ জনকে পদক ও মানপত্র, ৫১ জনকে ধন্যবাদ পত্র এবং ১৪ জন নরপতি ও ধর্ম্মাচার্য্যকে সংরক্ষক মানপত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

এই মহাধিবেশনে ভারতের সকল প্রান্ত হইতেই বিদ্বান, সুপণ্ডিত, নেতৃবর্গ ও ধর্ম্মাচার্য্যগণের শুভাগমন হইবে। এইজন্য মহামণ্ডলের কর্তৃপক্ষগণ মনস্থ করিয়াছেন যে এই শুভ অবসরে সনাতন ধর্ম্মের অভ্যুদয় কল্পে বর্ত্তমান সামাজিক, জাতীয় এবং বিদ্যা ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিচারনীয় বিষয়ের উপর সকলে একত্রিত হইয়া বিচার করা হয় এবং এইরূপে শাস্ত্রানুমোদিত সার্ব্বজনিক সিদ্ধান্ত সকলের সম্মুখে প্রকটন করা হয়, যাহাতে বর্ত্তমান সময়ে বিবিধ সামাজিক বিষয়ে মতদ্বৈধতা নিবন্ধন যে নানাবিধ অশান্তি উপস্থিত হইয়াছে তাহা বিদূরিত হইয়া জাতীয় জীবনের মধ্যে শান্তি সংস্থাপিত হইতে পারে। সকল বিষয়ই অন্তরঙ্গ কমিটিতে প্রথম বিচারিত হইয়া পরে সর্ব্বসাধারণের গোচর করা হইবে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর বিচার ও মতামত প্রকাশের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিষয়।

স্কুল ও কলেজে ধর্ম্ম শিক্ষার বিস্তার, সাধু ও গৃহস্থ প্রচারক প্রস্তুত, সর্ব্ব-সাধারণের মধ্যে সনাতন ধর্ম্মের প্রচার ও প্রচারকদিগের সহায়তা প্রদান, শান্তি ও আস্তিকতা নাশকারী বাহ্য অহিন্দুভাব সকলের দুরীকরণ, উত্তম কথা, কীর্ত্তন, যাত্রা আদিদ্বারা ধর্ম্ম প্রচার, পাঠশালা, টোল, চতুষ্পাঠী ঋষিকুল আদি সংস্থাপন দ্বারা আর্য্য-বিদ্যার বিস্তার, প্রাচীন-বিদ্যা পীঠ সমূহ এবং জোশিমঠের উদ্ধার, হিন্দুগৃহে সতী-ধর্ম্মের আদর্শ রক্ষা এবং বর্ত্তমান বিজাতীয় বিরুদ্ধ সংস্কার সমূহের নিরাকরণ ইত্যাদি।

সামাজিক বিষয়।

বিবাহে অতিরিক্ত পণ গ্রহণ, ও শ্রাদ্ধাদিতে অন্যায্য ব্যয়াধিক্য, ধর্ম্মার্থ উৎসর্গীকৃত সম্পত্তি ও দানের সদ্ব্যবস্থা তীর্থস্থানে মন্দির, কুণ্ড, সরোবর, ঘাট আদির সদ্ব্যবস্থা, মন্দিরের পুরোহিত ও পাণ্ডাগণের উন্নতি, সাধু ও ব্রাহ্মণগণের উন্নতি সাধন, বিধবা ও অনাথগণের প্রতিপালন, সামাজিক অনুশাসন ব্যবস্থা, পঞ্চায়তি ব্যবস্থার প্রচার, সাম্প্রদায়িক বিরোধ পরিহার ইত্যাদি।

উল্লিখিত বিষয়গুলির উপর বিচার যাহাতে শাস্ত্রানুসারে সর্ব্বাঙ্গীণ পূর্ণতাযুক্ত ও হৃদয়গ্রাহী হয় সেই বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইবে। এইরূপ জাতীয় বিরাট সম্মিলনে হিন্দু মাত্রেরই যোগদান করা উচিত। ধার্ম্মিক একতা ও সঙ্ঘ শক্তির অভাবে হিন্দুজাতি দিন দিন অবনতির অন্ধকারময় কূপে নিমজ্জিত হইতে চলিয়াছে। মত ভিন্নতা জনিত অন্তর্বিবাদ এই অনাদি আর্য্যজাতিকে কীটদষ্ট তরুর ন্যায় দিন দিন নিঃসার করিয়া ফেলিতেছে। এই জন্য শ্রীমহামণ্ডলের এই জাতীয় মহাযজ্ঞে আমরা আদরের সহিত সমস্ত হিন্দুকে আহ্বান করিতেছি। আশা করি প্রত্যেক হিন্দুই এই মহাযজ্ঞে যোগদান করিয়া হিন্দুজাতির কল্যান সাধন করিবেন।

উৎসবের মনোহারিতা বৃদ্ধির জন্য ভারতীয় একটি সুন্দর প্রদর্শনীর (exhibition) ও ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

প্রতাপ সিংহ মেজর জেনেরেল
জি, সি, এস, আই, জি, সি, আই, ই,
মহারাজা জম্বু ও কাশ্মীর
সভাপতি ভারতবর্ষীয় প্রতিনিধি সভা।
রাবনেশ্বর সিংহ কে, সি, আই, ই,
মহারাজা গিধোর সভাপতি প্রবন্ধ
কারিণীসভা।
সারদাচরণ মিত্র।
ভূতপূর্ব্ব জজ্ কলিকাতা
হাইকোর্ট প্রধান মন্ত্রী।

শ্রীভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডল
প্রধান কার্য্যালয় জগৎগঞ্জ
বেনারস ছাউনি।
১লা নবেম্বর ১৯১৫।

সংবাদ।

(১)

ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রার্থনানুসারে ভারত সচিব এতদ্দেশীয় মহিলাদিগের নিমিত্ত বাৎসরিক ৩০০০৲ টাকার একটী বৃত্তি মহিলা ... করিয়াছেন। বৃত্তি প্রাপ্ত ...য়েট হওয়া আবশ্যক।

নোট—মহাধিবেশন সম্বন্ধীয় পত্র ব্যবহার করিতে বা কোন সংবাদ জানিতে হইলে সেক্রেটরী মহাধিবেশন বিভাগ শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল এই ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিবেন।

তাহাকে গ্রেটব্রিটনের কোন স্থানে বা অনুমতি লইয়া অন্যত্র চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিতে হইবে। বিশেষ ক্ষেত্রে অপর শাস্ত্র আলোচনার নিমিত্ত ও এই বৃত্তি দেওয়া যাইতে পারিবে।

(২)

মান্দ্রাজ প্রদেশে ভিজিয়ানাগ্রামে অন্ধ বালিকাদিগের এক সম্মিলনীতে বালিকাদিগের শারীরিক ব্যায়ামের আবশ্যকতা আলোচিত হইয়াছে। সম্মিলনীর নায়িকা শ্রীমতী সূর্য্য অর্ম্মা খেলার উপকারিতা বর্ণনা করিয়া বালিকাদিগের স্বাস্থ্যের উন্নতির নিমিত্ত খেলায় যোগদান করিতে উপদেশ দিয়াছেন। অন্ধবালিকারা স্থির করিয়াছে যে তাহারা মূল্যবান অলঙ্কার পরিধান করিবে না এবং তাহাদের সকল সাজ সজ্জা স্বদেশী হইবে।

(৩)

অনাথা বিধবাগণ যাহাতে শিল্পকার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে তজ্জন্য বিহারের পাটনা নগরে বরোদার মহারাণী মহোদয়ার নামে এক শিল্প ভবনের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে

(৪)

অষ্ট্রেলিয়ার ম্যালেসাইল নামক একজন বৈজ্ঞানিক কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টিপাতের চেষ্টা করিতেছেন। নিউসাউথওয়েলসের গবর্ণমেণ্ট এই কৃত্রিম বৃষ্টি সংক্রান্ত পরীক্ষার সমস্ত ব্যয় বহন করিতে সম্মত হইয়াছেন। বৈজ্ঞানিক ম্যালেসাইল বলেন ছয় সাত হাজার ফিট উপরে বেলুনে উঠিয়া উহার সাহায্যে বায়ুস্তরে তড়িৎ প্রবাহের প্রয়োগ করিবেন। ইহার ফলে বায়ুতে যে আর্দ্রতার সঞ্চার হইবে তদ্বারা বাষ্প ঘনীভূত হইয়া মেঘরাশিতে পরিণত হইয়া বারি বর্ষণ করিবে। বৈজ্ঞানিক বলেন, বায়ু প্রবাহের পথে এই প্রকারের কয়েকটী আড্ডা স্থাপন করিতে পারিলে কৃত্রিম উপায়ে বারিবর্ষণের কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না।

(৫)

এবার বড়দিনের সময় বোম্বাই নগরে বাণিজ্য সমিতির অধিবেশন হইবে, তাহাতে বোম্বাইয়ের বণিক সমাজের অন্যতম উদ্‌যোগী মান্যবর স্যার ফজলর ভাই করিম ভাই সভাপতি হইবেন এবং শ্রীযুক্ত ওয়াচা অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন।

(৬)

বর্দ্ধমানের মহারাজা বাহাদুরের কন্যাগণ ও রাজ পরিবারস্থ কুমারীগণ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষে বেঙ্গল এম্বুলেন্স দলের ছেলেদের ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার ফোটা ও তত্ত্ব পাঠাইয়াছেন। মহারাজা বাহাদুরের কন্যাগণের এই উদারতা অতি মহৎ আদর্শস্থল।

(৭)

আমরা অতি দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে ভারত হিতৈষি স্যার ফেরোজ শা মেটা ও ভারত বন্ধু স্যার হেনরী কটন্‌ আর ইহলোকে নাই।

এই দুই ভারত হিতৈষির তিরোভাবে সমগ্র দেশবাসী ব্যথিত হইয়াছে।

ইন্দোরের সহৃদয়া মহারাণী ইন্দিরাবাই হোলকার দেওয়ালি উপলক্ষে বোম্বায়ের লর্ড হার্ডিঞ্জ হাসপাতালের আহত সৈনিকগণকে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া নানাবিধ সুভোজ্য দানে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন।

বামারচনা।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

আজি হেন শুভদিনে
কে আছে বিষন্ন মনে
আনন্দে ভাসিছে সবে এ বঙ্গ আগারে।
ভগিনী ভ্রাতার ভালে
ফোঁটা দেয় কুতুহলে
এত সুখ আর কোথা আছে এ সংসারে।
ভ্রাতারে ভগিনী যত
সাজায় যে মনমত
কত যে আশীষ মাগে বিভুর চরণে।
ভগিনী ভ্রাতার তরে
কত যে যতন করে
প্রকাশে সে ভালবাসা যত ছিল মনে।
হেন পুণ্যময় দৃশ্য
খুঁজিলে না পাবে বিশ্ব
ভগিনী ভ্রাতার এই মধুর মিলন।
কোথা কি দেখেছ কেহ
হেন ভাই বোন স্নেহ
এ বন্ধু সংসারে বিনা মিলে না কখন।
বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে
কি স্নেহ বিরাজ করে
দেখায় জগত জনে আজি এ মরতে।
কর বিধি আশীর্ব্বাদ
পূর্ণ হোক এই সাধ
এই দৃশ্য চিরদিন থাকে এ ভারতে।
যেন শেষে কাল ফলে
ডুবে না অতল জলে
বাঙ্গালীর সব সুখ ডুবেছে যে মতে।

মৃন্ময়ী দেবী

---

৩৭ নং মথুরাম লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্তৃক ৩৯ নং অ্যান্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

৫৩ বর্ষ।

বামাবোধিনী পত্রিকা

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি. এ, কর্তৃক প্রবর্ত্তিত।

অগ্রহায়ণ, ১৩২২। ডিসেম্বর ১৯১৫।

সূচী।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৸০ ; অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১।৵০ ; প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।০ (চারি আনা মাত্র)।

মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার।

অগ্রিম।

শ্রীমতী ক্ষিরোদবাসিনী দাসী, কলিকাতা		১।৶০
শ্রীযুক্ত বেণীমাধব মিত্র	,,	১।৶০
শ্রীমতী ইন্দুবালা	,,	২॥৶০
শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র	,,	২॥৶০
সেক্রেটরী বাগবাজার রিডিংরুম,	,,	১।/০
শ্রীযুক্ত সুর্য্যকুমার চৌধুরী	,,	২॥৶০
রায় বাহাদুর শশীভূষণ দত্ত, আগরতলা		২॥৶০
শ্রীযুক্ত বরদা দাস বসু, কারমাটার		১।/০
শ্রীমতী শরৎশশী গুহ, ঢাকা		১।/০
শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, বদরপুরঘাট		২॥৶০
,, প্রাণরাম বসু, কলিকাতা		১৲
শ্রীমতী ক্ষিরোদমোহিণী দাসী, কলিকাতা		১।০

সাবেক।

শ্রীমতী ক্ষিরোদবাসিনী দাসী, কলিকাতা		॥৶০
শ্রীযুক্ত বেণীমাধব মিত্র,	,,	২॥৶০
,, পূর্ণচন্দ্র বসু, দ্বারভাঙ্গা		৩৲
,, তারাপদ ঘোষ, খিদরপুর		২॥৶০
মিসেস আর কে চাটার্জি, কলিকাতা		২॥৶০
শ্রীমতী লাবণ্যময়ি দাসী, গাইবান্ধা		১।/০
শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র মিত্র, বিলাসপুর		২॥৶০
অনারারি সেক্রেটরী শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরি		৸০
শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র বসু,		১৲
শ্রীমতী সুনীতিবালা দত্ত,		২॥৶

৳ বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 628. December, 1915.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"
কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।
স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৩ বর্ষ। ৬২৮ সংখ্যা।	অগ্রহায়ণ, ১৩২২। ডিসেম্বর, ১৯১৫।	১০ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

আমাদের কথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যাক্ ওসব কথা, আপনার কাছে একটা বিশেষ আবশ্যক আছে, তাই শ্রীচরণে নিবেদন করতেই আসা;—

তর্ক। আর গৌরচন্দ্রিকা কেন? সোজা বল্ না কি বল্‌বি?

আমি ফস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলাম, "বিদ্যাসাগরের 'বিধবা-বিবাহ' পড়েছেন তো? আপনার সে সকল বিষয়ে কি মত?

তর্ক। তুই কি, তা বল্ দেখি?

আ। আজ্ঞে সে বিষয়ে মতভেদ আছে।

তর্ক। সে আবার কি?

আ। আমি যে কি, তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ মতভেদ দৃষ্ট হয়। বাবা বলতেন গাধা, মা বলতেন হতভাগা, মেজদি বলেন সোনা, সত্যবাবু বলেন ষ্টুপিড্, সরলা বলে দাদা, শ্বশুর বলেন বাবাজী, তাঁর মেয়ে বলে ওগো, চাকর বলে বাবু, চাকরাণী বলে দাদাবাবু, হিমী বলে মামাবাবু, লোকে বলে ডাক্তার বাবু, ঠান্‌দিদিরা বলেন শালা, আপনি বলেন পাগল —ইত্যাদি। সে কথা যাক্। এখন এ বিষয়ে কি মত বলুন।

তর্ক। দূর গর্দ্দভ! ওসব কথা তোর মুখে কেন? তুই কি একটা বিধবা বিয়ে করবি নাকি?

আ। যদি করি? আপনি মত দেবেন?

তর্ক। বালাই? বিধবা বিয়ে করতে কেন যাবি? মেয়ের অভাব, কি? কত

সব খাসা খাসা—বলিতে বলিতে হঠাৎ দম্ খাইয়া, ঢোক গিলিলেন—"তা—তা—তা—তোর শ্বশুর আমার শিষ্য—

আ। নইলে বুঝি এর উপর আমার আর একটা গছাতেন?

তর্ক। না—না,—বলি ওসব কথা কেন?

আ। সত্য বলব?

তর্ক। কি? ব্যাপারটা কি? ওসব কথা মুখে আনতে আছে? মহাপাপ—মহাপাপ!!

আমি কি করিয়া কথা পাড়িব ভাবিয়া পাইলাম না। ব্যবসাদারী কথা বড় শিখিতে পারি নাই। সোজাসুজি সব বলিয়া ফেলিলাম, কাল সকালে মেজদিদির বাড়ী সভা হবে এবং চন্দ্রনাথবাবু প্রমুখ গণ্যমান্য অনেকের উপস্থিতিতে এবিষয়ে বিচার হবে, কিন্তু আপনার অনুপস্থিতে এ সকল কিছুই হতে পারে না, এজন্য সন্তোষবাবুর আপনার শ্রীচরণে সবিনয় প্রার্থনা যে, আপনি উপস্থিত থাকেন, ইত্যাদি সবই বলিলাম। ঠাকুরদাদা প্রথমে আমায় খানিক গালিগালাজ করিয়া অবশেষে সম্মত হইলেন। সন্তোষবাবু মাতব্বর যজমান,—অবশ্য মেজদির কল্যাণে,—নহিলে এত দিনে মিষ্টার ডাটু ব্যাপ্‌টাইজ হইতেন।

বেলা আদৌ নাই দেখিয়া তাঁহার পদধূলি লইয়া বিদায় হইলাম।

বাড়ী আসিয়া দেখি, একটি ভদ্রলোক গ্রামান্তর হইতে চাকর পাঠাইয়াছেন, লোকটা অনেকক্ষণ হইতে অপেক্ষা করিতেছে,—তাঁর ভ্রাতৃবধূর কলেরা। তৎক্ষণাৎ পোষাক পরিয়া ঔষধের বাক্স চাকরটির মাথায় দিয়া, অশ্বসজ্জিত করিয়া রওনা হইলাম।

(৫)

আমার স্বর্গীয়া জননী মৃত্যুশয্যায় আমায় বলিয়া গিয়াছেন, "গ্রামে কাহারো কাছে টাকা লইয়ো না;" কিন্তু গ্রামান্তর হইতেই মাসিক যাহা পাইতেছি তাহার দশমাংশও যদি পিতার আয় থাকিত তবে আমাদের জীবন-কাহিনী আর রাখিয়া যাইবার প্রয়োজন হইত না; কিন্তু তাহা ছিল না। এ দুঃখময় জগতে কয়জন এমন আছেন, যাঁহার অন্তত একদিনও মনে করিতে হয় নাই—"হায়, এমনটি না হইয়া যদি এমনটি হইত, তবে আমি আজ কত সুখী হইতাম।" কিন্তু তাহা হইলে বৈষম্যময় জগৎ চলে কৈ? ঐ টুকুই তো দুনিয়ার দুনিয়াত্ব!

মেডিকেল্ কলেজের পাশকরা ডাক্তার আমি ছাড়া নিকটে আর কেহ ছিল না; সুতরাং ব্যবসা আরম্ভ করিতেই আমি "বড় ডাক্তার" নামে অভিহিত হইয়াছি। চারিদিকে অনেক সহস্র-মারী ছড়ানো ছিল, তাদেরই একজন এই রোগিনীকে প্রথমে চিকিৎসা করে, এবং কাজ গুছাইয়া তুলিয়া তবে আমায় 'কন্‌সাল্ট' করিতে চাহে। গিয়া দেখি অধিক বিলম্ব নাই—সাত আট ঘণ্টা পূর্ব্বেও যদি আমায় ডাকিত, তথাপি নয় যমরাজের

সঙ্গে কিছুক্ষণ বোঝাপড়া করিয়া দেখিতাম। গ্রামের বাহিরে আমার অদৃষ্টে প্রায় এইরূপই হইত। দৃষ্টি-কৃপণেরা রোগীকে না নামাইয়া প্রায়ই আমায় ডাকিত না; এই দৃষ্টি-কৃপণতার জন্য যে কত নিরীহ জীব প্রাণ হারায়, তাহার সংখ্যা নাই। শেষে পাঁচ শত টাকা ব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না—অথচ তাহা নিস্ফল হয়। কিন্তু প্রথমে পঞ্চাশটি টাকাও ব্যয় করিতে পশ্চাৎপদ হইবে। সে যাক্। তথাপি ঔষধ দিলাম, উপকারের মধ্যে হইল—আমার কিছু পাপসঞ্চয় এবং রোগিনীর মৃত্যু-যন্ত্রণার বৃদ্ধি। একটা কথা আছে "যমে মানুষে টানা,"—কথাটা বড় সত্য। ইহাতে উপকারের মধ্যে অনেক সময়ে এই হয় যে, জীবনীশক্তিকে অতি কষ্ট পাইয়া বাহির হইতে হয়। হয় তো কেহ বিষপান করিয়া সংজ্ঞাহারাইয়াছে, কিছুক্ষণ পরেই সব যন্ত্রণার হাত এড়াইবে; এমন সময় আমরা গিয়া ঔষধ প্রয়োগে তাহার সংজ্ঞা ফিরাইয়া আনিলাম; আরো পাঁচ সাত ঘণ্টা বাচাইয়া রাখিলাম—শেষে রণে ভঙ্গ দিলাম—রোগীও মরিল, লাভের মধ্যে এই বাড়তি কষ্টটুকু ভোগ করিয়া গেল। বলে "বাঘে বাঘে লড়াই হয়, কবাড় বনের প্রাণটি যায়।" আমাদেরও যমে ডাক্তারে লড়াই হয়, মরিতে রোগীরই হয়; এখানেও তাহাই হইল। সমস্ত রাত্রি জাগিয়া চেষ্টা করিলাম, শেষ রাত্রে রণে ভঙ্গ দিলাম।—বৃন্তচ্যুত রক্তোৎপলকে জলের ছিটা দিয়া কতক্ষণ রাখিব? রোগিনীকে ঘরের বাহির করা হইল, আমিও বাহিরে আসিলাম। তখন ভোরের পাখীরা অনেকক্ষণ হইতে চাঁচা-মিচি আরম্ভ করিয়াছে। যে বাড়ীতে গিয়াছিলাম তাহার সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছ, তাহাতে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুল ফুটিয়াছে, তাহাতে অসংখ্য মধুমক্ষিকা আসিয়া জুটিয়াছে; একটা অবিশ্রান্ত ঝন্—ন্—ন্—ন্—শব্দ উঠিতেছে,—যেন সেই আদি প্রণব ঝঙ্কারের জের চলিয়াছে। আমারও সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় মাথার মধ্যে ভোঁ ভোঁ করিতেছিল, সুরে সুর মিলিল। এমন সময় দেখিলাম, মৃতা ষোড়শীর স্বামী বাহিরে আসিলেন।—এঁকে আমি চিনিতাম—এম্-এ পাশ করিয়া ইনি কলিকাতায় আইন পড়িতেন। এঁর সঙ্গে কলিকাতায় অনেক ফুটবলের ম্যাচ খেলিয়াছি, তবে ছেলেবেলায় তত পরিচয় ছিল না। এঁদের অবস্থা ভাল, প্রায় আমারই বয়স।

তাঁহার স্ত্রীকে মৃত্যুশয্যায় দেখিয়াছি, সুস্থ অবস্থায় তাহার যে কি ছিল তাহা ভাবিয়াই পাইলাম না। বাহিরে আসিবার সময় আসন্নমৃতা রোগিনীর মুখ দেখিয়াছি, আর এই সুস্থ মানুষের মুখ দেখিলাম—প্রভেদ অল্পই। সেরূপ বিকৃত মুখশ্রী জীবন্ত মানুষের খুব কমই দেখিয়াছি।—যুবকের সে মুখের দিকে চাহিতে ভয় হয়।

ডাক্তারী করিতে বসিয়াছি, আমাদের

সম্মুখে এ সকল দৃশ্য নিত্য, তথাপি যেন আমি বিচলিত হইলাম। তাঁহার দাদা অর্থাৎ গৃহস্বামী, আমার হাতে পঞ্চাশটি টাকা দিতে এলেন, করজোড়ে আমি তাহা প্রত্যাখ্যান করিলাম—লইতে প্রবৃত্তি হইল না। তিনি অনেক অনুরোধ করিলেন, তথাপি লইতে পারিলাম না। মনে হইল, পূর্ব্বজন্মে বুঝি এমনি কোনো ফুল্ল কুসুমের প্রতি অবিচার করিয়াছিলাম, তাই এজন্মে—

বাড়ী ফিরিলাম। তখন বেশ বেলা হইয়াছে। সরলা স্নান করিতে গিয়াছে। পদ্মমুখী অবশ্য তখনো শয্যাত্যাগ করেন নাই; আমায় দেখিয়া, আড়ামোড়া খাইয়া হাই তুলিয়া, চক্ষু মুছিতে মুছিতে তিনি উঠিয়া বসিলেন। একটু ভাঙা ভাঙা স্বরে আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত টাকা দিয়েছে?" আমি আদ্যোপান্ত সব বলিলাম। এই সুখময় সংসারের কণ্টক স্বরূপ একটি সুন্দরী রমণী পৃথিবী ছাড়িয়াছে শুনিয়া অবশ্য পদ্মমুখী মনে মনে খুসী হইলেন, তথাপি তাঁর মুখপদ্ম একটু বিরক্তির ভাব ধারণ করিল। তিনি বলিলেন, "বাবা রোগী দেখতে গিয়ে যদি দেখেন, রোগী মরিয়াছে, তবু ভিজিট্ ছাড়েন না।" গরিবের ছেলে, অর্থের মর্ম্ম বুঝি না বলিয়া বিলক্ষণ অপ্রতিভ হইলাম। জামাতার সুখের জন্য সকলে কন্যার বিবাহ দেয় না, তবে কন্যার সুখের জন্য জামাতার যে সকল সুখ আবশ্যক, তাহা অবশ্য বাঞ্ছনীয় বটে। যথা, জামাই দরিদ্র হইলে কন্যা বড়মানুষ হওয়া বাঞ্ছনীয়। জামাতা অসুন্দর, দুর্ব্বল, রূঢ়ভাষী অথবা অধার্ম্মিক হইলে কন্যার সুখ হওয়া অসম্ভব, অতএব এগুলির বিপরীত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। জামাতার সুখ গৌণ, আর কন্যার সুখ মুখ্য,—এটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। পদ্মমুখীর মুখের দিকে তাকাইয়াই আমায় ডাক্তারী পড়ানো; অতএব আমি বেয়াকুবী করিয়া অর্থোপার্জ্জনে শিথিলতা প্রদর্শন করিলে পদ্মমুখীর আমাকে তিরস্কার করিবার অধিকার আছে।

স্নান করিয়া আসিয়া নিতান্ত অপরাধীর মত ক্ষুধা তৃষ্ণা জানাইলাম, কিছু খাবার ও একগ্লাস জল মিলিল। পদ্মমুখীর তখনো স্নান বা কাপড় ছাড়া হয় নাই। আদুরীই এ সকল আনিয়া দিল। কম্পিতস্বরে একটু চিনি বা খানকয়েক বাতাসা প্রার্থনা করিলাম, এমন সময় সরলা হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিল, "দাদা, খাবার পেয়েছ? কৈ সরবৎ খাওনি?" এই বলিয়া সে তাড়াতাড়ি সিরাপ আনিতে গেল। পদ্মমুখী বলিলেন, "স্পষ্ট বল্লেই হতো যে সরবৎ চাই, আমি কি করে' জানব? আমি তো দেবতা নই। তা কেন? নিজের সুন্দুরী বোন হাতে করে' না দিলে মন উঠবে কেন?" এমন সময় সরলা সিরাপের বোতল আনিয়া দিল, সিরাপ না দিলেও চলিত;—সমস্ত রাত্রি জাগরণের পর রক্তবর্ণ চক্ষু হইতে একবিন্দু উষ্ণাশ্রু তাহাতে পড়িয়াছিল। তোমরা

জিজ্ঞাসা করিবে অশ্রু কেন? সে কথাটা আমিও চক্ষুকে মধ্যে মধ্যে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকি। সদুত্তর পাই না।

রাত্রিতে ঘুমাই নাই, ঘুম আসিতেছিল কিন্তু জানিতেছি মেজদিদির বাড়ী এতক্ষণে আসর জমিয়াছে, সে জন্য ঘোর উৎকণ্ঠা রহিয়াছে। সরলা পান আনিয়া দিল, একটা চুরুট লইব বলিয়া ঘরের ভিতর গেলাম, দেখি, তথায় পদ্মমুখী বসিয়া পাখার বাতাস খাইতেছেন, মুখ ভারী, ক্ষমা চাহিলাম, আরো জ্বলিয়া উঠিলেন। ভয়ে চলিয়া আসিলাম।

(৬)

মেজদিদির বাড়ী গিয়া দেখি সকলেই উপস্থিত, কেবল তর্করত্ন মহাশয়ের জন্য সকলে অপেক্ষা করিতেছেন। অনেক গুলি ভদ্র সন্তান সমবেত হইয়াছেন, তার মধ্যে নব্যের সংখ্যাই অধিক। বৈঠক-খানার বারান্দায় সকলে ফরাসে বসিয়াছেন, ভিতরে মেজদিদি ও গ্রামের আর কয়েকটি শিক্ষিতা রমণী সোৎসুক চিত্তে বসিয়া চিকের ভিতর দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া আছেন। মেজদিদি আমায় বলিলেন, "তুই একবার দেখে আয় না, ঠাকুরদাদা মহাশয় কেন আস্‌ছেন না।" তৎক্ষণাৎ সত্যবাবুর বাইসিকেল লইয়া সন্ সন্ করিয়া চলিলাম।

তথায় পৌঁছিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম মেজঠান্‌দিদি পূজার ঘর হইতে বাহিরে আসিতেছেন, ঠাকুরদাদার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তিনি অনেকক্ষণ গিয়াছেন। বুঝিলাম তবে আর কাহারো বাড়ীতে হয় তো অপেক্ষা করিতেছেন, অবিলম্বেই মেজদিদির বাড়ীতে যাইবেন। অগত্যা ফিরিলাম, এমন সময় দেখি ছোটঠান্‌দিদি স্নানান্তে আলুলায়িতকেশে উঠানের এক ধারে দাঁড়াইয়া একটু অঙ্গ দোলাইয়া একখানি শুষ্ক তোয়ালের এক অংশ দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনিতে জড়াইয়া, প্রাণপণ শক্তিতে কানের পিঠ রগড়াইতেছেন। মুখখানির উপরেও সম্প্রতি ঐরূপ অত্যাচার হইয়াছে বুঝিতে পারিলাম। আমি বেশ পদশব্দ করিয়াই গিয়াছি, তাহা শুনিতে পাওয়াই উচিত ছিল, তথাপি ভ্রূক্ষেপ নাই দেখিয়া, কর্ত্তব্য বোধেই, একবার কাশিলাম। তখন তিনি আমার দিকে একবার ঘাড় ফিরাইয়া চাহিয়া জিব কাটিলেন, এবং বস্ত্রাদি সংযত করিয়া ঘোম্‌টা দিলেন। অতঃপর আমার চোখের দিকে আর একবার তাকাইয়া ঘরের ভিতর গেলেন।

এমন সময় মেজ ঠান্‌দিদি তাঁহার সেই স্নেহমাখা কণ্ঠে ডাকিলেন, "পেরফুল্লো, বেলের সরবৎ খাবি?" হাতে স্বর্গ পাইলাম। সমস্ত রাত্রি প্রায় অনাহারে কাটিয়াছে। বাড়ীতে আসিয়া শ্রীমতী পদ্মমুখী দাসী (!) র বরাদ্দ দেড় আনার রসগোল্লায় ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় নাই। সরলা সাহস করিয়া মধ্যস্থতা করে না, আমি তো জড়ভরত আছিই—যেদিকে ফিরাও

তুমি, সেই দিকে ফিরি আমি—নীরবে নিঃশব্দে দিন কাটিতেছে। সে যাক্। মহা আগ্রহে সম্মতি জ্ঞাপন করিলাম এবং উদরে হস্ত মর্দ্দন করিতে করিতে অগ্রসর হইলাম। ছুটি পাথর বাটি পূরিয়া সরবৎ পান করিলাম, এবং কিছু দমে-ভারী অর্থাৎ solid খাদ্য প্রার্থনা করায়, নটবর ময়রার দোকানের তিন ছটাক আন্দাজ কাঁচা গোল্লা পাইলাম—পোয়াবারো। অতি কৃতজ্ঞতার সহিত মুহূর্ত্ত মধ্যে সেগুলির সদ্গতি করিয়া, একটি দেড় হাত লম্বা ঢেকুর তুলিয়া জীবাত্মার পরিতৃপ্তির সংবাদ বহির্জগৎকে জ্ঞাপন করিলাম। চাকরকে আমার উচ্ছিষ্ট রেকাব ইত্যাদি ধুইবার হুকুম করিয়া বাহিরে আসিলাম।

(৭)

ফিরিয়া আসিয়া দেখি, আসর জমাট্। দূর হইতেই তর্করত্ন মহাশয়ের শিখাস্ফালন, হস্ত সন্তাড়ন, এবং মুহুর্মুহু তর্জ্জন গর্জ্জন লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। কিন্তু "অভাগা যেদিকে চায়, সমুদ্র শুকায়ে যায়"; আমিও উপস্থিত, তর্করত্ন মহাশয়েরও পালা শেষ। এবার চন্দ্রনাথ বাবুর পালা আসিল। ছেলে বেলায় যাত্রা শুনিতে গিয়া, যাত্রার যে অংশে ভীম অর্জ্জুন জাতীয় অভিনেতাদিগের বীর-রসের "অ্যাক্ট্" হইত, এবং অনতিবিলম্বে অয়েল্ ক্লথের মধ্যে নারিকেলের ছোবড়া-ভরা গদা এবং দুই দিকে সমান ধারওয়ালা তরবারির সাহায্যে যুদ্ধ হইত, সে সময়টা যদি দুর্ভাগ্যক্রমে ঘুমাইয়া পড়িতাম, তবে 'বিফলে জনম গেল' মনে হইত। এখানেও আমার তাহাই হইল। তথাপি মতি রায়ের নারদাভিনয়ের ন্যায় নবীন দুইটি এম-এর তর্ক বিতর্ক শুনিতেই বাধ্য হইলাম।

সত্যেন্দ্রনাথ কায়স্থ, একজন গ্রাম্যান্তরের আমার এবং তাঁহার বন্ধু একজন সংস্কৃত কলেজের এম-এ ব্রাহ্মণ-যুবক আমাদের হইয়া চন্দ্রনাথবাবুর সহিত তর্ক করিতে রাজী হইয়াছিলেন। তাঁর নাম হরিদাস। এতক্ষণ তর্করত্ন মহাশয়ের সহিত তাঁহারই কথা হইয়াছে। শুনিলাম তর্করত্নের তরফ হইতে এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, বিদ্যাসাগর মূর্খ এবং নিষ্ঠুর;—"বিধবা বিবাহ" নামক পুস্তক লেখাই তাহার প্রমাণ। অপিচ তিনি সমাজের পরম শত্রু, "বহুবিবাহ" নামক পুস্তক লেখা তাহার অলন্ত প্রমাণ। পরন্ত, এই অচল, অটল, অনাদিমধ্যান্তমজমরবৃদ্ধিক্ষয়মচ্যুত হিন্দু সমাজের মধ্যে সংস্কার করিবার কিছুই থাকিতে পারে না ও নাই।—কাহারো ইহাতে হস্তক্ষেপ করিবারও অধিকার নাই। তর্করত্ন মহাশয় নাকি, বজ্রগম্ভীর স্বরে এই মহাসত্য ঘোষণা করিয়াছেন। শাস্ত্র সম্বন্ধীয় বিচারের এই সিদ্ধান্তের পরে, যুক্তি কি বলে তাহা দেখিলেও মহাপাতক হইবার বিশেষ সম্ভাবনা নাই স্থির হওয়ায়, বর্ত্তমান বাক্‌বিতণ্ডা আরম্ভ হইল।

হরিদাসবাবু চন্দ্রনাথবাবুকে নম্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখন বিধবা-বিবাহ

প্রচলিত হ'লে সমাজের কি অনিষ্ট হতে পারে আপনি মনে করেন? অবশ্য শাস্ত্রাদি যে সমাজ রক্ষারই জন্য, একথা অস্বীকার ক'রে কোনো লাভ নেই। এবং আমাদের শাস্ত্রাদিরও এমন উদ্দেশ্য নয় যে বিনা-যুক্তিতে তা গ্রহণ: করতে হবে। এখন গোলমাল—বর্ত্তমান সমাজ সমস্যা নিয়ে, কি বলেন?

চন্দ্র। দেখ ভায়া, বুড়ো হয়েছি, সমাজের যে সকল রেওয়াজের মধ্যে এতদিন কাটালুম, তার একটু এদিক্-ওদিক্ দেখলেই যেন গা কেমন করে ওঠে। শাস্ত্র ফাস্ত্র অত আর তখন বিচার তর্ক করতে ভাল লাগে না। আর যতদূর বুঝেছি, তাতে তোমাদের গতিক দেখে বোধ হয়, আজ না হোক কাল, কাল না হোক দশ বিশ বৎসর পরেও তোমরা অনেক ওলট-পালট করবেই করবে। তবে কি জান, আমাদের ও-সবের মধ্যে জড়িয়ো না। এসব স্থলে আমাদের emotion prevails over reason. এই জন্যেই দেখ না এ সকল প্রসঙ্গ উঠলেই তখনি খবরের কাগজে কাটা কাটা বোল দিয়ে প্রবন্ধ লিখে পাঠাই?

হরি। আজ্ঞে তাতো দেখি, আবার আপনার লেখার মধ্যে শ্লেষ বিদ্রূপের এমনি বাঁধুনি যে, সে সকল যখন পড়ি, তখন সত্যই মনের ভাব বদলে যায়, তখন আর 'সংস্কার' কথাটা মুখে আনতেও লজ্জা করে। আবার স্থির হয়ে চিন্তা করলেই দেখতে পাই যে, বর্ত্তমান অবস্থায় এই সমাজের কতকগুলি নির্ম্মম প্রথার পরিবর্ত্তন না করতে পারলে, আমাদের অধঃপতনের গতি দিন দিন ভীষণ হতে ভীষণতর ক্ষিপ্রতা লাভ করবে।

চন্দ্র। কেন? সমাজের এমন কি অবস্থা উপস্থিত হয়েছে যে, বিধবাদের আবার বিবাহ না দিলে আর চলেনা, সমাজ হতে কি বিধবার ব্রহ্মচর্য্য লোপ পেতে বসেছে বলে তুমি মনে কর? আমার কনিষ্ঠা ভগ্নীকে তুমি জান?

হরি। জানি। তাঁর কথা শুনেছি —তিনি দেবী। আমি উদ্দেশে ভক্তি-ভরে তাঁকে প্রণাম করি। জানি, আপনি তাঁকে ঠাকুরবাড়ীর সমস্ত ভার দিয়েছেন, তিনি রাত্রিদিন পূজা-অর্চ্চনা এবং হিন্দুর পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠে ও শ্রবণে অধিকাংশ সময় যাপন করেন। অন্তঃপুরের প্রায় সর্ব্ববিষয়েই তাঁর কর্ত্তৃত্ব আছে। আপনার বাড়ীর ছেলে মেয়ে এবং বধূরা তাঁকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মান করেন, সবই জানি।

চন্দ্র। তবে?

হরি। এ আদর্শ ঘরে-ঘরে কোথায় পাব? সকলেরই শিক্ষা এবং সংসারের অবস্থা আপনার মত হওয়ার নিশ্চয়তা কি? আমরা যে অত্যন্ত অধঃপতিত হয়েছি, আমরা আদর্শভ্রষ্ট হয়েছি এইজন্য দেশ কাল ভেদে আদর্শ অনুরূপ করতে বসেছি।

চন্দ্র। কি পাগল! আদর্শ কখনো এক ভিন্ন দুই হয়?

হরি। সহস্র হয়, দেশভেদে, কালভেদে, পাত্রভেদে আদর্শ অবশ্যই ভিন্ন হয়; দেশভেদে,—যেমন পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের আদর্শ কখনই এক হতে পারে না—"the East is East, the West is West, the two shall never meet." কালভেদে, যেমন সেই আর্য্য-সভ্যতার শৈশবের—সেই বৈদিক যুগের, এবং এই সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত অবস্থায় পতিত এই কলিযুগের আমাদের আদর্শ কোনোক্রমেই এক হতে পারে না। আবার পাত্রভেদে, যেমন, স্ত্রী বা পুরুষের, বালক বা বৃদ্ধের, ব্রাহ্মণ বা শূদ্রের, সুস্থের বা রোগীর ইত্যাদি পাত্রভেদে আদর্শ অবশ্যই ভিন্ন হবে।

চন্দ্র। তুমি কি তবে বলতে চাও যে ব্রহ্মচর্য্যের পরিবর্ত্তে বিধবার বিবাহই বর্ত্তমানে আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত?

হরি। বড় যে কথায় কথায় আদর্শ ফলাচ্ছেন, আদর্শ আপনারা কি রাখতে পেরেছেন? ব্রাহ্মণের গায়ত্রী ভুলে সাহেব সেজে দাস্যবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক সাহেবের তাঁবেদারী করা কি হিন্দুর আদর্শ? মদ খেয়ে রাস্তায় বা পথায় গড়াগড়ি দেওয়া এবং বাপ বলতে শালা বলা কি হিন্দুর আদর্শ? স্ত্রীর সঙ্গে সামান্য মনোমালিন্য হলে আর একটা বিয়ে করে প্রথমা পত্নীকে মর্ম্মান্তিক পীড়ন করাই কি হিন্দুর আদর্শ? এই সকল যদি হিন্দুর আদর্শ হয়, তবে সে হিন্দু জাতি, সে হিন্দু সমাজ; সে হিন্দু ধর্ম্ম অতল জলে ডুবে যাক। সমাজে কয়টা আদর্শ রাখতে আমরা সক্ষম হয়েছি এবং অদূর ভবিষ্যতে সক্ষম হব বলে আশা করতে সাহস করছি? তবে এই নিরপরাধিনী অবলাদের উপর যত আদর্শের বোঝা চাপাতে গিয়ে এমন করে কেন সমাজের সর্ব্বনাশ করি? আমরা নিজের গায়ে হাত দিয়ে দেখি নে আমরা কতদূর অধঃপাতে গিয়েছি। আমাদের চোখের উপর দিবা-রাত্রি অপ্রতিহতভাবে যে পাপের স্রোত চলেছে, আমরা তাতে নীরব। এই কি আদর্শ? আবার বলি, কতশত ধর্ম্মহীন ধনশালী ও পদস্থ পাষণ্ডকে আমরা নির্ব্বিবাদে সমাজে স্থান দিয়ে রেখেছি আর কি না যে সকল সোনার চাঁদ যুবকেরা ইংলণ্ড, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি সুসভ্য স্থান হতে বিদ্যোপার্জ্জন করে এসে দেশের মুখোজ্জ্বল করচে—ম্যাজিষ্ট্রেট, জজ, সিভিল্-সার্জ্জন, ইঞ্জিনিয়ার, মেকানিক্, ব্যারিষ্টার প্রভৃতি হয়ে আসচে, কেউবা য়ুরোপ আমেরিকা প্রভৃতি মহাদেশে গিয়ে, বেদান্ত-দর্শনের ব্যাখ্যা শুনিয়ে, সভ্যজগতের কাছে প্রাচীন ভারতের মুখোজ্জ্বল করচে; তারা কিনা আমাদের নিকট হতে নিষ্ঠুরভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ম্লানমুখে, ব্রাহ্ম সমাজে অথবা খৃষ্টান সমাজে মিশছে। একটা সমাজ ভিন্ন মানুষ কি করে থাকতে

পারে? "Man is a social animal, as social as any ant or bee."

চন্দ্র। তথাপি আদর্শ কি কখনো ছাড়া উচিত?

হরি। না, কখনই না। কিন্তু যে কারণেই হোক, আমরা আদর্শ শিথিল করে ফেলেছি, একথাও অস্বীকার করতে গেলে মিথ্যা কথা বলা হয়। আমি হিন্দু, আমি ব্রাহ্মণ-সন্তান, আমি কেমন করে অস্বীকার করব যে সংযম অপেক্ষা ধর্ম্ম নেই? আমি কেমন করে অস্বীকার করব যে বিধবার ব্রহ্মচর্য্যাপেক্ষা পবিত্রতর আদর্শ পৃথিবীর আর কোনো জাতি দেখাতে পারে নি? এ আদর্শ অন্যত্রও আদৃত। আমি বেশ জানি, যুরোপেও আজো দু'একটি অল্পবয়স্ক বিধবা রমণীকে জীবনের অবশিষ্টকাল কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক, মৃত স্বামী-দেবতার ধ্যানে অতিবাহিত করতে দেখা যায়। আমি সাহস করে বলতে পারি, এ পবিত্র হিন্দু সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হলেও, সহস্র সহস্র হিন্দু-নারী স্বেচ্ছায় ব্রহ্মচর্য্য পালন করতে থাকবেন। কারণ হিন্দু-রমণী স্বামীকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করতে জানেন।

চন্দ্র। ভায়া, বাঁধ একবার ভাঙ্‌লে কি আর রক্ষা থাক্‌বে?

হরি। একথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। তবে একথা স্বীকার করি যে, এ প্রথা প্রচলিত হলে অবিমিশ্র মঙ্গল হবে না। —এসংসারে কোনো কার্য্যেই তা হয় না। তবে হিসাব করে দেখতে হবে, যদি কোনো কার্য্যে অমঙ্গল অপেক্ষা মঙ্গলের ভাগ অধিক হয়, তবে তা অবশ্য কর্ত্তব্য। আমার বিশ্বাস, সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায়, বিধবা-বিবাহ প্রচলনে মঙ্গলই অধিক হবে। অনেক স্থলে হয় তো বাড়াবাড়ি হবার সম্ভাবনা থাক্‌তে পারে, কিন্তু এতদ্দ্বারা সমাজের যে মহা কল্যাণ হবে তদ্বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

চন্দ্র। যদি স্ত্রীলোকের মনে বিশ্বাস থাকে, এ-স্বামী মরিলে আবার স্বামী হবে, তবে কি তারা আর স্বামীকে তেমন শ্রদ্ধা-ভক্তি করবে?

হরি। প্রথমত, এ অতি নীচ, স্বার্থপর এবং কাপুরুষের মত কথা। আমার নিজের গুণে যদি আমি স্ত্রীর শ্রদ্ধা-ভক্তি আকর্ষণ করতে না পারি, তবে ধর্ম্মের ভয় দেখিয়ে এবং আমি মরলে তাকে অনন্যোপায় হতে হবে, এইরূপ সামাজিক শাসনে রেখে ধরে বেঁধে তার শ্রদ্ধা-ভক্তি রাখা আমি চাহ নে। তা কখনই আন্তরিক হয় না, কেবল মৌখিক। দ্বিতীয়ত, আমরা জানি যে স্ত্রী মরলে আমাদের ডজন্ ডজন্ বিয়ে হতে পারবে, কিন্তু তাই বলে কি আমরা বর্ত্তমান স্ত্রীকে অবহেলা বা অশ্রদ্ধা করে থাকি? যাঁরা এ প্রশ্ন করেন তাঁরা নিশ্চয়ই স্ত্রীকে অশ্রদ্ধা করেন। নব্যেরা তা করেন না। আজ কাল নব্যের মধ্যে কারো স্ত্রী-বিয়োগ

হলে তাঁকে পুনরায় বিবাহ দিতে কিরূপ বেগ পেতে হয়, তা সকলেই জানেন। কিন্তু প্রাচীনেরা বিলক্ষণ স্বামীগিরি ফলিয়ে আসছেন জানি। এইজন্যই দেখতে পাই দাসারও যেটুকু স্বাধীনতা ও সম্মান আছে, হিন্দুর স্ত্রীর তাও নেই। এই সকল নারীর গর্ভজাত সন্তানদের "বাঁদিকা বাচ্ছা" বললে কি অপরাধ হয়? হায়, তাই বুঝি আমাদের সমাজে আজ এত কাপুরুষ!

চন্দ্র। ছি ছি এসব কি বল? তুমি ক্ষেপে উঠবে দেখছি। তুমি বলতে চাও যে বিধবা-বিবাহের জন্যেই দেশ উদ্ধার আটকে আছে?

হরি। মানুষ স্বভাবতই একটু প্রভুত্ব প্রিয়। কিন্তু আজকাল যাদের ঘরের বাইরে ঝাঁটা জুতো খেয়ে দিন যায়, তারা যদি ঘরে এসেও একটু প্রভুত্ব না করবে, তবে আর বেচারীরা যায় কোথা? বাইরে যাকে ঘুসি খেয়ে, ড্যাম শুয়ার শুনে, নীরবে ঢোক গিলতে হয়, সে যদি কোমলাঙ্গী পতিগত-প্রাণার সামান্য ত্রুটীর অছিলা করে' সেই কোমলাঙ্গে আপনার দৃঢ়তা পরীক্ষা না করবে, তবে আর উপায় কি? যারা বাড়ীর প্রাচীরের বাইরের খবর রাখে না, তাদের কাছে ভিন্ন তাঁদের বীরত্বের কাহিনী বলে বিশ্বাস করাবার আর স্থান কোথায়?

চন্দ্র। সমাজে সবই কি এই প্রকার?

হরি। সাড়ে চোদ্দ আনা।

চন্দ্র। যদি তাই হয়, তবে কি বিধবার বিয়ে দিলেই সব বন্ধ হ'য়ে যাবে?

হরি। আমার বলবার উদ্দেশ্য এই যে, যাঁরা বালবিধবার পুনর্বিবাহে মত দেবেন, তাঁরা জোর করে কাল্পনিক উপায়ে স্ত্রীর ভক্তি আদায় করতে চান না, ইহাই বুঝতে পারা যায়। যাঁরা জানেন 'আমি ম'লে স্ত্রীর আর গতি নাই' এই ভেবে সে নিশ্চয়ই আমার যথেচ্ছাচার সহ্য করবে, তাঁদের মনে স্ত্রীর প্রতি অযথা অত্যাচার করবার প্রলোভন হওয়া অনেক স্থলে স্বাভাবিক,—হয়েও থাকে তাই। নিজগুণে তাঁর শ্রদ্ধা আকর্ষণের যত্ন তত আসে না। এসকল স্ত্রীও কাজেই নিস্তেজ হয়, এবং তার অনিবার্য্য ফলস্বরূপ সন্তানও কাপুরুষ, ভীরু এবং স্বাস্থ্যহীন হয়; বড় হয়ে পিতার ন্যায় "ঘরে এসে স্ত্রী ঠেঙানোর" মন্ত্রে দীক্ষিত হয়। সৎশিক্ষা দিয়ে, আপনারাও একটু ব্রহ্মচর্য্য পালন করে এবং স্ত্রীলোকদিগকে তা শিক্ষা দিয়ে, সংসারে সংযম, সাত্ত্বিকতা, পবিত্রতা বজায় রাখবার চেষ্টা করুন, তা হলে বিধবা-বিবাহ প্রচলনে সমাজের ক্ষতি হবে না।

চন্দ্র। যাঁরা বিধবা-বিবাহে আপত্তি করেন, তাঁরা কি তা চেষ্টা করেন না?

হরি। করতে পারেন। কিন্তু দশজন খবরের কাগজের এডিটর, পাঁচজন টোলের অধ্যাপক অথবা বিশজন বৃদ্ধ নিষ্ঠাবান ভাগ্যবান বড়লোক নিয়েই তো সমাজ নয়। আর তাঁরা "এইপ্রকার হওয়া

উচিত" বলে প্রবন্ধাদি লিখলেই সমাজের অবস্থা যে হঠাৎ পরিবর্ত্তিত হয়ে যাবে, তা অসম্ভব।

চন্দ্র। কিসে অসম্ভব? যদি আমরা আবার সমাজে সংশিক্ষা পুনরানয়ন করি, তবে কি সমাজের পবিত্রতা রক্ষিত হতে পারে না? হয় তো কিছু বিলম্ব হবে। এর মধ্যে যারা অধঃপাতে যাবে যাক্;—কি করা যাবে? তা বলে সমাজের এমন সংশাসন-গ্রন্থি শিথিল করতে যাওয়া কোনো মতেই যুক্তিযুক্ত নয়। আমাদের হিন্দু নারী যে আজো দেবী। তাঁদের একবার ম্লেচ্ছ যবনের মত করে ফেললে আর কিসে দেবীর ভাব ফিরে পাব? তোমরা কি করতে যাচ্ছ? মনে ধিক্কার আসে না?

হরি। আসে ঠাকুরদাদা,—কান্না আসে। যা যায় তা আর সহজে আসে না, তাও জানি। বড় দুঃখেই এডমণ্ড্ বার্ক বলেছেন "The days of chivalry are gone!" কিন্তু gone তো নিশ্চয়ই। Days of economists and calculators তো নিশ্চয়ই এসেছে,—কে রোধ করবে? কার সাধ্য কালের গতি রোধ করে? এখন সময়ের সঙ্গে চলতেই হবে। বিধবার আন্তরিক ব্রহ্মচর্য্য বজায় রাখতে হলে, সমাজের এবং পরিবারের যেরূপ অবস্থা থাকা আবশ্যক, পূর্ব্বে অনেক পরিমাণে তা ছিল, এখন নেই এবং উত্তরোত্তর তা আরো লোপ পাচ্ছে। এর প্রধান কারণ, জীবন-সংগ্রামের বৃদ্ধি—increased and ever-increasing struggle for existence. ইহা অনিবার্য্য। তার আরো দুটি কারণ আছে; (১) অন্যান্য জাতির সহিত আমাদের সংঘর্ষণ (২) আমাদের সমাজের পুরুষ জাতির অধঃপতন। (ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

একাদশী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ঘর্ম্ম-শীতল, মৃদু-কম্পিত শিথিল হাতখানি একাদশীর হাতের উপর রাখিয়া ফুরিণ কিছুক্ষণ নীরবে রহিল, কিছু বলিতে চেষ্টা করিতেছিল, পারিতেছিল না। ধারার পর ধারা বহিয়া অশ্রুস্রোত নিঃশব্দে উপাধান সিক্ত করিতেছিল! উঃ কি নিদারুণ অবস্থা!

"একাদশী?"

"দাদা!"

বড় করুণ, নিস্তেজ স্বরে ফুরিণ্ বলিল,

"আমার তো কিছু নেই একাদশী, তুমি এই পিস্তলটা নাও,—আমার চিহ্ন—শেষ উপহার!"

একাদশী পাগলের মত আছড়াইয়া পড়িল। মরণাতুর ফ্লিনের চোখ ধীরে ধীরে মুদিয়া আসিল, একটা গভীর মর্ম্ম-ভেদী কোলাহলে ... ড়ীখানা মুখর হইয়া উঠিল।

(৬)

সমস্ত দিনটা কোথা দিয়া কেমন করিয়া কাটিল কেহ সংবাদ লইল না। সন্ধ্যার পর সাহেব যখন ভারাক্রান্ত-হৃদয়ে বাড়ী ঢুকিতেছিলেন তখন দেখিলেন স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় একাদশী ধীরে ধীরে কুঠীর বাহিরে আসিতেছে, তাহার মুখখানা পাথরের মূর্ত্তির মুখের মত অচঞ্চল ভাবহীন; দৃষ্টি উদ্ভ্রান্ত বিহ্বল; বুকের স্পন্দনও বুঝি অস্বাভাবিক ক্ষীণ!

সাহেবকে দেখিয়াও একাদশী অভিবাদন করিল না, যেমন চলিতেছিল, তেমনিই চলিয়া যায় দেখিয়া সাহেব তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন এবং স্নেহময় স্বরে ডাকিলেন—"একাদশী!"

অকস্মাৎ সুপ্তোত্থিতের মত একাদশী চমকিয়া উঠিল! অর্থশূন্য দৃষ্টিতে নীরবে তাঁহার মুখ-পানে চাহিয়া রহিল, কিছু বলিল না।

সাহেব আবার ডাকিলেন,—আবার ডাকিলেন, তথাপি একাদশী নিস্তব্ধ অবিচল! সাহেব তাহার হাত ধরিয়া কুঠীর ভিতর টানিয়া লইয়া চলিলেন।

ঘরের দ্বারের কাছে আসিয়া হঠাৎ যেন একাদশীর চমক ভাঙিল; সজোরে হাত টানিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। সতর্ক সাহেব তখনই তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন, "কোথা যাচ্ছ একাদশী, মেঘ করে আসছে, কাল সকালে তোমার ভাইয়ের কাছে যেয়ো।"

ভয় স্খলিত-কণ্ঠে একাদশী বলিল, "ভাই, সমুদ্রের ধারে একলাটি ছোট ছেলে ঘুমুচ্চে, মেঘ আসচে, ছাড়ো সাহেব আমি সেখানে যাই।"

"পাগল"—সাহেব বলপূর্ব্বক তাহাকে টানিয়া ঘরে আনিলেন, একটা চৌকির উপর তাহাকে বসাইয়া কত কথা বুঝাইলেন একাদশী ডান হাতের উপর মাথা কাত করিয়া—অন্য হাত গালে দিয়া বিহ্বলের মত তাঁহার মুখ-পানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া রহিল; সে কিছুই বুঝিল না!

তাহার অবস্থা দেখিয়া সকলেরই কষ্টের উপর কষ্ট বাড়িয়া গেল। একে একে সকলেই তাহাকে কত সান্ত্বনা দিল কিন্তু একাদশী কাহারো কথার কিছু জবাব দিল না।

অবশেষে সাহেব বলিলেন, "আর ওয়ালটেয়ার ভাল লাগছে না, চল একাদশী আমরা ওয়ালটেয়ার ছেড়ে যাই।"

আহত ভুজঙ্গের ন্যায় একাদশী লাফাইয়া উঠিল। কথাটা বিদ্যুদ্দৃপ্ত সূক্ষ্ম স্পর্শের মতই তাহার অসাড় প্রাণটাকে সজোরে

আলোড়িত করিয়া তুলিল। বুকভাঙা কাতরতায়, প্রাণভরা বেদনায় একাদশী চীৎকার করিয়া উঠিল, "থামো সাহেব থামো, ও কথাটি বোলো না, ফ্লরিণকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না!"

(৭)

পরদিন সকালে কেহ আর শোকোন্মত্ত একাদশীকে খুঁজিয়া পাইল না।

উদ্বেগ-কাতর সাহেব সমুদ্রের ধারে, বড় রাস্তায়, বাগানে, সহরের অলি-গলি —এমন কি তাহার ভাইয়ের বাড়ীতে পর্য্যন্ত লোক পাঠাইলেন। কুঠীর সকলেই শশব্যস্ত হইয়া চারিদিকে ছুটিল; সাহেব নিজেও গোরস্থানের দিকে চলিলেন —কি জানি, যদি সেখানে গিয়া থাকে।

পূর্ব্ব রাত্রের বৃষ্টি-বারি-ধৌত বৃক্ষ লতা পত্র পুষ্প সকল তরুণ লাবণ্যে প্রাতঃ সূর্য্যের কিরণোদ্ভাসিত হইয়া হাসিতেছে। বিরাট সমাধি-ক্ষেত্র নিস্তব্ধ। সাহেব দ্রুতপদে গোরস্থানে ঢুকিলেন। উদ্বিগ্ন নয়নে চারিদিক চাহিতে চাহিতে চলিয়াছেন, দূর হইতে দেখিলেন—ঐ ফ্লরিণের কবর! হাঁ তাই ঠিক! কবরের গায়ে মাথা রাখিয়া, ভিজা মাটির উপর ঐ যে কে একজন অসাড়ে ঘুমাইতেছে! কি চমৎকার নিশ্চিন্ত মুখ! সাহেব বেগে ছুটিলেন—"একাদশী—একাদশী!"

একাদশীর ঘুম ভাঙিয়া গেল। ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া ব্যাকুলভাবে সে কবরের দিকে চাহিল। "না; ফ্লরিণ ঠিকই আছে, যাক্ বাঁচা গেল।" আশ্বস্ত ভাবে অতি যত্নে অতি সন্তর্পণে সে কবরের মাথার দিকটা চাপড়াইতে লাগিল।

সাহেব রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিলেন "একাদশী!"

মা যেমন ছেলের কাঁচা ঘুম ভাঙবার আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত হইয়া উঠেন, একাদশীও তেমনি হইয়া উঠিল, মুখ ফিরাইয়া বিরক্ত ভাবে চাপা গলায় সে বলিল, "কি, এখানে কেন?"

"তুমি আর এখানে কেন একাদশী? এখানে পড়ে থেকে আর কি করবে?"—

"কি করবে?" একাদশী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। এমন অদ্ভুত আশ্চর্য্য প্রশ্ন সে যে জীবনে কখনো শুনে নাই! তাহার যা-কিছু কাজ করিবার আছে তাহা তো এইখানেই!—এমন সোজা কথাটা ইঁহারা কেহই বুঝিতে পারিলেন না!—কি নির্ব্বুদ্ধিতা!

বেদনা-পীড়িত স্বরে সাহেব বলিলেন, "অনর্থক এসব পাগলামি করে কোনো ফল নেই, ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কারুর ক্ষমতা চলে না।"

"ঈশ্বর!" অত্যন্ত নিশ্চিন্তভাবে একাদশী একবার আকাশ-পানে চাহিল। "বেশ সাহেব, তবে তোমরা চলে যাও, আমায় জ্বালাতন কোরো না...আমার ফ্লরিণ এখানে আছে, আমিও থাকবো।

সাহেবের চোখ দিয়া হু হু করিয়া জল পড়িতে লাগিল "অন্ধ ভ্রান্ত, ফ্লরিণ কি আর এ জগতে আছে? সে যে এ জগৎ ছেড়ে চলে গেছে!"

সহসা একাদশী গর্জ্জিয়া উঠিল!

"মিথ্যাবাদী নিষ্ঠুর!"—ইহারা সকলে মিলিয়া শত্রুতা সাধিতে চায়! তাহার শান্তির অবলম্বনটুকু চুরমার করিবার জন্যই ইহাদের সকলের চেষ্টা! কি ভয়ানক! যাও, সে কাহারো কথা শুনিতে চাহে না, তাহার ফ্লুরিণ এই খানেই আছে!—একাদশী কবরের উপর বুক দিয়া প্রাণপণে মৃত্তিকা আঁকড়াইয়া ধরিল।

বিষাদ-মথিত হৃদয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সাহেব পাশে বসিলেন। "একাদশী তোমার মন বড় খারাপ হয়েছে, বুঝ্‌তে পার্‌ছি চল বাবা তোমায় নিয়ে এ দেশ ছেড়ে অন্য জায়গায় যাই।"

তীরবেগে একাদশী উঠিয়া দাঁড়াইল। আবার সেই উচ্ছৃঙ্খল উন্মাদের হাসি! "ওঃ! বুঝেছি সাহেব আমাদের দুটোকে তফাৎ করাই তোমাদের মতলব, আর কিছু না! কিন্তু সেটি হবে না!————

ঝটিতি বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে পিস্তল বাহির করিয়া, একাদশী মুখে তাহার নল পুরিল, মুহূর্ত্তে ঘোড়া টিপিল!

হাঁ হাঁ করিয়া সাহেব উঠিতে-না-উঠিতে দড়াম্ করিয়া আওয়াজ হইয়া গেল! একাদশীর প্রাণহীন দেহ কবরের উপর লুটাইয়া পড়িল! সারা কবরটা রক্তে রক্তময়———টক্‌টকে লাল হইয়া সূর্য্য-কিরণে ঝলসিয়া উঠিল!

স্তম্ভিত সাহেব মুহ্যমান নিস্পন্দ!

যে শূন্যগর্ভ মারাত্মক উপহার ফ্লুরিণ স্নেহশীল সুহৃদের হাতে তুলিয়া দিয়াছিল, যন্ত্রণা-উন্মাদ সুহৃদ তাহাতে বজ্রানল ভরিয়া সযত্নে বুকের ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছিল! কেহই জানিতে পারে নাই!

(সমাপ্ত)

বারাণসী-তত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শাস্ত্রে পরমেশ্বরকে সাকার ও নিরাকার উভয় বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। উভয় বাদই সাধু হইলেও আপোষে কিন্তু অনেক মতভেদ আছে। যাঁহারা ঈশ্বরকে নিরাকার মনে করেন তাঁহারা তাঁহাকে নির্গুণ বলিয়া ব্যক্ত করেন। সাকারবাদীরা বলেন যে, ঈশ্বরকে সাকার বলিয়া না মানিলে সৃষ্ট্যাদিকার্য্যে নিরাকারের অপসমতা হইয়া উঠে এবং তিনি সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা বলিয়া মান্য হইতে পারেন না। কারণ তাহা করিলে তাঁহাতে সগুণত্ব আরোপ করা হয়। সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে

ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হইলে সহজে আপনিই তাঁহার শরীরীত্ব প্রতিপন্ন হয়। যেমন ঘটকর্ত্তা কুম্ভকার শরীরী, সে কদাপি অশরীরী নহে। যাহা হউক শাস্ত্রে যখন উভয় বাদই সাধু বলিয়া উক্ত হইয়াছে তখন উভয় বাদই হিন্দুর মান্য।

ঈশ্বর-প্রাপ্তির মার্গ ত্রিবিধ; যথা কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি। গৃহস্থাদিগের জ্ঞানের সহিত কর্ম্মযোগকে সমাশ্রয় করা কর্ত্তব্য। কেবল জ্ঞান, কি কেবল কর্ম্মে হিন্দু পরিমুক্ত হইতে পারে না; জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয় যোগেই পরিমুক্ত হয়। যেমন উভয় পক্ষের সহযোগে পক্ষীদিগের আকাশে গতি হয়, সেইরূপ জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয় যোগে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়; অন্যথা হইতে পারে না। কর্ম্মও দ্বিবিধ—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। জ্ঞানপূর্ব্বক নিবৃত্তি অন্যথা ভোগার্থ প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। অতএব নিবৃত্তি মার্গে কর্ম্মের সেবা করিলে তৎফলে বিষ্ণুর পরম পদে গমন করা যায় (গ)। প্রবৃত্তি মার্গে যে গৃহস্থ কর্ম্ম করে তাহার সংসারে পুনরাগমন হয়, নিবৃত্তিমার্গে পুনরাবৃত্তি নাই; এ কারণ সর্ব্ব বেদান্তে নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তিকে দেবযান ও পিতৃযান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রবৃত্তি মার্গের নাম (পিতৃযান) ইহাকে দক্ষিণায়ণ বলে, তদ্দ্বারা চন্দ্রলোকে গতি করিয়া কর্ম্মানুসারে সুখভোগ করত ভোগাবসানে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। নিবৃত্তি মার্গের নাম (দেবযান) তাহাকে উত্তরায়ণ বলিয়া বেদে ধৃত করিয়াছেন; তদ্দ্বারা সূর্য্যলোকে গতি করিয়া ভোগ-বর্জ্জিত ঈশ্বরার্পিত জ্ঞান পূর্ব্ব কর্ম্মের ক্ষমতাতে পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। তাহার আর পুনরাবৃত্তি নাই। অতএব ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ ব্যক্তিকে নিবৃত্তি মার্গে বেদোক্ত কর্ম্ম করিতে হইবে।

যে কর্ম্মই কর, তাহাতে তোমার বিশ্বাস থাকা আবশ্যক। বিশ্বাস ব্যতীত কর্ম্মের আর অন্য স্থান নাই। বিনা বিশ্বাসে কর্ম্মের ফল হয় না। যে ব্যক্তির বিশ্বাস আছে, তাহার সর্ব্ব কালেই কর্ম্মের ফল অনুভূত হয়। বিশ্বাস-রহিত ব্যক্তির কর্ম্মের ফল কদাপি ফলে না। তাই হিন্দুশাস্ত্র বলেন যে, "বিশ্বাসাজ্জায়তে সিদ্ধি র্ন সিদ্ধিঃ সংশয়াত্মনঃ" অর্থাৎ বিশ্বাসযুক্ত ব্যক্তির সমস্ত কর্ম্ম সিদ্ধ হয়; সংশয়াত্মার কোন কর্ম্মই সিদ্ধ হয় না।

ভক্তি মার্গের সুলভা গতি। তাহার লক্ষণ যথাঃ—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ম নিবেদনং॥
(শ্রীভাগবতং)।

লীলা শ্রবণ, গুণকীর্ত্তন, নাম স্মরণ, পাদ সম্বাহন, গন্ধ পুষ্প দ্বারা পূজা, স্তুতি, সেবা, সখ্য, আত্ম-নিবেদন এই নববিধ ভক্তি দ্বারা উপাসনায় মোক্ষ লাভ হয়।

(গ) প্রবৃত্তিশ্চ নিবৃত্তশ্চ দ্বিবিধং কর্ম্ম বৈদিকং। জ্ঞান পূর্ব্বং নিবৃত্তি স্যাৎ প্রবৃত্তিরর্ন্যতেথা। নিবৃত্তিং সেবমানস্ত যাতিতৎ পরমং পদং। ইতি ভবিষ্যপুরাণং।

যদি বল, নব লক্ষণ ভক্তি এক সাধকের সাধ্য নহে। উত্তর—সম্যক্ করণে অক্ষম হইলেও একের অনুষ্ঠানে ভগবৎ প্রাপ্ত হয়, অতএব ভক্তিমার্গে উপাসনাই সুলভ যথা.—

শ্রবণে পরীক্ষিদভবৎ বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে
প্রহ্লাদঃ স্মরণে।
পদাব্জ ভজনে লক্ষীঃ পৃথুঃ পূজনে।
অক্রূর স্তভিবন্দনে। কপিপর্ত্তির্দাস্যেথ
সখ্যেঽর্জ্জুনঃ সর্ব্বস্বাত্ম নিবেদনে।
বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরং॥
শ্রীরূপোক্তিং।

রাজা পরীক্ষিৎ লীলা শ্রবণে, শুকদেব গুণ কীর্ত্তনে, প্রহ্লাদ নাম স্মরণে, লক্ষ্মী চরণ সেবনে, পৃথুরাজা পূজায়, অক্রুর স্তুতিতে, হনুমান দাস্যে, অর্জ্জুন সখ্যকরণে, বলিরাজ শরীর নিবেদনে,' পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

প্রচলিত রিতানুসারে হিন্দুজাতি বৈষ্ণব এবং শৈব সম্প্রদায়ে বিভক্ত কিন্তু তদতিরিক্ত আরও তিনটি সম্প্রদায় দৃষ্ট হইয়া থাকে যথা শাক্ত, নানকসাহি এবং জৈন। একনে হিন্দুজাতি এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত। জৈন সম্প্রদায়ের উপাসনা প্রণালী পৃথক হইলেও জৈনগণ হিন্দু এবং তাহারা আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয়।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়।

বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিষ্ণুর উপাসক। এই সম্প্রদায়ের বিদ্বান ব্যক্তি মাত্রেই বেদ, স্মৃতি, পুরাণ এবং তন্ত্রের উপদেশে আস্থা প্রদর্শন করেন। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ষোড়শ শাখা যথা,—

(১ বৃন্দাবনী গোঁসাই, (২) গোকুল গোঁসাই (৩) সখীভাব, (৪) রামানন্দী, (৫) বৈরাগী, (৬) বিরক্ত, (৭) নাগা, (৮) রামানুজি, (৯) কবীর পন্থী, (১০) দাদুপন্থী, (১১) রায়দাসপন্থী, (১২) হরিচন্দী, (১৩) সধ্নাপন্থী, (১৪) মাধবী, (১৫) সাধবী, (১৬) চরণদাসী।

বৃন্দাবনী গোঁসাইগণ জাতিতে ব্রাহ্মণ। রাধাকৃষ্ণ ইঁহাদিগের উপাস্য দেবতা। বিশেষ বিশেষ উপাসনানুযায়ী ইঁহারা রাধাবল্লভজী, বিহারীজী, রাধারমণী, গোবিন্দজী এবং যুগলজোড়ী নামে খ্যাত। ইঁহারা রাধাবল্লভজী, বিহারীজী, যুগলজোড়ী প্রভৃতির মূর্ত্তি আপন আপন গৃহে রাখেন এবং প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেইসকল মূর্ত্তির উপাসনা করিয়া থাকেন। সময় সমাগত হইলে উল্লিখিত গোঁসাইদিগের; চেলারা এবং সাধারণ তীর্থযাত্রীগণ ঐ সকল দেবমূর্ত্তি দর্শন করেন এবং প্রণামী দেন। অবশ্য প্রণামী গোঁসাইগণের প্রাপ্য এবং তাঁহারা তাহা পুরুষানুক্রমে ভোগ করিয়া আসিতেছেন। শিষ্য করিতে হইলে চতুর্বর্ণের কোন বাচবিচার নাই বলিয়া জাতি-নির্ব্বিশেষে সকলেই গোঁসাইদিগের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে পারে, সুতরাং শিষ্যবৃত্তি ও গুরুগণের একটি ধনাগমের উপায় বলিতে হইবে। মন্ত্র লইবার পরই শিষ্যগণকে কণ্ঠি ধারণ এবং কপালে তিলক সেবা

করিতে হয়। তিলক ধারণেরও আবার বিশেষত্ব আছে। গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ একবার স্থাপিত হইলে তাহা আর যাইবার নহে। পুরুষানুক্রমে সে সম্বন্ধ অচল অটল হইয়া থাকে।

গোঁসাই গোকুল বা গোকুলস্থ সম্প্রদায়ের সহিত পূর্ব্বোক্ত বৃন্দাবনী গোঁসাইদিগের বহুলাংশে সাদৃশ্য আছে। প্রায় গুজরাটী বণিকগণ এই সম্প্রদায়ের শিষ্য। শিষ্যগণ পুরুষ ও স্ত্রী নির্ব্বিশেষে গুরুচরণে তনু মন ধন অর্পণ করেন। তাঁহারা অশক্তে একবার এবং শক্তে তিনবার গুরুসন্নিধানে আসিয়া আপনাদিগের উপাস্য দেবতার পূজা করিয়া থাকেন। শিষ্যদিগের গুরুভক্তির সীমা এতদূর বিস্তৃত যে, তাহারা নব বিবাহিত বধূকে বরগৃহে আনিবার পূর্ব্বে একবার গুরু-সকাশে লইয়া যায়। অধিক লেখা বিড়ম্বনা মাত্র। বলা বাহুল্য যে তাহারা গুরুর আদেশ ঈশ্বরের আদেশের ন্যায় মান্য করে। এইরূপে গুরুগণ শিষ্যদিগের নিকট হইতে প্রচুর অর্থ পাইয়া থাকেন। সুতরাং গুরুবর্গের সকলেই সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি।

সখীভাব সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ শারীরিক ও মানসিক স্ত্রীত্ব ভাবাপন্ন। রাধাকৃষ্ণ ইঁহাদিগের উপাস্য দেবতা। স্ত্রীভাবে ইঁহারা ভজনা করেন। বাক্যে, আচারে, ব্যবহারে এমন কি পরিচ্ছদেও ইঁহাদিগের স্ত্রীভাব অভিব্যক্ত। এ বিষয়ে যতই স্বল্প বলা হয় ততই ভাল।

রামানন্দী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতার নাম রামানন্দ। ইনি একজন সন্ন্যাসী ছিলেন। সুতরাং সকলেই ইঁহাকে মান্য করিত। ইঁহারা রাম ও হনুমানের উপাসক। কণ্ঠিধারণ ইঁহাদিগের বিশেষ বিধি। বৈরাগী এবং গৃহস্থ নির্ব্বিশেষে সকলেই এই দলভুক্ত হইতে পারেন।

বৈরাগী সম্প্রদায়ের জাতি-বিচার নাই। সুতরাং এই ধর্ম্ম সকলেরই সহজলভ্য। বৈরাগী হইতে হইলে শিরোমুণ্ডন, গলায় কণ্ঠি এবং হস্তে জপমালা ধারণ করিতে হয়। ভিক্ষাই ইঁহাদিগের উপজীবিকা। তবে ইঁহাদিগের কেহ কেহ সঙ্গতিপন্ন। কৃষ্ণ ইহাদিগের উপাস্য দেবতা।

বিরক্ত সম্প্রদায়। বিরক্ত অর্থে বিষয়-বাসনা নির্ম্মুক্ত বুঝায়। শিরোমুণ্ডন এবং অর্থগ্রহণ হইতে বিরত থাকাই এই সম্প্রদায়ের বিশেষত্ব। দৈনিক আহারের যতটুকু আবশ্যক ততটুকুই ইঁহারা ভিক্ষা করিয়া থাকেন। ইঁহাদিগের পরিধানে একমাত্র ল্যাঙোটী এবং চাদর ব্যতীত অন্য কিছু দেখা যায় না। সুতরাং এই সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা অতীব বিরল। ইঁহাদিগের উপাস্য দেবতা রাম ও কৃষ্ণ।

নাগা। বিলম্বিত কোঁকড়ানো কেশ, কটিতটে ল্যাঙোটী এবং অঙ্গে ভস্মলেপন নাগাদিগের বাহিক চিহ্ন। ইহাদিগের দল সুবৃহৎ এবং ইহারা সদাই শস্ত্রপাণি। অসি, চর্ম্ম, বন্দুক এবং ভল্ল ইহাদিগের অস্ত্র। প্রয়াগ এবং হরিদ্বারের মেলায় ইহারা দলবাঁধিয়া আগমন করে।

সন্ন্যাসীদিগের সহিত ইহাদিগের চির-শক্রতা। দুইদল সন্নিকর্ষে আসিলেই তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং ইংরাজ সরকার বাধা না দিলে অনেকেই হতাহত হইয়া থাকে। নাগারা ভিক্ষোপজীবী।

রামানুজী সম্প্রদায় লক্ষ্মণের উপাসক। ইঁহারা মাল্যধারণ করেন বটে, কিন্তু রামানন্দী সম্প্রদায়ের ন্যায় কণ্ঠি এবং জপমালা ধারণে বিশেষ কঠোর বিধি নাই। ইঁহারা অলন্ত লৌহ দ্বারা হস্তে বিষ্ণুপদ, শঙ্খ এবং দন্ত চিহ্নিত করেন। এই চিহ্ন আমরণ থাকিয়া যায়। ইঁহারা গোপনে রন্ধন ভোজন এবং পান করেন। বিষ্ণুকে ইঁহারা ব্রহ্ম বলিয়া মানেন। ইঁহাদের মতে বিষ্ণুই জগতের আদিপুরুষ।

কবীরপন্থী। কবীর সিকেন্দার লোদীর সমসাময়িক ব্যক্তি এবং কবীর-পন্থী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি জাতিতে তন্তুবায় এবং ইঁহার নিবাস বারানসীধামে ছিল। যৌবনে ইনি রামানন্দের শিষ্য হন এবং গুরুর উদাহরণ মত কণ্ঠি এবং জপমালা ধারণ করেন। পরে কবীরের খ্যাতি দিক্‌দিগন্তে ব্যাপিয়া পড়িল। দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার শিষ্য হইতে লাগিল দেখিয়া তিনি সেই সুযোগে আপনার একটি দল গঠিত করিলেন। জীবদ্দশায় কবীর একজন সাধুপুরুষ ছিলেন। অদ্বৈতবাদের উপর ইনি অনেকগুলি দোঁহা রচনা করিয়া যান। সেগুলি এক্ষণে পুস্তকাকারে পরিণত হইয়াছে। অনেকে সেই দোঁহা-গুলির প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কবীরপন্থী সম্প্রদায়ের ভিক্ষাই উপজীবিকা। বারানসীধামে কবীর-চওড়া নামক মহল্লায় বহু সংখ্যক কবীরপন্থী দৃষ্ট হইয়া থাকে।

দাদুপন্থী। এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতার নাম দাদু। কণ্ঠি এবং জপমালা ধারণের প্রচার ইনি বহুল পরিমাণে করেন। ঈশ্বরের পূজা-পদ্ধতি এবং ঈশ্বরজ্ঞানের উপায়াদি-সম্বন্ধে ইঁহার একখানি পুস্তক আছে। শিষ্যেরা এই গ্রন্থ ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করিয়া থাকেন। সংসারী ব্যক্তি যে এদলে নাই একথা বলিতে পারা যায় না। ইঁহারা অধিকাংশই ভিক্ষুকবেশে থাকেন এবং কিরীটী ধারণ করেন। উইলসন সাহেবের মতে দাদুর জন্ম আহমদাবাদে। যখন ইঁহার বয়ঃক্রম দ্বাদশবর্ষ তখন ইনি আজমিরে সম্বর নামক স্থানে সমাগত হন। ৩৭ বৎসর বয়ঃক্রমে ইঁহার নারায়ণ নামক স্থানে যাইবার ইচ্ছা জন্মে। সে বাসনা পূর্ণ হইল বটে, কিন্তু বহেরণা পর্ব্বতে যাইবার জন্য তাঁহার প্রতি দৈববাণী হইল। তিনি অচিরে তথায় গমনপূর্ব্বক ভগবানে তন্ময় হইয়া লোক-দৃষ্টির বহির্ভূত হন। ১৬০০ খৃষ্টাব্দ তাঁহার প্রাদুর্ভাব কাল।

রয়দাসপন্থী। রয়দাস জাতিতে মুচি। জীবনের মধ্যাহ্ন সময়ে তাঁহার মানসিক ভাবের পরিবর্ত্তন হয়। সংসারাশ্রম তাঁহার পক্ষে ভারবহ হইয়া উঠিল। তিনি

কালবিলম্ব না করিয়া মায়াপাশ ছিন্ন করত ভগবানের নাম লইয়া সাধুবৃত্তি অবলম্বন করিলেন। পবিত্রতা ও ভক্তি-সহকারে তিনি যেমন পূর্ণতা লাভ করিতে লাগিলেন, অমনি তাঁহার প্রতি লোকের শ্রদ্ধা এবং ভক্তি ক্রমশঃ আকর্ষিত হইতে লাগিল। কাল-সহকারে তিনি একদলের নেতা হইলেন। তাঁহার শিষ্যগণ জাতিতে চামার। এলাহাবাদ জেলার অন্তঃপাতী কড়া নামক স্থানে এই পন্থীর প্রধান আড্ডা। "রায়দাস" চামার জাতির সম্মানসূচক শব্দ। এই শব্দে অভিহিত হইলে চামার জাতির আনন্দের আর সীমা থাকে না।

হরিচন্দি। মহারাজা হরিশ্চন্দ্রের কথা প্রত্যেক হিন্দু মাত্রেই অবগত আছেন। গ্রহবৈগুণ্যে তিনি বারানসীধামে সমাগত হইয়া জনৈক ডোমের দাস হন। শবদাহার্থে লোক আসিলে তাহার নিকট হইতে কর আদায়ই তাঁহার প্রধান কার্য্য ছিল। ঘটনাসূত্রে তাঁহার স্ত্রী তাঁহার সন্তানের শবদেহ লইয়া আসিলে পাছে তিনি স্বীয় কর্ত্তব্য হইতে স্খলিত হন ভাবিয়া বিনা করে পুত্রের অগ্নি-সংকার করিবেন না বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। তাঁহার স্ত্রী শৈব্যারও হস্তে এমন কিছুই ছিল না যে তাহা দিয়া পুত্রের মৃতক ক্রিয়া করেন। প্রবাদ এইরূপ যে, উপায়ান্তর না দেখিয়া কর-স্বরূপ তাঁহার স্ত্রী স্বীয় বস্ত্রার্দ্ধ প্রদান করিবামাত্র দৈবীমায়া তিরোহিত হইল। অমনি স্বর্গ হইতে একটি বিমাণ ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাদিগের তিনজনকেই অমর নগরে লইয়া গেল। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র স্বয়ং কোনো সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক না হইলেও ডোমজাতি তাঁহার নামে এক পন্থী স্থাপিত করে; তাহাই হরিচন্দী নামে খ্যাত।

সদনাপন্থী। সদনাপন্থী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতার নাম সদনা। ইনি জাতিতে কষাই। প্রবাদ এইরূপ যে, ইনি একদা জনৈক সন্ন্যাসীর সন্নিধানে গমন করত জিজ্ঞাসা করেন যে কোন্ মূর্ত্তির উপাসনা করিলে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। সন্ন্যাসী তাঁহাকে এক প্রস্তর-মূর্ত্তি দান করেন। সদনা সেই মূর্ত্তিতে মনঃসংযোগ করিয়া ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হন। ক্রমে তাঁহার বিমল চৈতন্যের বিকাশ হয়। তাঁহার জীবদ্দশায় অনেকেই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। ক্রমে শিষ্য সংখ্যার বৃদ্ধি হইলে একটি সম্প্রদায় গঠিত হয়। ইহাই সদনাপন্থী নামে খ্যাত।

মাধবী। মাধব নামে জনৈক সন্ন্যাসী এই দলের প্রতিষ্ঠাতা। মাধবীগণ "বালবন" নামক বাদ্য বাজাইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করত কালযাপন করে।

সাধবী। সাধন নামক জনৈক সন্ন্যাসীর অভ্যুদয় প্রথমে বুন্দেলখণ্ডে হয়। ইনি একটি সম্প্রদায় গঠিত করিয়া সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে স্বীয় দলভুক্ত করেন। তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিয়া ইহাই প্রতীতি জন্মে যে,

হিন্দু ও মুসলমান জাতির সম্মিলনই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। সাধক নবাগত ব্যক্তিদিগকে সহসা স্বীয় দলে স্থান দিতেন না। কিছুদিন ধরিয়া তিনি তাহাদিগকে পরীক্ষা করিতেন ও পরে যখন বুঝিতেন যে তাহাদিগের মনে দাঢ্যতা ও তাঁহার আদেশে অচলা ভক্তি প্রকটিত হইয়াছে তখন তিনি তাহাদিগকে আপনার দলভুক্ত করিতেন। হিন্দু মুসলমানে তাঁহার দ্বৈতভাব ছিল না। কিন্তু জনসমাজ কেন নিশ্চেষ্ট থাকিবে? সুতরাং উভয়জাতিই তাঁহার মতের বিরোধী হইয়া উঠিলেন।

চরণদাসী। চরণদাস জাতিতে বণিক। হিন্দু সমাজে ইঁহার জাতি "ধূসর বণিয়া" নামে খ্যাত। ইঁহার নিবাস দিল্লী। ইনি বালসন্ন্যাসী ছিলেন। ইনি হিন্দিভাষায় একখানি যোগগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া যান। তাঁহার শিষ্যেরা প্রত্যহ এই গ্রন্থ ভক্তি-পূর্ব্বক পাঠ করিয়া থাকেন। কিম্বদন্তী আছে যে, একদা তিনি অরণ্যে ভগবানের ধ্যানে রত ছিলেন এমন সময়ে ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব তথায় আগমন করত তাঁহাকে ভগবদ্ভক্তি শিক্ষা দেন। এই শিক্ষার প্রভাবে চরণদাস পূর্ণতা প্রাপ্ত হন এবং জাতি-নির্ব্বিশেষে হিন্দুর চতুর্বর্ণকেই শিষ্যভাবে গ্রহণ করেন। কণ্ঠি, মালা, এবং মলিন বস্ত্র এই সম্প্রদায়ের বিশেষত্ব।

(ক্রমশঃ)

গার্হস্থ্য বিষয়ে নারী মিতব্যয়ী হইলে কত বৃহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে।

সংসার-ধর্ম্ম পালন করিতে হইলে যেমন পরিবারের সকল সুখস্বচ্ছন্দের দিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য, তেমনি মিতব্যয়ী হওয়াও কর্ত্তব্য। এবিষয়ে নর এবং নারী উভয়েরই সমান দায়িত্ব। এই মিতব্যয়িতা দ্বারাই মানুষ দরিদ্রাবস্থা হইতে প্রভূত ধনশালী হইতে পারে। এ সম্বন্ধে কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদান করা হইল।

আমাদের দেশের পূর্ব্বেকার গৃহিণীগণ এবিষয়ে অনেকেই আদর্শস্থানীয়া ছিলেন। সেকালের গৃহিণীগণ যেরূপ মিতব্যয়ী ছিলেন ও সকল বিষয়ের শৃঙ্খলা জানিতেন এখনকার গৃহিণীদিগকে প্রায় সেরূপ দেখা যায় না। সেকালের রমণীগণ অতি সামান্য সামান্য দ্রব্য গুছাইয়া রাখিয়া কত সময় কত বৃহৎ বৃহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। কোনো জিনিষ তাঁহারা তুচ্ছ ভাবিয়া নষ্ট করিতেন না। সামান্য তরকারীর খোসা হইতে মসলা-বাঁধা

দড়িটা পর্য্যন্ত গুছাইয়া রাখিয়া কার্য্যে লাগাইতেন। এইসকল কারণে তাঁহাদের সংসারে সহস্র অভাব থাকিলেও একটি লক্ষ্মীর শ্রী দেখা যাইত। আমরা এই সকল কথা শুনিয়া মনে করি দড়িটা না হয় কাজে লাগিল, তরকারীর খোসা আবার কি হইবে? এ সকল ত জঞ্জাল। কিন্তু তাঁহারা ঐ খোসাগুলিকে শুষ্ক করিয়া রাখিয়া দিতেন, কত সময় উহা জ্বালাইয়া রন্ধন কার্য্য সমাপন করিতেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের এক বৃদ্ধা ঠাকুরমাতার কথা মনে পড়িল। তিনি যখন পরলোক গমন করেন তখন তাঁহার বয়স ৮০ বৎসর হইয়াছিল। মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘকাল তিনি নিজে তাঁহার ভাণ্ডার গুছাইয়া রাখিতেন ও স্বহস্তে রন্ধন করিয়া আহার করিয়াছেন। তাঁহার ভাণ্ডারে বাটীর অন্য কাহারো প্রবেশের অধিকার ছিল না; তাঁহার মৃত্যুর পর দেখা গেল তাঁহার ভাণ্ডারে ছেঁড়া কাপড়ের টুক্‌রা বাঁধা এত মসলা জমা রহিয়াছে যে, তাহাতে প্রায় ২০০।২৫০ শত লোকের খাওয়া হইতে পারে। ইহা দেখিয়া সকলে অবাক! সামান্য ২।১ পয়সার মসলা হইতে কিরূপে তিনি এত সঞ্চয় করিলেন! এবং সেই সকল মসলা এত পরিষ্কার টাট্‌কা যে দোকানের নূতন জিনিষও ওরূপ পরিষ্কার পাওয়া যায় না। পয়সা প্রভৃতি ও সামান্য ২।১ টাকা যাহা হাতে আসিত তাহা হইতে দু এক পয়সা সরাইয়া এ-কৌটা ও-ঝুলি, তাকের কোণে এইরূপ নানাস্থানে রাখিয়া দিতেন। সন্তান দিগের প্রয়োজনে কত সময় ইহা বাহির করিয়া দিয়াছেন তথাপি মৃত্যুর পর যাহা পাওয়া গেল তাহাতে কাঙালী বিদায় ব্রাহ্মণ-ভোজন ও দাক্ষিণা দান প্রভৃতি অতি সমারোহে সম্পন্ন হইল।

একজন গৃহিণী তাঁহার গৃহাস্থলীর কথা বলিতে বলিতে বলেন যে, তিনি মিতব্যয়িতার জন্য একটি বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হন। তিনি বলেন, আমি ছোট ছেলেদের জন্য কখনো মিথ্যা পয়সা ব্যয় করি নাই। ছেলেদের শৈশব অবস্থায় যে তোমরা কাঁথা তৈয়ার কর, তাহা পরে কি আর তোমাদের কোনো অর্থ সাহায্যে আসে? আমরা বলিলাম,—না। তাহাতে তিনি বলেন ঐ সকল কাঁথা আমাকে অর্থের সাহায্য করিয়াছে। তোমরা সকলেই ছেঁড়া কাপড় টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাঁথা সেলাই কর? আমি কিন্তু কখনো তাহা করি নাই; অল্প অল্প ছেঁড়া কাপড় আস্ত পাট করিয়া কাঁথা করিয়াছি; ছেলেরা বড় হইলে সেই কাপড়ের সেলাই খুলিয়া কাচিয়া তাহা দ্বারা বাসন ক্রয় করিয়াছি, তথাপি যখন সেলাই খুলিতাম দেখিতাম এতদিন ব্যবহারেও কাপড়ের বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় নাই। তৎপরে ছেলেদের জামা।—গৃহকর্ত্তার ছেঁড়া পিরাণ, (তোমরা সকলেই জান পুরুষদের পিরাণের তলা খুব শক্ত থাকে, উপর ও হাতা ছেঁড়ে) তাহার তলা কাটিয়া ৩।৪

বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাটীতে পরিবার উপযোগী জামা ইজার প্রভৃতি তৈয়ার করিয়া দিয়াছি। সেজন্য এক পয়সাও ব্যয় করিতে হয় নাই। এইরূপ অন্যান্য সকল ব্যয় সংক্ষেপে করিয়া যে অর্থ আমার হস্তে সঞ্চিত হইত তাহা বাক্সে রাখিয়া ক্রমে উঁহাদ্বারা একখানি পাকা বাটী নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হইয়াছি। এইরূপ দৃষ্টান্ত অনেক আছে। আমাদের বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ-পীড়িত দেশে লোকে দৈনিক গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিবে কিরূপে ভাবিয়া অস্থির ;—সঞ্চয় ত পরের কথা। কিন্তু তাঁহারা যদি বর্ত্তমান সময়ে পূর্ব্বপুরুষ দিগের গার্হস্থ্য দক্ষতা বিস্মৃত না হইতেন তাহ হইলে আজ আর এ কষ্টভোগ করিতে হইত না। দুঃখের বিষয় আমরা সে-সকল অনুকরণ করিতে বড় ইচ্ছুক নহি। এই জন্যই বর্ত্তমান সময়ে আমাদের অভাব কিছুতেই মোচন হয় না।

প্রাচ্য পণ্ডিতগণও বলিয়াছেন—

"In the family as in the state, the best source of wealth is economy."

সংসারেই হউক আর রাজ্যেই হউক, মিতব্যয়ীতাই ধনাগমের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা।

"Frugality makes an easy chair for all age." মিতব্যয়ীতার দ্বারাই লোকে বৃদ্ধ বয়সে অর্থ কষ্ট হইতে অব্যাহতি পাইয়া আরাম সম্ভোগ করিতে সমর্থ হয়। অতএব গৃহী ব্যক্তির মিতব্যয়ী হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। গৃহিনীগণ এই পথ অবলম্বন করিলে অনেক অভাব মোচন করিতে সক্ষম হইবেন।

৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জীবনী।

তাঁহার লিখিত ডায়েরী হইতে।

বিষয় ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্য।

১। সংসার ও ধর্ম্ম পরস্পর বিরোধী। সংসারের লক্ষ্য ঐহিক সুখ, ধর্ম্মের উদ্দেশ্য পারত্রিক কল্যাণ। অতএব সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মসাধন হয় না।

২। ধর্ম্মের যাঁহারা প্রধান সাধক, তাঁহারা সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী ; যেমন খৃষ্ট, চৈতন্য, শঙ্করাচার্য্য।

৩। ধর্ম্মসাধনের জন্য নির্জ্জন-চিন্তা, স্বাধীন ভাবে উপাসনাদি চাই, সংসারে পদে পদে তাহার প্রতিবন্ধক।

উত্তর—

১। ধর্ম্ম যাঁহার, সংসারও তাঁহার ; সুতরাং দুইয়েরই উদ্দেশ্য তাঁহার প্রীতি ও প্রিয়কার্য্য সাধন।

২। ধর্ম্মের কতকগুলি প্রবর্ত্তক যদিও সন্ন্যাসী ছিলেন, তাঁহাদিগের সেরূপ

থাকিবার বিশেষ কারণ ছিল তাঁহা-দিগকে নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে তাহাতেই আত্মসমর্পণ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা গৃহে থাকিয়াই ধর্ম্মসাধন করিতেন। সাধারণের ইহাই কর্ত্তব্য।

৩। নির্জ্জনে ধর্ম্মসাধন একদিকে ভাল, কিন্তু তাহার বিপদ আছে। সংসারের পরীক্ষায় তাহা টেঁকে না। কত মুনি ঋষির পতন হইল। আর বনেও সজন, গৃহেও নির্জ্জন, মন বশীভূত হইলে। রাজর্ষি জনকের দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

৪। সংসাররক্ষা ও ধর্ম্মরক্ষা দুই পূর্ণভাবে হয় না, একের জন্য অন্যকে ত্যাগ করিতে হয়। দুই শ্রেণীর ব্রাহ্ম দেখা যায় —সংসারী ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্ম সংসারী।

সংসারী ব্রাহ্ম সংসারকে অগ্রে রক্ষা করেন, ধর্ম্মের ক্ষতি স্বীকার করেন। ব্রাহ্ম সংসারী সংসারের ক্ষতি স্বীকার করিয়া ধর্ম্মকে বজায় রাখেন। সংসার সমরক্ষেত্র—প্রস্তুত হইয়া সেখানে যাইতে হয়। ধর্ম্মের পতাকা-হস্তে—ধর্ম্মের জন্য লক্ষ্য। তজ্জন্য সংসারের লাভেও আনন্দ, ক্ষতিতেও আনন্দ। সংসার-প্রভু—মনুষ্যকে দাস করিয়া খাটাইয়া মনুষ্যত্বশূন্য করে। ঈশ্বর-প্রভু মনুষ্যকে আপনার দাস করিয়া তাহার সেবাতে স্বয়ং নিযুক্ত হন। ঈশ্বর-প্রভুর সেবাতেই আত্মার পূর্ণতা হয়।

ডিসেম্বর—৮

৫ই ৬ই ও ৮ই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি ২৫ বৎসর পূর্ব্বে বিজয়বাবুকে (গোস্বামী মহাশয়) এই শ্লোকটি লিখিয়া দিয়াছিলেন এবং তাহা সার্থক হইয়াছে বলিলেন।

নামান্যনন্তস্য হতত্রপোঽ পঠন্
গুহ্যানি ভদ্রাণি কৃতানি চ স্মরণ্;
গাং পর্য্যটন্ তুষ্টমনাঃ গতস্পৃহঃ
কালং প্রতীক্ষান্ ন মদোন মৎসরঃ।

গুরুবাদ-বিষয়ে বলিলেন, ব্রাহ্মধর্ম্মে যেরূপ গুরুর উপদেশ আছে, তাহাই চাই। বিদ্বান্ গুরু না হইলে ভ্রম ও কুসংস্কারে পড়িতে হয়। ব্রহ্মবাদী ও সত্যবাদী একই কথা বলিলেন। ব্রহ্মবাদীর মুখ সত্যপূর্ণ হওয়া আবশ্যক। প্রত্যক্ষ সত্যের অপলাপ দেখিলে লোকে তাঁহার মুখে পরলোক প্রভৃতি পরোক্ষ সত্যে কেন বিশ্বাস করিবে?

জল্পনা ব্রাহ্মসাধনার প্রধান ব্যাঘাত বলিলেন। জল্পনা, ইন্দ্রিয়শক্তি...বাধা জন্মায়।

নীহারেণ প্রাবৃতাঃ।

অনেক দিনের পরীক্ষার কথা যে চায়, সে পায়।

যব দেনে তব দেনে অই হার মুক্তার তুঝি কাম।

আমার কাজ কেবল পড়ে পড়ে ডাকা আমাদের কিছুরই মূল্যে তাঁহাকে পাওয়া যায় না।

৪—১—৯৪

ভোলা গিরি—গিরি-সম্প্রদায়ের নেতা, গত কুম্ভমেলায় যিনি সন্ন্যাসীদলের

সভাপতি হন অদ্য তাঁহার সহিত সাক্ষাতে এই উপদেশ লাভ হইল ;—

(১) এক গরিবের ছেলে এক রহিসের বাড়ী খেলিতে গিয়াছিল, রহিস তাহাকে এমনি চড় মারে যে, তাহার গাল হইতে রক্ত বাহির হয়। সে কাঁদিতে কাঁদিতে আপনার বাটীতে পিতার নিকট আসিল। পিতা কোলে লইয়া আহত স্থানে হাত বুলাইয়া সান্ত্বনা দিলেন। একদিন ঘোড়সোয়ার হইয়া রহিসের বাড়ীর মধ্যে গিয়া পড়াতে অনেক জিনিষ পত্র তছরূপাত হইল। কলেক্টার জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার কি ক্ষতি বোধ হইল ? রহিস বলিলেন, হুজুর কিছুই নয়. দৈবাৎ ঘোড়া ক্ষেপিয়া হইয়াছে আমি সব ঠিক করিয়া লইব। রহিস কলেক্টারের গোলামের মত আনুগত্য করিতে লাগিল।

এই কলেক্টার আমাদের আত্মা, রহিস কাম ক্রোধাদি এক এক রিপু। রিপুলাঞ্ছনায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া তহবিলদারী পদ পাইলে রিপু গোলাম হয়।

ছেলে সে কষ্ট ভুলিল না। সে সহরে গিয়া খুব লেখা পড়া শিখিয়া এল ; এবং বি এ পাস হইয়া শেষে কলেক্টর হইয়া আপনার দেশে আসিল এবং তাহার বাড়ীতেই কাছারী করিবার অনুমতি পাইল। কত জমিদার ডালী-স্কন্ধে তাহার দ্বারস্থ। রহিসের চড় তাহার মনে আছে, কিন্তু রহিস তাহা ভুলিয়াছে। সে এক এক করিয়া সকলের ডালী লইয়া সর্ব্বশেষে রহিসের ডালী লইল এবং সৌজন্য করিয়া বলিল, আপনার বড় ক্লেশ হইয়াছে দেখিতেছি। রহিস বলিল, হুজুর কিছু কষ্ট নাই। পরে রহিসকে বলিল, আমার একটি পাকা সরকারী কাছারী করিতে হইবে ও তাহার নিকট ছাউনী বসিবে। রহিস বলিল, তা আর কি হুজুর, আমি জায়গা দিব, পাকা ইট আছে সব অল্প দিনে প্রস্তুত হইবে। কলেক্টর বলিল, দেখিবেন কাহারও উপর কোনও অত্যাচার না হয়, রহিস তথাস্তু বলিয়া বাড়ী গাঁথার উদ্যোগ করিলেন। এদিকে কলেক্টর এক ব্যক্তি মেথরকে ঘৃণা করে ; কেন না তাহার বাটীতে কোথাও হাড়, কোথাও মল কোথাও ময়লার পাত্র সকল পড়িয়া আছে। কিন্তু জ্ঞান-চক্ষে এই দেহ দেখিলে কি তদ্রূপ তাহা নহে ? সংসারে বৈরাগ্য হইলে প্রেমের পথ পায়।

ভোলাগিরি বলেন, অন্ধ বোবা কালা ইত্যাদি হওয়া পূর্ব্ব জন্মের পাপের ফল, এবং ইহাদের ইহ জন্মে সদগতির উপায় নাই। আমি তাঁহাকে কালা বোবা স্কুলের কথা ও বালকদের উন্নতির কথা বলিলাম। তাহাতে তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া একদিন স্কুল দেখিতে আসিলেন এবং ছেলেদিগকে মিষ্টান্ন বিতরণ ও আশীর্ব্বাদ করিয়া পরম সন্তুষ্টচিত্তে চলিয়া গেলেন।

দীক্ষা।

(কথা-উপনিষৎ)

ছান্দোগ্য উপনিষদ- ৪ প্রপাঠক।

"গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানম্,
শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ॥"

শান্তি পাঠঃ

আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গাণি বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্ব্বাণি। সর্ব্বং ব্রহ্মৌপনিষদং মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণমস্ত-নিরাকরণং মেহস্ত। তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্ম্মাস্তে ময়ি সন্তু, তে ময়ি সন্তু॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। হরিঃ ওঁ॥

শান্তি পাঠ

পুষ্ট হউক আমার সমস্ত অঙ্গ, পুষ্ট হউক আমর ইন্দ্রিয়সকল, আমার বাক্, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, বল, আমার প্রাণ। উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য—ঋষি-প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম আমার নিকট প্রতিভাত হউন। আমি যেন ব্রহ্মকে নিরাস না করি, অস্বীকার না করি, ব্রহ্মও যেন আমাকে প্রত্যাখ্যান না করেন, পরিত্যাগ না করেন। তাঁহার নিকট আমার, আমার নিকট তাঁহার—আমাদের উভয়ের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন যোগ বর্ত্তমান থাকুক্। আত্মনিষ্ঠ আমাতে উপনিষদের ধর্ম্ম প্রকাশিত হউক। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ—হরিঃ ওঁ।

পুণ্য কুশক্ষেত্র উপনিষদের পবিত্র তীর্থ। শান্তসলিলা—মাতার স্তন্যধারা রূপিণী স্রোতস্বতী সরস্বতী পুণ্য কুশক্ষেত্রের চরণ বেড়িয়া কত না কলস্রোতে নৃত্য করিয়া বহিয়া চলিয়াছে।

সেই পূতপুণ্য সরস্বতী-তীরে কুশক্ষেত্রে হরিদ্রুতনয় ঋষি গৌতমের আশ্রম তপোবন; গৌতমের তপঃক্ষেত্র—শান্ত নিভৃত।

অদূরে পরপারে একখানি কুটীর—ছায়ায় ঢাকা; উহা জননী জাবালার কুটীর। সে কুটীরে জননী জাবালা একমাত্র স্নেহের নিধি, সংসারের একমাত্র অবলম্বন পুত্র সত্যকামকে বক্ষে করিয়া জীবনের সন্ধ্যার প্রতীক্ষায় চাহিয়া আছেন।

একদিন এক মধুর প্রভাতে কিশোর কুমার সত্যকাম মাতার চরণে আবেদন জানাইল,—

"মা, মা, আমি ব্রহ্মবিদ্যা শিখবো।"

ছলছল আঁখি,জননী পুত্রের শিরশ্চুম্বন করিলেন।

"বাপ, আমায় কি করিতে হইবে?"

"আমার গোত্র কি বলিয়া দাও।"

অবনতমুখী জননী অন্যমনা হইলেন। বলিলেন, "বাপ, কি গোত্র তোর জানি না। আমি বহু আরাধনা করিয়া তোকে লাভ করিয়াছি। আমি তোর মা, তুই

আমার বাছা ; অন্য পরিচয় কিছু জানি না। আচার্য্য শুধাইলে বলবি,—আমি সত্যকাম জাবাল।"

ঊর্দ্ধে ঐ বিরাট সান্ধ্য সভা—আকাশ। তাহারি তলে তপঃক্ষেত্র—গৌতমের কুটীর-প্রাঙ্গণ হোমাগ্নির চকিত বিভায় উদ্ভাসিত। শিষ্যগণ শান্তস্তব্ধ, ধ্যানচিত্তে ব্রহ্মবিদ্যা শুনিতেছে, গৌতম কহিতেছেন

এমন সময়ে সত্যকাম আসিয়া ঋষির চরণযুগল বন্দনা করিল।—"ভগবন্, আমি আপনার নিকট ব্রহ্মবিদ্যা শিখিব, আমি আপনার শিষ্য, আমায় দীক্ষা দিন।"

"বৎস কি নাম তোমার ?"

"সত্যকাম, প্রভো।"

"বৎস, গোত্র কি তোমার ? উপনয়ন অনুষ্ঠানে গোত্র-কুল-পরিচয় আবশ্যক।"

"ভগবন্, গোত্র-কুল আমার কি তাহা আমি কিছুই জানি না। জননীকে জিজ্ঞাসিলাম, তিনি কিছু বলিলেন না। আনমনে অবনত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। শুধু বলিলেন,—"বাপ্, বহু আরাধনায় তোকে লাভ করিয়াছি। ভর্ত্তৃহীন অভাগিনীর পুত্র তুই। আচার্য্য শুধাইলে বলবি,—'আমি সত্যকাম জাবাল'।"

শিষ্যগণ হেলাভরে বারেক হাসিল। নয়নে নয়নে ভ্রূকুটির রেখা ফুটিয়া উঠিল।

তাপস গৌতম তরুণ বালকের শির চুম্বিলেন।

"বৎস, সৌম্য ?"

"ভগবন্।"

"আজ কুটীরে ফিরিয়া যাও, কাল প্রভাতে আসিয়ো।"

সত্যকাম ঋষির চরণধূলি মাথায় লইল।

রজনীর প্রথম যামে সত্যকাম তারকা-ফোটা কুন্তলের ন্যায় ক্ষীণ সরস্বতী পার হইয়া চলিল। যাইতে যাইতে সে একবার চারিদিকে চাহিল। কুটীর-দুয়ারে দেখিল, তাহার মা দীপটি জ্বালিয়া আকুল-নয়নে পথপানে চাহিয়া বসিয়া আছেন। সত্যকাম সব ভুলিল। তাড়াতাড়ি আসিয়া জননীর কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিল। অশ্রুসিক্তা জননী পুত্রের মুখচুম্বন করিলেন।

৪

স্নাতপূত—চিরপূত সুন্দর সত্যকাম প্রভাতে আসিয়া গুরুর চরণ বন্দনা করিল।

"গুরুদেব, সত্যকাম—আমি আসিয়াছি।"

গুরু শিষ্যের মাথায় হাত দিলেন। বলিলেন,—

"তুমি, সত্যকাম জাবাল ?"

"আমি সত্যকাম জাবাল।"

"ব্রাহ্মণ তুমি। বৎস, আমি এই শুভ ক্ষণে—এই পবিত্র প্রভাতেই তোমাকে উপনীত করিব। সত্যকাম, সমিধ আহরণ কর, হোমকার্য্য সম্পন্ন করিব।"

অনন্তর সত্যকাম সমিধ আহরণ করিল। মহর্ষি গৌতম বালক সত্যকামকে উপনয়ন সংস্কারে দীক্ষিত করিলেন। দীক্ষাশেষে বলিলেন,—

"গোমুখ-আনীত এই চতুঃশত ক্ষীণ গো, তুমি ইহাদের অনুসরণ কর। উদকতৃণে ইহাদিগকে পরিপুষ্ট করিবে এবং যাবত ইহারা সহস্র সংখ্যায় পূর্ণ না হয়, তাবৎ ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে বনে বনে ভ্রমণ করিবে—ইহাই তোমার সাধনা।"

গুরু শিষ্যকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

৫

বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, শিশির একে একে আসিল, চলিয়া গেল। আবার আসিল, আবার চলিয়া গেল। দিন বহিয়া চলিল। বল্কলবাস জীর্ণ জীর্ণতর হইল। সুকুমার অলকগুচ্ছ কৈশোর শিরে জটায় শোভিল। এমনি করিয়া সত্যকামের সাধনার দিন বহিয়া চলিল।

অরণ্যের শ্যামল স্নিগ্ধ সরসতৃণে ও সরসীর নির্ম্মল স্ফটিক জলে গো-কুল দিন দিন পূর্ণতনু দিব্যকান্ত হইয়া উঠিল।

সাধনা পূর্ণ হইল। গোকুল সহস্র সংখ্যায় পূর্ণ হইয়াছে।

মধুর প্রভাতে সহস্রসংখ্যক ধেনু সত্যকামকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। সত্যকাম আর্দ্রনয়নে হৃদয় বিকীর্ণ করিয়া পূর্ণ সহস্র ধেনুকে নমস্কার করিল। গোগণ চোখ তুলিয়া সত্যকামের মুখের দিকে চাহিল। সত্যকাম তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—

"আজ তোমরা পূর্ণ হইয়াছ। চল আচার্য্যকুলে যাই।"

গো-কুল তাহার অনুসরণ করিল।

সেই দিন পূর্ণমনে সত্যকাম আচার্য্য-কুলাভিমুখে গমন করিল। পথ প্রান্তর বহিয়া সন্ধ্যায় ধেনুগণসহ সে এক নিভৃত কাননে আশ্রয় লইল, এবং অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া তাহার পার্শ্বে উপবেশন করিল।

তপস্যায় সিদ্ধ সত্যকামের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া দিক্ সর্ব্বাঙ্গিনী বায়ু-দেবতা তাহাকে অনুগ্রহ প্রকাশ মানসে ধেনুদলের এক বৃষে অধিষ্ঠান করিয়া সত্যকামকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

"সত্যকাম!"

"ভগবন্।"

"সৌম্য, আমরা সহস্রসংখ্যায় পূর্ণ হইয়াছি। এখন আমাদিগকে গুরুর নিকট প্রত্যর্পণ কর।"

সেই বৃষরূপী বায়ুদেবতা পুনরায় সত্যকামকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

"বৎস, আমি তোমার নিকট পরব্রহ্মের পাদ কীর্ত্তন করিতেছি।"

"ভগবন্, আমার নিকট পরব্রহ্মের পাদ নির্দ্দেশ করুন।"

"পূর্ব্বদিক্ ব্রহ্মের পাদের চতুর্থভাগ; এইরূপ পশ্চিম দিক্, দক্ষিণ দিক্ ও উত্তর দিক্ এই সমুদয়ই ব্রহ্মের পাদের এক এক অংশ। এইরূপে ব্রহ্মের পাদ চতুষ্কল—চারি অবয়ব বিশিষ্ট। সেই চতুষ্কল ব্রহ্মপাদ "প্রকাশবান" নামে অভিহিত। *

* "প্রাচী দিক্কলা প্রতীচী দিক্কলা দক্ষিণা দিক্কলোদীচী দিক্কলৈষ বৈ সৌম্য, চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণঃ প্রকাশবান্নাম।" (ছাঃ উঃ - ৪ প্রপাঠক)

"ব্রহ্মের প্রথমপাদ কীর্ত্তন করিলাম, অপর পাদত্রয় পরে জানিতে পারিবে। দ্বিতীয় পাদ অগ্নি বলিবেন।"

৭

রাত্রি প্রভাত হইল। প্রকাশ—সমগ্র বিশ্বে যাঁর—তাঁরি, সত্যকামের হৃদয়ে প্রকাশিত হইল। নিখিল ভুবন ভরিয়া অন্তরে বাহিরে, গন্ধে বর্ণে গানে, প্রকাশ—তিনিই প্রকাশিত। সত্যকাম সত্যলাভ করিল। দীক্ষা আরম্ভ হইল। অনাহত সে রাগিণী—যে নিখিলে বাজিতেছে। সে সুর, সে গাথা আজ তাপসের হৃদয়-বীণায় ঝঙ্কারিয়া উঠিল।

বিশ্বে তাঁহারি প্রকাশ, তিনিই প্রকাশ, প্রকাশ তাপসের মাঝারে। নবীন অরুণে, নব আনন্দে, নব জাগরণে বিশ্ব জাগিল। ভুবন ভরিয়া প্রকাশ—আনন্দ।

সত্যকাম আচার্য্যকুলাভিমুখে প্রস্থান করিল। নব নব সরস তৃণে রসনা ও উদর তৃপ্ত করিয়া গোগণ তাহার অনুসরণ করিল।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল; এবং ক্রমে উহা রাত্রির গহ্বরে প্রবেশ করিল। গোসকল সম্মুখীন হইয়া একত্র মিলিত হইল। অগ্নি সমাধানান্তে সত্যকাম তাহাদিগকে অবরুদ্ধ করিল; এবং সমিধ গ্রহণপূর্ব্বক বৃষের বাক্য ধ্যান করত অগ্নির পশ্চাদ্ভাগে পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিল।

"সত্যকাম?" অগ্নি সম্বোধন করিলেন।

"ভগবন্।" সত্যকাম প্রত্যুত্তর করিল। এবং জিজ্ঞাসা করিল,—

"ভগবন্, আপনি ব্রহ্মের দ্বিতীয় পাদ বলিবেন, এরূপ প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন; তাহা উপদেশ করুন।"

"পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ ও সমুদ্র ইহারাই ব্রহ্মের দ্বিতীয় পাদের অবয়ব। সেই চতুষ্কল ব্রহ্মপাদ (দ্বিতীয়) "অনন্তবান্" নামে অভিহিত।" *

ব্রহ্মের দ্বিতীয় পাদ তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। তৃতীয় পাদ 'হংস'—আদিত্য উপদেশ করিবেন।

৮

প্রভাত হইল। অনন্তবান্ অনন্ত বিশ্বে অনন্তেরই প্রকাশ। অনন্ত গগনে অরুণ-প্রকাশ। অনন্ত সমুদ্র-লহরী-বক্ষে, উন্মুক্ত অনন্ত আকাশ-তলে অনন্ত পৃথিবী নব আলোকে উদ্ভাসিত—প্রকাশিত। স্বর্গ ঊর্দ্ধে নয়, নিখিল ভরিয়াই।

সত্যকাম জাগিল, জগৎ চাহিয়া দেখিল ভূমা—অনন্ত। ক্ষুদ্রহৃদয় ক্ষুদ্র সে, শুধু সত্যকাম—সে আজ সকল ব্যাপিয়া সকল ভরিয়া! অনন্ত তাহার মাঝারে আজ সান্ত! সে-সান্তে কত বিচিত্র প্রকাশ, সে-প্রকাশ অনন্তেরই। ক্ষুদ্রে-বিপুলে যোগ—সসীমে-অসীমে যোগ। সত্যকাম অনন্ত হইয়া ছড়াইয়া পড়িল। এবং সেই অনন্ত প্রকাশকে নমস্কার করিল।

সত্যকাম ধেনুগণসহ আচার্য্যকুলাভিমুখে প্রস্থান করিল।

---

* পৃথিবী কলাহন্তরীক্ষং কলা দ্যৌঃ কলা সমুদ্রঃ কলৈষ সৌম্য। চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণোঽনন্তবান্নাম।" (ছাঃ উঃ—৪ প্রপাঠক)

আবার রাত্রি আসিল। গোগণ পরস্পর সম্মুখীন হইয়া একত্র মিলিত হইল। সত্যকাম অগ্নি সমাধনান্তে তাহাদিগকে অবরুদ্ধ করিল। সমিধ গ্রহণ পূর্ব্বক অগ্নির বাক্য চিন্তা করত উপবেশন করিল।

"হে সত্যকাম," হংস (আদিত্য) সম্বোধন করিলেন।

"ভগবন্," সত্যকাম প্রত্যুত্তর করিল। এবং জিজ্ঞাসিল, "ভগবন্, আপনি 'ব্রহ্মের তৃতীয় পাদ বলিতেছি' বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। এখন তাহা বলুন।"

"অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র ও বিদ্যুৎ ইহারাই ব্রহ্মের তৃতীয় পাদের কলা—অবয়ব। এইরূপে ব্রহ্মের তৃতীয় পাদ চতুষ্কল—চারি অবয়ব-বিশিষ্ট। এই চতুষ্কল ব্রহ্মের তৃতীয় পাদ "জ্যোতিষ্মান্" নামে অভিহিত।* "হে সৌম্য, মদ্গু † তোমায় ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ উপদেশ করিবেন

৯

রাত্রি প্রভাত হইল। জ্যোতিষ্মান্ অনন্ত প্রকাশ—অনন্ত বিশ্বে।

সবিতা জ্যোতিষ্মান্, বিদ্যুৎ, অগ্নি, চন্দ্র তারা তো সবিতারই ছায়া। সবিতা সেই অনন্ত জ্যোতিরই কণিকা মাত্র। সান্ত সবিতা—প্রকাশ। প্রকাশ অনন্তের। জ্যোতিষ্মান্ অনন্ত প্রকাশের—সবিতার ভিতর দিয়া জল স্থল নভোমণ্ডল জ্যোতির্ম্ময় করিয়া আজ কোমল কুসুমদল সত্যকামের নয়নপল্লবে জ্যোতির রেখা আঁকিয়া দিল। সত্যকাম হৃদয় মেলিয়া সেই অনন্ত প্রকাশ জ্যোতিষ্মান্‌কে দেখিল। ভিতরে বাহিরে জ্যোতি। তাপস ক্ষুদ্র কর দু'টি জুড়িয়া তাঁহাকে নমস্কার করিল।

রাত্রি প্রভাত হইল।

সত্যকাম ধেনুগণসহ আচার্য্যকুলাভিমুখে প্রস্থান করিল।

রাত্রি আসিয়াছে। পাখীরা দিবসের গান সাঙ্গ করিয়া নীড়ে আসিয়াছে। গোসকল পরস্পর সম্মুখীন হইয়া একত্র মিলিত হইল। অগ্নি সমাধনান্তে সত্যকাম তাহাদিগকে অবরুদ্ধ করিল, এবং সমিধ গ্রহণ পূর্ব্বক আদিত্যের বাক্য চিন্তা করিতে করিতে অগ্নির পশ্চাদ্ভাগে পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিল।

"সত্যকাম?" মদ্গু সম্বোধন করিলেন।

"ভগবন্," সত্যকাম উত্তর করিল। এবং জিজ্ঞাসিল, "ভগবন্, আপনি ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ বলিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, এখন তাহা বলুন।"

মদ্গু কহিলেন, "প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র ও মন ইহারাই ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ চতুষ্কল—চারি অবয়ব বিশিষ্ট। এই চতুষ্কলবিশিষ্ট চতুর্থ পাদ 'আয়তনবান্' নামে অভিহিত।"*

সত্যকাম নমস্কার করিল।

* "অগ্নিঃকলা সূর্য্যঃকলা চন্দ্রঃকলা বিদ্যুৎ কলৈষ বৈ সৌম্যঃ! চতুষ্কল পাদো ব্রহ্মণো জ্যোতিষ্মান্নাম।" (ছাঃ উঃ—৪ প্রপাঠক)

† জলচর পক্ষিবিশেষ, পানকৌড়ী।

* "প্রাণঃ কলা চক্ষুঃ কলা শ্রোত্রং কলা মনঃ কলৈষ বৈ সৌম্য! চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণ আয়তনবান্নাম।" (ছাঃ উঃ—৪ প্রপাঠক)

প্রভাত হইল। পাখী গাহিল, কিম্বা জাগিল। আজ দীক্ষা পূর্ণ। জ্যোতিষ্মান্ অনন্ত প্রকাশ মন প্রাণ চক্ষু শ্রোত্র প্রভৃতি বিভিন্ন স্তরের ভিতর দিয়া আজ সত্যকামের নিকট প্রকাশিত। নয়নে বিশ্বের রূপ, শ্রোত্রে অনাহত বিশ্ব রাগিণী, প্রাণে প্রকাশ অনন্তের, সকল মিলিয়া একটা অপূর্ব্ব সৃষ্টির কল্পনা—মনে। নব নব রূপে গন্ধে গানে ভাবে আজ বিপুল তিনি, মহান্ তিনি, নয়ন মন শোত্র প্রাণের ভিতর দিয়া সত্যকামের নিকটে আসিয়াছেন। দীক্ষা শেষ হইয়াছে।—শেষ আর কি সে, চিরঅনন্ত চিরনবীন। দীক্ষা—জ্যোতিষ্মান্ অনন্ত প্রকাশ আয়তবান্। জ্যোতিষ্মান্ অনন্ত প্রকাশ আজ সত্যকামের বিভিন্ন স্তরসমূহের ভিতর একখানি অখণ্ড বিচিত্র সুরের রাগিণী জাগাইয়া তুলিয়াছে। সত্যকাম দেখিল, শুনিল, জানিল, অনুভব করিল—পাইল। আজ সে যুক্ত—সকল রকমে সেই বিরাটের সাথে। এই যোগ—মহান্ যোগের বহি-দীক্ষা বাঁধিয়া দিল

সত্যকাম পূর্ণ-সহস্র ধেনু সমভিব্যাহারে আচার্য্য-সমীপে উপস্থিত হইল। এবং তাঁহার পূত চরণরেণু মাথায় লইল।

"সত্যকাম ?"

"ভগবন্!"

"তোমার মুখ এত উদ্ভাসিত কেন ?"

সত্যকাম সস্মিত অবনতমুখে রহিলেন। তাহার শিরশ্চুম্বন করিয়া আচার্য্য বলিলেন;—

"বৎস, প্রিয়দর্শন, তোমাকে ব্রহ্মজ্ঞানীর ন্যায় দেখিতেছি। যিনি প্রসন্নেন্দ্রিয়, প্রহসিতানন, নিশ্চিন্ত এবং কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তিনিই ব্রহ্মবিজ্ঞানবান্। বৎস, তোমাতে এ-সবই দেখিতেছি। তোমার ইন্দ্রিয়গণ প্রসন্ন, বদনে অকৃত্রিম হাস্য, ললাটে চিন্তার কোনো ছায়া নাই, তুমি কৃতকার্য্য হইয়াছ। তোমার দীক্ষা পূর্ণ হইয়াছে। তুমি ব্রহ্মবিজ্ঞানবান্ হইয়াছ।" এই বলিয়া আচার্য্য সত্যকামকে বক্ষে টানিয়া লইলেন এবং তাহার বদন চুম্বন করিলেন। পরে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল, কে তোমায় ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ দিয়াছেন ?"

সত্যকাম আবেগভরা ছল ছল আঁখি দু'টি তুলিয়া বলিল, "দেবতারা—তাঁরা তো আপনিই! আপনিই, গুরুদেব! আপনিই আমাকে দীক্ষা দিয়াছেন, ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়াছেন।"

"তবে শোনো বৎস, আবার বলি—'জ্যোতিষ্মান্ অনন্তপ্রকাশ আয়তবান্ ব্রহ্ম সৎ চিৎ এবং আনন্দ। অরূপ রূপের, অসীম সীমার মাঝে আপন সুর বাজাইতেছেন, স্থূল সূক্ষ্ম স্থূল সূক্ষ্মাতিরিক্ত ইন্দ্রিয় মন প্রজ্ঞার নিকট ধরা দিতেছেন। সত্যকাম, প্রিয়দর্শন, তোমার দীক্ষা পূর্ণ হইয়াছে। তুমি আজ পূর্ণকাম সিদ্ধকাম।'"

সত্যকাম আপন ভুলিয়া গুরুর চরণ চুম্বন করিল। গুরুও শিষ্যকে বক্ষে তুলিয়া তাহার শির চুম্বন করিলেন।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত।

সংবাদ।

১। নিগ্রো জাতির কর্ম্মবীর বুকার ওয়াসিংটন।—মার্কিণ যুক্তরাজ্যের নিগ্রো সম্প্রদায়ের নেতা কর্ম্মবীর বুকার ওয়াসিংটন অধঃপতিত নিগ্রো জাতির সংস্কার ও উন্নতিকল্পে আজীবন অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিয়া ইহজগৎ হইতে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন।

কর্ম্মবীর বুকার ওয়াসিংটন অসাধারণ অধ্যবসায়, কর্ম্মপটুতা ও স্বজাতিপ্রীতি-প্রভাবে নিগ্রোদিগকে যুক্তরাজ্যের রাজনীতি-ক্ষেত্রে শ্লাঘার আসন প্রদানে কৃতকার্য্য হইয়া স্বয়ং ধন্য ও জগৎবাসীর বরেণ্য হইয়াছিলেন। কর্ম্মানুরাগ স্বজাতিপ্রীতি মনুষ্যকে কিরূপ মহান করিতে পারে বুকার ওয়াসিংটনের জীবন তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। শিক্ষার বিস্তার ও মনুষ্যত্বের পরিপুষ্টি সাধন তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। মার্কিণ রাজ্যে বুকার ওয়াসিংটনের পুণ্যস্মৃতি চিরদিন জাগরুক থাকিবে।

২। জাপান সম্রাটের অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সম্রাট এই উপলক্ষে প্রজাবর্গের হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

৩। ইংলণ্ড সবমেরিণ ধরিবার এক নূতন জাল পাতিয়াছেন। ইহাতে ৪০ খানা জর্ম্মণ সবমেরিণ ধরা পড়িয়াছে, এরূপ শুনা যাইতেছে।

৪। জর্ম্মণী এক প্রকার নূতন অটোমেটিক রাইফেল আবিষ্কার করিয়াছে। ইহাতে প্রতি মিনিটে ২৫টা করিয়া গুলি নিক্ষিপ্ত হয়।

৫। আগামী ইণ্টারমিডিয়েট ও বি-এ পরীক্ষা যথাক্রমে ১৯১৬ সালের ১৩ই ও ২০শে মার্চ্চ আরম্ভ হইবে।

৬। মিস্ কভেলের পাশবিক প্রাণদণ্ড।—ইংরাজ কুমারী মিস কভেল বেলজিয়মে আহত সৈনিকের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। এই পুণ্যবতী স্নেহশীলা নারী শত্রু-মিত্র-নির্ব্বিশেষে সকল সৈন্যেরই শুশ্রূষা করিতেন। অনেক জর্ম্মাণ সৈন্য ইঁহার করুণায় সান্ত্বনা লাভ করিয়াছে। এই বালিকা দয়াপরবশ হইয়া কতিপয় বেলজিয়ম সৈন্যের পলায়নের সহায়তা করায় জর্ম্মাণগণ কাহাকেও কিছু না জানাইয়া ১১ই অক্টোবর তাঁহার প্রাণদণ্ডের হুকুম দেন। এই বালিকার বয়ঃক্রম মাত্র ১৭ বৎসর। বালিকা মৃত্যু-সময় পর্য্যন্ত স্থির ও শান্তভাবে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, ইহাই আমার সুখ যে, আমি জন্মভূমির জন্য আমার প্রাণ দান করিতেছি। বীর নারীর ন্যায় ব্রিটিশ পতাকায় স্বীয় অঙ্গ বিভূষিত করিয়া বালিকা নীরবে মৃত্যুকে বরণ করেন। এই সেবিকা বালিকার নৃশংস হত্যার কথা চিরকাল মানব মনকে পীড়িত করিবে।

বামারচনা

অতিথি

বিদেশী অতিথি আমি তোদের আলয়ে
ঘুচাইতে ভুল-ভ্রান্তি
এসেছি লভিতে শান্তি,
এসেছি এ দেব দেশে তাপিত-হৃদয়ে।

২

এ যে মোর তীর্থ-ভূমি চিরজনমের
এ দেশের পাতা লতা,
কয় সে দেবের কথা,
এ দেশের পাখী গান গায় সে দেবের।

৩

তারি পরিমল ল'য়ে ফোটে হেথা ফুল।
বায়ু তারি বাস বয়,
সদাই এ দেশময়
তারি প্রেমে মত্ত হ'য়ে ছোটে অলিকুল।

৪

এ দেশের তরুলতা সকলি সুন্দর!
হেথাকার ধূলা-ঢাকা,
তাহারি পদাঙ্ক-আঁকা
হেথাকার তৃণগুচ্ছ কত মনোহর!

৫

এখানে যমুনা গঙ্গা সদা ব'য়ে যায়।
কি অমৃত কি পবিত্র,
এখানে বিরাজে নিত্য;
কত তীর্থ-ফল লভি' আসিলে হেথায়।

৬

কি হবে অযোধ্যা, কাশী, গয়া বৃন্দাবন?
এ পুণ্যভূমির কাছে,
কোন্ তীর্থস্থান আছে?
তীর্থ—সে তো দাম্ভিকের দম্ভের কারণ!

৭

এ মোর তপস্যা-ভূমি চিরসাধনার।
তাই তো আকুল প্রাণে
আসিয়াছি এই খানে;
এ পুণ্য ভূমিরে করি কোটি নমস্কার।

শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র।

ভালো ও মন্দ

পরের মন্দ করতে গেলে
নিজের মন্দ আগে হয়,
এ কথাটি নয় কো প্রবাদ—
খাঁটি সত্য এ নিশ্চয়।

তেমনি পরের ভালোটুকু
করলে নিজেরভালো হয়,
পরের সেবা, দয়া, দানে
আপনার লাভ আগে হয়

শ্রীনলিনীবালা দেবী।

৩৭ নং মথুরাম লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং অ্যান্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

৫৩ বর্ষ।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

পৌষ, ১৩২২। জানুয়ারী, ১৯১৬।

সূচী

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৸০; অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১।৵০; প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।০ (চারি আনা মাত্র)।

নিজের মন্দ আগে হয়,

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 629. January, 1916.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৩ বর্ষ। ৬২৯ সংখ্যা। | পৌষ, ১৩২২। জানুয়ারি, ১৯১৬। | ১০ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

গান।

১

মোর প্রভাতের এই প্রথম খনের
কুসুমখানি,
তুমি জাগাও তারে ঐ নয়নের
আলোক হানি।
সে যে দিনের বেলায় করবে খেলা
হাওয়ায় দুলে,
রাতের অন্ধকারে নেবে তারে
বক্ষে তুলে;
ওগো তখনি তো গন্ধে তাহার
ফুটবে বাণী।
আমার বীণাখানি পড়চে আজি
সবার চোখে।
হের তারগুলি তার দেখ্‌চে গুণে
সকল লোকে।
ওগো কখন সে যে সভা তোজে
আড়াল হবে,
শুধু সুরটুকু তার উঠবে বেজে
করুণ রবে;—
যখন তুমি তারে বুকের পরে
লবে টানি।

২

রহি রহি আনন্দ তরঙ্গ জাগে।
রহি রহি প্রভু তব পরশ মাধুরী
হৃদয়-মাঝে আসি লাগে।
রহি' রহি' মম মন-গগন ভাতিল
তব প্রসাদ রবিরাগে।
রহি রহি শুনি তব চরণপাত হে
মোর পথের আগে।

৩

অগ্নিবীণা বাজাও তুমি
কেমন করে?
আকাশ কাঁপে তারার আলোর
গানের ঘোরে।
তেমনি করে আপন হাতে
ছুঁলে আমার বেদনাতে,
নূতন সৃষ্টি জাগলো বুঝি
জীবন পরে।
বাজে বলেই বাজাও তুমি
সেই গরবে
ওগো প্রভু আমার প্রাণে
সকল সবে।
বিষম তোমার বহ্নিঘাতে
বারে বারে আমায় রাতে
জ্বালিয়ে দিলে নূতন তারা
ব্যথায় ভরে।

৪

আঘাত করে নিলে জিনে,
কাড়িলে মন দিনে দিনে।
সুখের বাধা ভেঙে ফেলে
তবে আমার প্রাণে এলে,
বারে বারে মরার মুখে
অনেক দুখে নিলেম চিনে।
তুফান দেখে ঝড়ের রাতে
ছেড়েছি হাল তোমার হাতে।
বাটের মাঝে হাটের মাঝে
কোথাও আমায় ছাড়লে না যে,
যখন আমার সব বিকালো
তখন আমায় নিলে কিনে॥

৫

চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে
নিয়োনা নিয়োনা সরায়ে।
জীবন মরণ সুখ দুখ দিয়ে
বক্ষে ধরিব জড়ায়ে।
স্খলিত শিথিল কামনার ভার
বহিয়া বহিয়া ফিরি কত আর,
নিজ হাতে তুমি গেঁথে নিয়ো হার,
ফেলোনা আমারে ছড়ায়ে।
চির পিপাসিত বাসনা বেদনা
বাঁচাও তাঁহারে মারিয়া;
শেষ জয়ে যেন হয় সে বিজয়ী
তোমারি কাছেতে হারিয়া।
বিকায়ে বিকায়ে দীন আপনারে
পারি না ফিরিতে দুয়ারে দুয়ারে
তোমারি করিয়া নিয়ো গো আমারে
বরণের মালা পরায়ে॥

৬

মন জাগো মঙ্গল লোকে
অমল অমৃতময় নব আলোকে
জ্যোতি বিভাসিত চোখে।
হের গগন ভরি জাগে সুন্দর
জাগে তরঙ্গে জীবন সাগর
নির্মল প্রাতে বিশ্বের সাথে
জাগো অভয় অশোকে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বারাণসী-তত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শৈব সম্প্রদায়। কাশীর দেড়ভাগ লোক শৈব। শৈবগণ উনবিংশ শাখায় বিভক্ত, যথা—(১) দণ্ডী, (২) অগ্নিহোত্রী, (৩) যোগী, (৪) শঙ্করাচার্য্য, (৫) অতিথ গোঁসাই বা সন্ন্যাসী, (৬) সংযোগী, (৭) নাগা, (৮) অবধূত, (৯) ঊর্দ্ধবাহু, (১০) আকাশমুখী, (১১) কড়ালিঙ্গী, (১২) রোখড়, (১৩) অঘোর, (১৪) অঘোরী, (১৫) অলখনামী, (১৬) জঙ্গম, (১৭) নখী, (১৮) জোক্রী এবং (২৯) পরমহংস।

দণ্ডী। যাঁহারা দণ্ড ধারণ করিয়াছেন তাঁহারাই দণ্ডী। দণ্ডটি বংশ নির্ম্মিত এবং তদুপরি একখণ্ড গৈরিক বস্ত্র বাঁধা থাকে। এই দণ্ডটিকে সর্ব্বদাই হস্তে রক্ষা করিতে হয়; মৃত্তিকায় রাখা নিষেধ। বিলাস সামগ্রীর মধ্যে তাঁহাদের একমাত্র কমণ্ডলু। ইহাতেই তাঁহারা পানাহার করিয়া থাকেন। দণ্ডীরা গাত্রে লোম থাকিতে দেন না। ক্ষৌরকর্ম্ম দ্বারা বিগতলোম হইয়া সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম লেপন করিয়া থাকেন। কটিতটে কাপড় ও গলদেশে চাদর দৃষ্ট হইয়া থাকে। কামিনী কাঞ্চন ইঁহাদিগের সেব্য নহে। উদরপূর্ত্তির জন্ম ইঁহারা স্বয়ং পাক করেন না। মধ্যাহ্ন সমাগত হইলে কোনো ব্রাহ্মণের বাটীতে যাইয়া অতিথি হন। এইরূপে ইঁহাদিগের ভোজনক্রিয়া নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। ঈশ্বরচিন্তাই ইঁহাদিগের জীবনের মুখ্য ব্রত। দিবানিশি ভগবৎ চিন্তায় এবং নিভৃতবাসে ইঁহারা কালক্ষেপ করেন। ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় ব্যতীত অন্য কোনো জাতি এই দলভুক্ত হইতে পারে না। ইঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই বেদপারগ এবং শাস্ত্রজ্ঞ। ব্রহ্মসূত্র (পৈতা) অথবা কণ্ঠি ইঁহারা ধারণ করেন না। জীবতারা কক্ষচ্যুত হইলে ইঁহাদিগের অগ্নিসৎকার হয় না—নদীতে শব ফেলিয়া দেওয়া হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ইঁহাদিগের সম্মান অধিক। বেদে ইঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ জীবনের অন্তিম দশায় দণ্ডগ্রহণ পূর্ব্বক ঈশ্বর প্রণিধানে রত হন। বারাণসীক্ষেত্রে এবং দাক্ষিণাত্যে বহু দণ্ডী দৃষ্ট হইয়া থাকে।

অগ্নিহোত্রী। অগ্নিহোত্রীগণ অগ্নির উপাসক। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীগণ অগ্নিকুণ্ড মধ্যে রাখিয়া মুখোমুখী উপবেশন করত দিনে বারত্রয় হোম করেন। হোম ইঁহাদিগের নিত্যকর্ম্ম; আমরণ হোম করিতে হইবে। ইঁহারা অগ্নি নির্ব্বাণ হইতে দেন না। যদি দৈবাৎ অগ্নি নির্ব্বাপিত হয় তবে বিধিমত তাহার অর্চ্চনা করিয়া অগ্নিকে পুনঃসংস্থাপিত করিতে হয়।

যোগী। ইঁহাদিগের মধ্যে নবাগত ব্যক্তিদিগকে কর্ণে কুণ্ডল ধারণ করিতে হয়। পরিধানে ছিন্নবাস, মস্তকে টুপি, শরীরে ভস্মলেপন এই সম্প্রদায়ের বিধি। পূর্ব্বে জনসমাজের বিশ্বাস ছিল যে, যোগীগণ ঐশ্বরিক শক্তিসমন্বিত; জন্ম, মৃত্যু, জরা, বার্দ্ধক্য ইঁহাদিগের ইচ্ছাধীন; ইঁহারা যোগবলে শূন্যে বিচরণ করিতে সমর্থ। এক্ষণে সে বিশ্বাস আর নাই। যোগীগণ অধঃপতিত হইয়াছেন। মাংস মদিরা ইঁহাদিগের সেবা। ভৈরবনাথ এবং হনুমান ইঁহাদিগের উপাস্য দেবতা। ইঁহারা বলেন যে, মহাদেব স্বয়ং এই দলের স্রষ্টা। গোরখনাথ এবং মোক্ষন্দরনাথ যোগের নিয়ন্তা। অন্যান্য ক্রিয়ার সঙ্গে পাতঞ্জলী সূত্রমত কার্য্য করা ইঁহাদিগের সমাজের বিধি।

শঙ্করাচার্য্য। শঙ্করাচার্য্য এই সম্প্রদায়ের স্রষ্টা। শঙ্কর শিবের অবতার। বৌদ্ধধর্ম্মে যখন আবর্জ্জনারাশি আসিয়া ধর্ম্ম পঙ্কিল করিল, তখনি দেবাদিদেব মহাদেব শঙ্কর মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইলেন।

অতিথ গোঁসাই বা সন্ন্যাসী। জাতি-নির্ব্বিশেষে সকলেই এই দলভুক্ত হইতে পারেন। গৈরিক বসন ইঁহাদিগের পরিধেয় বস্ত্র। ভিক্ষাই ইঁহাদিগের উপজীবিকা। ইঁহারা দারপরিগ্রহ করেন না। গোঁসাইগণ বালক ক্রয় করেন এবং তাহাদিগের মস্তক মুণ্ডন করিয়া আপনাদিগের শিষ্য করেন। পুত্রনির্ব্বিশেষে বালকগণ লালিত পালিত হয় এবং পরে গুরুর দেহান্তে শিষ্যদিগের মধ্য হইতে একজন গুরু নির্ব্বাচিত হন। ইঁহাদিগের আবাস "মঠ" নামে খ্যাত এবং ইঁহাদিগের নামের পরে গির, পুরী, ভারতী প্রভৃতি উপাধি দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সংযোগী। সংযোগীগণ অতিথ গোঁসাইয়ের মত থাকেন তবে পার্থক্য এই যে, ইঁহারা বিবাহ করিতে পারেন।

নাগা। পূর্ব্বে নাগাগণকে বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ভুক্ত বলা হইয়াছে, কিন্তু অতিথ গোঁসাইদলের যদি কোনো ব্যক্তি কোনো কারণ বশতঃ বিতাড়িত হয় তবে সে নাগা আখ্যা পাইয়া থাকে। বিষ্ণু ইঁহাদিগের উপাস্য দেবতা নহেন। মহাদেব ইঁহাদিগের অভীষ্ট দেবতা।

অবধূত। অবধূতগণ নগ্নাবস্থায় বাস এবং জটা ধারণ করেন। শীতকালের দারুণ শীতে শীতনিবারণার্থ ধূলিই ইঁহাদিগের একমাত্র অবলম্বন। ইঁহারা নিরীহ জাতি। ভিক্ষাই ইঁহাদিগের উপজীবিকা।

ঊর্দ্ধবাহু। ইঁহারা শূন্যে হস্ত উত্তোলন করিয়া রাখেন। হস্তের নখ কর্ত্তন করেন না। হস্ত উত্তোলন জন্য রক্ত সঞ্চারণ বন্ধ হইয়া হস্ত ঊর্দ্ধেই রহিয়া যায়, নিম্নে আর আইসে না। ঊর্দ্ধবাহুরা উলঙ্গ থাকে এবং লোক-প্রদত্ত ভিক্ষা দ্বারা জীবন যাপন করে।

আকাশমুখি। ইঁহাদিগের জীবনের সহিত ঊর্দ্ধবাহুর জীবনের সাদৃশ্য আছে। বিশেষত্ব এই যে, ইঁহারা আকাশের দিকে চাহিয়া থাকেন।

কড়ালিঙ্গী। এই সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীগণ আপন উপস্থ দেশে ছিদ্র করিয়া লৌহবলয় (কড়া) পরিধান করে। সুতরাং ইহারা কামজয়ী।

রোখড়। নাগা এবং অতিথ গোঁসাই-দিগের সহিত ইঁহাদিগের বাহ্যিক সাদৃশ্য আছে। ইঁহারা অধিক ধার্ম্মিক বলিয়া প্রসিদ্ধ ইঁহারা ভিক্ষোপজীবী ভিক্ষাকালীন ইঁহারা হস্তে অগ্নি-সংধুক্ত পাত্র লইয়া যাইয়া গৃহস্থের দ্বারে অগ্নিতে ধূনা নিক্ষেপ করেন ও ভিক্ষা চান। ইঁহাদিগের মস্তকে গোল টুপি, পরিধানে লম্বা জামা।

অঘোর। অঙ্গে ভস্মলেপন, মস্তক মুণ্ডন, অখাদ্য বস্তুর পান আহার অঘোর দিগের ধর্ম্ম। ইহাদিগকে দেখিলে ভয়ের সঞ্চার হয়। ইহারা ভিক্ষোপজীবী এবং কেহ কেহ ইন্দ্রজাল বিদ্যাবিশারদ। কুকুর ইহাদিগের সহচর।

অঘোরী। অঘোরীগণ সর্ব্বদাই মদ্য পানে মত্ত থাকে। সকল মাংসই ইহাদিগের ভোজ্য—এমন কি রক্তমাংসেও ইহাদিগের অরুচি নাই। ইহারা অঙ্গে মূত্র বিষ্ঠা লেপন—এমন কি সেবনও করিয়া থাকে।

অলখনামী। এই সম্প্রদায়েরা "অলখ" নাম উচ্চারণ করে। বসন ভূষণের মধ্যে ইহাদিগের মস্তকে লম্বা টুপি, এবং পরিধানে কম্বলের জামা। ইহারা ভিক্ষোপজীবী। লোকের নিকটে গিয়া একবার মাত্র অলখ নাম উচ্চারণ করিবামাত্র যদি ভিক্ষা পায় তো গ্রহণ করে নতুবা অন্যত্র গমন করে।

জঙ্গম। জঙ্গম সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ গৈরিক বস্ত্র পরিধান, অঙ্গে ভস্মলেপন, এবং কণ্ঠে শিবের তাম্র মূর্ত্তি-সংযোজিত রুদ্রাক্ষ মালাধারণ করে। হস্তেও রুদ্রাক্ষমালা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভিক্ষাই ইহাদিগের উপজীবিকা। ইহাদিগের মধ্যে ধনীও দেখিতে পাওয়া যায়। বারাণসীধামে ইহাদিগের জঙ্গমবাড়ী নামে একটি বাড়ী আছে।

নখী। নখীগণ কখনো নখ কর্ত্তন করে না।

জোক্রী। পরিধানে গৈরিক বসন এবং পাগড়ীর উপরে মহাদেবের ছবি জোক্রী সম্প্রদায়ের চিহ্ন। কেহ কেহ তাহাদিগের জটার মধ্যে একটি জলপূর্ণ পাত্র রাখিয়া দেয় এবং মস্তক সঞ্চালন দ্বারা জল নিপতিত করে। মূর্খেরা বিশেষত মহিলাগণ ভাবে যে, সন্ন্যাসীটি সিদ্ধ পুরুষ নতুবা মস্তক হইতে সহসা বারিপতন কি করিয়া সম্ভবে। কেহ কেহ কপর্দ্দক-সুশোভিত বস্ত্রাচ্ছাদিত ষাঁড় লইয়া ভিক্ষা করে।

পরমহংস। শৈব সম্প্রদায়ের মধ্যে পরমহংস দলটিই অত্যন্ত ধার্ম্মিক। ইঁহারা নগ্ন ও বাকশূন্য হইয়া কালাতিপাত করেন। যদি কেহ ইঁহাদের মুখে কিছু খাদ্য বস্তু দেয় তবে ইঁহারা ভক্ষণ করেন, নতুবা উপবাসী থাকেন। খাইবার জন্য ইঁহারা নিজ হস্ত ব্যবহার করেন না।

শাক্তগণ চারিভাগে বিভক্ত, যথা,—(১) ভকত (ভক্ত) বা সন্ত, (২) ওয়ামী বা বামী, (৩) কাঞ্চলিয়া এবং (৪) কড়ারী।

ভক্ত বা সন্ত। ভক্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা দেবীর উপাসক। ইহাদিগের কেহ কেহ মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে, কিন্তু কেহই আসবপায়ী নহে। সাধারণতঃ তাহারা কোনো-না-কোনো বাণিজ্য করে। পাঞ্জাবীগণ দেবীর অত্যন্ত ভক্ত। প্রত্যেক মাসের ২৩ তারিখে তাহারা আটার একটি দীপ তৈয়ার করে এবং তাহাতে তৈল সংযুক্ত করিয়া প্রজ্বলিত করে। এই দীপালোক অত্যন্ত পূত পদার্থ। আশ্বিন এবং চৈত্র মাসে নয় দিন ধরিয়া ভক্তগণ উপবাস করে এবং দিবারাত্র দেবীর পূজা করে।

ওয়ামী বা বামী। জাতি নির্ব্বিশেষে লোকে ওয়ামী বা বামী দলভুক্ত হইতে পারে। ভক্তগণ স্ত্রী সমভিব্যাহারে কোনো নির্দ্দিষ্ট সময়ে গুরুসকাশে গমন করত কতকগুলি ক্রিয়া করে; উহার বিবরণ অদ্যাপিও জানিতে পারা যায় নাই।

কাঞ্চলিয়া। আমরা পূর্ব্বে ওয়ামী ও বামী সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি কাঞ্চলিয়া সম্বন্ধেও তাহা প্রযোজ্য। ইহারাও দেবীর উপাসক।

কড়ারী। কড়ারী সম্প্রদায়ের লোক মাত্রেই মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। এক্ষণে এই সম্প্রদায়ের লোক কচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাদ এইরূপ যে, ইহারা নরবলি দিত। জামাই বা ভাগিনেয় বলির জন্য নির্ব্বাচিত হইত।

নানকসাহি সম্প্রদায় ও তাহার শাখা। নানকসা একজন পাঞ্জাবের ফকির। ইঁহার প্রসিদ্ধি এরূপ ছিল যে, গঙ্গা নদী হইতে আটক পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র ব্যক্তি তাঁহার চেলা হয়। নানক জাতিতে ক্ষত্রিয় এবং সম্রাট বাবরের সমসাময়িক লোক। যৌবনের অঙ্কুরকাল হইতেই তিনি সাধুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া তীর্থ পর্য্যটন করেন। তাঁহার জীবনী জনম-শাখী এবং অন্যান্য পুস্তকে বিবৃত আছে। নানকের উপদেশ "গ্রন্থ" নামক পুস্তকে সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। শিষ্য মাত্রেই উক্ত পুস্তক একখানা করিয়া রাখিয়া দেয়। নানকের মৃত্যুর পর ঐ সম্প্রদায়টি ৭ ভাগে বিভক্ত হয়; যথা—(১) উদাসী, (২) গঞ্জবক্সী, (৩) রামরায়, (৪) সুদরসাহি, (৫) গোবিন্দ সিংহি, (৬) নির্ম্মলা এবং (৭) নাগা।

উদাসী। উদাসী দলভুক্ত ব্যক্তিগণ নির্জ্জনে বাস করেন। ইঁহাদিগের পরিধানে ফকিরী পোষাক; মস্তকের টুপি লম্বা—দেখিতে বাউলের ন্যায়। ইঁহারা মস্তকের কেশ কর্ত্তন করেন না এবং যে বাটীতে বাস করেন তাহার নাম "সঙ্গত"।

গঞ্জবক্সী। এই দলের প্রতিষ্ঠাতার নাম গঞ্জবক্স। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং নানকসাহের শিষ্য। গুরুর নিকট হইতে তিনি যে নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন

সেই নামেই তিনি তাঁহার সম্প্রদায়ের নামকরণ করেন। সম্প্রদায়টি নানক সাহের ধর্ম্মনীতি মানিয়া চলে।

রামরায়। রামরায় নানকসাহের অপর একটি শিষ্য। তিনি এই দলের প্রতিষ্ঠাতা।

সুদরসাহি। সুদরা একজন নানক-সাহি ক্ষত্রিয়। নানকের গদী-প্রাপ্ত গোবিন্দ সিংহের পিতা তেগ বাহদুর ইঁহার গুরু। সুদরা আমোদপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। এমন কি গুরুর সহিত উপহাস না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। সুদরার শিষ্যগণ হস্তে দুইটি কাঠি বাজাইয়া ও তৎসঙ্গে ব্যঙ্গসূচক গীত গাইয়া দোকানদারদিগের নিকট হইতে ভিক্ষা করে।

গোবিন্দসিংহি। এই দলের নামকরণ প্রতিষ্ঠাতার নামেই করা হইয়াছে।

নির্ম্মলা। গোবিন্দ সিংহই এই সম্প্রদায়ের মূল। ইঁহার শিষ্যগণ সন্ন্যাসী। পরিধানে ধুতি ও চাদর। ইঁহারা বিদ্বান এবং বাহ্যদৃশ্যে উদাসিদিগের ন্যায়। নানকসাহের উপদেশ যে, বেদানুকুল তাহাই প্রতিপন্ন করা এই সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য। ইঁহারা সংযমী এবং ঈশ্বর-চিন্তায় সদাই মগ্ন থাকেন। বেনারসে এই সম্প্রদায়ের অনেক লোক দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু পাঞ্জাবেই ইঁহাদিগের দল অধিক।

নাগা। নানকসাহি নাগাগণ বৈষ্ণব এবং শৈব নাগাগণের ন্যায় থাকে।

জৈন। জৈনগণ হিন্দু। ইঁহারা হিন্দুর এক শাখা মাত্র। হিন্দুদিগের ধর্ম্মবিপ্লবে অনেক পন্থাই গঠিত হইয়াছে —জৈনগণও এক পন্থীভুক্ত। ইঁহারা জাতিতে বৈশ্য। ব্যবসা ইঁহাদিগের উপজীবিকা। ইঁহাদিগের শাখা জাতির নাম অসওয়াল, শ্রীমল শ্রীশ্রীমল, পরোয়াল, দিসাওয়াল, খানদেলবাই, মহেশ্রী, আগরবাল, মারবাড়ী ইত্যাদি। ইঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না কিন্তু বৌদ্ধদিগের ন্যায় সাংসারিক তাবৎ পদার্থই অনাদি বলিয়া মান্য করিয়া থাকেন। আত্মা কর্ম্মানুযায়ী স্বর্গ বা নরকে গমন করে। পুনর্জ্জন্মে ইঁহাদিগের বিশ্বাস আছে। ভোগক্ষয় হইলে আর জন্ম মৃত্যুর ধার ধারিতে হয় না—নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। ২৪ জন তীর্থঙ্কর নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইঁহারা এই তীর্থঙ্কর দিগের মূর্ত্তির উপাসক। জৈনগণ দুই ভাগে বিভক্ত যথা দিগম্বরী এবং সিতম্বরী। দিগম্বরীগণ তাঁহাদিগের উপাস্য মূর্ত্তিকে নগ্ন রাখেন; সিতাম্বরীগণ বসন ভূষণ পরাইয়া দেন। পারত্রিক শিক্ষাদাতা যদি পুরুষ হয় তবে তাহার নাম যতি এবং স্ত্রীলোক হইলে গুরুণী হইয়া থাকে। যতিগণ এবং গুরুণীগণ বিবাহ করেন না। চেলাগণ যতি বা গুরুণীতে উন্নীত হন। জীবরক্ষাই ইঁহাদিগের প্রধান ধর্ম্ম। সর্পবধেও ইঁহারা কুণ্ঠিত হন; এমন কি বৃক্ষাদি কর্ত্তনও ইঁহাদিগের নিকট পাপের মধ্যে গণ্য। পাছে মুখে পতঙ্গ প্রবেশ

করে, সেই আশঙ্কায় কোনো কোনো যতি মুখে কাপড় বাঁধিয়া রাখেন। জৈন ধর্ম্ম হইতে বোধ হয় বৌদ্ধ ধর্ম্মের উদ্ভব।

ষোড়শ অধ্যায়।

জাতি, আবাস ভবন, দেশাচার, সভা সমিতি, উদ্যান ও খনিজ পদার্থ।

হিন্দুগণ চারিবর্ণে বিভক্ত যথা,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। ইহাদিগের প্রত্যেকটির আবার বহু শাখা আছে। ব্রাহ্মণগণের শাখা-জাতির মধ্যে সরবেরিয়ার সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। অবশিষ্ট ব্রাহ্মণজাতি কান্যকুব্জ, গৌড়, সারস্বত, মহারাষ্ট্রীয়, সাকলদ্বিপী এবং বাঙ্গালী। বাঙ্গালীদিগের মধ্যে অধিকাংশই কান্যকুব্জোদ্ভূত। সাকলদ্বিপী ব্রাহ্মণগণ জাত্যংশে হীন। এতদ্ব্যতীত মহাব্রাহ্মণ ও ভূমিহার ব্রাহ্মণ বেনারসে দৃষ্ট হয়। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রায় সকলেই পূজা পাঠ করিয়া গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করেন। তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা ধনী ব্যবসাই তাঁহাদিগের উপজীবিকা। সরবোরিয়া এবং সরযূপারী ব্রাহ্মণ এক জাতি। "সরযূ" (ঘর্ঘরা) নদী পার হইতে যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহারাই সরযূপারী। সরোয়ার সরযূ পারের অপভ্রংশ। গোরক্ষপুর, বস্তি এবং অযোধ্যার কিয়দংশ সরযূপার নামে খ্যাত। ভূমিহারের শাখা-জাতি-গৌতম। বেনারসের মহারাজা এই জাতির এক জন। কিথু মিশ্র নামে জনৈক ব্রাহ্মণ ইহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ। কিথু মিশ্র বরুরাজার গুরু ছিলেন। রাজার দান গ্রহণ করিবেন না বলিয়া তাঁহার পণ ছিল। একদা বরুরাজা গুরুর অজ্ঞাতসারে তাঁহার পাগড়ির মধ্যে নিষ্কর জমির দানপত্র লুকাইয়া রাখেন। কিথু মিশ্র স্নান করিবার সময় সেই দানপত্র দেখিয়া ক্রোধে অভিশাপ দেন যে, রাজার সমুদয় রাজ্য তাঁহার বংশধরগণের হস্তে আসিবে। সে অভিশাপ কিন্তু দুর্ব্বার ফলিয়াছে। বারাণসীর মহারাজা কিথু মিশ্রের বংশ।

ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে লোকগণনায়, রঘুবংশী, ভৃগুবংশী, নাগবংশী, বাইস, গৌতম, বিসন, সূর্য্যবংশী, চ্যাণ্ডেল, বনাকর এবং বরৌলিয়া জাতি প্রধান। শেষোক্ত জাতিটি ভৃগুবংশীয়গণের শাখা মাত্র। রঘুবংশীয়গণ অযোধ্যার রাজা রঘুর বংশোদ্ভব। দেওকুমার নামে জনৈক রঘুবংশীয় সন্তান বারাণসীধামে আসিয়া বরু রাজার আতিথ্য স্বীকার করেন। পরে তাঁহার সহিত বরু রাজার কন্যার বিবাহ হয়। কাটিহারের লৈয়ার তালুক বিবাহের যৌতুক-স্বরূপ প্রাপ্ত হন। নাগবংশী রাজপুতগণ ছোটনাগপুর হইতে বারাণসীধামে আইসেন। বারাণসী ধামের নাগবংশীয় রাজপুতগণের গোত্র "বাৎস"। পুরাণে যে নাগবংশের উল্লেখ দেখা যায় বেনারসের নাগবংশীয়গণ তাঁহারই বংশধর। রাজা তক্ষক এই জাতির পূর্ব্বপুরুষ।

বৈশ্য জাতির মধ্যে যাঁহারা ব্যবসা

বাণিজ্য লইয়া আছেন তাঁহাদিগের মধ্যে অগ্রবাল, ধূসর এবং রাস্তোগী সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ। কৃষকদিগের মধ্যে কোরাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। ইহারা অন্যান্য কৃষি কার্য্য তেমন করে না, তবে ইক্ষু আহিফেন এবং অপরাপর ফলকর শস্য উৎপাদন করিয়া থাকে।

হিন্দুদিগের মধ্যে যেমন অনেক জাতি এবং শাখা-জাতি আছে, মুসলমানদিগেরও তদনুরূপ আছে। জুলাহা, সেখ, সৈয়দ, পাঠান, দর্জ্জি, মোগল, কুঁজড়া, ফকির প্রভৃতি অনেক জাতিই মুসলমানদিগের মধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে। বারাণসীর জুলাহাগণ বহুলাংশে হিন্দু ছিল। মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার পর হইতে ইহারা ভয়ানক হিন্দুদ্বেষী হইয়াছে। অন্যান্য মুসলমান অপেক্ষা ইহারা কলহকারী। বারাণসীধামে যে, সময়ে সময়ে ধর্ম্মসূত্রে হাঙ্গামা হইয়াছে তাহার মূল জুলাহাগণ। মুসলমানদিগের মধ্যে সৈয়দ, মোগল ও পাঠান জাত্যংশে শ্রেষ্ঠ। পাঠান জাতির মধ্যে লোডী, ঘোরী, আফারিদি এবং বঙ্গশ বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে। সৈয়দ এবং মোগল জাতি জমিদার-শ্রেণীভুক্ত। সৈয়দেরও বহু শাখা-জাতি আছে; তন্মধ্যে রিজুভ, হুসেনী এবং জাফারী শ্রেষ্ঠ। মোগলগণও বহু নামে আখ্যাত হইয়া থাকেন; তন্মধ্যে চাগতাই দলই শ্রেষ্ঠ। দিল্লীর বাদশাহের বংশধরগণ—যাঁহারা বারাণসীতে বাস করিয়াছেন তাঁহারা চাগতাই দলভুক্ত।

আবাস-ভবন। বেনারস সহরে স্থপতি-বিদ্যার নানারূপ নমুনা দেখিতে পাওয়া যায়। ইষ্টকনির্ম্মিত সুবৃহৎ চৌকোনা দোতালা হইতে আটতালা পর্য্যন্ত উচ্চ গৃহ আমাদিগের নয়নপথের পথিক হইয়া থাকে। এই বাসভবনের পুরোভাগ প্রস্তরফলক দ্বারা আবৃত। বাটীগুলি খুবই মজবুত। প্রথম তালায় পুরুষগণ, এবং দ্বিতলে অন্তঃপুর-পুরনারীগণ বাস করেন। রাস্তার সম্মুখবর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামরাগুলিতে দোকানদারদিগের বাস। দোকানের সহিত ভিতরবাটীর অন্য কোনো সংস্রব নাই। এই তো গেল সহরের কথা। পল্লীগ্রামের বাটীগুলি কাঁচা, সম্মুখে প্রাঙ্গণ—তাহাও প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। বাটীগুলির ছাদ খোলামকুচি বা খড় দ্বারা আবৃত। তবে জমিদারদিগের ঘর দ্বিতল বা ত্রিতল এবং প্রকোষ্ঠগুলি সুবৃহৎ।

(ক্রমশঃ)

আমাদের কথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

চন্দ্র। সমাজে শিক্ষার সংস্কার হলেই দ্বিতীয় কারণ দূরীভূত হতে পারে। আর অন্য জাতির সহিত আমাদের অন্তঃপুরের সংস্রব হওয়ার সম্ভাবনা কি ?

হরি। সমাজের শিক্ষার যেরূপ আমূল সংস্কার হলে দ্বিতীয় কারণ দূরীভূত হতে পারে, সেরূপ সংস্কার বর্ত্তমানে এবং নিকট ভবিষ্যতেও অসম্ভব। তা কখনই পেরে উঠবেন না। আপনার Idealকে Realএ আনা মুখের কথা নয়। আজ সমাজের কি অবস্থা!—আর আগেই বা কি ছিল! আগে বিলাসিতা কতটুকু ছিল? প্রলোভন কতটুকু ছিল? আর এখন বাড়ীর চাকর পাচক পর্য্যন্ত টেড়ি কাটে, বেলদার পাঞ্জাবী গায়ে দেয়; মুচী চামারের মেয়েরাও তরল আলতা পায়ে দেয়, তাম্বুল-বিহার দিয়ে পাণ খায়! আগে পাঠ্য ছিল রামায়ণ মহাভারত, পাঁচালী, পুঁথি; এখন নাটক নভেল, বিরহ, হা হুতাশ; আগে ছিল কথকতা, হরিভক্তির গান, রামায়ণ, পুরাণের যাত্রা; এখন প্রেমের থিয়েটার, বিলাসের অপেরা, নিধুবাবুর প্রেমের গান; আগে ছিল চুয়া, চন্দন, কুঙ্কুম, হরিদ্রা; এখন এসেন্স, পারফিউম, সাবান, পাউডার; —আর কত বলব? আগে গ্রামের জমীদার শাল বা জামিয়ার গায়ে দিলে এবং তাঁহার গৃহিণী সোনার বাউটি পরলে, পাঁচখানা গাঁয়ের লোক তা দেখতে আসতো। আর আজ কি দেখচেন? ত্রিশ টাকা মাইনের "বাবু"র স্ত্রীর তোরঙ্গে একশিশি দেলখোস্, একশিশি কুন্তলীন, অন্ততঃ একখানাও পার্শী সাড়ী, একটা সিল্কের জ্যাকেট্;—এ ছাড়া সূতোর ঢাকাই শান্তিপুরী তো দু পাঁচখানা আছেই। পেটে অন্ন না থাকতে পারে, কিন্তু এগুলি অপরিহার্য্য। আগে এ-গ্রামের লোক ও-গ্রামের লোককে চিনতো না, এখন আমরা মেয়ে-পুরুষে কাজের দায়ে হিল্লি-দিল্লী যাচ্চি। কলকাতা, এলাহাবাদ, লাহোর, বম্বে, মান্দ্রাজ ইত্যাদি তো এবাড়ী-ওবাড়ী হয়েছে;—তথাপি আপনি বলেন যে, অন্তঃপুরের সঙ্গে বাহ্য জগতের সাক্ষাৎ হবার সম্ভাবনা কি? এযে অনিবার্য্য, এবং আমাদের পরমমঙ্গলকর। অন্তঃপুরীকাদের পাঁটরায় পুরে চোখ বেঁধে লগেজ করে এখানে-ওখানে নিয়ে যাওয়া এবং অবশিষ্ট সময় খাঁচায় ঘেরাটোপ দিয়ে পুরে রেখে ছাতু দিয়ে "আত্মারাম" বলিয়া যাঁরা স্ত্রীজাতির উপর প্রভুত্ব রাখতে চান, সে-সকল চণ্ডালের মুখে আমি পদাঘাত করি! যাক্, যা বলছিলুম, —আগে আহারে ব্যবহারে যতটুকু সাত্বিকতা ছিল, তা এখন কোথায়? আগের বিধবারা একান্নবর্ত্তী সংসারের

একপ্রকার কর্ত্রী হয়ে থাকতেন, এখন একান্নবর্ত্তী সংসার উঠে যাচ্ছে—দুদিন পরে একটিও থাকবে না। কেবল খবরের কাগজে আর্টিকেল্ লিখে কিছুই করতে পারবেন না—কালের গতি! তখন বিধবারা হয় নিরাশ্রয়া হবেন নতুবা ভ্রাতৃজায়া অথবা জা-এর ঝাঁটা খেয়ে একমুষ্টি অন্ন পাবেন। সেদিন নিকটবর্ত্তী,—অনেক স্থলে এসেছে। সেদিন আদালতে একটী পতিতা স্ত্রীলোক আসামী হয়ে এসে ডিপুটিবাবুর কাছে কেঁদে বল্লে, আশ্রয় অভাবেই তার কপাল পুড়েছিল। আহা সে ব্রাহ্মণের বালবিধবা! যাক্ সে কথা। তাই বলছি, এই সকল বিলাসিতার মধ্যে যে সকল বালিকা প্রতিপালিতা, বর্দ্ধিতা, যে সকল বালিকা পিতা বা ভ্রাতার সহিত থিয়েটারে যাচ্ছে, সার্কাস্ দেখছে, কত সখ্ করছে, কত দেশভ্রমণ করছে, পুস্তক ও সংবাদ পত্রাদি পাঠে এবং কতপ্রকার মানুষ ও দ্রব্যাদি দেখে কত শিখ্ছে, তারা যেই বিধবা হবে, অমনি পাষাণী হয়ে যাবে? ভেল্কি বটে! আর বিধবা হওয়ার পরেও কি নিস্তার আছে? তখন কি এসকল দৃশ্য এবং উপকরণ তাদের চক্ষের সম্মুখ হতে উঠে যাবে? বিধবাদের সর্ব্বদা সধবাদের সঙ্গেই থাকতে হয়; কিন্তু সধবারা সর্ব্বদাই আজকাল রঙ্গ-রস, বেশবিন্যাস, বিলাস-বৈভব নিয়েই থাকেন। বিধবাদের সঙ্গে কিরূপে চলা উচিত এবং বিধবাদের কিরূপে রাখা উচিত তা আজকাল কয় জন সধবা জানেন বা ভেবে দেখেন? অনেক স্থলে কন্যা বা পুত্রবধূ বিধবা, কিন্তু মাতা বা শ্বশ্রূকে বিলক্ষণ ভোগ-বিলাস-পরায়ণ দেখা যায়। এসকল বর্ত্তমান অধঃপতন—পূর্ব্বে ছিল না। কারণ, পূর্ব্বে সমাজে বিলাসিতা ছিল না বল্লেই হয়। এখন স্ত্রীলোকেরা কুমারী ও সধবাবস্থায় ভোগ-বিলাসের চরম করে। "আমি বিধবা হতে পারি, তখন কি হবে" ইহা ভেবে কেউ নিরস্ত থাকে না। অভিভাবকেরাও বাধা দেন না, বরং তাঁরাই স্ত্রীলোকের বিলাস-সম্ভোগ বাড়িয়েছেন এবং নিজেরা বিলাসী হয়েছেন; পূর্ব্বে এমন ছিল কি? আমি বেশ জানি, বাড়ীতে ভগ্নীপতি এলে বিধবা শ্যালিকার উপরেই অধিক কার্য্যের ভার পড়ে,—ভগ্নীকে "ছেড়ে দেওয়া", আর অন্যান্য সধবা সঙ্গিনীদের সঙ্গে মিশে "শাড়ি পাতা" এবং এই সকল প্রসঙ্গের সালঙ্কার সমালোচনা। ঠাট্টা বিদ্রূপ তো অবারিত। এতে অনেক স্থলে অভিভাবকেরা বাধা দেওয়া অনুচিত এবং অনাবশ্যক মনে করেন। কেন না "ঠাট্টার সম্পর্ক"! এর মাঝখানেই আপনারা পবিত্র ব্রহ্মচর্য্য বর্দ্ধিত করতে চান? পারেন ক্ষতি নেই,—তার চেয়ে সুখের কথা, পবিত্র কথা আর কি আছে? কিন্তু আজ কি দেখছি? প্রত্যেক সহরবাসী ক্ষুদ্র দোকানদার, মেঠাই-ওয়ালা, ফেরিওয়ালা, হোটেল্‌ওলা প্রভৃতি সকলেই এক একটি স্ত্রীলোক নিয়ে বাস করে! সেই সকল স্ত্রীলোক হিন্দুর বাল-

বিধবা হতে—আমাদের কাল্পনিক ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হতে নেওয়া !! এক একজন অশিক্ষিত ভিক্ষা-ব্যবসায়ী কর্ত্তাভজার সঙ্গে সঙ্গে পাঁচজন করিয়া তিলক-ধারিণী বৈষ্ণবী টুক্‌নি হাতে করে "জয় রাধে" বলে ফিরচে—সবই হিন্দুর বাল-বিধবা। এক একটি মেলায়, তীর্থস্থানে, যোগ-উপলক্ষ্যে, সহস্র সহস্র হিন্দুর বিধবা ম্লান-ক্ষুধার্ত্ত মুখে ফিরচে—এবং অর্দ্ধেকের বেশি বাড়ী ফিরচে না। রূপের হাট তো গুল্‌জার। এ-ছাড়া অসংখ্য ভ্রূণ-হত্যা ব্যভিচার সমাজের বুকের উপর তো অবাধেই চলেছে। এমন ডাক্তার খুব কমই আছেন, যাঁর জীবনে—হয় বাধ্য হয়ে, নয় অর্থলোভে দু পাঁচটা হিন্দু বাল-বিধবার ভ্রূণ-হত্যা করাতে হয় নেই। তাছাড়া অধিকাংশ স্থলে আনাড়ী লোকের ঔষধ ব্যবহারে কত বিধবা ছট্‌ফট্‌ করে ভ্রূণ সমেত প্রাণত্যাগ করছে! নরকের দৃশ্য! যাঁরা এসকল অস্বীকার করেন, হয় তাঁরা আজো মাতৃগর্ভে অর্থাৎ সমাজের কোনো খবর রাখেন না, নয় তো কোনো কারণে ইচ্ছা করেই চুপ করে থাকেন,—মনকে চোখ ঠারেন। এই সকল দেখেই তো আজ বিলাতী সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা আমাদের বিদ্রূপ করতে সাহস পান! নইলে পবিত্র হিন্দুর বিধবার নাম পর্য্যন্ত মুখে আনতে তাঁরা সম্ভ্রমে শিহরিয়ে উঠতেন। একদিন যাঁকে শরতের শিশির-বিধৌত শেফালিকার ন্যায় সমাজের ক্রোড়ে দেখে আমরা ভক্তিভরে গদ্গদ হয়েছিলুম, পাঁচ বৎসর পরে তাঁকে বাজারের মাঝখানে নরক-কুকুরের অঙ্কশায়িনী দেখচি;—সহস্র লম্পট-স্পৃষ্টা, উচ্ছিষ্টা, ঘৃণিতা; এবং কিছুদিন পরে ঘৃণিত রোগাক্রান্তা, অসহায়া, পদদলিতা, পরিত্যক্তা; অসংখ্য কৃমিকীট-দংশনে ছট্‌ফট্‌ করে মৃত্যুমুখে পতিত হতে দেখলুম! শৃগাল কুকুর, গৃধিনী, শকুনী, আজ সেই একদিনকার পবিত্র কোমলাঙ্গের গলিত মাংস ল'য়ে কাড়াকাড়ি করতে লাগলো! ক্রোধে নিজের হস্ত নিজেই দংশন করলুম! ক্ষোভে, দুঃখে, চক্ষু ফেটে তপ্তাশ্রু ছুটে এল! অনুসন্ধানে হয় তো জানলুম, কোনো বক-ধার্ম্মিক প্রতিবেশী অথবা আত্মীয় তাঁকে প্রলোভিত করে ঘরের বাহির করেছিল, শেষে অসহায় অবস্থায় অবলাকে এই ভয়াবহ ভবিষ্যতের জন্য ছেড়ে দিয়ে নিজে এসে আবার সমাজের বুকে বসে মহাবিজ্ঞ সেজে বিধবা-বিবাহের প্রতিবাদ করছে! এরা তো প্রতিবাদ করবেই!

চন্দ্র। তুমি বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করলে দেখ্‌ছি। সমাজে সব বাল-বিধবারই কি এই অধঃপতন, এই পরিণাম ঘটে? আর যে সকল লোক প্রতিবাদ করেন, তাঁদের সকলেই কি এই শ্রেণীর লোক? ছি ছি ছি! সাম্‌লে কথা বোলো।

(এই সময় আমার মনে বড় ইচ্ছা হইল যে, চন্দ্রবাবুর সেই পাতাসী নাপতিনীর কথাটা মনে করাইয়া দিই। সত্যেন বাবুকে

জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি উত্তরে আমাকে বড় জোরে একটি চিম্‌টি কাটিলেন—বড় লাগিল, বলা হইল না। এদিকে হরিদাস বাবু উত্তর আরম্ভ করিয়াছেন।)

হরি। ঠিক তা নয়, সকলেই সেরূপ নয় তা অবশ্য জানি; কিন্তু যা আছে, তাই বা কেন থাকে? এটি যে সম্পূর্ণ আমাদেরই দোষে। হিন্দু রমণী দেবী! তাঁর চরিত্র মন কলুষিত করা অতি কঠিন। অল্প কষ্টে, অল্প প্রলোভনে, অল্প দুর্যোগে এবং অভিভাবক শ্রেণীর (যদি থাকে) অল্প অসাবধানতায় এবং তাচ্ছিল্যে হিন্দু রমণীর অধঃপতন অসম্ভব। কিন্তু তাও যখন সাধিত হচ্ছে, তখন বুঝতে হবে আমাদেরও সেই পরিমাণ অধঃপতন ঘটেছে। খবরের কাগজে রসান্‌-দেওয়া প্রবন্ধ লিখে বা দুখানা বাংলা "আদর্শ নভেল" লিখে কি করবেন? শাক দিয়ে মাছ কত ঢাকবেন? কাটা কান চুল দিয়ে কত ঢাকবেন?

চন্দ্র। আচ্ছা ভায়া, আর সব জাতির, যেমন মুসলমান খৃষ্টান ইত্যাদি—এদের তো বিধবা-বিবাহ আছে; কিন্তু এদের মধ্যে কি ব্যভিচার একেবারেই নেই?

হরি। আছে, কিন্তু আমাদের যা আছে তা যে অতি ভীষণ, দুরপনেয়; আমরা চেষ্টা করলে কখনই এতটা থাকত না। কারণ এদের আমাদের মত সমাজ-বন্ধন নেই, আমরা যদি সংশিক্ষার বলে সমাজে পবিত্রতা রক্ষা করে চলতে পারতুম, তবে আমাদের সমাজ আজ স্বর্গ হত, কারণ সমাজ আমাদের হাতে। তা যখন তেমন উচিতমত পেরে উঠি নি, তখন যদি আমরা এইসকল বালবিধবার পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা করি, তা হলে পাঁচ বৎসর পরে আর বাজারে হিন্দুর কুলবধূকে লম্পটের অঙ্কশায়িনী দেখতে হবে না। দূরদর্শী পরমজ্ঞানী পরাশর ইহা জেনেই বালবিধবার পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা করে রেখে গিয়েছেন। তিনি গাঁজাখোর ছিলেন না। এখন এই নিরপরাধিনী অবলা বালিকাদিগের প্রতি একটু দয়া প্রকাশ করলে মহাপাতক হবে বলে আমি মনে করি নে, এবং তাতে আমাদের বীরত্বেরও কিছু লাঘব হবে না।

চন্দ্র। ভীমরুলের চাকে একবার ঘা দিলে আর রক্ষা থাকবে না—তখন দেখতে পাবে।

হরি। বলেন কি! সমাজ যে আমাদের হাতে; বাড়াবাড়ি হতে কেন দেবো? আর বলেছি তো—অবিমিশ্র শুভ কিছুতেই পাবেন না। বর্ত্তমান অবস্থাতেই কি অবিমিশ্র শুভ আছে? বরং অমঙ্গলই খুব বেশি; আরো বাড়বে। এই দেখুন না কেন, কামার, কুমোর, ধোপা, নাপিত, দেশ হতে লোপ পেতে বসেছে। একেই তো এদের ঘরে মেয়ে কম, তার মধ্য হতে বিধবা হতে থাকলে আর তাদের বংশরক্ষা কেমন করে চলে? এমন করে লোকসংখ্যা ক্ষয় পেলে যে সর্ব্বনাশ।

চন্দ্র। তুমি দেখছি Malthus এসে কোল্লে? একে আমরা খেতে পাই নে; এর উপর লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া কি ভাল?

হরি। কেন খেতে পাব না? যারা খেতে পায় না, অর্থাৎ অনার্য্য জাতীয় হিন্দু এবং অনার্য্য জাতীয় (Converted) মুসলমান,—তাদের মধ্যে তো বিধবা-বিবাহ প্রচলিতই আছে। আর্য্য এবং বর্ণশঙ্কর হিন্দুর অবস্থা খুব খারাপ একথা কে বল্লে?

চন্দ্র। কিন্তু তারা, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে তখন তো অবস্থা খারাপ নিশ্চয়ই হবে; লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াই যে খারাপ।

হরি। কখনই না। Efficient population, অর্থাৎ লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি বর্দ্ধিত লোকসংখ্যা, আপন আপন জীবনযাপনের উপযোগী অর্থ উপার্জ্জন এবং শস্যাদি উৎপাদনের ক্ষমতাও লাভ করতে থাকে, এবং সমাজের বা দেশের স্কন্ধে burden (ভার) স্বরূপ না হয় তবে তো লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পরম মঙ্গলকর; কারণ তা হলে সমাজের বলবৃদ্ধি হয়।—একথা প্রফেসর্ মার্শাল্ তাঁর "Principles of economics" নামক সুবৃহৎ গ্রন্থে অতি সুন্দররূপে বুঝিয়েছেন। হিন্দুর লোকসংখ্যা বৃদ্ধি বর্ত্তমানে খারাপ একথা কোনো economist আমার কাছে প্রমাণ করতে পারেন না। বরং বিধবা-বিবাহ প্রচলিত না হলে হিন্দু-বংশ লোপ পাবারই কথা।

চন্দ্র। তা যেন হল। কিন্তু যখন হাঁসের পালের মত লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে সত্যসত্যই সমাজের বোঝা হয়ে দাঁড়াবে, তখন কি করবে?

হরি। তখন, আবশ্যক হলে, বিধবা-বিবাহ না হয় বন্ধই করব। সে তখনকার কথা তখন দেখা যাবে।

চন্দ্র। তখন তুমি কোথায় থাকবে? সে কি আর আজই হবে?

হরি। আমাদের বংশধরেরা করবে। সমাজে শিক্ষাবিস্তার আরম্ভ হয়েছে। আমাদের বংশধরেরা আমাদের অপেক্ষা অধিক জ্ঞানীই হবে। তারা সমাজ রক্ষা করতে জানবে এবং পারবে।

চন্দ্র। বিধবা-বিবাহ তারা কেমন করে বন্ধ করবে? একবার বাঁধ ভাঙিলে আবার কেমন করে গাঁথবে?

হরি। ঠিক গাঁথবে। সমাজ যে হাতের মুঠোর মধ্যে। সমাজের পণ্ডিতাগ্রগণ্যেরা যে বিধি-ব্যবস্থা করবেন, যে ব্যক্তি তা না মানবে সে যে সমাজচ্যুত হবে। এখন বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি সমাজের পরমমঙ্গলকর সংস্কার সকল বন্ধ রেখেছেন কিসের জোরে? এই দেখুন না কেন, আগে তো বিধবা-বিবাহ, রমণীর স্বেচ্ছাবিহার, এসব ছিল; কিন্তু কলিতে তার অনেকগুলিই পাপ, বলে অভিহিত হয়েছে, এবং সেইজন্যই উহা নিষিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু বন্ধ করলেন লাঠির জোরে, না সমাজ-শাসনের জোরে? কালভেদে ধর্ম্মভেদ অবশ্যই

হবে ; এবং তখনো এই সমাজশাসন-রূপ পেনাল্‌-কোডের সাহায্যেই আমরা তা সমাজ পালিত করাবো।

চন্দ্র। ভাল কথা মনে পড়ল, গোলাপ শাস্ত্রী তাঁর Hindoo-Law তে (হিন্দু আইন) যে টিপনিটুকু কেটে রেখেছেন, তা দেখেছ কি ?

হরি। দেখেছি। তিনি এবিষয়ে একটু ভ্রান্ত। তিনি বলেন, বিধবা-বিবাহ আরম্ভ হলে, কুমারীর দল অবিবাহিতা থাকতে আরম্ভ করবে।—উদাহরণ বিলাত।

চন্দ্র। সে তো ঠিক কথা। ছোঁড়ারা বড় পেলে কি আর ছোট মেয়ে বিয়ে করবে ?

হরি। আ সর্ব্বনাশ—কি বুঝলেন ? বিলেতে সেজন্য কুমারীর সংখ্যা মোটেই বাড়ে নি—সেখানে কুমারীও বয়স্কা। সে-খানে বিধবারা বিবাহ করলেও তাদের পূর্ব্ব স্বামীর সম্পত্তির অধিকারিণী থাকে, এই লোভেই অনেকে বিধবাকে বিবাহ করে। হিন্দু-আইনে তা পায় না, এজন্য লোকে বিধবা বিবাহ করতে কখনই তত প্রলুব্ধ হবে না। আর এক কথা,—হিন্দুর কাছে স্ত্রীর অতি পবিত্র আসন, সুতরাং কুমারীর আদর কোথাও যাবে না। অধিকন্তু আমরা অবশ্যই এবিষয়ে নিয়ম করব যে, কেবল মৃতদারই বিধবা-বিবাহ করতে পারবেন। যে কুমার বিধবা-বিবাহ করবেন অথবা যে অভিভাবক কুমারের সহিত বিধবার বিবাহ ঘটাবেন, তিনি সমাজচ্যুত হবেন।

চন্দ্র। শাস্ত্রী মশায় আরো বলেন, স্ত্রীলোকেরা রিপুদমন করতে পারে, এজন্য, সার্ব্বজনীন মঙ্গলের খাতিরে, তাঁদের ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জ্জন করাই উচিত।

হরি। প্রথমত, আমি এতক্ষণ যা বুঝিয়েছি তাতে সার্ব্বজনীন মঙ্গল বিধবা-বিবাহ প্রবর্ত্তনে কখনই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না ;—বরং লাভবান হবে। দ্বিতীয়ত স্ত্রীলোকেরা রিপুদমন করতে পারে বটে, অনেক স্থলে য়ুরোপের চক্ষে নেটিভেরা যেমন না খেয়েও বাঁচতে পারে, আমাদের গুণধর পূর্ব্বপুরুষদের চক্ষেও তেমন বিধবা হলে সহমরণের সময় আগুনের জ্বালা অনুভব না করেও পুড়ে মরতে পারে। হাত পা এবং মুখ বেঁধে আমার পিঠে বেত লাগালে আমি যেমন লক্ষ্মী শান্ত ছেলেটির মত নীরবে সহ্য করতে পারি,—অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকেরাও তেমনি পারে। আবার প্রফেসর্ সেল্‌বী তো ঠিক উল্টো বলেন। তিনি বলেন যে, তারা যখন weaker sex, তখন সব বিষয়েই weak. কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে, রিপুদমন করার কথা মেনে নিলেও, সমাজের পুরুষেরা কত স্বার্থপর ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান-শূন্য হয়েছে, তা জানেন ? এ-ছাড়া এদেশে ঘরের দুয়ারে অহিন্দু জাতি তো অসংখ্য আছে। গর্ত্তের সাপ খুঁচিয়ে বার করলে,—সাপের অপরাধ ? উচ্চশিক্ষিত যুবকেরা ভাল বটে, কিন্তু তাদের সংখ্যা এত অল্প যে, নগণ্য বল্লেও

চলে। শাস্ত্রী মশায়ের রিপুদমনের প্রমাণ তো বাজার দেখলে, সমাজের গুপ্ত ব্যভিচারের অবারিত স্রোত দেখলে, খুবই পাওয়া যাচ্ছে দেখচি। যখন আন্তরিকতা ছিল, তখন ব্রহ্মচর্য্য চলত এবং তাতে পুণ্য ছিল। এখন আন্তরিকতাই যখন সমাজের দোষে গিয়েছে, তখন এ-প্রথা রাখা সম্পূর্ণ বিড়ম্বনা। আন্তরিকতা হারিয়ে যে প্রথা, যে ধর্ম্ম-কর্ম্মই বজায় রাখতে যাবেন, তারই ফল বিষময় হবে। আগে এমন দিন ছিল, যখন বিধবারা স্বেচ্ছায় সংমৃতা হতেন। কিন্তু যখন নারীরা সেই আন্তরিকতা হারালেন, তখন আপনারা তাঁদের বেঁধে জোর করে জীবন্ত পুড়িয়ে মারতে লাগলেন, এবং পাছে তাঁদের ভয়ের এবং মৃত্যু-যন্ত্রণার কাতর চীৎকার শুনতে হয়, এজন্য ঢাক-ঢোল বাজিয়ে আসর জমজমাট রাখতেন। উঃ কি নিষ্ঠুর বর্ব্বরতা! মনে করলেও গা শিউরে ওঠে! এই মহাপাপেই আজ আমরা এত অধঃপতিত।—পাপের ফল, নিরপরাধে নিষ্ঠুর স্ত্রী-হত্যার ফল, কোথায় যাবে? সভ্যতার অভিমান করতে লজ্জা করে না? এরই নাম পবিত্রতা! আন্তরিকতার বিরুদ্ধে সন্তান-ধনে বঞ্চিতা বাল-বিধবার ধর্ম্মানুমোদিত পুনর্বিবাহ বন্ধ রেখে, আবার আমরা সেই পাপসঞ্চয় করছি। এখনো সাবধান! আমি ব্রাহ্মণ—আমার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হচ্ছে। —আমাদের অদৃষ্টে আরো কি আছে! ভরদ্বাজ ঋষির রক্ত এখনো এই শিরায় প্রবাহিত হচ্ছে,—আমি মূর্খ নহি। ভরদ্বাজ ঋষির মত রাজনীতি-বিশারদ কয়জন ছিলেন? আজো ভারতের নানাস্থানে এবং অনেক নেটিভ ষ্টেটে ভরদ্বাজ গোষ্ঠীয়েরা মস্তিষ্কের পরিচয় দিচ্ছেন। আমার দুরদর্শিতা তুচ্ছ করবার নহে। মাথায় টিক রেখে আর, খানিকটা ব্যাকরণ কাব্য পড়ে এক একটা আড়াই হাত সমাস-ওয়ালা টাইটেল ল্যাজে বাঁধলেই পণ্ডিত হয় না। কূটবুদ্ধি, ও দূরদর্শিতা, পৃথক জিনিষ। মাথায় ঝুঁটি পরেও তার অধিকারী হওয়া যায়। আগে সমাজে সৎশিক্ষা বজায় রাখুন তারপর আদর্শ খাটাবার কথা বলবেন। নিজে স্ফূর্ত্তি করে বেড়াব,—যত আদর্শ এই অবলাদের ঘাড়ে। এঁদেরই গর্ভে না আমাদের জন্ম! এঁরা না আমাদের মা? আমরা মায়ের প্রতি নিষ্ঠুর নৃশংস! ফলও হাতে হাতে পাচ্ছি। এখনো সাবধান না হলে আরো ফলভোগ করতে হবে। আন্তরিকতাই ধর্ম্ম, নহলে সকল কর্ম্মই প্রতারণা এবং মহাপাপ। কার্লাইল্ গোঁড়া খৃষ্টান ছিলেন, তিনিও তাঁর বিখ্যাত "হিরো-ওয়ারশিপ্" গ্রন্থে লিখেছেন যে, যতদিন পৌত্তলিকতায় আন্তরিকতা থাকে, ততদিন উহা ধর্ম্ম, তারপর তাহা প্রহসন এবং মহাপাপ। যুগভেদে মানুষের ক্ষমতা এবং শিক্ষা-জ্ঞানাদিরও যেমন ভেদ হয়, তাদের ধর্ম্মকর্ম্মেরও তেমনি পরিবর্ত্তন হবে।

এখন কি আর সেই বৈদিক যজ্ঞ উপবাস পোষায়? তেমনি আমাদের ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে আগে যেমন সতীদাহ ছিল, তারপর যেমন তা গিয়ে ব্রহ্মচর্য্য হল, তেমনি এখন শাস্ত্রানুমোদিত বিধি-অনুসারে বাল-বিধবার পুনর্বিবাহই নিরাপদ। আস্তরিকতার বিরুদ্ধে জোর করে প্রথা বজায় রাখতে গিয়ে কেবল লোক হাসাচ্ছেন এবং সমাজের সর্ব্বনাশ করছেন। এ ছাড়া অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীর ন্যায় যে নীরব তপ্তাশ্রু-প্রবাহ,কোমলহৃদয়া,নিরপরাধিনী, চিরদুঃখিনীদের মর্ম্মভেদ করে অহরহ প্রবাহিত হচ্ছে তা হিন্দু সমাজের উপর, হিন্দু পুরুষজাতির উপর দেবীর অভিশম্পাতের ন্যায় পতিত হচ্ছে,—তাই বুঝি হিন্দু আজ যায়-যায়, তাই বুঝি সমাজে পুরুষসংখ্যা লোপ পাচ্ছে। তাঁদের সংবৃত দীর্ঘ নিশ্বাস প্রলয়ঝটিকার ন্যায় এই সমাজের মর্ম্মে আঘাত করছে। তাঁদের গুপ্ত মর্ম্ম-প্রদাহ আগ্নেয় পর্ব্বতাভ্যন্তরের গুপ্ত বহ্নি-রাশির ন্যায় এই সমাজের কল্যাণরাশি দগ্ধ করছে। এতে ঘোর অমঙ্গল হবে। কেবল মস্তিষ্ক নিয়েই (তার পরিচয়ই বা পাই কই?) মনুষ্যত্ব নহে—হৃদয় চাই। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের তা ছিল। নইলে তাঁর কি স্বার্থ? তাঁর কয়টি বালবিধবা ভগ্নীর বা কন্যার তিনি বিবাহ দিয়ে গিয়েছেন? কিন্তু তথাপি স্বীকার করছি, পুনর্বিবাহ অপেক্ষা ব্রহ্মচর্য্য সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ, এবং বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হলে অবিমিশ্র মঙ্গল পাবেন না—কোনো কার্য্যেই তা আশা করা যায় না। কিন্তু সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার হিসেবে মঙ্গলই অনেক;—অতএব এর বিপক্ষবাদী হওয়া হীনবুদ্ধি এবং হৃদয়হীনতারই পরিচায়ক।

চন্দ্র। খুব গালাগালি দেও তাতে কারো গা পচে যাবে না। কিন্তু গোলাপ শাস্ত্রী মশায়ের আপত্তি এখনো খণ্ডন করতে পার নি, কেবল বাচালের মত বকে যাচ্ছ আর বাক্‌পটুতা দেখাচ্ছ। যদি বিধবা-বিবাহ প্রচলিত না হয়, তবে যে সকল মৃতদার বিধবা-বিবাহ করবেন, তাঁরা কুমারীই অবশ্য বিবাহ করতেন—যেমন এখন করছেন। কিন্তু বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হলে, তখন এইসকল কুমারী তো surplus থেকে যাবে—কারণ তাদের দাবী বিধবারা এসে অধিকার করবে। তখন এই বাড়্‌তি কুমারীগুলির কি গতি করবে?

হরি। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত না করলে ক্রমে কুমারীর সংখ্যা আরো বাড়বে। তখন বিধবা-বিবাহ বন্ধ থাকা সত্বেও কুমারী অবিবাহিতা থাকবে—তার জোগাড় হয়ে এসেছে। আমরা তো কেবল যারা বিবাহের কিছুই জানে না—নিঃসন্তান, তাদেরই পুনর্বিবাহ দিতে চাই, তাতেই আপনারা কূট বুদ্ধি দেখিয়ে ভবিষ্যতে কুমারী-বিবাহের মুস্কিল কল্পনা করছেন। কিন্তু মুসলমানদের তো নিঃসন্তান দূরের কথা, এক এক পাল ছেলে মেয়ে নিয়ে পুনর্ব্বার বিবাহ

করেছেন, কিন্তু তাঁদের তো কুমারী বাড়ে নি? বরং তাঁদের মধ্যে একটি পাঁচ বৎসরের মেয়েও পড়তে পায় না। বিলেতের কথা পৃথক, সেখানে পুরুষেরা অনেকেই বেশি বয়সে বিয়ে করেন, কেউ বা আদৌ বিয়ে করেন না, কেউ বা বিদেশে বিয়ে করেন; স্ত্রীলোকেরাও অনেক বেশি বয়সে বিবাহ করেন, অনেকে আবার ইচ্ছা করেই কুমারী থাকেন; সেখানে মিশনারী ও "নাইটিঙ্গেল" দলকে "সিষ্টার" বলে 'সেনসাস্' করা হয়, তাই দূর থেকে অমন দেখায়। আর ঐ অর্থলোভে বিধবা-বিবাহ তো আছেই—সে কথা আগেই বলেছি। বিশেষতঃ বদেশে বিয়ে করা বড় হাঙ্গাম—বিবি পোষা না হাতী পোষা। এজন্য অনেকের বিয়ে হয় না। আমাদের দেশে সে ভয় নেই। সেখানে যেমন কুমারীও অনেক, তেমনি কুমারও অনেক। বিলেতের তুলনা কি এখানে খাটে? বরং বিধবা-বিবাহ বন্ধ রাখলে নিশ্চয়ই সমস্যা বাড়বে। এখানে দেশীবর ঘটকের কল্যাণেও অনেক স্থলে কুমারী বেশি দেখা যায়। কুমারীবৃদ্ধির জন্য বিধবা-বিবাহ দায়ী হবে না, বরং তা বন্ধ রাখাই বর্ত্তমানে দোষের হয়েছে। আর এও তো বড় মজা মন্দ নয় যে, কুমারী বাড়তে "পারে" এই আশঙ্কাতেই সোনার চাঁদ মেয়েগুলোর ধর্ম্মানুমোদিত পুনর্বিবাহ হতে দেবো না! Utilitarian theory ধরে আমি যদি বলি, মেয়েগুলো বিধবা হলে তাদের বিষ খাইয়ে মারলে সমাজের সমস্যা আরো সহজ হয়। রাজপুতেরা তাই করে মেয়ে কমিয়েছিল, এ তো বিজ্ঞানসম্মত পরামর্শ। Darwin বলেন—"We have some reason to believe that female-in-fanticide, consistently practised for along time, tends to make a male-producing race."—তাই করতে বলি। আহলে না থাকলে বোধ হয় এ পরামর্শটাও দিতেন। যদি বিবাহের অযোগ্য কুমারী surplus থাকে, তাতে ক্ষতি নেই। তাদের স্থলে উপযুক্ত বিধবার "মা" হওয়া উচিত। ও অসার কথা আর তুলবেন না, শুনলেও হাড় জ্বলে যায়। বিলেতের মত কুমারীবৃদ্ধি হয়েও যদি আমরা তাদের অর্দ্ধাংশও উপযুক্ততা লাভ করতে পারি সেও আমাদের মঙ্গল।

চন্দ্র। যাক্ ও সব বাজে কথা। শাস্ত্রের কথা ভেবে দেখ দেখি; যে কন্যাকে একবার দান করলুম, আবার তাকে দান করা কোন্ শাস্ত্রের অনুমোদিত?

হরি। সে কথা যদি বলেন তবে পুরুষদেরও বাদ দেবেন না। সে হিসেবে তর্করত্ন ঠাকুরদাদা চারটি বিবাহ করেছেন;—এখনো কি করেন বলা যায় না।

(তর্করত্ন ঠাকুরদাদা তাকিয়া ঠেস্ দিয়া নাসিকা গর্জ্জন সুরু করিয়াছিলেন, আমি তাঁর আজ্ঞা-মত পায়ে হাত বুলাইতেছিলাম। নিজের নাম উচ্চারিত হওয়ায় চোখ রগড়ে, বড় বড় হাই তুলিয়া নাক ডাকা

বন্ধ হইল। একদম্ উঠিয়া বসিয়া, বিস্ফারিত-নয়নে এদিক-ওদিক চাহিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—"পাতা হ'য়েছে নাকি?" চারিদিকে হাসির রোল পড়িয়া গেল। সকলেই বুঝিলেন তর্করত্ন মহাশয় ফলাহারের স্বপ্ন দেখিতেছেন। একটা চেংড়া বামুনদের ছেলে একধার হইতে বলিয়া উঠিল—"ঝাঁটা বা'র হ'য়েছে—পাতা এখনি আসবে।" এতক্ষণে তর্করত্ন মহাশয়ের কল্পনা সত্যজগতে ফিরিয়া আসিয়াছিল। তিনি সেই ছোঁড়াকে "দূর পাঁঠা" বলিয়া গালি দিয়া আবার তাকিয়া পরিগ্রহণ করিলেন। আমায় বলিলেন "একটু বাতাস কর।")

হরিদাস বাবু হাস্যসম্বরণ করিয়া আবার আরম্ভ করিলেন—"দান করে ফিরিয়ে নেওয়া মহাপাপ সত্য। কিন্তু একটি কথা আছে,—একটি পবিত্র মনুষ্য-জীব—বিশেষতঃ পবিত্রতর নারীরত্ন—সামান্য টাকা-কড়ি বাসন-কোসন, অথবা পাঁচ বিঘা জমির সহিত যে তুলনা করে, সে নর-প্রেত; তার সহিত আমার সম্বন্ধ নেই—আমি ব্রাহ্মণ। মানুষের অধিকারীত্ব এবং ইতর জীব বা জড়ের অধিকারীত্ব সমান কি? আপনি কি আপনার কন্যা, পুত্র বা স্ত্রীকে খুন করতে পারেন?—করলে, রাজদ্বারে এবং ধর্ম্মের কাছে কি আপনি অপরাধী হন না? স্থাবর অস্থাবর কিছু আমাকে দান করলেন, আমি তা নিয়ে যা ইচ্ছে করতে পারি;—জলে ফেলে দিতে পারি, বিক্রয় করতে পারি, দান করতে পারি, কিনা করতে পারি? কিন্তু আমার পূজনীয় শ্বশুর আমাকে যে কন্যাটি দান করেছেন, তাঁকে আমি কি করতে পারি? আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং সতত তাঁর সন্তোষবিধান, কল্যাণবিধান, এবং ধর্ম্মের সহায়তা ব্যতীত যদি আমি এক বিন্দুও তাঁর প্রতি অসদাচরণ করি, তবে আমি নরাধম, মহাপাপী। অতএব স্ত্রীলোক দান করার বেলায় "দান" কথাটা একটু বিশেষ করে সম্ঝে করে ব্যবহার করবেন। কিন্তু মনে করুন আমার সহিত স্ত্রীর বিবাহের পরেই আমার মৃত্যু হল;—আমার সহিত তাঁর প্রণয় দৃঢ় হবার বা আদৌ হবার এবং সন্তান হবার পূর্ব্বেই আমি ইহধাম পরিত্যাগ করলুম। এখন যদি আমার দান-লব্ধ-প্রাপ্ত অন্য পদার্থ কিছু থাকত, তবে আমার উত্তরাধিকারী তা ভোগ করত, কেউ না থাকলে সে জিনিস সরকারে নিলাম হত। কিন্তু মশায়, এই স্ত্রীটি কোন্ উত্তরাধিকারী "ভোগ" করবে? অথবা কোন্ বাজারে নিলাম হবে? যদি আমার সহিত প্রণয়ের খাতিরে অথবা ধর্ম্ম-জ্ঞানের বলে তিনি স্বতঃপ্রবৃত্তা হয়ে ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে পিতৃকুল অথবা শ্বশুরকুলে বাস করে' লোকসেবায় এবং ধর্ম্মচর্য্যায় জীবনাতিবাহিত করেন, তবে তো তিনি দেবী। কিন্তু এতে প্রথমত শিক্ষাবলে তাঁর ধর্ম্মে মতি থাকা চাই, এবং দ্বিতীয়ত উত্তম আশ্রয় চাই,—কারণ আপনারাই বলেন, "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।"

এ সকলের অভাবে যদি তাঁর পিতা অথবা তদভাবে পিতৃস্থানীয় অন্য কেহ তাঁকে পাত্রান্তরে সম্প্রদান করেন, তবে তো বর্ত্তমান সমাজের অবস্থায় তা মঙ্গলজনক। নইলে ভয়ঙ্কর কুফল ফলবে। আর দান ফিরিয়েই বা নেওয়া হল কই? আপনাকে আমি দশটি টাকা দান করলুম, আপনি যদি পথের ধারে তা ফেলে রেখে সরে যান, তবে আমি যদি তা কুড়িয়ে নিয়ে পাত্রান্তরে দান করি,—তবে তাতে ফিরিয়ে নেওয়া হল কই? কিন্তু এ তো টাকাও নয় যে আপনি কাউকে দিয়ে যাবেন। এতে আপনি ভিন্ন আর কেউ অধিকারী হতেই পারেন না। আপনি বেঁচে থাকলে যদি কেড়ে নিতুম, তবে সে পৃথক কথা। কিম্বা সন্তানহীনা বালবিধবা যদি স্বেচ্ছায় ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করেন, সে তো উত্তম। জোর করে কেন? দড়ি বেশি টানলেই ছিঁড়বে, লেবু বেশি টিপলেই তেতো হবে।

চন্দ্র। তবে পুনর্বিবাহ-কালে কোন্ গোত্রের উল্লেখ করবে? সে যে প্রথম বিবাহের সময় প্রথম স্বামীর গোত্রে গিয়েছে।

হরি। এ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মশায় যা বলে গিয়েছেন, তাই যথেষ্ট বলে মেনে নেওয়া উচিত ছিল। তথাপি তর্কবাগীশ প্রভৃতি কতকগুলি তথাকথিত পণ্ডিত, কত সব বয়েৎ আওড়িয়ে, বলেন যে, "গোত্র মানে বংশের পরিচয় বটে, কিন্তু necessarily বংশের কোনো আদি পুরুষের নাম নহে—যেমন কায়স্থদের গোত্র তাদের আদি পুরুষের পুরোহিতের নাম হতে হয়েছে। মেয়ের বিয়ের পর থেকে তার স্বামী-গোত্রেরই উল্লেখ হবে, কেননা এখন সে স্বামী-গোত্রে অবস্থিতা—"কুলং জনপদে গোত্রে"—ইত্যমরঃ। যদিও তার জন্ম ভিন্ন গোত্রে। অতএব গোত্র মানে যে-কুলে স্থিতা বা অধিষ্ঠিতা। যে-কুলে জন্ম তা necessarily গোত্র নহে। যেমন দত্তক পুত্র জন্মদাতার গোত্রের উল্লেখ করবে না, পালনকর্ত্তারই গোত্রের উল্লেখ করবে—কেননা সে ঐ কুলে অবস্থিত। আরো অনেক নজির (হিন্দু শাস্ত্রে কোনো কাজের জন্যই নজিরের তো অভাব হয় না) দেখিয়ে তাঁরা মোটের উপর এই কথাই বলতে চান। কিন্তু আমি বলি এই যে, বিবাহিতা কন্যার সঙ্গে দত্তকপুত্রের তুলনাটা নাই বা করলুম? পোষাপুত্রের বাপের নাম জিজ্ঞাসা করলে, সে কার নাম বলবে? কিন্তু বিবাহিতা কন্যাও কি বিবাহের পর বাপের নাম ভাঁড়াবে? যে আপন পুত্রকে দত্তকপুত্র-রূপে দান অথবা বিক্রয় করল, সে যে আপনার পিতৃত্ব ত্যাগ করল, এবং সেই পুত্র গ্রহীতার পুত্র হল—"পুত্রের মত" হল না। সে ছেলে এখন হতে বাপের নাম ভাঁড়াবে। কিন্তু কন্যার পিতা কখনই কন্যাদান-কালে পিতৃত্ব পরিত্যাগ করেন না, এবং কন্যাও শ্বশুরের পুত্রবধূ অর্থাৎ "কন্যার

মত” হয়, “কন্যা” হয় না; বাপের নামও ভাঁড়ায় না, বাপের সঙ্গে সম্বন্ধ, স্নেহ মমতা, কিছুই ত্যাগ করে না। কিন্তু জন্মদাতার সহিত দত্তকপুত্রের কোনো সম্বন্ধই থাকল না। পিতা মরলে কন্যা শৌচগ্রহণ করবে এবং চতুর্থ দিবসে শ্রাদ্ধ করবে, কন্যার পুত্র কন্যার পিতার শ্রাদ্ধাধিকারী এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকারী—অবশ্য তাঁর পুত্র অভাবে। কিন্তু দত্তকপুত্রের সঙ্গে জন্মদাতার এসকল সম্বন্ধ কোথায়? আর একটি কথা;—স্বগোত্রে বিবাহ বিজ্ঞানও নিষেধ করবে। হিন্দুরা জ্ঞানবলে তা জেনেই ইহা নিষেধ করে গিয়েছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রী প্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

কার্য্যস্রোত।

কার্য্য-কারণের স্রোত বহিয়াছে নিশিদিন;
দাঁড়ায়ে স্রোতের মুখে বৃথা কি ভাবিছ ভুল?
সুধু দুদিনের খেলা—দুদিনের পরিচয়,
দুদিনে ফুরায়ে যাবে দুদিনের অভিনয়!
বাতুল, ভেবনা তাহা জটিল এ বিশ্বজালে,
কখন পড়িবে ধরা কে জানে কিসের ছলে!
একি সুধু আসা-যাওয়া? মাননাকো কর্ম্মফল
জড়ত্বে জড়ত্বলাভ মনুষ্যত্বে আনে বল!
বিশ্বাসী, বিশ্বাস রাখ হো'কনা যতই ছোট,
কিছুই হবেনা ধ্বংস—তবে একসাথে জোট;
লয়ে অণু পরমাণু, লয়ে ক্ষুদ্র বালু-কণা,
মহান্ পর্ব্বত হয় ধরা-'পরে জান কিনা?
সবই যদি অনশ্বর সবই যদি মহীয়ান,
তবে কেন তুমি সুধু জড়ে হবে অবসান?
সুধু কার্য্য করি চল চেয়োনাকো কর্ম্মফল;
কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া হারায়ে ফেলনা বল।
বিপদে সম্পদে মূঢ় কেন হও আত্মহারা?
পিছনে দেখো না ফিরে আগু হয়ে চল ত্বরা।
আঁধার ঘনায়ে আসে এখনি আসিবে নিশি;
অসমাপ্ত কার্য্য রেখে যেয়োনাকো হে বিশ্বাসী।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।

আদেশ পালন।

(গল্প)

প্রতিবেশীরা সকলেই স্বীকার করিত যে ভাইলালজী রূপে-গুণে এবং বুদ্ধিমত্তায় গ্রামস্থ যুবকবৃন্দের অগ্রগণ্য ব্যক্তি। প্রশংসার ব্যাপকতা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিল এবং অল্পদিনের মধ্যেই গ্রামের মাতব্বর, সম্পদশালী বৃদ্ধ পঞ্চায়তের

সুনজরে পড়ায়, চারিদিক হইতে ভাইলালের সম্ভ্রম ও সম্মান অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। পঞ্চায়েতের পরামর্শে মন্ত্রী এবং কার্যে দক্ষিণ হস্ত বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়া ভাইলাল দশজনের একজন হইয়া দাঁড়াইল।

মানবের ভাগ্য-গগনে সৌভাগ্যের সূর্য্য যখন পূর্ণতেজে জ্বলিয়া উঠে, তখন মানুষের বড় ভয়ঙ্কর সময়, কারণ তাহার তেজে কেহ বা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্মান হইয়া উঠে, কেহ বা ঝলসাইয়া পুড়িয়া মরে; কিন্তু দুই অবস্থার যেটাই আসুক, কোনোটাই নিস্তরঙ্গ চাঞ্চল্যহীন নয়, দুই-ই প্রখর উদ্দামতা-পূর্ণ! অনভিজ্ঞতার অপযশে চিরদাহ যতই তীব্র হউক, মানুষ তাহা সামলাইতে পারে; কিন্তু অভিজ্ঞতার সুযশে অনেক সময় শান্ত-প্রকৃতি লোকেরও মস্তিষ্ক সাংঘাতিক রকম বিচলিত হয়, এবং তাহার পরিণামও বিশেষ সুবিধাজনক বলিয়া বিবেচিত হয় না।

গ্রামের মধ্যবিত্ত গৃহস্থ প্রভু রাওয়ের কন্যার সহিত ভাইলালের বিবাহের সমস্তই পাকাপাকি ঠিকঠাক, এমন কি বিবাহের দিন পর্য্যন্ত স্থির হইয়া গিয়াছিল, এমন সময় সকলে একদিন হঠাৎ শুনিল যে, বিবাহ হইবে না!

"কেন?"—এই 'কেন' প্রশ্নটার সদুত্তর অনেক সময় ঠিকরূপে ব্যক্ত হয় না;—বিরক্ত মূর্ত্তিতে রূপান্তরিত হইতেও দেখা যায়। পাড়ার লোকেরা অনেক মাথা ঘামাইয়া বিস্তর দুশ্চিন্তার পর স্থির করিল "বরের কন্যা পছন্দ নহে", এবং মেয়ে-মহলে কানাঘুষার মধ্য দিয়া একটা গোপন রহস্য প্রচার হইয়া গেল যে ………।

কেবল পাড়ার বৃদ্ধ বহেলোজী বিশ্বস্ত-সূত্রে অবগত হইলেন যে কোনো কারণ না থাকা সত্ত্বেও ভাইলাল বিবাহ করিতে নারাজ। শুধু প্রভু রাওয়ের কন্যা বলিয়া নহে, সে কাহাকেও বিবাহ করিবে না। এবং ইহার প্রতিবাদে সে আত্মীয় বন্ধু সকলেরই যুক্তি তর্কের উত্তরে শুধু নিঃশব্দে মাথা নাড়িয়াছে, বিবাহ সে করিবে না, কিছুতেই না———!

আশাভঙ্গে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত প্রভু রাও বয়স্থা কন্যাটির সদ্গতির জন্য, আবার নূতন করিয়া পাত্রের সন্ধানে মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু পাত্র মেলা যে দুর্ঘট।

বিশেষতঃ কনকাঙ্গ মেয়েটি নিতান্ত ছোট নহে; বাল্য-বিবাহ-প্রচলিত মহারাষ্ট্র সমাজের নিয়মানুসারে ধরিতে গেলে তাহার বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ভাইলালের ভরসায় তাহার পিতা মাতা এ পর্য্যন্ত পরম নিশ্চিন্ত ছিলেন, এমন সময় ভাইলাল হঠাৎ বাঁকিয়া বসায়, একটা মস্ত গোলযোগ বাধিয়া গেল। সকলের কাছেই ব্যাপারটা কুহেলিকাচ্ছন্ন নিগূঢ় রহস্য বলিয়া প্রতীয়মান হইল। এ বড় আশ্চর্য্য!

শৈশব হইতে একই জল-বায়ুর ভিতর দিয়া উভয়ের জীবন গঠিত বলিয়া,—প্রভু রাওয়ের হিতৈষীবর্গ ভাইলালকে খুব

বেশী রকম চাপাচাপি করিতেও ছাড়িলেন না কিন্তু ফল কিছুমাত্র সন্তোষজনক হইল না লোকটা সমস্ত অনুরোধ উপরোধ অগ্রাহ্য করিয়া সমান ভাবে রহিল হিতৈষীরা হাল ছাড়িলেন, বিজ্ঞের দল মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—"কিছু বোঝা যাচ্ছে না। ———"

দেখিতে দেখিতে কয়েক মাস কাটিয়া গেল।

২

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে।

ভুঁইয়াদের পাথরের বাঁধা ঘাটে পৈঠার উপর কতকগুলা ভিজা কাপড় স্তূপীকৃত করিয়া রাখিয়া, জলের ভিতর গলা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া কনক অন্যমনস্কভাবে হাত পা রগড়াইতেছে সন্ধ্যা সমাগমের বহু পূর্ব্বেই ঘাটের যাত্রীরা আপন আপন কর্ম্ম সারিয়া চলিয়া গেল। নির্জ্জন ঘাটে একা রহিল কনক।

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, কনকের তবুও উঠিবার তাড়া নাই সারাদিনের গ্রীষ্ম গুমোটের পর এখন সদয় হইয়া সান্ধ্য সমীরণ মৃদু হিল্লোলে মধুরভাবে নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে। সেই সুখময় স্নিগ্ধ স্পর্শে বালিকার প্রাণের অতীতের কত ঘুমন্ত স্মৃতিকে জাগাইয়া, কত পুরাতন—দূরস্থকে নূতন—নিকটস্থ করিয়া আনিতেছে, কতদিনের কত অস্পষ্ট চিত্র উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত করিয়া মনের চোখের সামনে আনিয়া ধরিতেছে, তাহার ঠিকানা নাই! মৃদুমন্দ ফুরফুরে হাওয়া সারা প্রাণটাকে কেমন এক অজ্ঞাত মত্ততায় বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছে। কনক অন্যমনস্ক — বড় অন্যমনস্ক!

আহা কতদিনের কত হর্ষ-পুলক-ভরা মধুময় স্মৃতি গৌরব-জড়িত, ভুঁইয়াদের এই বাগান এই পাথর বাঁধা ঘাট, কত নিস্তব্ধ নির্জ্জন দ্বিপ্রহরে এই তরুচ্ছায়াচ্ছন্ন ঘাটে বসিয়া ভাইলাল তাহার সাধের বাঁশীটিতে মধুর তান ধরিয়া, সুর-লহরীর কম্পন কীর্ত্তনে, পাড়ার ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের কত বিমোহিত করিয়া তুলিয়াছে; দিগন্ত-বিস্তৃত ঐ প্রান্তরে, কৌমুদী-কিরণ-প্লাবিত কত মধুর যামিনীতে সুকণ্ঠ ভাইলাল চিত্তদ্রবকারী সঙ্গীতে, নিপুণ সুর ঝঙ্কার তুলিয়া শৈশব সঙ্গীদের তরুণ মস্তিষ্কে কতদিন কত নব নব আবেশের সঞ্চার করিয়াছে! কত অন্ধকার রাতে 'পুন্নাগ' তৈলের দীপোজ্জ্বল কক্ষে, গায়ে গায়ে ঘেঁসাঘেঁসি ভাবে উপবিষ্ট গল্পশ্রবণোৎসুক পাড়ার ছেলের দলকে, ভাইলাল কত ঝড় বৃষ্টি বজ্রঝঞ্ঝনা মুখরিত কত বিদ্যুৎ-চমকিত ঘটনা বৈচিত্র্য রঞ্জিত কাহিনীর,—কত দৈত্য দানা ভূত-প্রেত-সমাচ্ছন্ন আখ্যায়িকার অদ্ভুত আজগুবী বর্ণনা-চাতুর্য্যে ভয় বিস্ময় ও আনন্দ উত্তেজনায় মাতাইয়া তুলিয়াছে; আজ এখন আর কে তাহার সন্ধান দিতে পারে? সেই একদিন গিয়াছে,—আর এই একদিন চলিতেছে।

মানুষের নির্দ্দয়তার বহরের সহিত

আকাশের অসীমতার পরিমাণ করিবার জন্যই বোধ হয় কনক আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিতেছিল। অতীতকে আজ যেন অদৃষ্টের একটা বজ্ররূঢ় পরিহাস বলিয়া মনে হইল। কনকের সারা বুকটা আলোড়িত করিয়া একটা মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস, অন্তরের গোপন গুহা হইতে আর্ত্তনাদ করিয়া বাহির হইয়া অলক্ষ্যে বায়ু-স্তরে মিলাইয়া গেল।

সন্ধ্যার আঁধার যখন খুব ঘনাইয়া আসিল, তখন কনকের চমক ভাঙ্গিল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া, ললিত লাবণ্য-সুন্দর যৌবন-বিজলী-মণ্ডিত মনোহর, ক্ষীণ তনুলতায় সিক্ত বস্ত্র নিংড়াইয়া জড়াইল। পৈঁঠার উপরকার কাপড়গুলায় অঞ্জলি অঞ্জলি জল সিঞ্চন করিয়া, সেগুলা আবার জলে ডুবাইয়া নিংড়াইয়া কাঁধে ফেলিল; তার পর কঠিন পাষাণের উপর, জলসিক্ত চরণের কোমল কমনীয় রেখা অঙ্কিত করিয়া, সোপান বাহিয়া উপরে উঠিল।

ঘাটের উপর লতামণ্ডপ। লতামণ্ডপের বাহিরে, রাস্তার একধারে একটা গাছের গুঁড়িতে ডান পা তুলিয়া, এক ব্যক্তি বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া শিস্ দিতেছিল, বোধ হয় তাহার ঘাটে নামিবার প্রয়োজন আছে, স্ত্রীলোক ছিল বলিয়া এতক্ষণ নামিতে পারে নাই, এখানে অপেক্ষা করিতেছে।

ঝুমঝুমার চরণক্ষেপে আহত, সিক্ত বস্ত্রের শব্দ-সংঘাতে আকর্ষিতচিত্ত লোকটি ফিরিয়া তাকাইল। চকিতে দৃষ্টি-বিনিময়ে, বিদ্যুৎপৃষ্টের ন্যায় চমকিয়া কনক দাঁড়াইল। উভয়েই স্তব্ধ বিস্মিত!

লোকটি ভাইলাল।

চকিতে কাঁধের উপর হইতে ভিজা কাপড়গুলা টানিয়া থর-কম্পিত বুকের কাছে প্রাণপণে গুটাইয়া ধরিয়া, লতা-মণ্ডপের পাশে ভর দিয়া—একটু হেলিয়া কনক দাঁড়াইল! কি সুন্দর মৃদু বঙ্কিম ভঙ্গী! সৌন্দর্য্যমুগ্ধ লালসালুব্ধ ভাইলাল বিস্ফারিত-নয়নে সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকের নীচে, চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল! উদ্দাম আকাঙ্ক্ষার প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা বায়ু নিমেষে তাহার চিত্ত-সাগরে তাণ্ডব নৃত্য জুড়িয়া দিল!

"ভাইলাল, তুমি! ক্ষমা কর, তোমায় একটি কথা বলবার ইচ্ছা আছে, দেখা পাইনি এদ্দিন, তাই বলতে পারি নি,—আজ এখন—" একটু ইতস্তত করিয়া ধীরভাবে কনক বলিল, "বলব কি ভাইলাল আজ?"

একটা অবাক্ত বেদনা ভাইলালের হৃদয়টা মর্ম্মন্তুদ নিষ্পেষণে নিঃশব্দে গুঁড়াইয়া ফেলিল! বাক্যবিহ্বল ভাইলাল একটি কথাও বলিতে পারিল না! স্তব্ধ ভাবে রহিল! তাহাকে নীরব দেখিয়া ঈষৎ আহত ভাবে কনক বলিয়া উঠিল, "তুমি অন্য কিছু ভেবো না, আমি অন্য সম্বন্ধে তোমায় কিছু অনুরোধ করতে আসিনি, আমি তোমার জন্যেই তোমায় কিছু বলতে চাই—"

কুণ্ঠিত মৃদু ভাইলাল ক্লিষ্টস্বরে বলিল, "কি?"—বেশী বলিতে পারিল না।

নম্রকোমলকণ্ঠে কনক ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল—"জানি, এ কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করার চেয়ে না করাই ভাল, তবু জিজ্ঞাসা কর্‌চি ভাইলাল, মার্জ্জনা কর, সত্যি করে বল ভাইলাল—" কনকের কণ্ঠ শুকাইয়া আসিয়াছিল, সে থামিল! আরক্তমুখে একবার রক্তকিরণাভা-মণ্ডিত অস্তগামী সূর্য্যের লুপ্তপ্রায় শেষ রশ্মিটুকুর পানে চাহিল! তখনো দিক্‌চক্রবালের ক্ষীণ উজ্জ্বলতাটুকু সন্ধ্যা রাক্ষসীর গাঢ় মলিনতার মাঝে ঢাকিয়া ফেলিতে, একটু—অতি সামান্য একটু দেরি আছে। কনক কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া নতদৃষ্টিতে বলিল,—"সত্যি করে বল ভাইলাল, তোমার চরিত্র—"

আতঙ্কশঙ্কিত ভাইলাল জোর করিয়া বিদ্রূপের হাসি টানিয়া, অর্দ্ধসমাপ্ত কথাটা অসম্পূর্ণ রাখিবার জন্য তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল,—"পাগল কনু পাগল!—তুমি কার কাছে ওসব গুলিখোরী গল্প শুনেছ?"

তীব্র-তেজ-বর্ষী স্থির দৃষ্টি ভাইলালের চোখের উপর ন্যস্ত করিয়া, ধীরস্বরে কনক বলিল,—"কারু কথা বিশ্বাস করি নে ভাইলাল, শুনি মাত্র, সংসারে তোমার ওপর,—শুধু তোমার ওপর আমার অটল বিশ্বাস। তাই তোমায় জিজ্ঞাসা কচ্ছি, তুমিই বল—সত্যি বল ভাইলাল যা শুনি তা সবই কি মিথ্যে?"

সে জ্বালাময় দৃষ্টির সাম্‌নে ভাইলাল যেন ঝলসাইয়া পুড়িয়া মরিল, তাহার শ্বাস-রোধের উপক্রম হইল, বিবর্ণমুখে হৃতবাক্ হতবুদ্ধির মত সে নতশিরে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার চক্ষু তুলিবার সাহস হইল না!

তাহাকে নীরব দেখিয়া গভীর ক্ষুব্ধস্বরে কনক বলিয়া উঠিল,—"আমি তোমার কেউ নই ভাইলাল, তোমায় কোনো কথা বলবার অধিকার আমি জগতের কাছে পাই নি, কিন্তু তবু ভাইলাল, আমি, তোমার চিরমঙ্গলপ্রার্থিনী শৈশব-সঙ্গিনী, তাই আজ তোমারই অন্যায়ের জন্য তোমায় সতর্ক কর্‌তে এসেছি; এতে হয় তো আমি নিজের সীমা লঙ্ঘন করে চলেছি, কিন্তু সেও তোমার কাছে,—তুমি আমার সে ত্রুটী ক্ষমা কোরো ভাইলাল, ভাল হোক মন্দ হোক, আমি সত্যটা জান্‌তে চাই।"

কনক একটু থামিয়া আবার বলিতে লাগিল,—"উপেক্ষার নির্ম্মম কশাঘাত অগ্রাহ্য করে, অপমানের পশরা মাথায় বয়ে নির্লজ্জা আমি, তোমার কাছে আজ অনেক দিনের পর সেই পুরোণো কনক হয়ে এসে দাঁড়িয়েছি; বড় মর্ম্মাহত হয়েই এসেছি, এ যদি তোমার মঙ্গল উন্নতির সংবাদ হোত, তা হলে সন্তুষ্টচিত্তে, চিরদিনের জন্য তোমার দৃষ্টির সীমানার বাইরে-ই থাক্‌তুম, আর জীবনে ফিরেও তাকাতুম না!—"

বজ্রাহত অভিমানভরা মর্ম্মস্পর্শী

মনোরম স্বর! মুহ্যমান ভাইলালের আপাদমস্তকে প্রখর অগ্নিশিখা প্রবাহিত হইতে লাগিল! দুই মুহূর্ত্ত উত্তর-প্রত্যাশায় নীরব থাকিয়া সহসা মর্ম্মভেদী নৈরাশ্যে, যন্ত্রণা-উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে কনক বলিয়া উঠিল, "জানি ভাইলাল, তোমার এ প্রশ্ন করবার অনেক আগেই জানি, তুমি এ কথার জবাব দিতে পারবে না!—"

মুহূর্ত্তে দুটি হৃদয়ের শান্ত ধমনীতে, বহ্নিময় মহাবজ্র বিস্ফুরিত হইয়া প্রলয়ের করাল দুন্দুভি বাজাইয়া তুলিল! বহির্জগত আতঙ্কে আড়ষ্ট!

কিয়ৎক্ষণ পরে একটু সামলাইয়া উপস্থিত তেজকে সবলে সংহত করিয়া, ধীরে ধীরে—অতি ধীরে কনক আবার বলিল,—"তুমি অন্ধ, তাই বুঝছ না ভাইলাল, কিন্তু এর পরিণাম বড় ভয়ানক হবে, এখনো ফেরো ভাইলাল, এখনো ফেরো, আমার কথা রাখতে চেষ্টা কোরো, লক্ষ্মীছাড়া নেশায় আত্মহারা হয়ে, নিজের সর্ব্বনাশ সেই নির্ব্বোধ বিধবার সর্ব্বনাশ কোরো না,—"

"কে সে?" কলঙ্কপঙ্কিল, জীবনের দীপ্তশক্তির গ্লানি, বুঝি মৃত্যুভীতির অপেক্ষাও বেশী যন্ত্রণাদায়ক, বেশী বিভীষিকাময়! তাই মৃত্যুর মুখেও মরিয়া হইয়া ভাইলাল মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল, অস্থির শঙ্কিতে বলিল, "কার কথা বলছ, কে সে?"

ঘৃণার স্বরে কনক বলিল — "কে সে! প্রবঞ্চক তুমি, জান না কে সে? তোমাদের পঞ্চায়েতের বিধবা যুবতী কন্যা।"

ত্রাসব্যাকুল ভাইলাল বলিয়া উঠিল,— "মিথ্যা মিথ্যা মিথ্যা, এ সব যে বলেছে সে মিথ্যাবাদী!"

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কনক ভাইলালের মুখের দিকে দুই মুহূর্ত্ত তাকাইয়া রহিল; তার পর তীব্রকঠিন স্বরে বলিল, "অন্যে যদি এ-রকম মিথ্যে বলতো, তবে তার মুখের ওপর থাবড়া দিয়ে চলে আসতুম, তুমিও আমায় প্রবঞ্চনা করলে ভাইলাল, ছিঃ! তোমার মুখ চোখ সবাই তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিচ্ছে, তবু তুমি আমায় পরিষ্কার বোঝাতে চাও ভাইলাল, বেশ!"

বেগে মুখ ফিরাইয়া কনক দ্রুতপদে ফিরিয়া চলিল। তাহার মুখ হইতে শেষ কথা ভাইলাল শুনিল—"তবু পার তো এখনো ফেরবার চেষ্টা কোরো।"

৩

আবার আগেকার মতই সন্ধ্যা সকাল যথাক্রমে অতিবাহিত হইতে লাগিল।

ক্রমশ দেখা গেল যে, পঞ্চায়েত-পরিবারের একটা কলঙ্ক-কালিমা জড়িত অস্ফুট গুঞ্জন, গ্রামের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত মৃদুস্বরে ধ্বনিত হইতেছে। বর্ষীয়সীদিগের পর-চর্চ্চায়, মধ্য-বয়স্কাদিগের হাস্য-পরিহাসে চরিত্রহীন নিকর্ম্মা নরনারীগণের অশ্লীল কুৎসা-কৌতুকে, ইতর সাধারণের অনাবশ্যক বাক্‌-প্রাবল্যে, কথাটা 'কানা ঘুসার' মধ্য দিয়াই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

সম্ভ্রান্ত ঘরের গুপ্ত তত্ত্ব ব্যক্ত করিবার এবং তাহা লইয়া গ্লানি আন্দোলন করিবার লোকের অভাব নাই। তাহার উপর সংসারে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, অন্তরে-বাহিরে সহস্র সৌহৃদ্য থাকিলেও অসচ্চরিত্র ব্যক্তিগণ কার্য্যক্ষেত্রে ঈর্ষাবশে প্রায়ই পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিতে আরম্ভ করিয়া আততায়ী পর্য্যন্ত হইয়া দাঁড়ায়। এ জগতে বিধাতার অমোঘ বিধান চিরদিনই অলঙ্ঘ্য। অন্যায়ের উপর যাহার প্রতিষ্ঠা, ন্যায়ের নিঃশ্বাসে তাহার পতন অনিবার্য্য। অধর্ম্মের মেঘের অন্তরালে যাহার জীবন, ধর্ম্মের বিদ্যুৎবিকাশে তাহার মরণ অবশ্যম্ভাবী।

উপস্থিত ক্ষেত্রেও তাই ঘটিল বিপুল বৈভবশালী, গ্রামের মস্তক-স্বরূপ, পঞ্চায়েতের স্ব-ইচ্ছা-সম্পন্না, স্বাধীনা বিলাসিনী কন্যার উপাসক জুটিয়াছিল ঢের, কাজেই বিপদের গুরুত্বও বেশী।

বৃদ্ধ পঞ্চায়েত নিরীহ নির্ব্বোধ গোবেচারা ধরণের মানুষ, অধীনস্ত কাহাকেও হাতে পাইলে চোখ রাঙ্গাইয়া, হাক ডাক করিবার যতই ক্ষমতা তাঁহার থাকুক না কেন, সংসারের কুটীল মার-প্যাঁচের মধ্যে মাথা গলাইবার সাধ্য তাঁহার ছিল না। সারা গ্রামটার শৃঙ্খলাসাধনের জন্য তাঁহার সমস্ত বুদ্ধিশক্তি নিঃশেষিত হইয়াছিল বলিয়া, পৃথিবীর অন্য কোনো কিছু খবর তাঁহার কাছে পৌঁছিবার অবকাশ পাইত না। দৈবাৎ বাতাসের স্রোতে ভাসিয়া আসিয়া কোনো কথা কানে ঢুকিলেও প্রাণে ঠাঁই পাইত না। আর মুখোমুখি স্পষ্টাক্ষরে তাঁহাকে কিছু বলিতে পারে, এমন শির-শির-বিশিষ্ট দুঃসাহসী জীব সে গ্রামে তখনো জন্ম-গ্রহণ করে নাই।

অসৎ-পথের আকর্ষণও যেমন তীব্র, বিরক্তি ও অবসাদও ততোধিক তীব্র! অল্পদিনের মধ্যেই সমস্ত জগত। ভাইলালের কাছে তীক্ষ্ণ কটু বিষাদের আবহাওয়ায় ভরিয়া গেল। কুহকের মোহ পাশ হইতে আপনাকে ছিনাইয়া লইবার জন্য, ক্রমে তাহার মনে দারুণ অধীরতা বাড়িতে লাগিল,—কিন্তু ভবিষ্যৎ! সে উভয় সঙ্কটে পড়িয়াছে, এখন যদি ফিরিতে চায়, তাহাহইলে মহা বিপত্তি; ভবিষ্যৎ উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে, অন্যায়ের সংস্রব এড়াইয়া এখন সন্তর্পণে চলিতে হইলে, অনেকেই ঘোরতর অসন্তুষ্ট হইবেন, তাই কি পঞ্চায়েতের কোপে পড়িতেও পারে—তখন সে কিসের বলে আত্ম-রক্ষা করিবে? সে যে নিজের শক্তি পরের হাতে তুলিয়া দিয়াছে, এখন উপায়?

দুশ্চিন্তাবাঞ্ছিত ভাইলাল শুষ্কমুখে দিন কাটাইতে লাগিল। ও'দিকে সে'দিনের সেই ঘটনায়, কনকের কনকোজ্জ্বল মধুর সৌন্দর্য্য নবীন আবেশে নূতন অপরূপতায়, তাহাকে পলে-পলে তিলে-তিলে আবিষ্ট করিয়া নতুন আকর্ষণে টানিতে লাগিল! হায় সে কি করিবে!

দুর্ভাগ্যলাঞ্ছিত যুবক জানুর ভিতর মাথা রাখিয়া বিমূঢ়ের ন্যায় কেবল ভাবিতে লাগিল, অকূল অসীম চিন্তার মাঝে—কনকের সেই বাণী থাকিয়া থাকিয়া অন্তর্জগত চমকিত করিয়া বজ্র-রূঢ়স্বরে ধ্বনিত হইতে লাগিল—"ফেরো ফেরো, এখনো ফেরো।"

৪

দেখিতে দেখিতে দুই মাস কাটিয়া গেল। প্রভুরাও কোনোই কূল-কিনারা করিতে পারিল না। কনক আজিও অনূঢ়া।

রাসপূর্ণিমার দিন বৈকালে পাড়ার সব ছেলে-মেয়েদের জড়ো করিয়া, বিঠোবা দর্শন করিতে যাইবার সময়, বৃদ্ধা নানকীর মা কনককেও ডাকিল। কনক গৃহ-কার্য্য সব সারিয়া তখন পিতার জলখাবার সাজাইতেছিল, নানকীর মা, তাহাকে পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে আদেশ করিয়া, ছেলের পাল লইয়া, বহুবিধ শব্দ-বৈচিত্র্যে নির্জ্জন গ্রাম্য-পথ মুখরিত করিয়া দেবদর্শনে চলিল। গ্রাম হইতে সিকি ক্রোশ তফাতে বিঠোবাদেবের মন্দির।

তাড়াতাড়ি হাতের কাজ সারিয়া, মাতার অনুমতি লইয়া, কাপড় চোপড় পরিয়া কনক বাহির হইল। তাহার পূর্ব্বগামীগণ তখন অর্দ্ধ পথ অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

পথ-ঘাট সবই জানা, কনক সঙ্গীদের সহিত মিলিত হইবার জন্য ছুটিয়া চলিল। হেমন্তের নূতন হাওয়ার মাঝে, ললিত-লাবণ্য-হিল্লোলিত তরুণ তনুলতা, মৃদু-কম্পনশীল বসন্ত-সৌরভের মত বহিয়া চলিল! কঠিন নিস্তব্ধ রাজপথ, সেই শুভ্র কোমল পায়ের তলায় বুক পাতিয়া, মোহমুগ্ধের মত নীরবে পড়িয়া রহিল!

দুপাশে সারি বাঁধিয়া গাছগুলি সাজানো। স্বল্পান্ধকারে সমাচ্ছন্ন গ্রামের বাঁধা পথ ছাড়িয়া, কনক ছুটিতে ছুটিতে শেষে উন্মুক্ত আকাশের তলে, সুদূর-বিস্তৃত মাঠে অনেকখানি আলোকের নীচে—অনেকখানি ফাঁকা জায়গার আসিয়া পড়িল।

আঃ কি সুন্দর খোলা জায়গা! এখানকার হাওয়ায় একটা নিশ্বাস টানিয়া লইলেই সারা প্রাণ অপরিসীম তৃপ্তির উল্লাসে ভরিয়া উঠে! আঃ এখানকার চারিদিকেই যেন অনন্ত অসীম মধুর মুক্তি, সান্ত্বনা! কি চমৎকার!

ছুটিতে ছুটিতে ঝোপের পাশটা ছাড়াইয়া কনক হঠাৎ একটা লোকের সামনে আসিয়া পড়িল, লোকটা বাঁ দিকের ঝোপের আড়ালের এই রাস্তা ধরিয়াই বরাবর এইদিকে আসিতেছিল বলিয়া কনক তাহাকে দেখিতে পায় নাই।

আরে ছ্যাঃ!—একেবারে চোখোচোখী! ভাইলাল!

ঝাঁ করিয়া পথ ছাড়িয়া মাঠে পড়িয়া একেবারে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট্! আর ফিরিয়া চাহিলও না! অদূরেই সঙ্গীরা,—কনক

ছুটিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে তাহাদের কাছে গিয়া পড়িল।

দুঃসহ লজ্জা ও ক্ষোভে তাহার সর্ব্বশরীরে তখন অসহ্য জ্বালাময় অগ্নিস্রোত বহিতেছিল! ছি ছি, ভাইলালের সঙ্গে আবার চোখোচোখী হইল! সে যে ইহার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না! অতর্কিতে সংঘটিত ক্ষণিকের এই সামান্য বিড়ম্বনাটুকু কত ভয়ানক, কি সাংঘাতিক! একটা তীক্ষ্ণ ধিক্কারে ও মর্ম্মান্তিক বেদনায় কনকের সারা বুকটা যেন খোঁচাইয়া খোঁচাইয়া ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিল! কনক মুখ তুলিয়া কাহারো সহিত কথা কহিতে পারিল না; নীরবে নতশিরে চলিল।

যথাসময়ে বিঠোবার মন্দিরে আসিয়া সকলে বিগ্রহকে প্রণাম করিল। তখনো সন্ধ্যা-আরতির দেরী আছে দেখিয়া, নানকীর মা ছেলেদের লইয়া মন্দির-প্রাঙ্গণে বসিল। সেখানে একজন সাধু 'অভাঙ্গ' গাহিতেছিলেন, অনেক লোক বসিয়া শুনিতেছিল; তাহারাও শুনিতে লাগিল।

উগ্র-বৈরাগ্য-উদ্দীপ্ত, তীব্র-ভক্তি-মাদক পূর্ণ, মধুর হইতে মধুরতম ভজন, সংসার-বিতৃষ্ণ ভক্তের প্রেমবিগলিত স্বরে অন্তরের গভীর আবেগ উচ্ছ্বাস! দেবতার পদে উন্মুক্ত আত্মনিবেদন! কি সুন্দর,—

শুনিতে শুনিতে কনকের তরুণ মস্তিষ্কের মধ্যে বিরাগ-ব্যাকুলতার প্রচণ্ড বজ্র ঝঞ্চনা বজিয়া উঠিল! ধীরে ধীরে কুহেলিকা-ঘোর কাটিয়া সারা জগৎ আশার পুলকে মুগ্ধ অভিভূত করিয়া আনন্দ-চন্দ্র হাসিয়া উঠিল। সে কি গভীর বিস্ময়! কি নিবিড় সান্ত্বনা! —মানুষ মানুষকে শঠতায় সর্ব্বস্বান্ত করিবে! প্রতারণায় পরাভূত করিবে! কি ভুল, কি ভুল!—মানুষ নিজের সহিত নিজে যে শত্রুতা সাধিয়া রাখিয়াছে, তাহার উপর—পরে আসিয়া অনিষ্ট করিবার স্থান নাই, মানুষ বোঝে না, তাই হীনতার চরণে মাথা খুঁড়িয়া মরে, ধিক্!

বিক্ষোভ-উত্তপ্ত জীবনে অতি ধীরে, অতি শান্তভাবে অপার্থিব শান্তির বসন্ত আসিল! নীরস হৃদয়-ক্ষেত্রে মঙ্গলামৃত বর্ষিত হইল! আশায়, উজ্জ্বল-উৎসাহে তাহার সমস্ত চিত্ত মহাভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল!

কে বলে মানুষের জীবন ব্যর্থ!—কে বলে মানুষের আর উপায় নাই! ঐত সম্মুখে উপায়। ঐযে সকার্যসাধক সর্ব্ব-মঙ্গলময় দেবতা, অমর সার্থকতার আশীর্ব্বাদ লইয়া আবির্ভূত। তবে কাকে ভয়, কিসের সঙ্কোচ, কার মুখাপেক্ষা!—সে আত্মত্যাগের মাঝে আপনাকে জয় করিয়া লইবে, সিদ্ধির সাধনায় আপনাকে পূর্ণ করিয়া লইবে। হে ভগবান শক্তি দাও।

আগামী বারে সমাপ্য।

শ্রীশৈলবালা ঘোষ জায়া।

বিবিধ সংবাদ।

১। সম্প্রতি ইটালীদেশে শিক্ষয়িত্রী "মন্টীশ্বরী" বালক বালিকাদিগের জন্য এক নূতন শিক্ষা-পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি বলেন, শিশুদিগকে কোনো রূপ দণ্ড না দিয়া কল্পনা বা খেলনার সাহায্য ব্যতীত শিক্ষা দেওয়াই যথার্থ শিক্ষা। এই রমণী রীতিমত চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া শিক্ষাকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। মানসিক বিকৃতিতে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকায় শিক্ষা সম্বন্ধে কি কি প্রণালী অবলম্বন করিলে অপরিণত বয়স্কগণের ভবিষ্যৎ জীবন সুন্দরভাবে গঠিত হইতে পারে তদ্বিষয়ে নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিয়া শিক্ষাকার্য্যে হস্তক্ষেপ ও আশানুরূপ ফল লাভ করিতেছেন।

২। এইরূপ শুনা যাইতেছে যে, লর্ড হার্ডিঞ্জ মহোদয়ের স্থানে ভারতের ভাবী বড় লাট হইবেন লর্ড চেমসফোর্ড সাহেব।

৩। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত দাদাভাই নওরোজী মহোদয়কে ডি-এল, উপাধি প্রদান করা হইয়াছে।

৪। কাচ কিম্বা চীনা বাসন ভাঙ্গিলে অনেকে তাহা অব্যবহার্য্য মনে করিয়া ফেলিয়া দেন। ফটকিরি আগুনে গলাইয়া তদ্দ্বারা ভগ্নাংশ জুড়িয়া দিলে তাহা বেশ লাগিয়া যায়।

৫। রাণীর বাঘ শিকার—সৌড়ুর নামক ক্ষুদ্র রাজ্যের শ্রীমতী সৌভাগ্যবতী "তারারাজ" রাণীসাহেবা খোরপড়ে একটি বাঘ শিকার করিয়াছেন। কিছু দিন হইতে তাঁহার শিকারের সখ চড়ে। গত বৎসর ৯ই আগষ্ট সন্ধ্যা ৭॥ টার সময় সৌড়ুর রাজ্যের স্বামীকার্ত্তিক পাহাড়ের পশ্চাতে তিনি এই বাঘ শিকার করেন। শিকারের সময় তাঁহার কাছে আর কোনো মানুষ ছিল না; তিনি তখন শিকারের বেশেও ছিলেন না। কিন্তু বাঘকে সামনে আসিতে দেখিয়া অব্যর্থ সন্ধানে এক গুলিতেই তাহার প্রাণবধ করেন। রাণী সাহেবা অক্কলকোটের মহারাজার তৃতীয় কন্যা। তাঁহার বয়স ন্যূনাধিক বিশ বৎসর। "হিন্দি চিত্রময় জগতে" এই সংবাদ ও রাণীর ছবি বাহির হইয়াছে।

"প্রবাসী।"

বামারচনা।

স্মরণ-অর্ঘ্য।*

নমি পূজনীয়া পুণ্যোজ্জ্বলা
"বিজয় কেতন" দ্যুতি ; —
ক্ষত্র-শৌর্য্য-সম্ভূত তেজে,
শান্ত সৌম্য জ্যোতি।
শুভ সুন্দর আশা বাসনায়,
"উদয়-জননী" তুমি !
নবীন আলোকে, নব গরিমায়,
উজলি বঙ্গভূমি !
উজল শীর্ষ, "বিদ্যা আলয়"
আজি গৌরব রাগে,
মাতৃ-আশীষে, হর্ষ-আবেশে,
প্রণমি চরণ যুগে।
দীনে দৃষ্টি যার, সেই তো মহান্,
সেইত' দেবতা বিশ্বে—
নমো মহাদেবী নমস্তে জননী
বন্দি প্রণতশীর্ষে।
রাণী-মহারাণী!—তুমি মা মোদের
স্বতঃ উচ্ছ্বাসিত প্রাণে—
শ্রদ্ধারচিত, যত্নপূজিত,
হৃদয়-সিংহাসনে !
প্রাণ-কম্পনে প্রীতির প্রবাহে,
মাতৃ মূরতি রাগে—
জননী মোদের জয়দা মোদের,
প্রণমি চরণ যুগে।
রমণী-রূপেতে, রমণীয় ব্রতে,
বাড়ায়েছ দুটি হাত—
মমতা ও স্নেহে উদার প্রবাহে,
ভাঙি সংকোচ-বাঁধ।
দৃঢ় উদ্যমে পিষি অবসাদ,
মহান্ কর্ম্ম-স্রোতে—
গৃহে গৃহে গৃহে, গৃহিণী গড় মা,
শ্রেষ্ঠ শিক্ষাব্রতে।
"ভবিষ্য মাতারে"—কর মা "মানুষ"
দৃপ্ত গরিমা-রাগে—
জননী মোদের, জয়দা মোদের,
প্রণমি চরণ যুগে!
জাগাও বুদ্ধি, ঋদ্ধি সাধনে,
শিখাও স্বার্থ-জয়—
বুঝাও রমণী "বিশ্ব জননী"—
বিলাস-ভামিনী নয়।
নীচতায় তার, নাহি অধিকার,
উন্নত তার ধর্ম্ম ;
কল্যাণ-পথে, শুভ সাধনাতে
রমণী বিশ্বে রমা।
ফুটাও মাধুরী কলিকা-জীবনে
স্বর্গ-সুষমা-রাগে ;
জননী মোদের, জয়দা মোদের,
প্রণমি চরণ যুগে।
নারী নহে দীন, নারী নহে হীন,
নারী মানবের ধাত্রী,
নারীর বক্ষে ধর্ম্ম শর্ম্ম
লভে অনন্ত যাত্রী।

* বর্দ্ধমান মহারাণী রাধারাণী বালিকা-বিদ্যালয়ের বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ-উৎসবে শ্রীশ্রীভুবনেশ্বরী মহারাণী দেবীর প্রতি উৎসর্গ।

প্রাণে প্রাণে প্রাণে, প্রীতি-বন্ধনে,
নারীর সূক্ষ্ম শক্তি,
স্নেহ মমতায়, ক্ষমা করুণায়
উদ্বোধে জ্ঞান ভক্তি।
বুঝাও জননী, ডাকি বিশ্বেরে,
জলদ মন্দ্ররাগে,
জননী মোদের, জয়দা মোদের,
প্রণমি চরণ যুগে।
জাতির জননী আনন্দরূপিণী
পুণ্য-প্রেমের ছবি,
"মানুষের মাতা" হয় যেন এরা,
তোমার করুণা লভি।

ভোগেতে রমণী—কল্যাণরূপিণী,
যোগেতে সাধনা বল,
আত্মার পাশে হোক্ আত্মীয়া—
মঙ্গলে সমুজ্জ্বল!

জাগাও জননী—জীবনে "জীবনী"—
চেতনা শুদ্ধি রাগে;
জননী মোদের, জয়দা মোদের,
প্রণমি চরণ যুগে!

শ্রীশৈলবালা ঘোষ জায়া।
(বিদ্যালয়ের জনৈকা ভূতপূর্ব্বা ছাত্রী)

কে তুমি?

(কে তুমি) সুন্দর, মধুর, কোমল, নির্ম্মল,
সুপবিত্র নিষ্কলঙ্ক।
অপাপ, আনন্দ, আরাম, অতুল,
অমলিন নিরাতঙ্ক।
অদেয়, অমূল্য, উজ্জ্বল, আলোক,
সুদুর্লভ, সুবাঞ্ছিত।
সংসারের সার, মানবজীবনে,
বিধাতৃ কর-প্রেরিত।
সরল সহাস, সুরূপ সুশান্ত,
সুধাময় সুললিত।

নিখিলে মিলেনা, এ হেন রতন,
স্বর্গ-দেবতা-পূজিত।
শুভ আশীর্ব্বাদ এ দীন ভবনে,
পুলকে আলোকে মণ্ডিত।
শুধাই তোমারে "কে তুমি কে তুমি"
চিত্ত কর বিমোহিত।
অখিল বিশ্ব ডাকিছে তোমারে,
"শিশু" নামে পরিচিত।
তুমি কল্যাণ, তুমি মঙ্গল,
রহ হেথা বিরাজিত।

শ্রীমনোজবারচয়িত্রী।

---

৩৭ নং মধুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং আণ্টনিবাগান হইতে প্রকাশিত।

৫ম ভাগ

বামাবোধিনী পত্রিকা

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

মাঘ, ১৩২২। ফেব্রুয়ারী, ১৯১৬।

সূচী।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৸৹; অগ্রিম ষাণ্মাষিক মূল্য ১।৵; প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।৹ (চারি আনা মাত্র)।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 630. February 1916.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৩ বর্ষ। ৬৩০ সংখ্যা। | মাঘ, ১৩২২। ফেব্রুয়ারি, ১৯১৬। | ১০ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

গান।

১

আজ আলোকের এই ঝরণা ধারায়
ধুইয়ে দাও,
আপনাকে এই লুকিয়ে রাখা ধূলার ঢাকা
ধুইয়ে দাও।
যেজন আমার মাঝে জড়িয়ে আছে
ঘুমের জালে
আজ এই সকালে ধীরে ধীরে তার কপালে
এই অরুণ আলোর সোনার কাঠি
ছুঁইয়ে দাও।
বিশ্ব-হৃদয় হতে ধাওয়া
আলোয় পাগল প্রভাত হাওয়া
সেই হাওয়াতে হৃদয় আমার নুইয়ে দাও।
আজ নিখিলের আনন্দ ধারায় ধুইয়ে দাও
মনের কোণের সব দীনতা মলিনতা
ধুইয়ে দাও।
আমার পরাণ বীণায় ঘুমিয়ে আছে
অমৃত গান
তার নাইক বাণী নাইক ছন্দ নাইক তান,
তারে আনন্দের এই জাগরণী
ছুঁইয়ে দাও।
বিশ্ব-হৃদয় হতে ধাওয়া
প্রাণে পাগল গানের হাওয়া
সেই হাওয়াতে হৃদয় আমার নুইয়ে দাও।

২

এই ত তোমার আলোক-ধেনু
সূর্য্যতারা দলে দলে;
কোথায় বসে বাজাও বেণু
চরাও মহা গগনতলে।
তৃণের সারি তুলচে মাথা
তরুর শাখে শ্যামল পাতা,

আলোয়-চরা ধেনু এরা
ভিড় করেছে ফুলে ফলে।
সকাল বেলা দূরে দূরে
উড়িয়ে ধূলি কোথায় ছোটে।
আঁধার হলে সাঁঝের সুরে
ফিরিয়ে আন আপন গোঠে।
আশা তৃষা আমার যত
ঘুরে বেড়ায় কোথায় কত,
মোর জীবনের রাখাল ওগো
ডাক দেবে কি সন্ধ্যা হলে?

৩

অন্ধকারের উৎস হতে
উৎসারিত আলো
সেই তো তোমার আলো।
সকল দ্বন্দ্ব বিরোধ মাঝে
জাগ্রত যে ভালো
সেই তো তোমার ভালো।
পথের ধূলায় বক্ষ পেতে
রয়েছে যেই গেহ
সেই তো তোমার গেহ।
সমর-ঘাতে অমর করে
রুদ্র নিঠুর স্নেহ
সেই তো তোমার স্নেহ।
সব ফুরালে বাকি রহে
অদৃশ্য যেই দান
সেই তো তোমার দান।
মৃত্যু আপন পাত্রে ভরি
বহিছে যেই প্রাণ
সেই তো তোমার প্রাণ।
বিশ্বজনের পায়ের তলে
ধূলিময় যে ভূমি
সেই তো স্বর্গভূমি।
সবায় নিয়ে সবার মাঝে
লুকিয়ে আছ তুমি
সেই তো আমার তুমি।

৪

মেঘ বলেছে যাব যাব;
রাত বলেছে যাই;
সাগর বলে, কূল মিলেছে
আমি তো আর নাই।
দুঃখ বলে রইনু চুপে
তাঁহার পায়ের চিহ্নরূপে;
আমি বলে, মিলাই আমি
আর কিছু না চাই।
ভুবন বলে তোমার তরে
আছে বরণ-মালা।
গগন বলে, তোমার তরে
লক্ষ প্রদীপ জ্বালা।
প্রেম বলে যে, যুগে যুগে
তোমার লাগি আছি জেগে;
মরণ বলে, আমি তোমার
জীবন-তরী বাই।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কিরাতার্জ্জুনীয়।

(মহাকবি ভারবি-বিরচিত কিরাতার্জ্জুনীয় মহাকাব্যাবলম্বনে)

প্রথম সর্গ।

সুনিবিড় শ্যামশোভা দ্বৈতবনে যুধিষ্ঠির
করেন বসতি ;
আসিল সকাশে তাঁর ব্রহ্মচারি-বেশে দূত
কিরাত সুমতি ;
পাণ্ডব-আদেশে যিনি বিচরি হস্তিনাপুরে
কুরুরাজধানী,
বিদিত কৌরবপতি কোন্ নীতি অনুসরি
পালিছে অবনী।

সম্ভ্রমে প্রণাম করি বসিয়া বিহিতাসনে,
বর্ণনে বাসনা,
কি ভাবে দুর্য্যোধনশ্রেষ্ঠ রক্ষিতে বিজিত মহী
করিছে সাধনা ;
যদ্যপি অপ্রিয় বাণী, তথাপি হৃদয় তার
নহেক কাতর,
তোষে না হিতৈষী কভু অনৃতমধুরভাষে
প্রভুর অন্তর।

একান্তে আসীন দোঁহে; শত্রুজয়-অভিলাষী-
অধিপ-আজ্ঞায়,
বিজ্ঞাপিল বনেচর বিশেষ সৌষ্ঠবশালী
গম্ভীর ভাষায় ;
বহুক্লেশে ছদ্মবেশে ভ্রমি দেশ দেশান্তরে
নিশ্চিত প্রমাণ,
যে সমূহ তথ্যরাজি, নিবেদি সকল প্রভো,
কর অবধান।

গুপ্তচর-চক্ষু-বলে করেন নৃপতিগণ
সতত দর্শন
নিয়োজিত প্রণিধির সমুচিত নহে কভু
বঞ্চনা, রাজন্,
ক্ষমা কোরো সেই হেতু সাধু বা অসাধু যদি
সন্দেশ আমার ;
দুর্লভ ধরণীতলে মনোজ্ঞ কল্যাণকর
বচন-সম্ভার।

হিত উপদেশ যেবা না দেয় প্রভুরে কভু
দুর্ম্মন্ত্রী সেজন,
দুষ্ট প্রভু নাহি শোনে অমাত্যের হিতকর
অপ্রিয় ভাষণ ;
অমাত্য-অধিপ যেথা গ্রথিত প্রীতির সূত্রে,
অন্যোন্য-সহায়,
অকপট অনুরাগে অচলা চঞ্চলা সদা
বিরাজে তথায়।

নিসর্গ দুর্ব্বোধ কোথা কূটনীতি-পরায়ণ
নৃপতি-আচার ;
বিচার শকতিহীন অবোধ বিকৃতমতি
কোথা বা আমার ;
তথাপি নিগূঢ়তত্ত্ব অরাতির রাজতন্ত্র
বিদিত যে আমি
সম্ভাবিত আজি তাহা অপূর্ব্ব প্রভাবে তব,
হে জীবনস্বামি,

সম্রাটের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত সুযোধন,
তথাপি তাহার
বনবাসী পাণ্ডবের প্রতাপে শঙ্কিত হৃদি,
সদা গুরুভার;
সুবিশাল রাজ্য তব হেলায় অর্জ্জন করি
দুরোদরচ্ছলে,
শাসিতে সচেষ্ট আজি সমগ্র ধরণীতল
সূক্ষ্ম নীতিবলে।

সদগুণ সম্পদে তব সুনির্ম্মল যশোভাতি
আবরণ-আশে
আজন্ম কুটিলমতি, তথাপি ভাস্বরজ্যোতি
মহিমা প্রকাশে;
অনার্য্য-সঙ্গমে যত হৃদয়ের উচ্চভাব
পায় যে বিলয়,
উদার চরিত্রসনে বিরোধেও মানবের
মহত্ত্ব-উদয়।

অদম্য উৎসাহ-বলে বিদলি অন্তর-রিপু
মহাদুর্নিবার,
দিবানিশি অতন্দ্রিত সুনীতিসহায়ে করে
পৌরুষ বিস্তার;
মনুর পদাঙ্ক-লেখা অনুসরি মহোল্লাসে
অতীব দুর্লভ
সিদ্ধিলাভ-বাসনায় পালিছে প্রকৃতিপুঞ্জ
বৰ্দ্ধিতগৌরব।

অনুজীবিগণে সদা প্রীতিমান্ মিত্র-সম
স্নেহ ব্যবহার;
হিতৈষী সুহৃদগণে আত্মীয় কুটুম্ব-সম
মধুর সৎকার;

স্বজন-সকাশে পুনঃ বিনয়-বিনম্রভাব
যেন বা অধীন;
নাহি সে পূর্ব্বের গর্ব্ব, এবে রাজা অহঙ্কার-
লেশ মাত্রহীন।

ধর্ম্ম-অর্থ-কামরূপ ত্রিবর্গ সাধনে রত
অসক্ত অন্তর;
নাহি কোনো পক্ষপাত, যথোচিত ভক্তি-
ভরে সেবে নিরন্তর;
গুণ-অনুরাগে যেন মিত্রভাবে অবস্থিত
হৃদয়ে তাহার,
পরস্পরে নাহি বাধা, সমান প্রভুত্ব সবে
করিছে বিস্তার।

নহে দানবিরহিত সম্রাটের অমায়িক
প্রিয় সম্ভাষণ;
সমাদর-বিবর্জ্জিত নহে কভু প্রভূত সে
ধন-বিতরণ;
সদগুণ সম্পদ বিনা প্লাবি তাঁর হৃদিতট
বহে না উচ্ছল
সুবিমল প্রীতিধারা, স্নিগ্ধ করি সুহৃদের
অন্তর বিহ্বল।

মহীপাল-ধর্ম্ম সদা দুষ্ট-নিপীড়ন আর
শিষ্টের পালন,
ক্রোধে কিম্বা ধনলোভে বিনা দোষে কভু
কারো না হয় শাসন;
প্রধান বিচারপতি-উপদিষ্ট দণ্ডদানে
সতত তৎপর,
অধর্ম্ম দমনে তাঁর অরাতিতনয়ে নাহি
ভেদ আত্মপর।

নিয়োজিত নিরন্তর বিশ্বাসী রক্ষক কর্ম্ম
স্বপর মণ্ডলে,
শঙ্কিত হৃদয়ে তাঁর সুশীতল শান্তিসুধা
ঢালে সুকৌশলে;
কর্ম্মশেষে নরপতি বিপুল বিভবরাশি
দেন পুরস্কার,
কৃতজ্ঞতা কভু নাহি প্রকাশে কেবল মাত্র
প্রিয়বাক্য তাঁর।

সুবুদ্ধি-সহায়ে সদা সুবিহিত শক্রমাঝে
উপায় সকল,
সুবিশাল রাজ্যে তাঁর নাহিক কৌরব-
দ্বেষী বিদ্রোহী প্রবল;
সাম, দান, ভেদ, যুদ্ধ কুফল প্রসব কভু
করে না তাঁহার,
সজ্ঘর্ষ প্রভাবে যেন বর্দ্ধিত করিছে নিত্য
কল্যাণ-সম্ভার।

প্রভিন্ন বারণ কত উপহার দেয় তাঁরে
নৃপতিমণ্ডল,
সপ্তপর্ণদল-সম বিতরি মধুর গন্ধ
ক্ষরে মদজল;
রাজন্যনিকর-রথ-তুরঙ্গ-সঙ্কুল সভা-
মন্দির-প্রাঙ্গণ,
পরিষিক্ত গজমদে সতত সুবাসে তোষে
পারিষদগণ।

প্রজার মঙ্গলতরে হিতকর অনুষ্ঠানে
মুক্ত কোষাগার,
কৃষীবল জনপদে চাহে না সলিলধারা
ঘন বরষার;
উপজে বিবিধ শস্য অনায়াসে ক্ষেত্রে যেন
বিনা কর্ষণে;
শ্যামল বসনে যেন বিরাজিতা কুললক্ষ্মী
সস্মিত-আননে।

সদয়, উদারকীর্ত্তি, নিয়ত নিপুণ হস্তে
প্রকৃতি-পালন;
শান্ত যত উপদ্রব, পদে পদে চতুর্দ্দিকে
গৌরব লক্ষণ;
ধনপতিতুল্য তাঁর সদ্‌গুণ-প্রভাবে যেন
তরল-হৃদয়
মেদিনী দোহন করে, আপনি সন্তোষ
হেতু রতন নিচয়।

সমরে প্রথিতনামা অমিতবিক্রম কত
মহাধনুর্দ্ধর
সুজাত, সম্মানধন, পুরস্কৃত, রাজকার্য্যে
সমুদ্যত-কর;
পরস্পরে নাহি কভু সংহতি বিরোধ কোন
অশিবনিদান,
সতত বাঞ্ছিতলাভে সচেষ্ট সকলে রাক্ষ
নৃপতির প্রাণ।

অভীষ্ট সাধনে কভু বিরাম নাহিক তাঁর
বিনা ফলোদয়,
সুজন প্রণিধিমুখে বিদিত নৃপতিবৃন্দ
ক্রিয়া সমুচ্চয়;
বিধাতার কার্য্য যথা গম্ভীর অবোধগম্য
প্রারম্ভ তাঁহার;
মহোদয় শুভকর সিদ্ধিলাভ বিনা নহে
উদ্দেশ্য-প্রচার।

সমুদ্যত নহে কভু কার্ম্মুক শিঞ্জিনীযুত
অরাতি-সন্ত্রাস,
চিরহাস্যময় সেই বদনে হয় না কভু
ক্রোধের প্রকাশ;
সুরভি-সুন্দর পুষ্পে গ্রথিত মালিকা যথা
বহু গুণময়,
বহে তার সুশাসন আনন্দে আপন শিরে
নরপতিচয়।

নিয়োযিত দুঃশাসন যুবরাজপদে, দৃপ্ত
নবীন যৌবন;
পুরোধার অনুমতি শিরোদেশে ধরি রাজা
অলঙ্ঘ্য-শাসন,
বিশাল মণ্ডপ-মাঝে মহাযাগ-অনুষ্ঠানে
করেন বসতি
মাঙ্গলিক আজ্ঞাদানে হিরণ্যরেতসে তোষে
সমাহিতমতি।

আসমুদ্র ভূমণ্ডলে যদ্যপি প্রলীন যত
সপত্ন ভূপাল,
যদ্যপি গভীর শান্তি অকুণ্ঠ প্রতাপ-বলে
রাজে চিরকাল;
তথাপি পাণ্ডবভীতি-জলদে আবৃত তাঁর
হৃদয়-গগন;
বিরোধ প্রবলসনে সতত অশান্তিময়,
অহো কি ভীষণ!

কথার প্রসঙ্গে যদি কেহ কভু তব নাম
করে উচ্চারণ,
অর্জ্জুনের তেজোরাশি স্মরিয়া দুঃসহ দুঃখে
আনত-আনন;

ফণাধর সর্প যথা বিষবৈদ্য-উচ্চারিত
শুনি মন্ত্রধ্বনি,
তক্ষক বাসুকি নামে গারুড় বিক্রম স্মরি
আনত আপনি।

সমুদ্যত নরপতি করিতে কপট বলে
পাণ্ডব-বিলয়,
সমুচিত প্রতিকার বিধানে সত্বর দেব,
কর শত্রুজয়;
ভ্রমি দূর দূরান্তরে অন্য সহ আলাপনে
আনি সমাচার,
মন্ত্রণা-অপটু সদা আমাদের বাক্যাবলী
কথামাত্র সার।

সুধীরে কিরাতপতি নিবেদি সন্দেশ হেন
গম্ভীর বচনে,
সাদর সৎকার লভি চলিলা ত্বরিতপদে
কানন-ভবনে;
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী-সদনে গেলা
স্থির অচঞ্চল,
বর্ণিলা অনুজগণে বনেচর-বিজ্ঞাপিত
বারতা সকল।

শুনিয়া অরাতিশ্রেষ্ঠ কৌরবপতির সেই
বিপুল গৌরব,
অপমান-নিপীড়িত দ্রুপদতনয়া-হৃদে
বিকার-উদ্ভব;
আলোড়িত মনোভাব নিরুদ্ধ করিতে
নারি সতীশিরোমণি,
সগর্ব্বে কহিলা বামা সঞ্চারিতে
রোষানল উদ্দীপনা বাণী।

সুবুদ্ধি পণ্ডিত তুমি রাজনীতিবিশারদ
আরাধ্য আমার,
ভবাদৃশ জনে দেব, প্রমদা-নিয়োগ-বাণী
যেন তিরস্কার ;
তথাপি এ দীর্ঘকাল অসহ্য যন্ত্রণা আর
সহিতে না পারি
প্রকাশি হৃদয়ভাব-অবলার সমুচিত
লজ্জা পরিহরি।

দুর্দ্ধার সুরেন্দ্র-সম বিখ্যাত ভরতকুলে
নৃপতি সকল
প্রচণ্ড প্রতাপে সদা শাসিত অখণ্ড এই
অবনী-মণ্ডল ;
তুমি কিন্তু মহারাজ কুসুম-মালিকা যথা
প্রমত্ত বারণ
আপনার করে তুলি সুখভোগ্যা বসুন্ধরা
দিলে বিসর্জ্জন।

কপট-আচারি-সনে সেই জন নাহি করে
কপট আচার,
বিমূঢ় বিবেক বুদ্ধি, সুনিশ্চিত পরাভব,
কলঙ্ক তাহার ;
বর্ম্মহীন বীরদেহে সহজে প্রবেশে যথা
নিশিত সায়ক,
সরল ধার্ম্মিকমতি সুজনে আত্মীয় ছলে
বধে প্রবঞ্চক।

কোন্ রাজা তোমা বিনা উদগ্র ক্ষত্রিয়
বীর্য্য প্রবল সাধন,
ছদ্মবেশী বৈরি-করে অনুকূল কুললক্ষ্মী
করে সমর্পণ ?

শুনেছ কি কভু দেব কখনো কোথাও
কোনো কুলীন-সন্তান
সুন্দরীর শিরোমণি প্রণয়িনী কুলবধূ
অন্যে দেয় দান ?

নহে কভু সমুচিত মনস্বী বীরের কার্য্য
কপটে প্রশ্রয়,
সম্মুখ সমর ত্যজি প্রণত মস্তকে বহে
দৈন্য পরাজয় ;
কেমনে জ্বলে না বল উদ্দীপিত রোষানলে
হৃদয় তোমার ?
সমুজ্জ্বল বহ্নিশিখা পরিশুষ্ক শমীতরু
করে পরিহার ?

অবন্ধ্য যাহার ক্রোধ পরাঙ্মুখ নহে কভু
বৈরনির্য্যাতনে,
সুলভ গৌরব তার, প্রকম্পিত শত্রুগণ
লুটায় চরণে;
পদে পদে অবজ্ঞাত কাতর ঐশ্বর্য্যহীন
ক্রোধশূন্য জন,
কিলাভ সৌহার্দ্দ্যে তার ? বিদ্বেষে নাহিক
কোন ভীতির কারণ।

চেয়ে দেখ মহারাজ,এই কি সে ভ্রাতা তব
বীর বৃকোদর,
আরক্ত চন্দন-ভালে ভ্রমিত যে মহারথ
উল্লাস-অন্তর,
ভ্রমে আজি পদব্রজে ধূলিম্লান দেহকান্তি
পর্ব্বত কাননে,
তথাপি কি সত্যধন, আলস্যে কাটাবে
কাল চিন্তা নাহি মনে ?

অই দেখ ধনঞ্জয়, একাকী উত্তরকুরু
করিয়া বিজয়
অধিবাসিগণে দিলা প্রভূত সুবর্ণরৌপ্য
রতন-নিচয়,
সেই সে বাসবোপম পরি আজ বল্কবাস
ভ্রমে বনে বনে।
তথাপি কি সত্যধন, আলস্যে কাটাবে
কাল চিন্তা নাহি মনে?

অই দেখ মাদ্রীদেবী-যমজ তনয়যুগ
কুসুম-কোমল,
ধনা্ুশয্যায় আজি কঠিন-আকৃতি-গ্রস্ত
বিশীর্ণ কুন্তল,
গিরিগজ-তুল্য দেহ, বিশুষ্ক লাবণ্যলীলা
মধুর আননে।
তথাপি কি সত্যধন, সন্তোষে কাটাবে
কাল, সুসংযত মনে?

বুঝিতে পারি না দেব, কিরূপ হৃদয়ভাব
সম্প্রতি তোমার।
জগৎ বৈষম্যময়, মানবের চিত্তবৃত্তি
বিচিত্র-প্রকার;
অনভ্যাসে বনবাসে দারুণ দুর্দ্দশা তব
হেরি নিরন্তর,
অহো কি বেদনাভরে সতত অন্তর মম
বিকল কাতর।

কোথা আজি মহারাজ,সুন্দর কোমল তব
অমূল্য শয়ন?
কোথায় বা সুনিপুণ বৈতালিক স্তুতি-
গীতি মঙ্গল-বোধন?

দুঃসহ-কঠিনস্পর্শ বহুকুশ বনস্থলী
শয্যা সে তোমার
বিনিদ্র সতত শুনি অশিব বিকটশ্রুতি
শিবার চিৎকার।

তুষিতে যে প্রতিদিন সুখাদ্য-আহার-দানে
সহস্র ব্রাহ্মণ,
রমণীয় কলেবর সর্ব্বশেষে পরিতোষে
করিয়া ভোজন,
অন্নের অভাব আজি অবিমিশ্র বন্যফল
ভক্ষ্য সে তোমার
পরিক্ষীণ দেহ, কান্তি; পরিশূন্য আজি
তব যশের ভাণ্ডার।

মণিময় পীঠতলে অবিরত সুখশায়ী
যে পদ-যুগল,
রঞ্জিত সতত যাহা শিরোমালা রজোরাগে
রাজেন্দ্রমণ্ডল,
কত না বেদনা পাও সেই সে চরণে
আজি বিচরি কাননে;
ভ্রমে যেথা বহুক্লেশে কুশাগ্রছেদনরত
মৃগ দ্বিজগণে।

আজি যে দুর্দ্দশা তব একমাত্র দুর্যোধন
কারণ তাহার;
তাই দেব অপমানে সমূলে উন্মূল যেন
মানস আমার;
অরাতির পরাক্রমে অকুণ্ঠিত বলবীর্য্য
অভিমানি জনে
বিপত্তি, উৎসব-সম, আহ্লাদিত করে
নব-উন্মাদনা-দানে।

কে না জানে এজগতে অগ্রনেতা তুমি দেব,
তেজস্বি-সমাজে,
প্রতাপ-দুন্দুভি তব গম্ভীর-আরাবে সদা
চতুর্দ্দিকে বাজে ;
তুমি যদি যশোধন প্রণতমস্তকে সহ
হেন অপমান,
কে আর করিবে বল, গৌরবে ধরণীতলে
আশ্রয় প্রদান।

কি ফল বিক্রমে, যদি ক্ষমিতে কপটশত্রু
করেছ মনন ?
খুলে ফেল চিরতরে তুণীর কার্ম্মুক অসি
নৃপতি-লক্ষণ ;
জটাজূট শিরে ধরি নিঃস্পৃহ-অন্তরে থাক
তপস্বীর বেশে,
প্রজ্বলিত হোমানলে কর সুখে আত্মদান
মোক্ষলাভ-আশে।

কি ভাবিছ অরিন্দম, নাহি কোনো দোষ হেন
প্রতিজ্ঞালঙ্ঘনে ;
কে কবে বিরত বল, কপটী বৈরীর সহ
শাঠ্য-আচরণে !
দুর্ব্বিসহ বীর্য্যবলে সতত বিজয়লক্ষ্মী
অঙ্কশায়ী যার,
সে কি কভু করে দেব, মায়াসন্ধিবিঘটনে
সত্যের বিচার ?

দুর্দ্দৈব রজনীশেষে প্রভাত-সূর্য্যের সম
বর্দ্ধিত শোভায়,
উঠ পুনঃ দীপ্ততেজে বিনাশি ঘনান্ধতম-
অরাতিনিকায় ;
বিপদ-বারিধি-গর্ভে জলুক মহিমা মাখি'
গৌরবকিরণে,
লক্ষ্মীর প্রসন্ন হাসি বিম্বিত হউক্ তব
প্রফুল্ল বদনে।

ইতি কিরাতার্জ্জুনীয়ে মহাকাব্যে প্রথমঃ সর্গঃ সমাপ্তঃ।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস।

আদেশ পালন।

(গল্প)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কনকের শিরায় শিরায় মত্ত আবেগের প্রখর তড়িৎ-প্রবাহ ছুটিয়া ছুটিয়া, ফুলিয়া ফাঁপিয়া আকুল উন্মাদনায় ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল। কনক নির্জ্জীব পুতুলের মত স্থির!

অনেকক্ষণ পরে কাঁসর ঘন্টার ঘন

ধোর রোলে. ঠাকুরের সন্ধ্যারতি আরম্ভ হইল। সকলে গলবস্ত্র হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

আবেশবিহ্বল কনক মুদিতচক্ষে আপনার অন্তরের দিকে তাকাইল। দেখিল সেখানেও প্রেমের জ্যোতি-মণ্ডিত ভগবান বিঠোবার উজ্জ্বল চিন্ময় মূর্ত্তি! সে কি চমৎকার! সদা উচ্ছ্বসিত আনন্দ-আবেগে অধীর কনক বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া, একাগ্র নিষ্ঠায় আপনাকে সংযত করিয়া সেই অন্তরদেবতাকে অর্চ্চনা করিতে আরম্ভ করিল।

বাহিরের কোলাহলমুখর জগৎ দূর দুরান্তের অন্ধকার-মধ্যে সসঙ্কোচে পিছু হটিয়া গেল! এ বিচ্ছিন্নতার মাঝে কি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ! এখন মানুষের সহিত চোখোচোখী হইবার ভয় তাহার নাই! এখন তাহাকে বিচলিত করিবার কেহ নাই,—এখন সে তাহার দেবতার জন্য ছুটি পাইয়াছে, এখন সে নির্ভয়!

আরতি শেষ হইল। সকলে দেবোদ্দেশে মস্তক নত করিল। আত্মহারা কনকের মস্তক আকুল আবেগে একেবারে ঠিক যেন ইষ্টদেবতার পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল!

আবার ভজন আরম্ভ হইল, সকলে শুনিতে বসিল। রাত্রি হইয়াছে দেখিয়া নান্‌কীর মা ছেলেদের লইয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে গেল, কনককেও ডাকিল. কনক শুনিল না, উঠিল না—বুঝি সে-শক্তি তখন তাহার ছিল না। তখন তাহার মন পৃথিবী ছাড়িয়া—ভজন ছাড়িয়া, ঐ লোকালোক পারে, এক অজানা রাজ্যে বিহার করিতেছিল।

নান্‌কীর মা ভাবিল, কনক গানের নেশায় মাতিয়াছে, সে মন্দির প্রদক্ষিণ করিবে না; থাকুক ফিরিবার সময় তাহাকে ডাকিয়া লইলেই হইবে। তাহারা মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়া আবার কনককে ডাকিল, কনক তখনো বাহ্যজ্ঞানরহিত তন্ময় তদ্গত! হাত ধরিয়া টানিয়া তাহাকে উঠাইল, মুখের কাছে হেঁট হইয়া, হাত মুখ নাড়িয়া, বৃদ্ধা নান্‌কীর মা, আবার তাহাকে বাড়ী ফিরিবার কথা বলিল! এতক্ষণে তাহার চৈতন্য ফিরিল, দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া সুপ্তোত্থিতের মত বিস্তৃত চক্ষে চাহিয়া বলিল,—"মন্দির প্রদক্ষিণ!"

"ওমা আমরা যে এই প্রদক্ষিণ করে এলুম।" "তোমরা প্রদক্ষিণ করেছ? আচ্ছা থাক, আমি শীগ্‌গির প্রদক্ষিণ করে আস্‌ছি।"

কি হাঁদা মেয়ে! তাহারা যখন ডাকিল তখন হাঁ করিয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর এখন একলা চলিল! নান্‌কীর মা বলিল, "তবে প্রদক্ষিণ করে এস, আমরা মন্দিরের ভিতর দিয়ে আর একবার ঘুরে যাই—" নান্‌কীর মা ছেলেদের লইয়া ভিতরে চলিল।

কনক বাহিরে মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। কয়বার প্রদক্ষিণ হ'ল বা হইল তাহার হুঁস নাই, কনক আপন মনে মন্দির ছাড়িয়া, রাস্তা ধরিয়া একলাই

ঝোঁকের ভরে চলিল,। নান্কীর মার কথা তাহার মনেই নাই।

সোজা রাস্তা। বরাবর মাঠের রাস্তা পার হইয়া আসিয়া কনক গ্রাম্য পথ ধরিল; সে যে কতখানি রাস্তা পার হইয়া এখন কোন্ থানে আসিয়াছে, তাহা সে কিছুই বুঝিতে পারে নাই। আপন মনেই চলিয়াছে। গভীর তন্ময়তায় সে একেবারে মুহ্যমান!

বিস্তৃত প্রান্তরে, আলোর উপর আলো ঢালিয়া পূর্ণিমার চাঁদ আকাশের গায়ে হাসিতেছিল; কনক এতক্ষণ সেই আলোর দিকে চাহিয়া, নিজের ছায়া পিছনে ফেলিয়া, বরাবর চলিয়া আসিতেছিল। এখন সহসা গ্রাম্য পথে উঠিয়া পথিপার্শ্বস্থ বৃক্ষশ্রেণীর শাখা-পত্রান্তরালবিচ্যুত, খণ্ড বিভক্ত, অস্পষ্ট আলো দেখিয়া হঠাৎ তাহার চমক ভাঙিল। তাইত, আসিয়াছে কোথা! এরই মধ্যে এতখানি!

সঙ্গীরা কোথা? কনক পিছন দিকে চাহিল, কেহ নাই! নির্জ্জন পথে সে শুধু একাকী!—কনক থমকিয়া দাঁড়াইল, তাইত নান্কীর মা যে তাহাকে ডাকিয়া আনিতে বলিয়াছিল। তবে কি তাহারা নাই! না তাহাকে একলা ফেলিয়া তো তাহারা যাইবে না!

কনক সাম্নের রাস্তার দিকে চাহিল, অন্ধকারে বোধ হইল, একজন লোক সেইদিকে আসিতেছে। কনক উচ্চ গলায় বলিয়া উঠিল, "কে গা?"

বিধাতার বিড়ম্বনা! হঠাৎ সেই অস্ফুট অন্ধকার ভেদ করিয়া—উদ্দামচাঞ্চল্যভরা পবনের মত ছুটিয়া আসিয়া লোকটা সবলে কনকের বাহুদ্বয় চাপিয়া ধরিল এবং আবেগবিকম্পিত-কণ্ঠে স্নেহময় স্বরে ডাকিল, "কনু কনু তুমি—"

যুগপৎ সংঘটিত বিরুদ্ধ ঘটনাপরম্পরার উপর্য্যুপরি সংঘাতে কনক প্রথমটা হতভম্ব! তাহার পর অকস্মাৎ সবেগে এক ঝাপ্টা দিয়া সেই লোকটার কবল হইতে আপনাকে উদ্ধার করিয়া, ত্রস্ত কুরঙ্গিণীর মত লঘু লম্ফে, নিমেষ-মধ্যে পশ্চাতে হটিল; এবং বজ্রকঠোর স্বরে ডাকিল, "ভাইলাল!"

"হাঁ কনু, ভয় নাই, আমি ভাইলাল, আমি,——আমি তোমায় বড়——"

তীব্র কঠোর ঘৃণার স্বরে উত্তর হইল, "আবার—আবার প্রবঞ্চনা! কৃতঘ্ন ধূর্ত্ত, আবার ফের!—সরে দাঁড়াও!"

পিছু হটিয়া কাতরকণ্ঠে ভাইলাল বলিল, "না না কনু ছলনা নয়, আমি যথার্থই বল্‌ছি, কিন্তু কি করে তোমায় বোঝাবো? কনু, কি বিপদেই আমি পড়েছি! ক্ষমতাশালীের প্রসাদাকাঙ্ক্ষায় নিজের স্বার্থসাধনের জন্য এরকম গর্হিত কাজে—জেনে শুনে পাপে ডুবে আছি, ক্ষমা কর কনু ক্ষমা কর, তুমি আমায় ক্ষমা কর, আর দিন কয়েক অপেক্ষা কর—তার পর আমি তোমারি—" না না ও দুর্ব্বলতার গ্লানি আর নয়, মানুষ মানুষের আত্মীয়তা-প্রয়াসী! — ভুল।

চক্ষের জল, কণ্ঠের কাতরতা, ওসব তো দৃশ্য অভিনয়ের চূড়ান্ত নিদর্শন! সেও তো এতদিন অপরিসীম ব্যাকুলতায় ঐ ব্যর্থতার পশ্চাতে যথেষ্ট খাটিয়াছে, তবে তবে...! নিষ্ঠুর বিদ্রূপের মর্ম্মভেদী হাসি কনকের অধরে ফুটিয়া উঠিল।—"ভাইলাল, তুমি শুধু নরাধম নও, তুমি মহা অপদার্থ! কিন্তু তোমার ভুল হয়েছে ভাইলাল, আমায় আর প্রলোভনে লুব্ধ কর্‌তে পার্‌বে না, যা হবার তা হয়েচে; কিন্তু তবুও বল্‌চি, উপরদিকে চাও,—এ জীবনের পরেও জীবন আছে, মৃত্যুর পরও মৃত্যু আছে, এখনো ফেরো, এখনো আপনাকে সামলাও।"

কনক তীব্রবেগে চলিয়া গেল!

কুলিশনির্ঘোষে জলন্ত জ্বালাময়ী কঠোর আদেশ! বজ্রাহতপ্রায় ভাইলাল স্তব্ধ হতবুদ্ধি!

৫

তাহার দিনকয়েক পরেই একদিন পঞ্চায়েত-শক্তির প্রবল উৎপীড়নে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া হতভাগা ভাইলাল দেশ ছাড়িয়া পলাইল।

তাহার হঠাৎ নিরুদ্দেশের হুজুক লইয়া গ্রামে দিন কতক খুব আন্দোলন চলিল. কারণ পরিস্ফুট না হইলেও——মাতব্বর লোকেরা নিজেদের তীক্ষ্ণধার কল্পনা-শক্তির সাহায্যে চোখ টেপাটেপী করিয়া নানা অদ্ভুত সিদ্ধান্ত আবিষ্কার করিলেন.........।

কনক সকলই শুনিল; সে গভীর আখণ্ড-ভাবে বিঠোবার চরণোদ্দেশে ভক্তিভাবে প্রণাম করিল। তোমার অনন্ত করুণা প্রভু!

দিনকয়েকের মধ্যেই গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গেল যে, শম্ভু রাওয়ের কন্যা আজীবন কৌমার্য্য-ব্রত অবলম্বন করিয়া ভগবান বিঠোবাদেবের মন্দিরে সেবাব্রত-ধারিণী হইবে। সকলে অবাক!—কথাটা শুনিয়া কেহ হাসিল, কেহ কাঁদিল, কেহ বলিল দুর্ব্বুদ্ধি, কেহ বলিল নির্ব্বুদ্ধি, কেহ বলিল ...।

প্রভু রাও-এর পরিবারবর্গ কিন্তু নিস্তব্ধ; প্রত্যুত্তর-প্রত্যাশী বিজ্ঞের দল তাহা দেখিয়া অত্যন্ত মনক্ষুণ্ণ হইলেন।

তারপর সত্যসত্যই এক উজ্জ্বল প্রভাতে ততোধিক পুণ্যোজ্জ্বল বেশে—গার্হস্থ্যাশ্রম ত্যাগ করিয়া, যথাশাস্ত্র সন্ন্যাস-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ব্রহ্মচারিণী কনক, দেবসেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়া পল্লী ছাড়িয়া, আত্মীয়-পরিজন ছাড়িয়া, বিঠোবার মন্দির-পার্শ্বে ক্ষুদ্র কুটীরে আশ্রয় লইল।

৬

এই ঘটনার পর পাঁচ বৎসর কাটিয়াছে। পৃথিবীর কাজ যেমনকার তেমনই চলিতেছে, অনেক জায়গায় অনেক পরিবর্ত্তনও ঘটিয়াছে। ইতিমধ্যে পঞ্চায়েত-কর্ত্তার মৃত্যু হইয়াছে, এবং পঞ্চায়েত বদল হইয়াছে। প্রভু রাও-এর পরিবার আগের মতই আছে; ভাইলাল আজো নিরুদ্দিষ্ট।

প্রাতঃকাল। সদ্যস্নাতা গৈরিকধারিণী, সতীত্ব-লাবণ্য-উদ্ভাসিতা, পুণ্য-গৌরবে মূর্ত্তিমতী ব্রহ্মচারিণী কনক বিঠোবার মন্দির-পার্শ্বে ফুলবাগানে দেবপূজার পুষ্প চয়ন করিতেছিল। সমস্ত সদ্যপ্রস্ফুটিত পুষ্পগুলি সংগ্রহ করিয়া কনক পরিপূর্ণ শোভা সুন্দর সাজির পানে স্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া ঈষৎ হাসিল। সে কবে এমান ভাবে সম্পূর্ণ নির্ম্মল হইয়া এমনি করিয়া সারা জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য হৃদয়-দেবতার চরণে পরিপূর্ণ অসঙ্কোচে দান করিয়া নিজের কাছে মুক্ত হইবে!

মানবে যে মহত্ত্বের মূল্য বোঝে না, যে চ্যুত পূজার্ঘ্য তাহারা চরণে দলিয়া যায়, সেই অনাদৃত দান,—বড় অভিমানে বড় বেদনায় সে দেবতার দ্বারে বহিয়া আনিয়াছে। কিন্তু এখানেও যেন কি অব্যক্ত দ্বিধা জাগিতেছে! এ ভুল কেন ভগবান!—এ ভ্রান্তি সংহার কর, এ দানের সঙ্গে সে দানের পার্থক্য আকাশ-পাতাল! সে ছিল উগ্র-শক্তি সুরা, আর এ যে পিষ্ট হৃদয়ের সার—সুধা! এ যে সন্তাপের আগুনে শোধন করিয়া লইয়াছে,—এ হৃদয়-শতদলের স্নিগ্ধ পরিমল-সম্ভার, এ শুধু তোমার! সারা পৃথিবীর মধ্যে—জীবনের শেষের দান, শ্রেষ্ঠ সামগ্রী লইয়া ভক্ত দাঁড়াইয়া আছে, ওগো ভগবান, ইহার অধিকারী শুধু তুমিই! তবে কেন এখনো এ ব্যবধান, কেন এখনো এ কুণ্ঠা!

গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া, মাথা তুলিয়া কনক মন্দিরের পানে, বিহ্বল-বিস্ফারিত-নয়নে একবার তাকাইল! সহসা তাহার দুই চক্ষু দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া অশ্রু ঝড়িয়া পড়িল!

ফুলের সাজি-হস্তে কনক মন্দিরের সোপানের উপর আসিয়া বসিল। চক্ষু মুছিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া স্থিরদৃষ্টিতে মুগ্ধের মত অনেকক্ষণ দেবমূর্ত্তির পানে চাহিয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে মন্দিরের সোপানের উপর তাহার মাথা লুটাইয়া পড়িল। ভগবান, যদি দয়া করিয়া দুঃস্বপ্ন হইতে জাগাইয়াছ, তবে আবার কেন মাঝে মাঝে তার মোহময় স্মৃতিঘোরের মধ্যে টানিয়া নিয়া যাও ঠাকুর! যদি দয়া করিয়াছ, তবে আরো কর, একেবারে ছুটি দাও, সত্যকার মুক্তি দাও!—ত্যাগের মধ্যে জয়ের সন্ধানে চলিয়াছি ভগবান, জয় দাও—পরাজয়ের গ্লানি মোচন কর!”

কিছুক্ষণ পরে মন্দিরের পরিচারিকা অত্যন্ত ব্যস্তভাবে তথায় আসিল। পদশব্দে মাথা তুলিয়া কনক চাহিল, পরিচারিকা দেখিল, তাহার চক্ষে গভীর ঘুমের গাঢ় আবেশ!

“মা শুনেছ গা আহা কোথাকার কে ভিন্ দেশী অচেনা লোক, একলা এসে বেঘোরে প্রাণটা হারালে বাছা!—”

কনক জিজ্ঞাসা করিল, “কে মা?”

“ঐ উত্তরদিকের মাঠে একটা লোক ওলাউঠায় মর-মর হয়ে পড়ে আছে, সঙ্গে এক প্রাণীও নেই, শুন্‌ছি নাকি বিঠোবা

দর্শনে আস্‌ছিল তার পর এই বাবস্থা। বিঠ্‌ঠল, কার মাটি কোথায় কেনা তা তুমিই জানো!

কনক ব্যগ্র হইয়া বলিল,—"সঙ্গে কেউ নেই?"

"হাঁ। গো মা, আহা নিছক একলা!"

"বিঠোবার সেবাইত কেউ গেছে কি না?"

"এখনো কেউ খবর পায় নি, আমি এইমাত্র শুনে আস্‌ছি।"

কনক সাজিসুদ্ধ ফুল রাখিয়া, মনে মনে বিঠোবাকে নমস্কার করিয়া উঠিয়া পড়িল। মানুষের কাজের আগে দেবতার কাজ! চক্ষের সাম্‌নে এমন পূজার আয়োজন থাকিতে চক্ষু মুদিয়া অর্চ্চনার চেষ্টা আজ নিষ্ফল! দেবতা অন্ধ তোষামোদে তুষ্ট হইবার পাত্র নহেন, তাঁহার কাছে সাধনার পূরাপুরি মূল্য দিয়া তবে সিদ্ধিলাভ করিতে হয়। সকল দিকে।

কনক তখনি দুইজন সেবাইতকে সঙ্গে লইয়া ঘটনাস্থলে চলিল। আর এক ব্যক্তি চিকিৎসক আনিতে ছুটিল। তখনকার দিনে বিঠোবার সেবাইতদিগের নিকট অনাথ আতুরগণ সকল সময়ে সাহায্য পাইত।

তাহারা গিয়া দেখিল, প্রান্তর মধ্যে একটি বৃক্ষতলে পড়িয়া রোগী যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। রোগের অবস্থা তখন অতি ভয়ানক, রোগীর চোখে ঘোলা পড়িয়াছে, কাণে তালা ধরিয়াছে, হাতে-পায়ে আক্ষেপ হইতেছে; পেটের দারুণ যন্ত্রণায় দুর্ভাগা ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছে। সংক্রামক রোগের ভয়ে অগ্রসর হইতে না পারিয়া কয়েকজন হুজুকবাজ নিকর্ম্মা, দয়াপরবশ হইয়া তফাতে দাঁড়াইয়া আছে। রোগী জ্ঞানসঞ্চারে মাঝে মাঝে শুষ্ককণ্ঠে বলিতেছে,"জল জল—ওগো একটু জল!"

রোগীর মুখপানে চাহিয়া কনক স্তব্ধ হইয়া গেল। হাঁটু পাতিয়া নীচু হইয়া জন্মের মত, জীবনের মত—যেন ইহপর-কালের মত সন্দেহ মিটাইয়া ভাল করিয়া একবার দেখিয়া লইল। তাহার পর! তাহার পর বেদনাজড়িত অস্ফুট উচ্চারণে, কাতরস্বরে বলিল, "একি প্রভু একি! একি হৃদয়বিদারক প্রলয়ঙ্কর রহস্য!"

মুমূর্ষু ব্যক্তি ভাইলাল! কনক উর্দ্ধে মুখ তুলিয়া চক্ষু মুদিল। তাহার বুকের ভিতর হইতে, অন্তরের অন্তর হইতে নিগূঢ় মর্ম্মবাণী উচ্ছ্বসিত হইয়া দেবতার চরণ-উদ্দেশে ছুটিল! সে ভাষা শব্দহীন,সে ভাব অনুভবের অতীত।

সামান্য মেঘের ঘোর কাটাইতে বিশ্ব-গ্রাসী ঝড়ের আয়োজন! দর্পণের প্রতিবিম্ব মুছিতে দর্পণই চূর্ণ করিবার আদেশ! কি অদ্ভুত! ইহাই অনন্ত মঙ্গলময় দেবতার অনন্ত শুভময় ব্যবস্থা! কনক যে আজই খানিক আগে, দেবতার পদে নতশিরে বাসনা জানাইয়াছিল "দয়া যদি করিয়াছ প্রভু, তবে আরো দয়া কর।" কে জানে এই ঘটনা বুঝি সেই প্রার্থনারই সমসূত্রে গাঁথা, একই অখণ্ড বিধান।

তাহাকে পিষিয়া চুরমার করিয়া, সকল

কুণ্ঠার কক্ষ হইতে মুক্ত করিয়া—দেবতার নিজস্ব করিয়া লইবার জন্যই বুঝি এ সৌভাগ্য শাস্তির বেশে আসিয়াছে! তাই হোক ভগবান তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

কনকের চক্ষু হইতে দেবতার পূত আশীর্ব্বাদের মত, জলন্ত শোণিতের স্রোত যেন মর্ম্মের গ্লানি ধুইয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া অশ্রুরূপে খসিয়া পড়িল……। কনক শান্তমুখে রোগীর সেবা করিতে বসিল।

চিকিৎসক আসিয়া বিষণ্ণমুখে মাথা নাড়িলেন, বাঁচিবার আশা নাই।

কনক হাসিল। চিকিৎসকের অনুমতিক্রমে, সকলে মিলিয়া রোগীকে উঠাইয়া মন্দির-প্রাঙ্গণে—নাটমন্দিরে লইয়া আসিল। চিকিৎসক পাশে বসিয়া বহু যত্নে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে রোগের অবস্থা মিলাইয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সকলি বিফল, ক্রমশ রোগ প্রবল ও রোগী দুর্ব্বল হইতে লাগিল। অবশেষে হতাশ হইয়া চিকিৎসক অপরাহ্লের পর উঠিয়া গেলেন। সকলে বুঝিল সময় সন্নিকট।

সেদিন শুক্ল ত্রয়োদশী। সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই চাঁদের উজ্জ্বল আলোক সমস্ত ভুবন ভরিয়া উঠিল। চারিদিক ফুল্ল জ্যোৎস্না-স্নাত শুভ্র শান্তমূর্ত্তি! আর মন্দির প্রাঙ্গণে ততোধিক বিরাট অভিনব শান্তি!

অনেকক্ষণ পরে রোগী চক্ষু চাহিল। সকলে বুঝিল, এই শেষ। কনক তখনো রোগীর মাথা কোলে লইয়া বসিয়াছিল। রোগী কষ্টে মাথা ঘুরাইয়া ক্ষীণস্বরে বলিল, "কে?"

বিকৃতস্বরে কনক উত্তর দিল, —"দেবদাসী।"

"আমি কোথা?"

"ভগবান বিঠোবার মন্দিরে।"

রোগীর সর্ব্বশরীরে যেন জলন্ত তড়িৎ বহিয়া গেল! তাহার মৃত্যুম্লান বিবর্ণ মুখে সহসা একটা প্রোজ্জ্বল জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল! রোগী অত্যন্ত সহজভাবে উঠিয়া বিঠোবার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া, কনকের পদ-প্রান্তে নতশির হইল।

জনতা বিস্ময়ে স্তম্ভিত!

"গুরুরূপা জ্ঞানদাত্রী, আমার অপরাধ ক্ষমা কর, তোমার আদেশ পালন করেছি, এই উজ্জ্বল চন্দ্রালোকের নীচে, ভগবান বিঠোবাকে সাক্ষী রেখে আমি মুক্তকণ্ঠে বলছি, পাঁচ বৎসরের পরে আমি ফিরেছি, ফিরেছি, ফিরেছি!—জগৎ শুনুক আর না শুনুক, তাতে কিছু ক্ষতি নেই, কিন্তু আমি তোমায় আজ শোনাতে এসেছি দেবী, আজ আমি সকলের কাছ থেকে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বিছিন্ন করে, একেবারে ফিরে চলেছি।"

আকস্মিক উত্তেজনায় সামর্থ্যের অতিরিক্ত শক্তিব্যয়ে দুর্ব্বল স্নায়ুমণ্ডলী ভীষণ অবসাদে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। রোগী ঢলিয়া পড়িল। কনকের চক্ষু দিয়া আবার দুই বিন্দু অশ্রু ঝরিল। বেদনারুদ্ধকণ্ঠে কনক ধীরে ধীরে বলিল, "সংসারে তোমার মত যাদের তেজস্বী

প্রাণ তারাই ধন্য ভাইলাল, ভালয় হোক্ মন্দয় হোক্, তোমরা যে-দিকে ঝোঁকো,—সেদিকে পূর্ণ শক্তিতেই ঝোঁকো, আত্মহারা হয়ে যাও! জগতে তাই তোমাদের সাধনাই এত দ্রুতসার্থক! তোমরা হয় পূর্ণ দেবতা, নয় পূর্ণ অপদেবতা হয়ে দাঁড়াও,—অপূর্ণ থাকতে পার না!...... আশীর্ব্বাদ কর ভাইলাল, অমনি পূর্ণ তেজস্বিতার মাঝে নিজের ক্ষীণতা বিসর্জ্জন করে, আমিও যেন আত্মজয়ী হতে পারি।......

ভাইলাল শান্ত-স্নিগ্ধ-দৃষ্টিতে আকাশের দিকে খানিকক্ষণ নীরবে চাহিয়া রহিল। তারপর মৃদুস্বরে বলিল, "আজ জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন, বড় মঙ্গলময় মুহূর্ত্তে বিঠোবার দ্বারে আমার মহাশয্যা রচিত হয়েছে। কি অপরিসীম আনন্দ! আজ আমার অবশিষ্ট আর কিছু নেই, আছে শুধু হে বিঠোবা দেব, তোমার পাদপদ্মে বিলীন হবার জন্য শুধু একটি মুহূর্ত্ত!"

ভাইলালের ললাটে তখন বেদনা, ক্ষোভ, ক্লান্তির চিহ্ন কিছুমাত্র ছিল না! ছিল শুধু সুষমা-সিক্ত স্বর্গীয় তৃপ্তির একটি অপরূপ দীপ্তি!

উন্মুক্ত আকাশের তলায় বুকের উপর যুগ্ম হস্ত স্থাপন করিয়া, ভগবানের চরণ ধ্যান করিতে করিতে ভাইলাল মহা সমাধিতে মগ্ন হইল। চারিদিকে উজ্জ্বল ত্রয়োদশীর চন্দ্রালোক পরিপূর্ণ শোভায় হাসিতেছিল। সুধাকর-কর-সম্পৃক্ত সমীরণ জগতের চক্ষে স্নিগ্ধ পরশ বুলাইয়া বহিতে লাগিল! মন্দির-সোপানে উপবিষ্ট এক জ্ঞানী সাধক বদ্ধাঞ্জলি হইয়া গদগদ কণ্ঠে গাহিতেছিলেন;—

"ন জাতোঽহং মৃতোবাপি—
নাম কর্ম্ম শুভাশুভম্,
বিশুদ্ধং নির্গুণং ব্রহ্ম
বন্ধো মুক্তি কথং মম।"

সমাপ্ত।

শ্রীশৈলবালা ঘোষ জায়া।

বারাণসী-তত্ত্ব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দেশাচার। বারাণসীর চতুর্দ্দিকে যেরূপ আচার দৃষ্ট হয়, বারাণসীরও দেশাচার তদনুরূপ। অতি অল্প বয়সেই বিবাহ ক্রিয়া সমাধা হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ৫ হইতে ৯ বৎসরের মধ্যে বিবাহ হইয়া যায়। উচ্চ জাতির মধ্যে বিবাহের বয়স ১১ হইতে ১৫। এদেশে বর অপেক্ষা কন্যা বয়সে বড় হইয়া থাকে। অল্প বয়সে বিবাহ হইলেও দ্বিরাগমন ব্যতীত কন্যাগণ স্বামীর বাটীতে যাইতে পান না। সুতরাং স্বাস্থ্য-ভঙ্গের আশঙ্কা আদৌ নাই। সম্ভ্রান্ত অথবা মধ্যবিৎ ব্যক্তিদিগের মধ্যে বিধবাবিবাহের প্রথা নাই; নিম্নশ্রেণীস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যে এইপ্রথা সীমাবদ্ধ।

কোনো কোনো মধ্যবিৎ ব্যক্তি বিধবা-বিবাহ দিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাদিগের সংখ্যা অতীব ন্যূন। ব্রাহ্ম এবং পাহুলিয়া শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্য জাতিকে আপন দলভুক্ত করার প্রথা দেখা যায়। ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে হইলে ভগবানের নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথানুসারে যাবতীয় অনুষ্ঠানাদি করিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইতে হয়। আচার্য্য নিরাকার পরমেশ্বরের মহীয়সী শক্তির বর্ণনা করেন। অনন্তর সেই নিরাকার পরমপিতার চরণকমলে আপনাদিগকে সমর্পণ-বিষয়ক একটি গান হইয়া দীক্ষানুষ্ঠান শেষ হয়। দীক্ষিত ব্যক্তিকে অবশ্য যজ্ঞোপবীত, কণ্ঠী প্রভৃতি জাতিভেদসূচক সাম্প্রদায়িক চিহ্নগুলিকে পরিত্যাগ করিতে হয়।

পাহুলিয়া শিখ স্বীয় দলভুক্ত করিতে হইলে নবাগতের গলায় একখানি তরবারী ঝুলাইয়া তাহাকে আচার্য্যের সম্মুখে দাঁড় করায়। অতঃপর আচার্য্য একটি সরবৎ (চিনির পানা) লইয়া তাহাতে ছুরি ডুবাইয়া কতকগুলি বাক্য উচ্চারণ করেন। অতঃপর সেই সরবতের ছিটা আগন্তুকের মস্তকে দিয়া অবশিষ্টাংশ তাহাকে পান করায়। অনন্তর নবাগত ব্যক্তি আচার্য্যের দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুলি কিঞ্চিৎ জলে নিমজ্জিত করাইয়া সেই চরণামৃত পান করে।

হিন্দু এবং জৈন স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশ্বাস রাখেন। বৌদ্ধগণের ত্রীপিঠকই বিশ্বাস্য। শিখ আদিগ্রন্থে এবং মুসলমান কোরাণে আস্থাবান্। হিন্দু শিখ এবং জৈন পূর্ব্বাস্য হইয়া ভগবানের আরাধনা করে; মুসলমান মক্কার দিকে মুখ ফিরায়। পূর্ব্বোক্ত জাতিত্রয় ধর্ম্মমন্দিরে এবং শেষোক্ত জাতি মসজিদে উপাসনা করে। হিন্দু. শিখ এবং জৈনদিগের পুরোহিত ব্রাহ্মণ, তাহারা দারপরিগ্রহ করিতে পারে। বৌদ্ধগণের যাজকগণ অবিবাহিত থাকে। মুসলমানগণ স্বীয় সঙ্ঘ হইতে যাজক নির্ব্বাচিত করে। গোজাতি হিন্দুগণের আরাধ্য সুতরাং অবধ্য। এবং আমিষাহার হিন্দুর নিষিদ্ধ। শিখগণ গো-জাতির প্রতি অধিকতর ভক্তিমান্ কিন্তু আমিষ ভোজনে তাহাদিগের বাধা নাই। মুসলমানগণ শূকর এবং কুকুরকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে এবং ইহাদিগের মাংস তাহাদিগের নিকট অভক্ষ্য। বৌদ্ধ এবং জৈন প্রাণিহত্যা করে না। অনার্য্য ব্যক্তি ব্যতীত মৃত পশুর মাংস কেহই ভোজন করে না। শিখ তামাকুসেবনে বিরত থাকে, কিন্তু মাদক দ্রব্যে বীতস্পৃহ নহে। মাদক দ্রব্য হিন্দুর নিষিদ্ধ নহে—মুসলমানের বটে। হিন্দু এবং জৈন মস্তক মুণ্ডন করে, কিন্তু শিখা কর্ত্তন করে না। কেশ বা শ্মশ্রু কর্ত্তন শিখের পক্ষে নিষিদ্ধ। দাড়ি মুসলমানের মান্য পদার্থ। মস্তক মুণ্ডনে মুসলমানদিগের নিষেধ নাই; শিখা ধারণ তাহাদিগের পক্ষে অবিধি। হিন্দু, শিখ এবং জৈন কোটের বোতাম ডান দিকে এবং মুসলমান বাম দিকে রাখে। হিন্দু এবং জৈন পুরুষগণ ধুতি পরিধান

করে, শিখ জানু পর্য্যন্ত পাজামা পরে। মুসলমানগণের পাজামা ঢিলা। হিন্দু এবং বৌদ্ধদিগের নিকট লাল বা গৈরিক রঙের বস্ত্র পরিধান অবিধি নহে, তবে নীল রং হিন্দুর অবিধি। শিখগণ নীল বা শ্বেতবর্ণ পরিচ্ছদের পক্ষপাতী; কিন্তু গৈরিক রং তাহাদিগের নিকট ঘৃণ্য। মুসলমানগণেরও অনুরূপ প্রথা দৃষ্ট হয়। হিন্দু এবং জৈন মৃণ্ময় পাত্রে রন্ধন এবং পানাহার করে বটে, কিন্তু সেই পাত্রে আঁজি থাকা আবশ্যক। ধাতুপাত্র হইলে তাহা কাংশ বা পিত্তলের হওয়া চাই। মুসলমানদিগের মৃণ্ময় পাত্রে পানাহার নিষিদ্ধ নহে বটে, কিন্তু পাত্রে আঁজি কাটা হইবে না। ধাতু পাত্র হইলে তাহা তাম্রের হওয়াই বিধি। হিন্দু এবং শিখ প্রত্যহ স্নান করে; মুসলমান এবং বৌদ্ধের দৈনিক স্নানের নিয়ম নাই।

হিন্দু জৈন এবং শিখ অগ্নি সাক্ষী করিয়া বিবাহ করে। মুসলমানগণ উভয় পক্ষের মত লইয়া লোক সাক্ষী রাখিয়া দার-পরিগ্রহ করে। মুসলমানদের ত্বকচ্ছেদ একটি বিশেষ বিধি। শিখগণ বাপতিস্মা গ্রহণ করে। হিন্দু জৈন এবং শিখ শব দাহ করে, মুসলমান সমাধি দেয় এবং বৌদ্ধগণ হয় পুতিয়া ফেলে, নয় ফেলিয়া দেয়। কৃষকপত্নীগণ মাঠে স্বামীর সাহায্য করে। ব্রাহ্মণ কিম্বা ক্ষত্রিয়-রমণীর সে প্রথা নাই বলিয়া কৃষিকার্য্যে ভাড়াটিয়া লোক রাখিতে হয়। গৃহস্থালীকার্য্য মাত্রই স্ত্রীগণের অধিকৃত। গৃহকার্য্যে ত্রুটি হইলে রমণীগণ পুরুষদিগের নিকট হইতে তিরস্কৃত, এমন কি প্রহৃত হইয়া থাকে! নীচ রমণীরা পঞ্চায়ত দ্বারা শাস্য। একাধিক বিবাহ হিন্দু পুরুষদিগের নিষিদ্ধ নহে। রমণীগণ বয়স্থা অথবা অপুত্রক হইলে স্বামীকে অন্য বিবাহ করিতে পরামর্শ দেয়, কারণ তাহাতে তাহাদিগের গৃহকার্য্যের লাঘব হইয়া থাকে। বহুবিবাহ মুসলমানগণের নিষিদ্ধ নহে; সুতরাং তাহাদিগের অপত্যও অধিক হইয়া থাকে।

সভা-সমিতি। সাহিত্য এবং ধর্ম্ম সমিতিতে বারাণসী পূর্ণ। তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যেটি প্রধান, তাহার নাম কারমাইকেল্-লাইব্রেরি। ইহা ১৮৭০ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত। কারমাইকেল সাহেবের হুকুমে বাটীনির্ম্মাণের জন্য মিউনিসিপালিটি হইতে এক সহস্র মুদ্রা প্রদত্ত হয়। লাইব্রেরির আয় ১৯০০ টাকা। এই লাইব্রেরিতে "কাশী সুজন সমাজ" নামে একটি সমিতির অধিবেশন হইয়া থাকে। কাশীর সমধিক উন্নতি করাই উক্ত সমিতির উদ্দেশ্য। হিন্দি ভাষার উন্নতি কল্পে "নাগরী প্রচারিণী সভা" ১৮৯৩ খৃঃ স্থাপিত হয়। ইহার সভ্য-সংখ্যা ১৫০০ এবং বার্ষিক আয় ছয় সহস্র মুদ্রা। ইংরাজ সরকারও এই সমিতিকে সাহায্য প্রদান করিয়া থাকেন। মিত্রগোষ্ঠী নামে একটি সাহিত্য-সমিতি ১৯০২ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। সংস্কৃত শিক্ষাবিস্তারই এই সমিতির উদ্দেশ্য। সমিতির স্বীয় বাটী নাই এবং

আয়ও অল্প। বান্ধবসমিতি এবং সঙ্গীত সমিতি নামে বাঙালীদিগের দুইটি সমিতি আছে। ইহার সভাগণ বাঙালী। থিওসোফিক্যাল সোসাইটী নামে একটি সমিতি আছে। বিবি এ্যানিবেসান্ত ইহার সভাপতি। সমিতির সভা-সংখ্যা প্রায় পাঁচ সহস্র। শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল নামে হিন্দুদিগের একটি বৃহৎ সভা আছে। ইহার উদ্দেশ্য হিন্দুধর্ম্ম প্রচার। সভা-সংখ্যা অনূন সাত সহস্র। দারভাঙ্গাধীপ ইহার সভাপতি। এই সভার সহিত ভারতবর্ষীয় ধর্ম্ম প্রচারিণী সভা সম্মিলিত। ব্রহ্মশঙ্কর নামে একটি ধর্ম্মসভা বারাণসী ধামে প্রধান আড্ডা করিয়াছে। ইহার একটি বৃহৎ এবং সুন্দর অট্টালিকাও আছে। এতদ্ব্যতীত আর্য্য সমাজও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

উদ্যান। বারাণসীধামে অনেক উদ্যান আছে। তাহাতে সাধারণতঃ আম্রবৃক্ষই দেখা যায়। বারাণসী আমের জন্যই বিখ্যাত। উত্তমোত্তম পেয়ারা বারাণসীতে পাওয়া গিয়া থাকে। বাঁশ গাছও ভূরি দৃষ্ট হয়।

খনিজ পদার্থ। খনিজ পদার্থের মধ্যে যাহা মানবের ব্যবহারে আইসে তাহাদের নাম কঙ্কর, মৃণ্ময় ইষ্টক এবং "রে"। এতন্মধ্যে শেষোক্ত পদার্থটি উষর জমিতে দেখা যায়। 'রে' দেখিতে ঠিক লবণের ন্যায়। দেশী কাচ প্রস্তুতের জন্য "রে"র আবশ্যক হইয়া থাকে। রজকগণ সাবানের পরিবর্ত্তে "রে" ব্যবহার করিয়া থাকে। কঙ্করের খনি জেলার প্রায় সকল স্থানেই পাওয়া যায়। জমির চার ফিট নীচে কঙ্কর প্রাপ্তব্য। কঙ্কর চারি প্রকারের; যথা বিছোয়া, গাথিয়া, মাটিময়লা বা পাকালোয়া এবং ছাওয়ান। প্রথম দুইটি রাস্তা প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হয়। বিছোয়া এবং মাটিময়লা জ্বালাইয়া চুণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ছাওয়ান কঙ্কর কেবলমাত্র পুঁতিবার কার্য্যে আইসে। বিছোয়া এবং গাথিয়া কঙ্করের আকর গঙ্গার বাম তটে চৌবেপুর, চন্দ্রৌতি, টিক্রি এবং দক্ষিণ তটে বালুয়া, তাণ্ডা, ছনিয়ান এবং ডেঙ্গা; বরুণা-তীরে —রামেশ্বর এবং কোটা—চন্দৌলি তহশীল, আলিনগর, কানেরি, গঙ্গাপুরে ভিখিপুর ও ধামানপুর এবং বারাণসী তহশিলে রূপপুর, সরাইকাজি, দারুপুর, বরৌলী, ছুপেপুর, গোঁসাইপুর, নরপত-পুর নামক স্থানে দৃষ্ট হইয়া থাকে। মাটিময়লা কঙ্কর উল্লিখিত স্থানানিচয়ে পাওয়া যায়। ছাওয়ান কঙ্কর আলি-নগর, তেস্রা এবং বালুয়া ভিন্ন অন্য কোনো স্থানে দেখা যায় না। আকর হইতে কঙ্কর নিষ্কাষণের খরচা পদার্থ-কাঠিন্যে দেড় টাকা হইতে দুই টাকা পর্য্যন্ত প্রত্যেক এক শত ঘনফুটে পড়িয়া থাকে। মাইল প্রতি গাড়িভাড়া আট আনা হইতে বারো আনা পর্য্যন্ত; বারাণসীতে কঙ্কর নীত হইলে ৪॥০ টাকা হইতে ৫৷০ টাকা পর্য্যন্ত পড়ে। প্রত্যেক একশত ঘন ফুট ভাল কঙ্করের চুণ ২০।২১ টাকায়

পাওয়া যায়। ইষ্টক অনেক স্থানেই তৈয়ার হয়। ইষ্টকবিশেষে এক সহস্রের দাম ৫ টাকা হইতে ৮॥০ টাকা পর্য্যন্ত।

সপ্তদশ অধ্যায়।

ইতিহাস।

বেদব্যাস-প্রণীত কাশীখণ্ডে বারাণসীর সৃষ্টিসম্বন্ধে এরূপ লেখা আছে যে, একদা সপ্তর্ষিগণ বিষ্ণুর নিকট সমাগত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্‌ সাধারণ মানব সকল কিরূপে সহজে মুক্তিপ্রাপ্ত হইতে পারে? কারণ ঋষিরা কঠোর তপস্যা করিয়াও যখন ষড়রিপুকে সম্পূর্ণ বশ করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন সাধারণ মানব কিরূপে পারিবে। বিষ্ণু চিন্তা করিয়া একটি লিঙ্গমূর্ত্তি সৃজন করিলেন। তখন তাহা হইতে জ্যোতি নির্গত হইতে লাগিল। সৃজনকালে লিঙ্গ অর্দ্ধহস্ত পরিমিত ছিল, কিন্তু ক্রমশ বর্দ্ধিত হইয়া পঞ্চ ক্রোশ অধিকৃত করিল। ইহাই কাশী নামে খ্যাত। পৃথিবী এককালে জলে নিমগ্ন ছিল এবং লিঙ্গ সেই জলের উপর অচলভাবে অবস্থিতি করিলে বিষ্ণু দেখিলেন যে, স্থানটি ঋষিগণের আশ্রমের পক্ষে অতি সামান্য সুতরাং পৃথিবী সৃজন করিয়া লিঙ্গের চতুষ্পার্শ্বে স্থাপন করিলেন। এতদ্ধেতু কাশী পৃথিবীর কেন্দ্রস্বরূপ। পুরাতন কাশীর সীমার নিদর্শনস্বরূপ পঞ্চকোশী রাস্তা এখনো বিদ্যমান আছে।

কাশীর সৃষ্টি যে সময় হউক না কেন, পৌরাণিক সময়ে ইহার যে আদর অধিক ছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কাশী দুইটি নামে খ্যাত, যথা কাশী এবং বারাণসী। কাশী শব্দের উৎপত্তি বোধ হয় কাশ শব্দ হইতে হইয়াছে। পুরুবংশ-সম্ভূত কাশ নামক জনৈক রাজা হইতে কাশীর উদ্ভব হওয়াই সম্ভব। হরিবংশে কাশীরাজদিগের যে তালিকা আছে, তাহাতে দেখা যায় যে, কাশ নামক জনৈক রাজা পুরুর চতুর্থ পুরুষ নিম্নে। কাশী যে কোন্‌ সময় বারাণসীতে পরিণত হইয়াছে তাহা বলা সুকঠিন। পুরাণ, কাশীমাহাত্ম্য এবং কাশীখণ্ডে বারাণসীর স্থান বরুণা এবং অসির মধ্যে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং বরুণা এবং অসি শব্দযোগে বারাণসী শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। কাশীখণ্ডে লেখা আছে যে, কাশীর অধীশ্বর মহাদেব ; কিন্তু তিনি কৌশল দ্বারা রাজ্যভ্রষ্ট হন। মহাদেবের অনুপস্থিতিতে দেবগণ যখন নর্ম্মদা নদী-তীরে নূতন কাশী প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সভা করেন। ব্রহ্মা সেই অবসরে তাঁহার ভক্ত দিবোদাসকে কাশীরাজ্য অর্পণ করেন। মহাদেব প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার স্বরাজ্যে তাঁহার প্রবেশাধিকার আর নাই। মহাদেবের চর ধুন্দীরাজ দিবোদাসকে কোনরূপে পাপকার্য্যে রত করাইয়া তাহার দেবশক্তি অপহরণ করেন। এই সুযোগে মহাদেব দেববর্গে পরিবৃত হইয়া কাশী প্রবেশ করিয়া দিবদাসকে রাজ্যচ্যুত করেন। কলির প্রারম্ভ পর্য্যন্ত মহাদেব রাজত্ব করিয়া

অবিমুক্তেশ্বরকে রাজ্য সমর্পণ করত কৈলাসে গমন করেন। তদবধি কাশী অবিমুক্তেশ্বরের হস্তে আছে।

রামায়ণ ও মহাভারতে উক্ত আছে যে, বারাণসী কাশীরাজদিগের আবাসভূমি ছিল। কাশীর রাজাদিগের মধ্যে পুরূর প্রতিষ্ঠানে রাজত্ব করিতেন। প্রতিষ্ঠান এখন এলাহাবাদ নামে খ্যাত। ভাগবত পুরাণে কাশী কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধীভূত। আখ্যায়িকায় পুণ্ডরীক কাশীর এবং কৃষ্ণ দ্বারকার রাজা ছিলেন। উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকায় পুণ্ডরীক কৃষ্ণকে রণে আহ্বান করেন। ফলে পুণ্ডরীক হত হন; তাঁহার পুত্র সুদক্ষও পিতৃবৈরী নিধন করিতে গিয়া যমলোকে পিতার অনুগামী হন। কৃষ্ণের সুদর্শন এই সময়ে কাশীকে দগ্ধ করে। ইতিহাস বলেন যে, মহাভারতের বীর ভরত কাশীর রাজা ছিলেন। তাঁহার কেল্লা বড়া পরগণার বৈরন্ত নামক গ্রামে ছিল। অদ্যাপি সেই দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আমাদিগের নয়নপথের পথিক হয়। রাজা ভরত পাণ্ডবদিগের সহায় ছিলেন। তিনি এবং তাঁহার আত্মীয়বর্গ ঐ যুদ্ধে হত হন।

হিন্দুর ইতিহাস এই পর্য্যন্তই শেষ। পরে শাক্যমুনির আবির্ভাব হয়। ধর্ম্ম প্রচারের জন্য বারাণসীধামই তাঁহার কেন্দ্র ছিল। সারনাথে তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন এখনো দৃষ্ট হইয়া থাকে।

অতঃপর ভর এবং সৈরীগণের অভ্যুদয় হয়। গঙ্গার দক্ষিণ দিকে যে সকল ধ্বংসপ্রাপ্ত দুর্গ দেখা যায়, তাহা সৈরীগণের বলিয়া খ্যাত। বারাণসী জেলার অন্যান্য স্থান ভরদিগের অধিকৃত ছিল। অতঃপর কান্যকুব্জের রাজাগণ এবং পাটনার রাজাগণ কাশীর উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। গুপ্ত রাজাদিগের স্মৃতিচিহ্ন অদ্যাপি সৈয়দপুরে দৃষ্ট হইয়া থাকে। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দিতে বারাণসীধামে সহারওয়ার রাজপুতগণ শাসনদণ্ড লইয়া সমাগত হন। এই বংশের শেষ রাজার নাম বনর। ইঁহার দ্বারা রাজঘাটের দুর্গ নির্ম্মিত হয়। এই দুর্গটি বরুণা এবং গঙ্গার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। রাজা বনর মামুদ গজনবী দ্বারা হত হন। সহরওয়ার রাজপুতদিগের পতন হওয়ার পর বারাণসীধামের কতকটা কান্যকুব্জের রাঠোর রাজাদিগের হস্ত আইসে। এই বংশের শেষ রাজা জয়চাঁদ। অদ্যাপি তাঁহার তাম্রফলক আমাদিগের নয়নপথের পথিক হয়। রাজা জয়চাঁদ সাহাবুদ্দিন মহম্মদ ঘোরী দ্বারা নিহত হন। অতঃপর বহ্লুল লোদী বারাণসীধামকে দিল্লীর সম্রাটের রাজত্বভুক্ত করেন। ১৫২৯ খৃঃ কাশী বাবরের হস্তগত হয়। অতঃপর আকবরসাহ বারাণসীধামকে স্বীয় এলাহাবাদ সরকারভুক্ত করেন। আকবরের রাজত্বকালে বারাণসীধামে অনেক মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। জয়পুরের রাজা জয়সিংহ এই মন্দিরগুলির প্রতিষ্ঠাতা। সাজাহান তাঁহার পুত্র দারাসিকোকে বারাণসী

ধামের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। ইনি উপনিষদের এক তরজমা করেন। উহার ভূমিকায় লেখা আছে যে তিনি উক্ত কার্য্যের জন্য ১৫০ জন দণ্ডী নিযুক্ত করেন। পরে দুর্দ্দান্ত ঔরঙ্গজেব মন্দির দেখিলেই ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিলেন এমন কি কাশীর নাম পর্য্যন্ত লুপ্ত করিবার জন্য তাহার মহম্মদাবাদ নাম দিলেন। সংসারের কিছুই চিরস্থায়ী নহে; সুতরাং মহম্মদাবাদ নাম কালে লোপ পাইল, পুনরায় হিন্দুর কাশীর নাম কাশীই রহিল। মনসারাম এবং বলবন্ত সিংহ বিলোপোন্মুখ কাশীকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন।

১৭৭৫ খৃঃ হইতে ইংরাজরাজের অভ্যুদয় হয়। তদবধি কাশী ইংরাজ দিগের হস্তে আছে।

পরিশিষ্ট।

নদীগর্ভ

বারাণসীধামের যদি কিছু দৃশ্য দেখিতে চাও তবে একবার প্রাতঃকালে গঙ্গাতটে আসিয়ো। দেখিবে সূর্য্যদেব আরক্তিম বর্ণে প্রাচীদিক উদ্ভাসিত করিয়া উদিত হইয়াছেন গঙ্গাগর্ভ হইতে বাষ্পরাশি উত্থিত হইয়া ক্রমে আকাশে বিলীন হইয়া যাইতেছে। প্রাচী উষাদেবীর আরক্তিম বসনে সজ্জিত হইয়া উদয়োন্মুখ সূর্য্য-দেবকে আবাহন করিতেছেন! গঙ্গাপুত্র-গণ স্নাতকদিগকে নানারূপ কণ্ঠস্বরে আহ্বান করিতেছে। দেখিতে দেখিতে সূর্য্যদেব স্বীয় কিরণজাল বিস্তার করিলেন। সেই আলোকে দিগ্দিগন্ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। পক্ষিগণের কলরব, জলে স্নাতকদিগের ঝপ ঝপ শব্দ, নরনারীগণের ইতস্তত পদসঞ্চরণ, ঘাটিয়াগণের আহ্বানধ্বনি, বায়ুসঞ্চালিত মন্দিরের ধ্বজা-পতাকার আন্দোলন এবং ব্রাহ্মণদিগের বেদগান প্রভৃতিতে দৃশ্যটিকে অতি মনোরম করিয়া তুলিয়াছে। রমণীগণ সাজিতে পুষ্পমালা লইয়া দলে দলে বহির্গত হইতেছে। অদূরে মনিকর্ণিকা ঘাটে শবদাহ-জনিত ধূমরাশি উত্থিত হইতেছে। গঙ্গাগর্ভে সন্ন্যাসিদেহ-লোলুপ গৃধ্রগণ পরস্পর পরস্পরের সহিত কলহ করিতেছে। ঘাটে স্নানের পরও বিশেষ বিশেষ দৃশ্য আমাদিগের নয়নপথের পথিক হয়।

স্টেষণ হইতে জনপ্রবাহ দেখিয়া বুঝিতে পারিবে যে, কাশী হিন্দুদিগের কিরূপ পূজ্য। সহরের মধ্যে সন্ন্যাসিগণ বিবিধবর্ণের বস্ত্রে ভূষিত হইয়া ইতস্তত ধাবমান হইতেছে দেখিতে পাইবে। কৌপীনধারী হইতে গেরুয়াবসনপরিহিত-সন্ন্যাসিগণ, কেহ বা কমণ্ডলু, কেহ বা দণ্ড ধারণ করিয়া ঘরে ঘরে ভিক্ষার্থে ঘুরিতেছে। সহরে যেন আনন্দ উথলিয়া পড়িতেছে।

সমাপ্ত।

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী।

আমাদের কথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বিজ্ঞানের অননুমোদিত যে ধর্ম্ম, তাহা অধর্ম্ম। অতএব বিদ্যাসাগর যা বলেছেন তাই গ্রাহ্য;—কন্যার পুনর্বিবাহকালে জন্মদাতার গোত্রেরই উল্লেখ হবে, কারণ সেই বংশে তার জন্ম এ বিষয়ে ভুল নেই। যখন স্বামি-কুল ত্যাগ করে' স্বামিকুলের সঙ্গে সম্বন্ধ "অস্বীকার" করে' তিনি পুনরায় বিবাহে সম্মতা হয়েছেন, এবং পিতৃকুলে এসে আশ্রয় নিয়েছেন, তখন পুনরায় তিনি পিতৃগোত্রে স্থিতা হয়েছেন; অতএব পুনর্বিবাহকালে পিতৃগোত্রেরই উল্লেখ হওয়া উচিত।

চন্দ্র। তবে তো মেয়েরা ইচ্ছে কর্‌লেই যখন-তখন পিতৃগোত্রে ফিরবে?

হরি। যখন-তখন কেন? যদি নিঃসন্তান অবস্থায় স্বামীর মৃত্যু হয়, এবং যদি সেই বিধবা ইচ্ছা করেন, (ইচ্ছা করলে অবশ্য স্বামীগোত্রে থেকে ব্রহ্মচর্য্য পালন করতে পারেন) তবে তিনি পিতৃ-গোত্রে আসতে পারেন, নতুবা নয়।

চন্দ্র। তুমি যে এতক্ষণ বাক্‌চাতুরী করলে, কিন্তু শাস্ত্রের নজির তো একটিও দিলে না!

হরি। অনাবশ্যক বোধে।

চন্দ্র। শাস্ত্রের নজির অনাবশ্যক! এই আমি চল্লুম, তোমাদের সঙ্গে একত্রে উপবেশনেও পাপ আছে।

হরি। বসুন বসুন, রাগ করবেন না। একটা কথা শুনুন।

চন্দ্র। তোমার মাথা-মুণ্ড কি বলবে বল। আর কচ্‌কচি ভাল লাগে না—বেলা হ'য়েচে।

হরি। দেখুন, প্রথমত যদি নিরপেক্ষ ভাবে এবং হৃদয়হীন না হয়ে বিচার করি তবে দেখতে পাই যে, বর্ত্তমানে বিধবা-বিবাহ প্রচলন হওয়া উচিত। যখন বিধবা-বিবাহ প্রচলন করাই বর্ত্তমানে সম্পূর্ণ উচিত এবং সমাজের কল্যাণকর, তখন ব্যবস্থাও বাহির করা যাবে, এবং গিয়েছে। অবশ্য আমি শাস্ত্রের অননুমোদনে এমন একটি গুরুতর ব্যাপারে অগ্রসর হতে পরামর্শ দিই নে। মায়ের জাত, লক্ষ্মীর জাত, স্ত্রীজাতির প্রতি নৃশংস হয়ে, তাঁদের উপর অত্যাচার প্রভুত্ব নিষ্ঠুরতা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে, নিজে সুখভোগ করব বলে তর্ক সুরু করলে, কারো বাপের সাধ্য হবে না যে, তাঁকে তর্কে পরাস্ত করবে। কিন্তু তাই কি মনুষ্যত্ব?

চন্দ্র। কিন্তু বিধবাবিবাহ আরম্ভ হলে, পবিত্র সমাজটা কেমনতর হ'য়ে দাঁড়াবে, একবার ভেবে দেখ দেখি। হায়, হায়, হিন্দুর এমন সুন্দর আদর্শ—এ তোমরা ভাঙ্‌তে চাও?

হরি। ভাঙ্তে চাইনে; আদর্শ রক্ষা করতে কারো নিষেধ থাকবে না। এখন ব্রাহ্মণেরা ম্লেচ্ছের দাসত্ব করচেন বলে অধ্যাপক নিষ্ঠাবান ব্রহ্মচারী ঋষিতুল্য ব্রাহ্মণ হবার কারো নিষেধ নেই—আছেনও অনেক। ব্রহ্মচারিণী বালবিধবা চিরকালই আমাদের চক্ষে দেবী-সদৃশা বরণীয়া এবং পূজ্যা থাকবেন। যিনি আপন কন্যা ভগ্নী অথবা পিতৃকুলে উত্তম আশ্রয় হীনা পুত্রবধূ অথবা ভ্রাতৃবধূকে উপযুক্তরূপ ব্রহ্মচর্য্যপালন শিক্ষা দিয়ে, তাঁদের স্বর্গের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখতে সাহায্য করবেন, তিনি নিজেও পূজনীয়, পুণ্যাত্মা এবং স্বর্গের অধিকারী। আদর্শ ভাঙার কথা বলছেন, কিন্তু আপনারা কালের স্রোতে কোথায় এসে পড়েছেন? নিজের কালের সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা চলে এসেছেন, মাঝে পড়ে এই বেচারীদের কোথায় ফেলে রেখে আসতে চান? থাকতে পারবে কেন? আপনাদের মধ্যেই স্ত্রীলোকদিগকে বর্দ্ধিত প্রতিপালিত হতে হয়, আপনাদের হাতেই তাঁদের শিক্ষা-দীক্ষা, আপনারা যদি একটুও ব্রহ্মচর্য্য দেখাতে পারেন, তবেই তাঁদের উপর এত বোঝা চাপানো শোভা পায়, স্বাভাবিক হয়। এদিকে শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকেরা বুঝতে পারচে যে, তারা শেয়াল কুকুর নয়। স্ত্রীলোকের উপর আমরা যে অযথা অত্যাচার করি, একথা একটু ভেবে দেখ্‌লেই বুঝতে পারবেন। দেখুন না কেন, যে বঙ্কিম বাবু "বিষবৃক্ষে" বললেন, "বিধবার যে বিবাহ দিতে চায় সে যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে?" তিনিই শেষটা তাঁর "নবীনা ও প্রাচীনা" নামক প্রবন্ধে স্বীকার করেছেন যে, "আমরা নিজেরা যথেচ্ছাচারী, অথচ স্ত্রীলোক বালিকাবয়সে বিধবা হলেও তাকে আর বিবাহ দিতে দিই না!"

চন্দ্র। ভাল কথা। শাস্ত্রে বিধবার যে সকল নিয়ম প্রতিপালনের কথা আছে,—যেমন কেশবিন্যাস, বেশভূষা, তাম্বূল, উত্তম শয্যা, সুন্দর পুরুষের সহিত আলাপন ইত্যাদি পরিহার। কিন্তু এখন থেকে মেয়েরা বিধবা হলে আর তা পালন করবে না! স্বামী মরলেও দস্তুরমত বেশবিন্যাস চলবে! কেননা বিবাহ আবার তো হবে।

হরি। বলেন কি? পরপুরুষের সহিত স্বামীর বিনানুমতিতে আলাপন তো সধবারও মহাপাপ। আর স্বামী যার নেই, যে বিধবা হয়েছে, তার তো নিশ্চয়ই এসকল কঠোর নিয়ম পালন করতে হবে। সে যে বিধবা! আবার যখন সধবা হবে (অবশ্য নিঃসন্তান অবস্থায়) তখন স্বামীর চিত্তরঞ্জনের জন্য বেশভূষাদি করবে; বয়স্থা স্ত্রীলোকের স্বামীর চিত্তরঞ্জন ব্যতীত বেশভূষার অন্য উদ্দেশ্য হিন্দু কল্পনা করতে পারে না। কেমন করেই বা সে জানবে যে, তার বিবাহ হবেই? বিবাহ হলে তখন অন্য কথা। দেখুন না কেন, স্বামী প্রবাসে

থাকলেও হিন্দু স্ত্রীর অনেক নিয়ম প্রতিপালনের ব্যবস্থা আছে; যথা,—কবরীবন্ধন, বেশবিন্যাস, উৎসবে নৃত্যগীতে উপস্থিতি ইত্যাদি নিষিদ্ধ। যিনি আপনার আশ্রিতা বিধবাকে (যতদিন পুনর্বিবাহ না হয়) এ সকল নিয়ম পালন না করান, তিনি ঘোর মূর্খ, এবং বিধবার ব্যভিচারের প্রশ্রয়দাতা বলে গণ্য—অতএব অধার্ম্মিক ও অহিন্দু।

চন্দ্র। আর একটি কথা। স্ত্রীলোক বিধবা হলে তার পতিকুলের অভিভাবকই তো 'গার্জিয়ান' (guardian) থাকবেন; তিনি যদি এই বিধবার বিবাহ দিতে না দেন?

হরি। প্রথমত সপ্তদশ বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হলেই স্ত্রীলোক আইনের চক্ষে সাবালিকা হলেন; তখন তিনি আপনার স্বেচ্ছানুসারে পিতার, ভ্রাতার, শ্বশুরের বা দেবরাদির ঘরে আশ্রয় বেছে নিতে পারেন। কিন্তু স্বেচ্ছার কথা ছেড়ে দিলেও, আমার বিবেচনায়, যদি পিতৃকুলে উত্তম আশ্রয় থাকে এবং তাঁরা আশ্রয় দেন, তবে বৈধব্যের পরে বালবিধবার পিতৃকুলেই আশ্রয় লওয়া কর্ত্তব্য; এবং তাই-ই সচরাচর হয়ে থাকে, দেখা যায়। কারণ, পিতৃকুলের স্নেহ ও অনুরাগ স্বাভাবিক, এবং স্বামী-অভাবে পিতৃকুল হতেই অধিক হিতের এবং যত্নের আশা করা যায়। অতএব বালবিধবার পক্ষে পিতৃকুলই উপযুক্ত আশ্রয়, এবং পিতৃকুলের অভিভাবকই (যদি বালিকার আপত্তি না থাকে, এবং তিনি আবশ্যক বোধ করেন) নিঃসন্তান বালবিধবার পুনর্বিবাহ দিতে পারেন।

চন্দ্র। অর্থাৎ প্রফুল্লর ভগ্নীর বিবাহ প্রফুল্লই কর্ত্তা হয়ে দেবে;—শ্বশুরকুলের কেহ আপত্তি করতে অথবা অভিভাবকতার দাবী করতে এলে তার অর্দ্ধচন্দ্রের ব্যবস্থা করবে! তোমাদের যুক্তি এই যে, যাকে সম্প্রদান করলুম, সে এক মাসের ভিতরেই পটল তুলল, আর তার বাড়ীর লোকেরা কি না এখন আমাদের এত আদরের এত যত্নের মেয়েটাকে নিয়ে গিয়ে যা-ইচ্ছে তাই করতে বসবে,—সংসারের একটা বাঁদী রাখবে। স্বভাব চরিত্র, স্বাস্থ্য ইত্যাদি কিরূপ হয়ে যেতে পারে তার ঠিকানা নেই, তারা তো "পর", তাদের তো আঁতে ঘা লাগবে না;—এই সব আর কি,—কেমন?

হরি। আজ্ঞে অনেকটা তাই-ই বটে।

চন্দ্র। আমি এ সবের মধ্যে থাকতে পারি নে। সরলার জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত, তার ম্লান কচি মুখখানির দিকে চাইলে আমার এ বৃদ্ধ বয়সের কঠিন বুকও ফেটে যায় সত্য। কিন্তু,—বিধবার আবার বিয়ে!! মনে হ'লেও গা ঘিন্ ঘিন্ করে' ওঠে। কেবল তোমাদের দৌড় কতদূর তাই দেখবার জন্যই আমি এসেছিলুম। আর সত্য ছোঁড়াটা বড় ভাল ছেলে, আমাদের খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা করে; প্রফুল্লটাও পাগলো, আর চিরকাল আবদেরে, ওদের অনুরোধ এড়াতে

পারি নি। এখন যথেষ্ট বিস্ময়প্রকাশ করা হয়েছে তো? বেলা হয়েছে, আহারাদির চেষ্টায় যাও।

এই বলিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গাত্রোত্থান করিলেন। আমরা তাঁহার ও তর্করত্ন মহাশয়ের পদধূলি গ্রহণ করিলাম। সভাভঙ্গ হইল। তর্করত্ন ঠাকুরদাদাকে বাড়ী পৌঁছাইবার জন্য আমি ছাতা লইয়া সঙ্গে চলিলাম। সকলে আপন আপন গৃহে চলিলেন।

৮

ক্ষুণ্ণমনে শুষ্কমুখে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। সরলার তবে আর বিবাহ দিতে পারিলাম না! চন্দ্রনাথবাবু বুঝিয়াও বুঝিলেন না, শুনিয়াও শুনিলেন না? তিনি ধনে, মানে, কুলে, শীলে, গ্রামের শীর্ষস্থানীয়; তাঁহার অসম্মতিতে আমিই বা কি করিব, সত্যেন্দ্রনাথই বা কি করিবেন? তর্করত্ন মহাশয় এবং অন্যান্য পণ্ডিত মহাশয়েরা অর্থে বশ হইতেন, কিন্তু চন্দ্রনাথবাবুর সম্মতি কেমন করিয়া পাই?

এমনি করিয়া কিছুদিন কাটিল। আমাদের নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে বিলক্ষণ আন্দোলন চলিতে লাগিল। সকলেই একবাক্যে আমার সাহায্য করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। সকলেই শেষে স্থির করিলেন যে, আমরা না হয় একটা পৃথক সম্প্রদায় গঠন করিব। সেকেলেদের, গোঁড়াদের ত্যাগ করিতে হয় করিব। আমাদের একঘরে করিতে যাইয়া প্রকারান্তরে তাঁহারাই একঘ'রে হইবেন,—কম্বলের লোম বাছিয়া বাছিয়া একখানি পৃথক কম্বল বুনিতে বসিব, প্রথম কম্বল আপনিই লোপ পাইবে। পাত্রও স্থির হইল। কয়েক মাস পূর্ব্বে যে যোড়শীর চিকিৎসায় গিয়াছিলাম, তাঁহার স্বামী ওকালতী পাশ করিয়া আলিপুরে প্রাক্‌টিস্ করিবেন স্থির করিয়াছেন। অনেক সুন্দরী কুমারী তাঁহার সম্মুখে ধরিয়া তাঁহার দাদা, বন্ধুবর্গ এবং বৌদিদি তাঁহাকে বিবাহে প্ররোচিত করিতেছেন। কিন্তু সবই বিফল হইয়াছে। সংসারের কথা বলিলে তিনি বলেন, "বিদেশে যখন থাকবো তখন অর্থভোগী ভৃত্যেরা আমার সেবা করবে, অসুখ-বিসুখ হলে ছুটে বৌদিদির কাছে আসবো। তিনি কি আমায় ক্রোড়ে স্থান দেবেন না? আমি যে তাঁর বড় ছেলে, তিনি যে আমার মা, বৌদিদি ঘরে আসা অবধি আমি যে মায়ের অভাব বুঝতে পারি নি" বলেন আর কাঁদেন! বলেন, "একটি ছেলেতো হয়েছে, না বাঁচে, দাদার পুত্রের দ্বারা পিতার বংশরক্ষা হবে। যে দিন সে মরেছে, সেইদিন আমিও মরেছি।" এই সকল প্রলাপ তাঁহার মুখে সর্ব্বদা শুনিতে পাওয়া যায়। অথচ অন্য প্রসঙ্গে স্থির, অবিচলিত, প্রফুল্লবদন, মিষ্টভাষী, কার্য্যতৎপর এবং উৎসাহী।

একদিন সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহাকে অন্যান্য অনেকগুলি বন্ধুবান্ধবসমেত নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। আমাদের গ্রামেরও অনেক

নবাযুবক সেই সঙ্গে রহিলেন। আগারান্তে সকলে মিলিয়া তাঁহাকে সরলাকে বিবাহ করিবার জন্য ধরিয়া পড়িলেন। তিনি স্বীকার করিলেন,—"প্রফুল্লবাবুর ভগ্নীর নিশ্চয়ই বিবাহ হওয়া উচিত" এবং এ বিষয়ে সাহায্য করিতেও প্রতিশ্রুত হইলেন। কিন্তু নিজে বিবাহ করিতে চাহিলেন না। বলিলেন, "আমার স্ত্রী আছেন।" এবং পকেট হইতে একখানি সুন্দর ফটো বাহির করিয়া দেখাইলেন—সেখানি তাঁহার মৃতা সহধর্ম্মিণীর। ঝাড়া পাঁচ ঘণ্টা সকলের সমবেত অনুরোধ, উপরোধ এবং যুক্তিপ্রদর্শন ও প্ররোচনার পর অবশেষে কেবল example set করিবার জন্য এ কার্য্যে স্বীকৃত হইলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ সরলাকে দেখাইতে চাহিলেন, তাহাতে তিনি বলিলেন "অনাবশ্যক।" তারপর সত্যেন্দ্রনাথ সরলার গুণব্যাখ্যা করিয়া যখন রূপের কথা বলিলেন, তিনি লজ্জিতভাবে বলিলেন, "আজ্ঞে আমি তো এ সব কথা কাউকে জিজ্ঞাসা করি নি—ক্ষমা করবেন।" তথাপি সত্যেন্দ্র বলিলেন, "প্রফুল্লকে দেখলেই আমার শ্যালিকাকে দেখা হ'ল—সব এক ছাঁচ।" এই কথার পর অন্য কথা উঠিল।

বাস্তবিক আমরা ভাই-বোনে সব দেখিতে এক—এক ছাঁচ, এক রং, এক গড়ন। আমার ভগ্নীদের রূপ গুণের সুখ্যাতি গ্রাম-গ্রামান্তরেও ছিল। মালতী ভিন্ন তাহাদের জোড়া নিকটে কমই ছিল। ইনিও বোধ হয় তাহা লোক-মুখে শুনিয়া থাকিবেন। একবার দুর্গোৎসবের বিজয়ার দিন আমাদের নদীতে বা'চ হইতেছে, তখন মেজদির বয়স একাদশ বৎসর, বিবাহ হয় নাই ;—তিনি এলোচুলে আল্‌বার্ট কাটিয়া (না প্রায় তাঁকে এলোচুলেই রাখিতেন) সাজিয়া গুজিয়া পাড়ার আর আর মেয়েদের সঙ্গে নদীর ধারে দাঁড়াইয়া ঠাকুর দেখিতেছিলেন ;—শারদসায়াহ্নের চিক্‌চিকে পড়ন্ত রৌদ্র তাহার মুখের উপর পড়িয়াছিল ; তাই দেখিয়া নটাবেড় গ্রামের বৃদ্ধ দেওয়ানজি মহাশয় তাঁহার নৌকায় বসিয়া বলিয়াছিলেন, "জলের প্রতিমা দেখিব, না ঐ ক্ষুদ্র ডাঙার প্রতিমা দেখিব, ভাবিয়া পাইতেছি না।"

পাত্রও স্থির হইল, দলও বাঁধা হইল, অনেক কষ্টে মেজদি ও সরলাকে রাজী করাইলাম। সব ঠিকঠাক্। সরলাকে মেজদি আপনার বাড়ীতে লইয়া গেলেন। একজন সুশিক্ষিত স্মৃতিশাস্ত্রবিৎ পুরোহিত পৌরোহিত্য করিতেও রাজী হইলেন। সব প্রস্তুত—দুদিন পরেই বিবাহ। এমন সময় সরলা কি না পলায়ন করিয়া শ্বশুরালয়ে চলিয়া গেল! তাহার মনের ভাব কেন এমন হইল? ভাল, চিরকাল কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারে, সেতো ভাল কথা। থাকুক—

মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥

(ক্রমশঃ) শ্রী প্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

মার্কিণ ও বঙ্গমহিলা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সংসার

আমেরিকার মহিলারা বলেন :—"অমুকের শুধু টাকা আছে বলে বিবাহ করিয়ো না, এবং যাঁহার টাকা নাই তাঁহাকেও বিবাহ করিয়ো না, কিন্তু যাঁহার টাকা রোজগার করিবার ক্ষমতা আছে, তাঁহাকেই বিবাহ করিয়ো।" সুদূর পাশ্চাত্য দেশের লোকেরাও "ষোড়শী বালিকার" (sweet sixteen) পাণিগ্রহণে ইচ্ছুক। কারণ অধিক বয়সের মেয়েরা সহজে বিবাহে মত প্রকাশ করেন না। সুতরাং সুদীর্ঘ কোর্টসিপের প্রয়োজন। পরিশেষে এমন ঘটে যে, ঐরূপ যুবতীর অনেকগুলি প্রার্থী (suitor) হয়। এবং নিজে tasted girl নামে দশের নিকট পরিচিত হন।

কোনো কোনো মার্কিণ মহিলা বেশি সন্তান হওয়া পছন্দ করেন না; তাঁহারা তাঁহাদের ক্ষমতা অনুযায়ী যে কয়েকটিকে মানুষ করিতে পারিবেন তার বেশি সন্তান ভগবানের নিকট কামনা করেন না। কেহ কেহ অন্তঃসত্বা হইবামাত্র, যতদিন না সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, ততদিন তিনি যে ঘরে বেশিক্ষণ থাকেন সেই ঘরটিকে বিশেষভাবে সাজাইয়া রাখেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ঘরটি যদি বক্তার ছবিতে সজ্জিত থাকে, তবে সে-গর্ভের পুত্র বড় বক্তা হইবে, যদি প্রচারকের ছবিতে সজ্জিত থাকে, তবে সেই গর্ভের পুত্র একজন ধর্ম্মপ্রচারক হইবে, যদি সুন্দরী বালিকার ছবিতে সজ্জিত থাকে, তবে সেই গর্ভে সুন্দরী বালিকার জন্ম হইবে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে, তখনি তাহাকে ওজন করা হয়। তারপর যখন বাৎসরিক শিশু প্রদর্শনী (Baby show) হয়, তখন শিশুকে প্রদর্শনীতে পাঠান হয়, প্রদর্শনী কার্ডে শিশুর মাতার নাম, বয়স, ওজন ও প্রথম বা দ্বিতীয় সন্তান তাহাও লেখা থাকে। সে দেশের মাতারা সতত চেষ্টা করেন ও এমনভাবে জীবনযাপন করেন যাহাতে বলিষ্ঠ শিশু প্রসব করিতে পারেন, এবং যাহাতে ভবিষ্যতে আমেরিকার বংশ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বংশ বলিয়া গণ্য হয়। আমাদের দেশে ঐ রকম শিশু-প্রদর্শনী মধ্যে মধ্যে খুলিলে ভাল হয় না কি?

আমাদের দেশে যদি কাহারো একটি কন্যা ভূমিষ্ঠ হয়, আমরা সকলেই একটু ত্রস্ত হই। কারণ সে মেয়ের বিবাহ দিতে হইবে, অনেক টাকার দরকার হইবে, এবং পরিশেষে সে পরগৃহে চলিয়া যাইবে।

আমেরিকাতে কন্যা ভূমিষ্ঠ হইলে সে পরিবারে খুবই আনন্দ, কারণ সেই মেয়ের বিবাহ দিলে সেই পরিবারে আর একটি সন্তান (অর্থাৎ ভাবী জামাতা) হইবে। আমেরিকাতে আমি যে পরিবারে ছিলাম, সেই পরিবারের পুত্রবধূ যখন পিতৃ-আলয়ে যান, তখন তাঁহার শ্বশুর তাঁহাকে চুম্বন করিলেন দেখিয়া আমি Rev. Poeকে (যিনি এই বাড়ীর কর্ত্তা ও পুত্র-বধূর শ্বশুর) বলি—আমাদের দেশে এরূপ প্রথা নাই। তিনি তদুত্তরে বলেন,—"আমরা আমাদের জামাতা ও পুত্রবধূকে আপনার পুত্র কন্যার ন্যায় দেখিয়া থাকি।"

আমেরিকার কোনো কোনো মহিলা স্বামী অপেক্ষা বেশি মিতব্যয়ী। একবার একজন স্বামী তাঁহার স্ত্রীকে বলেন,—"তুমি কেন মিসেস্ অমুকের মতন পোষাক পরিতে পার না?" তদুত্তরে স্ত্রী বলিলেন,—"আমাদের টাকায় কুলিয়ে উঠে না।" হোটেলের waiterদের বলিতে শুনিয়াছি, যে ডিনার পুরুষের কাছে সস্তা-মনে হয়, তাহা স্ত্রীলোকদিগের নিকট মহার্ঘ।

সম্মান।

নারীজাতি কিরূপ সম্মান পাইয়া থাকে, তাহা যদি পাঠক পাঠিকা দেখিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমেরিকায় তাহা দেখিতে পাইবেন। সভাতে, ক্লাবে সকল স্থানেই মহিলাদিগকে সর্বোচ্চ ও সর্বোৎকৃষ্ট স্থান দেওয়া হয়। ট্রাম গাড়ীতে কিম্বা রেলগাড়ীতে ভ্রমণ করিবার সময় যদি গাড়ীতে স্থান না থাকে, তবে কোনো-না-কোনো পুরুষ স্বীয় স্থান তৎক্ষণাৎ রমণীর জন্য ছাড়িয়া স্বয়ং দাঁড়াইয়া যাইবেন। দোকানে কোনো দ্রব্য ক্রয় করিতে যাইতে পুরুষের পরে যে মহিলা কিছু কিনিবার জন্য আসেন, তাঁহাকে আগে কিনিতে দিয়া পুরুষ পরে কিনিবেন বলিয়া অপেক্ষা করিয়া থাকেন। রমণীর সহিত একত্র বেড়াইতে বাহির হইলে, জনতাতে রমণীকে আগে হাঁটাইয়া পুরুষ তাঁহার বা ধরিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ থাকেন। দুরন্ত শীতে গির্জ্জাতে ঢুকিয়া যখন মহিলারা ভারী over-coat খুলিয়া বসেন, তখন পার্শ্বস্থিত ব্যক্তিরা সেই over-coat তাঁহাদের গায়ে পরাইয়া দিবার জন্য সাহায্য করিয়া থাকেন। টাইটানিক্ জাহাজ যখন আটলান্টিক্ মহাসাগরে ডুবিয়া যায়, তখন জীবন-রক্ষার্থে নৌকা করিয়া আরোহীদিগকে বাঁচাইবার জন্য এই নিয়ম ঘোষণা করা হয়—প্রথমে শিশু সন্তানেরা, তাহার পর মহিলারা তাহার পর পুরুষেরা ক্রমে ক্রমে জীবনরক্ষার নৌকাতে উঠিবেন। আসন্ন বিপদকালেও সেখানে রমণীকুল সম্মান পাইয়া থাকেন।

শ্রীসত্যশরণ সিংহ।

পাচন ও মুষ্টিযোগ।

ঘুসুড়া

সেকালের প্রাচীনা গৃহিণীগণ, এমন কি কবিরাজ মহাশয়রাও কাহারো পুরাতন জ্বর হইলে ঘুসুড়া ঔষধ ব্যবস্থা করিতেন। এই ঘুসুড়া ঔষধ পুরাতন জ্বরে মহা উপকারী। আজকাল জ্বর হইলেই প্রায় পুরাতন জ্বরে দাঁড়ায়। পুরাতন জ্বরে মূল্যবান্ ডাক্তারি বা কবিরাজী ঔষধ সেবন না করিয়া পল্লীবাসী গৃহস্থগণ অনায়াসেই গৃহে বসিয়া এই ঔষধ প্রস্তুত করত সেবন করিয়া দেখিতে পারেন; ইহাতে উপকার হয় কি না। সেকালে ইহা সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইত, তখন এত ডাক্তার কবিরাজ ছিল না লোকে নিজ নিজ চেষ্টাতে বিনাব্যয়ে রোগ হইতে আরোগ্যলাভ করিতেন। দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান সময়ে এই মহা উপকারী ঔষধের নাম পর্য্যন্ত অনেকে জানেন না! অতএব কিপ্রকারে ইহা প্রস্তুত ও সেবন করিতে হয়, তাহা বলা বোধ হয় অনাবশ্যক হইবে না। নানাবিধ পেটেণ্ট ঔষধ ব্যবহার অপেক্ষা লোকে ইহা ব্যবহার করিলে সুফল লাভ করিতে পারেন।

ঘুসুড়া প্রস্তুতের নিয়ম।

গুলঞ্চ, ক্ষেৎপাপড়া ও শিউলিপাতা (কাহারো কাহারো মতে অথবা প্রয়োজন বুঝিলে আদাও একভাগ দেওয়া হয়) এই তিনটি দ্রব্য প্রত্যেকটি সমান পরিমাণ লইয়া একত্রে অল্প থেঁতো করিয়া কচি কলাপাতাদ্বারা চারি পাঁচ পুরু করিয়া বাঁধিতে হইবে। অনন্তর সেই পুঁটুলির উপর-নীচে ঘুঁটের আগুন দিয়া যাহাতে পুঁটুলি মধ্যস্থ ঔষধগুলি উত্তমরূপে সিদ্ধ হয় তত সময় রাখা উচিত। পরে শীতল হইলে কলাপাতা খুলিয়া ঔষধটি গ্রহণ করিবে। এই ঘুসুড়ার রস প্রতিদিন সকালে দুই তোলা ও বৈকালে দুই তোলা অল্প মধুর সহিত সেবন করিলে বিশেষ উপসর্গহীন প্রায় অধিকাংশ পুরাতন জ্বরের শান্তি হইয়া থাকে। বাসী ঘুসুড়ায় তত উপকার হয় না। প্রতিদিন নূতন নূতন করিয়া খাওয়াই ভাল।

(স্বাস্থ্য সমাচার)

রবি ও শশী।

নবীন তপনে হেরি লোহিত বরণ,
ম্লান শশী কহে ধীরে বিষাদে মগন;—
"যবে আমি পুনরায় হইব উদিত,
হবে তব দীন দশা হাসি-বিরহিত।"

কহে রবি, "তেজোহীন অবোধ চন্দ্রমা,
মোর করে তব কর জানে সেই অমা;
জাননা অবোধ তুমি সতের ধরণ,
উদয়ে বিষাদে মোর একই বরণ।"

শ্রীননীবালা দেবী।

সংবাদ।

১। এইরূপ শুনা যাইতেছে যে ২রা এপ্রেল বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ মহোদয় বোম্বাই বন্দর হইতে ডাক-জাহাজে স্বদেশ যাত্রা করিবেন। ভাবী বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ড ২১শে মার্চ্চ বোম্বাই বন্দরে পৌঁছিবেন।

২। হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুর অখিল ভারতবর্ষীয় মুসলমান শিক্ষাসমিতির ভাণ্ডারে প্রচুর অর্থ দান করিয়াছেন।

৩। ডাক্তার সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নরনারীর দুঃখমোচনের জন্য "ফাল্গুনী" নামক একখানি নাটকের অভিনয় করিয়াছিলেন, এই অভিনয়ে ৮১৭১ টাকা উঠিয়াছিল। এই অর্থ সমুদয়ই দুর্ভিক্ষে দান করিয়াছেন। অভিনয় ব্যাপারে ১০৩৩ টাকা ব্যয় হইয়াছে। এই টাকা সমস্তই শ্রীযুক্ত সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়গণ বহন করিয়াছেন।

৪। সম্প্রতি অষ্ট্রিয়ানগণ এক প্রকার নূতন যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছে শুনা যাইতেছে। এই যন্ত্র হইতে ৮০ হাত দীর্ঘ অগ্নিশিখা বহির্গত হয়।

৫। বরদার মহারাজা গায়কোয়াড় সরকারী বিদ্যালয়সমূহে ছাত্রগণের দৈহিক অবনতির কারণ অনুসন্ধান করিয়া অবধারণ করেন, ছাত্রগণের উপযুক্ত আহারের অভাবই তাহাদের দৈহিক অবনতির কারণ। ইহার প্রতিকারার্থে তিনি বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের জন্য বিনামূল্যে উপযুক্ত জলখাবারের ব্যবস্থা করেন। এই ব্যবস্থায় ছাত্রদিগের স্বাস্থ্যের আশাতিরিক্ত উন্নতি হইয়াছে। এদেশের অধিকাংশ ছাত্রই অনাহারে গুরুতর পরিশ্রম করিয়া অকালে প্রাণত্যাগ করে। এই ব্যবস্থা যদি এদেশে করা হয় তাহাহইলে ছাত্রগণের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।

৬। স্ত্রীশিক্ষাবিস্তার। সংপ্রতি মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট ৩ মাসের মধ্যে ৪৪টি বালিকাবিদ্যালয় স্থাপনের নিমিত্ত ২০ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের এই কার্য্য বিশেষ প্রশংসনীয়।

৭। পুণা মহিলাশ্রমের প্রধান শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী কৃষ্ণবাই ঠাকুর ও অধ্যাপক কার্ভে এলাহাবাদে আসিয়া মিঃ সি, ওয়াই, চিন্তামণির নেতৃত্বাধীনে এক সভায় স্বতন্ত্র মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন।

বামারচনা।

সুভদ্রা-পরিণয়।

কোদণ্ড টঙ্কারে সুরাসুর নরে
তুমি যবে করিয়া কম্পিতকায়।
কেন গো ফাল্গুনী হ'য়ে বীরমণি
রৈবতক দুর্গে লইয়া আশ্রয়।
গুণময় গাণ্ডীব করিয়ে নির্জ্জীব
নাহি জানি এখন কাহার শরে
হইয়ে আহত ত্যজি বীরব্রত
কাটাইছ কাল অধীর অন্তরে।
হেন অনুমানি বুঝি হৃদিখানি
যাদব-কুমারী করিয়াছে জয়।
চারু উপবনে সুভদ্রার সনে
হইয়াছে বুঝি চিত্ত-বিনিময়!
অথচ নেহারি বেশে ব্রহ্মচারী
আচরণে তার বিপরীত ভাব।
সন্ন্যাসী ধরম চিত্তের সংযম,
কুলবালা-পরে দৃষ্টি অসম্ভব।
পাণ্ডবগৌরব সব পরাভব
নারী-হস্তে আজি পাণ্ডুকুলমণি।
ত্রিভুবন জয় করিয়ে বিজয়
রহিলে হেথায় পরাজয় মানি।

যাহার কারণে রয়েছ এখানে
সে যে অসামান্যা রমণীকুলে।
বসুদেবাত্মজা শ্রীকৃষ্ণ-অনুজা
অনুপমা বামা হয় এ ভূতলে।
আশ্রয়দাতার প্রতি এ প্রকার
অনুচিত তব হেন ব্যবহার।
আতিথেয় ব্রত করি বিধিমত
যাদবের এই যোগ্য পুরস্কার।
রেবতীরমণ শুনিবে যখন
কেমনে সে রোষে পাইবে ত্রাণ?
দাবানল সম যে ক্রোধ বিষম
জলধির জলে না হবে নির্ব্বাণ।
অথবা যে পদ ভবের সম্পদ,
সে শ্রীপদে যবে লয়েছে শরণ।
ভদ্রা-পাণিতল তব করতল
সংশয় ইহাতে নাহিক কোন।
ধন্য কালীদাস ভারতীর দাস
তোমার অতুল কল্পনার বলে
ভদ্রা-পরিণয় নরনারীচয়
হেরে ধন্য হলো এ ধরণীতলে।

শ্রীসরলাবালা বিশ্বাস।

---

৩৭ নং মধুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

৫৩ বর্ষ

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

চৈত্র, ১৩২২—এপ্রেল, ১৯১৬

সূচী

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২।৵৹ অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য
প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য।৹ চারি আনা মাত্র।

বামাবোধিনী পত্রিকা

No 632 March, 1

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"
কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি-এ কর্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৩ বর্ষ। ৬৩২ সংখ্যা। | চৈত্র, ১৩২২। এপ্রেল, ১৯১৬। | ১০ম কল্প ৪র্থ ভাগ

নিবেদন।

(১)

শিশির-সিক্ত শ্যামল পত্র, তরুণ-অরুণ-রাগে
ঝলকিলে যবে পুলকে উলসি' বিহগের গীতি জাগে,
নিত্য নবীন মাধুরী ফুটিয়া কুসুমে লুটিয়া হাসে,
তখন যেন গো তোমারি বদন দেখি গো প্রভাত-বাসে।

(২)

দীপ্ত-দ্বিপ্রহরের রৌদ্র, নয়ন যখন বাধে,
কর্ম্ম-ভূমির তপ্ত শিলায় ক্লান্ত যখন কাঁদে,
তখন যেন গো তোমার শীতল করুণা-সাগর তীরে,
লভি গো তোমার শান্তি-সমীর বক্ষে, ললাটে, শিরে।

(৩)

সান্ধ্য ছায়ার মণ্ডপ-তলে সঞ্চরে যবে রাতি,
শ্রান্তি হরিতে সে ছায়া-প্রান্তে আসন যখন পাতি,
তখন যেন গো তোমার অভয়-পরশ জড়ায়ে দেহে
নবীন শক্তি লভিতে ঘুমাই আমার আঁধার গেহে!

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

আমাদের কথা

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

খাবার খাইয়া প্রফুল্ল চলিয়া গেল। আমরা আবার বসিলাম। তিনি বলিলেন, "আমায় বুঝাও।" মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, "হৃদয়-সর্ব্বস্ব, আমি তোমায় বুঝাব! আমি কে! আমি কতটুকু! তুমিই এ পামরীর অন্ধ চক্ষে জ্ঞানের আলো দিয়েছ,—তুমি আমার কাছে বুঝ্‌তে চাও! আমি কি বুঝ্‌তে পারি নে, তুমি আমায় পরীক্ষা কর? আমি তোমায় বুঝাব? তুমি সত্য, আমি মায়া; তুমি বস্তু, আমি ছায়া; তুমি গুণ, আমি কায়া;—আমি তোমায় কি বুঝাব নাথ! আমায় নিয়ে এমনি করে' রঙ্গ করে, এমনি করে নেড়ে চেড়ে তোমার তৃপ্তি হয়! তাতে আমার কত সুখ! পরীক্ষা দেবো বৈকি।"

আমায় চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন "বল সরোজিনী,—আমি তো বুঝ্‌তে পারি নে, নারী-হৃদয় কেমন করে এমন অবস্থায় আত্মার উন্নতি কর্‌তে সক্ষম হবে?"

আ। এমন অবস্থায় পড়লে নারী যদি অশিক্ষিতা, অন্ধসংস্কারাপন্না হয়, এবং ক্ষণজন্মা ও সুলক্ষণা হয়, তবে স্বামী যতই মন্দ হোক, যতই অসুন্দর হোক, যতই পিশাচ-বৃত্তি হোক,—সে তার সংস্কার বশে সেই স্বামীতে আন্তরিক ভক্তি রাখতে পার্‌বে। স্বামীর অসদ্ব্যবহার নীরবে সহ্য কর্‌বে এবং সতত সেই স্বামীর সন্তোষবিধানে সাধ্যমত তৎপর থাকবে। এ-ক্ষেত্রে তা'র ভক্তি—অন্ধ-ভক্তি—নিকৃষ্ট ভক্তি; কিন্তু ফল একই— মুক্তি, অর্থাৎ, আত্মার বিশুদ্ধতা-হেতু জন্মান্তরে পুরস্কারলাভ, সৌভাগ্যলাভ, এবং এজন্মে কর্ত্তব্য-সম্পাদনের অবশ্যম্ভাবী পুরস্কার—মনের শান্তি। তার কাছে আর কি আছে! দ্বিতীয় স্তরের নারী অর্থাৎ অর্দ্ধশিক্ষিতা নারী নিশ্চয়ই এখানে রণে ভঙ্গ দেবে। তা'র মনে আস্‌বে "ধর্ম্ম-কর্ম্ম, সতীত্ব ইত্যাদি সবই মানুষের কল্পনা-প্রসূত। কেবল সমাজে শান্তি রাখবার জন্যই কতকগুলি বাঁধাবাঁধি নিয়ম রেখেছে, এবং পাছে লোকে পালন না করে, এইজন্য নরকের ভয় ও জন্মান্তরে অসহনীয় দুঃখভোগের ভয় দেখিয়ে, শাস্ত্র বানিয়ে রেখেছে। এসবই রাজনৈতিক চাল—Political expediency. যা'রা লেখাপড়া জানে না তারা কি বোকা!—এই সব ধোকা তারা বিশ্বাস করে, আর গাধার মত কষ্ট ভোগ করে। আমি লেখাপড়া শিখেছি, এসব ব্যাপার তলিয়া বুঝে ফেলেছি,—আমার কাছে চালাকী? বাবার টাকা ছিল না বলে, আর ছাই কুল রক্ষা হয় না বলে, আমার আজ এই দশা! আমি এমন সুন্দর, আমার এমন গড়ন, আমার এমন বুদ্ধি, আমার এমন মিষ্টি কথা—আমার কত রূপ, কত গুণ, মানুষের হাতে পড়লে আমার কত কদর হ'ত। পোড়া কপাল, মিন্‌সের কি মূর্ত্তি—যেন পোড়া বাঁদর! গায়ে কি বিট্‌কেল্ গন্ধ! কি বাক্যি—যেন গায়ে ঝাঁটার বাড়ি দেয়; তার ওপর ঐ গুণের ছিরি!" এইসকল মনের ভাব যেদিন হতে হওয়া, সেইদিন হ'তে সর্ব্বনাশের সূত্রপাত, সেই মুহূর্ত্ত হ'তে কপালে আগুন;—যে সুবিধে পেল এবং লোক-লজ্জাকেও পদাঘাত করলে, সে কার্য্যতঃ পাপাচরণে প্রবৃত্ত হ'ল। পাপকে একবার আশ্রয় করলে, প্রবৃত্তিকে একবার

আশ্রয় দিলে—তার পরিণাম কোথায় কে বলবে? —Who knows where sin terminates? আবার কেহ হয় তো সুযোগ অভাবে অথবা লোকলজ্জার খাতিরে কার্য্যক্ষেত্রে নামল না, কিন্তু অন্তরে অন্তরে স্বামীর উপর বীতশ্রদ্ধা রইল। এরা মন্দের ভাল—কিন্তু প্রভেদ অল্পই।

দ। পুরুষের বেলা যা-ইচ্ছে করলে শোভা পাবে?—আত্মা ধোয়া-পোঁছা থাকবে?

আ। তাঁরা তো আর সৃষ্টিকর্ত্তার আদুরে ছেলে ন'ন্। কিন্তু তাঁদের পাপের ভোগ তাঁরা ভোগ করবেন, সে কথায় আমাদের কাজ কি? তুমি নেমক্‌হারাম বলে আমি কেন তোমায় দান করব না? কেন তোমার উপকার করব না? তোমার অকৃতজ্ঞতার ফলে তোমার আত্মা কলুষিত হইবে। আমার দানের, পরোপকারের পুরস্কার আমি অবশ্যই পাব—আত্মপ্রসাদ লাভ করিব, আত্মা পবিত্রতা লাভ করবে।

দত্ত। কিন্তু শিক্ষিতা নারীর হৃদয়ে কি ভাব আসবে? কি জ্ঞান তা'কে সৎপথে রাখবার সাহায্য করবে? দাঁতকাটাকে নিয়ে সে কি করবে?

আ। প্রথমতঃ শিক্ষিতা নারীকে স্বামী নিয়ে কষ্টে পড়তেই হয় না। যা'র বুদ্ধি নেই সে কখনো উচ্চ শিক্ষা পেতেই পারে না—অতএব সুশিক্ষিতা নারী অবশ্যই বুদ্ধিমতী। যে শাকান্নও এমন করে পাক করতে জানে, যা খেতে নিশ্চয়ই মুখরোচক হবে; সে পূর্ণকুটীরও এমন সুপরিস্কৃত ও সুসজ্জিত রাখতে জানে, যাতে অট্টালিকাবাসীও বাস করে শান্তিলাভ করতে পারে। বুঝিলে? এখন উক্তপ্রকার স্বামীর গুণকে শাকান্ন মনে কর, এবং রূপকে পর্ণকুটীর মনে কর—তা' হলেই সব বুঝতে পারবে। এ পৃথিবীতে আজো এমন পুরুষ-মানুষ কেউ জন্মায় নি, যে স্ত্রী-লোকের সৌজন্যে বশ না হয়। স্বামী যতই মন্দ হোক, এই স্ত্রীর হাতে পড়লে তাকে নিশ্চয়ই সোজা হতে হবে—নইলে কিসের শিক্ষা? শিক্ষিতা নারী যদি সংসারের দুঃখ-দারিদ্র্য-দুর্ভাগ্যাদিকে আপনার আয়ত্তে এনে, তাকেই সুখের স্বরূপ করতে না পারল, তবে তার কিসের শিক্ষা? শুধু বই পড়লেই শিক্ষা হয় না। বই না পড়েও আমাদের সমাজে এক একটি নারী আজো যে-জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেচনার পরিচয় দিয়া থাকেন, তার কাছে কোথায় তোমার বই? শিক্ষা মানেই বুদ্ধির উন্নতি।

দ। কিন্তু এমন করে থাকতে তার প্রবৃত্তিই বা কেন হবে? অর্দ্ধশিক্ষিতা নারীর যে মনোভাব আসবে, এর তা কেন আসবে না? —এবং কেন সে কষ্টভোগ করতে প্রস্তুত হবে? কি গরজ পড়েছে?

আ। যেহেতু শিক্ষিত স্ত্রীলোক বোঝেন যে, অনন্তকাল ধরে আমাদের জীবাত্মা আপনার কর্ম্মানুযায়ী ফলভোগ করতে করতে, কোটী-কোটী জন্মপরিগ্রহ করে, কোটী কোটী দেহ ধারণ ক'রে অনন্তের পথে চলেছে,—চরম উদ্দেশ্য মুক্তি, ব্রহ্মে লীন, সুখ-দুঃখের অতীত হওয়া। তিনি বোঝেন, তাঁর বর্ত্তমান সুখ-দুঃখ কতক পরিমাণে পূর্ব্ব-জন্মেরই কর্ম্মের ফল। তিনি বোঝেন, এই অনন্ত কালের কাছে—আমার এই অনন্ত ভ্রমণের কাছে, এইজন্মের পান্থ-নিবাসের অবস্থিতি কতটুকু? আমার এ জীবন কতটুকু?—বড় জোর এক শত বৎসর; তার মধ্যে আমার যৌবন কতটুকু?—বিশ বৎসর, বড় জোর ত্রিশ বৎসর। অনন্ত কালের কাছে, অনন্ত ভ্রমণের কাছে তাহা কতদিন? য়ুরোপ আজো তা বোঝে নি, আমরা অনেক দিন বুঝেছি। যদি বুঝেছি, তবে প্রবৃত্তির ভ্রূভঙ্গীতে কেন বিচলিত হই? তখন তিনি তাঁর জ্ঞানের আলোকে দেখতে পান, পূর্ব্ব-জন্মের কর্ম্মফলে আমায় এই পরীক্ষায় পড়তে হয়েছে,—সামান্য পরীক্ষা, এই জন্মের এই কয়টি দিনের পরীক্ষা

মাত্র। এখন যদি উত্তীর্ণ হতে না পারি, হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করে ফেলি, তবে সব মাটি;—গুঁটি এতদূর তুলেছি, এখন একটি দানের দোষে সে গুঁটি আবার কাঁচবে! এই কিস্তির বেলা বুঝে চা'ল দিতে না পারলেই অশ্ব-চক্র ঘুরবো, এইবার চুকুড়ি-সাতের খেলা রাখতে না পারলেই আমার এত কষ্টের চার-খানি কাগজ একবারে উঠে যাবে।

দ। তুমি তবে জন্মান্তর মানো? ভাগ্যও মানো?

আ। অবশ্যই জন্মান্তর মানি,—জন্মান্তরের সুকৃতি না থাকলে তোমার চরণে কেমন করে আশ্রয় পেলুম?

দ। সে কথাটি বরং আমারই বেলা খাটে। কিন্তু এ সব কথা ছেড়ে, অন্য কি দেখে তুমি জন্মান্তরে বিশ্বাস কর?

আ। এইসব থিওজফির গ্রন্থ ও মাসিক-পত্রিকাগুলি তুমি যতই আমায় পড়ে শোনাও, ততই আমি দেখ্‌তে পাই, আমাদের জন্মান্তরবাদ অক্ষরে-অক্ষরে সত্য। আর মানুষের কর-রেখা দেখে আমরা তা'র জীবনের অনেক কথা যখন বল্‌তে পারি, তখন নিশ্চয়ই বুঝ্‌তে হবে, জন্মান্তর আছে;—তারই কর্ম্মফলের নক্‌সা হাতে নিয়ে আমরা জন্মগ্রহণ করি। হিন্দুর জন্মান্তরবাদের এবং কর্ম্মফলবাদের এমন সোজা প্রমাণ আর কোথায়?

দ। যদি ভাগ্যই সব করায়, তবে পাপ-পুণ্যের দায়িত্ব আর কোথায় থাকে? পুরুষ-কারই বা কল্‌কে পান কৈ?

আ। পাপ-পুণ্য অবশ্যই আছে। ভাগ্য মানে কি? আমার পূর্ব্ব-জন্মের কর্ম্ম-ফল। কিন্তু এ-জন্মে পুরুষকার-দ্বারা আমি ভাগ্য অনেকটা পরিবর্ত্তন করে ফেলতে পারি—modify করতে পারি। পূর্ব্ব-জন্মের কর্ম্ম-ফলে আমার এ জন্মে মাসে একশত টাকা প্রাপ্য, কিন্তু এ জন্মের চেষ্টা ও পুরুষকারের গুণে আমি তা বৃদ্ধি করতেও পারি, আবার কর্ম্ম-দোষে তা কমাতেও পারি। দুইই সত্য—ভাগ্যও সত্য, পুরুষকারও সত্য—fate ও সত্য, freewillও সত্য। পুরুষকারের দ্বারাই তো ভাগ্য সৃষ্টি হয়েছে। কর্ম্মদ্বারাই তো কর্ম্ম-ফল নিয়ন্ত্রিত হয়। ঠাণ্ডা-লাগানো-রূপ কর্ম্মের ফলে জ্বর হ'ল; এখন কুইনাইন-খাওয়া-রূপ কর্ম্মের দ্বারা তা খণ্ডন করতে পারি, অথবা তেঁতুল খাওয়া-রূপ কর্ম্মের দ্বারা জ্বর-রূপ ফলের পুষ্টিও করতে পারি। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম-ফলে অর্থাৎ চেষ্টার ফলে যতটুকু বিত্তে এ জন্মে পাওনা, এ জন্মের কর্ম্ম-গুণে তা বাড়াতেও পারি, কমাতেও পারি। সকলের মূল—চেষ্টা। এই চেষ্টা-দ্বারাই জগৎ বিকাশমান;—আমরা তার আগে চলেছি, ইতর-জীব ও উদ্ভিদাদি পেছনে আসছে। এই চেষ্টা মানে প্রবৃত্তি— কু অথবা সু। যার ফলে দুঃখ তাই 'কু' অর্থাৎ পাপ, আর যার ফলে সুখ তাই 'সু' অর্থাৎ পুণ্য,—সোজা কথা। কিসে সু, কিসে কু ঠেকে শিখতে হবে—কেউ বলে দেবে না। পাঁচ বছরের শিশুকে অগ্নি ক্ষমা করে হাত পুড়িয়ে দিতে বিরত থাকবে না, অতএব সর্ব্বদাই নজরটা উঁচু রাখা উচিত,—বড় হব, ভাল হব, সুন্দর হইব, জ্ঞানী হইব, বীর হইব ইত্যাদি। সৎপথে থেকে এজন্মে যতদূর পারব,—উঠব, মরবার সময় সেই উঁচু নজর সঙ্গে নিয়ে যাব,—জন্মান্তর গ্রহণের সময় আমার সেই বিশুদ্ধ নজরই আমায় বাঞ্ছিত স্থানে নিয়ে যাবে। সুখী হবার চেষ্টা একবিন্দুও ছাড়া উচিত নয়। অভিমান ক'রে ভাল মানুষের মত দুঃখ সহ্য করলে, কখনো দুঃখ যাবে না—অভিমান শোনবার এ দুনিয়ায় কেহ নাই।

দত্ত। অর্থাৎ যেন-তেন-প্রকারেণ আপনার সুখ খুঁজিব, এতেই মঙ্গল হবে!

আ। অবশ্য, কিন্তু যেন-তেন-প্রকারেণ নহে। সৎপথ ব্যতীত সুখের রাজ্যে পৌঁছবার অন্য পথ নেই। প্রবৃত্তি প্রলোভন দেখাবে, কুপথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবে—সেইটে সাম্‌লাতে হবে।

দ। তবে যদি ব্যভিচারে সুখ হয়, তবে কেন তা না করবে?

আ। করুক ব্যভিচার। কিন্তু ব্যভিচারে যে আত্মার অধোগতি হয়, তা কোনো বুদ্ধিমান লোককেই বুঝাতে হবে না। প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির সমন্বয়েই আত্মার ক্রমোন্নতি হয়;—ব্যভিচার করলে গণ্ডীর বার হওয়া হল, কেবল প্রবৃত্তিতেই আত্মসমর্পণ করা হল,—তা হলেই সর্ব্বনাশ। সে যে কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেলবে তার ঠিকানা নেই।

দ। রামপ্রসাদ বলেন, কেবল নিবৃত্তিকেই আশ্রয় কর।

আ। ভুল এবং অসম্ভব। রামপ্রসাদ নিজে সিদ্ধ ছিলেন তাই সবাইকেই সিদ্ধ মনে করতেন। আম পাকলে বোঁটা আপনিই খসে আসে। অর্থাৎ যতদিন কাঁচা থাকে, ততদিন রস সংগ্রহ করতে থাকে, পুষ্ট হতে থাকে;—যেই ডাঁশা হয়, অমনি রসটানা বন্ধ হয়—নিবৃত্তি উঁকি মারে। কিছুদিন পরেই পেকে আপনিই খসে পড়ে,—মুক্তি হয়। তাঁর পূর্ব্বজন্মে বাসনার উচিত মত পরিতৃপ্তি হয়েছিল বলে, বাসনা আর ছিল না—তাঁর আম রং ধরেছিল। কিন্তু সকলের তা নয়—বাসনা আছে। ক্রমে ক্রমে কতজন্মে তার পরিতৃপ্তি হবে, এবং অবসাদ এসে নিবৃত্তির পথ দেখিয়ে দেবে। প্রথমে কেবল প্রবৃত্তি—যেমন উদ্ভিদ, পশু এবং অনুন্নত মনুষ্য। পরে প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি—যেমন সাধারণ মনুষ্য। তারপর নিবৃত্তি অর্থাৎ নির্ব্বাণ—যেমন সিদ্ধপুরুষ, মুক্তাত্মা। সাধারণ মানুষ কি একদম্ নিবৃত্তিকে আশ্রয় করতে পারে? সাধ্য কি? কাঁচা আম টেনে ছিঁড়ে মাটিতে পুঁতলে, তার আঁটিতে চারা হয় কি? না পেলেই কি বাসনা যায়? শেয়াল যেমন রাগ করে বলেছিল, "আঙ্গুর ফল বড় টক্"।

দত্ত। তবে যে বাল-বিধবাদের জোর ক'রে আমরা সন্ন্যাসিনী সাজাতে যাই—মহাপাপ করি নে কি? আমি মানলুম যে, একদম্ প্রবৃত্তির স্রোতে গা ঢেলে দিলে নিশ্চয়ই সে আমায় নিয়ে গিয়ে কালাপানিতে ফেলবে—তখন ফেরা মুস্কিল। এজন্য ক্রমে ক্রমে নিবৃত্তির সাঁতার শিখে উজান চলতে শিক্ষা ক'রে, ক্রমে জোর বাড়ানো স্বাভাবিক নয় কি? অতএব একটু মিশিয়ে, প্রবৃত্তির দাবীও একটু স্বীকার করে, চললে, ঠিক ঈশ্বরের আদেশ-অনুযায়ী কাজ করা হয় না কি? দেখ, প্রকৃতি সর্ব্বদাই সন্তান ধারণ করতে, সন্তান প্রসব করতে নিযুক্ত। প্রকৃতির অহরহ চেষ্টাই বীজ-ধারণ। আদি পুরুষ প্রকৃতির মধ্য দিয়েই বিকাশ পাচ্ছেন। উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব আলোচনা করলে দেখতে পাবে, ফলের গাছে যে-সকল সুন্দর সুগন্ধ ফুল ফুটেছে, তা তোমার খোঁপায় গুঁজবার জন্য নয়, এবং যে-মধু রয়েছে, তাও ভকরত্ন মশায়ের মকরধ্বজ মেড়ে খাবার জন্য নয়,—সন্তান প্রাপ্ত হবার জন্য। গাছের চেষ্টায় ক্রমশঃ সে তার পাতাকেই ফুল করে নিয়েছে, এবং তাতে সুমিষ্ট মধু ও সুগন্ধ রেখে দিয়েছে; ভ্রমর সেই লোভে তাদের মধ্যে যাওয়া-আসা করবে—ঘটকালী করবে এবং এই উপায়ে ভ্রমর পাখনা ও পায়ের দ্বারা এক ফুলের পরাগ অন্য ফুলে নিয়ে যেতে বাধ্য হবে, তাতেই তাদের বংশরক্ষা হ'বে—অর্থাৎ ফল বা সন্তান হবে। এই ফুল করবার জন্য

অর্থাৎ, সন্তান পাবার জন্য, তাকে কত ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে—যুগ-যুগান্তর ধরে বংশ-পরম্পরায় এই চেষ্টা চলেছে, তবে এতটা কাণ্ড করে তুলতে পেরেছে! এই ফুল করবার জন্য তারা নিজেরা বাড়তে পায় না! কি করে, সন্তান তো চাই; যে-সকল উদ্ভিদ ফুলের জন্য বিখ্যাত নয়, তাদের বংশরক্ষা-ক্রিয়া সমীরণের ঘটকালীতে, কোথাও বা অন্য উপায়ে সম্পন্ন হয়—তাদের এত কষ্ট পেতে হয় নি, বাড়তেও পায়। অতএব দেখ স্ত্রীলোকের সন্তান হতে না দেওয়া কত বড় মহা-পাপ। সন্তান-কামনা ছাড়া যে ইন্দ্রিয়-আলোচনা, তাই প্রবৃত্তি, তাই পাপ, তা' দমন করাই ধর্ম্ম। পশুর নিকট মানুষে এ ধর্ম্ম শিক্ষা করতে পারে। অনেক উদ্ভিদ একবার মাত্র প্রসব করেই জীবনের কর্ত্তব্য শেষ হ'ল ব'লে মনে করে; কিন্তু সন্তান একবার চাই-ই; যেমন কলাগাছ ইত্যাদি। সিংহী জীবনে একবার মাত্রই প্রসব করে,—কিন্তু এক-বার প্রসব চাই ই। কর্কট প্রসব করবার সময়ই মরে যায়—তথাপি সন্তান চাই। এখন দেখ, যে সন্তান না পেয়েছে, তার বিয়ে দিলে কোনো পাপ নেই, বরং না দেওয়া মহাপাপ। সে-স্ত্রীলোককে সন্ন্যাসী করতে যাওয়া, আর জোর করে "আঙুর খাট্টা হ্যায়" বলানো সমান কথা। বন্ধ্যাত্ব অবশ্য পৃথক কথা; তা পীড়া। সমাজে ধর্ম্মশিক্ষা বিস্তার-লাভ করলে, স্ত্রীলোকেরা আপনিই সংযত হবেন, —কিন্তু অন্ততঃ একবারও তাঁর সন্তানে দাবী আছে। ইহাই সৃষ্টির সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম। যদি কোনো ঋষি ইহা রদ করতে চান, তবে তিনি মহামূর্খ, তাঁর কথা অশ্রদ্ধেয়। সন্তান হওয়ার পর যিনি বিধবা হন,—তাঁর পরে সন্তান যদি মরে যায়,—তবু তাঁর মনকে প্রবোধ দেবার ধর্ম্মসঙ্গত যুক্তি আছে। এই সকল কারণেই আমি সরলার আবার বিয়ে দিতে চাই, তার দিকে আমি যে আর চাইতে পারি নে। সে যে আমার সহোদরা অপেক্ষাও আদরের; সে যে নিরপরাধিনী।

বেলা গিয়াছে খাবার প্রস্তুত করিতে হইবে, সংসারেরও অনেক কাজ পড়িয়া রহিয়াছে, ছুটী লইয়া চলিলাম।

৬

অন্যদিন সন্ধ্যার পরে পাচিকার সাহায্য করিবার জন্য রন্ধনশালায় থাকি। আজ সন্ধ্যার কিছু পরেই ঘরে আসিয়া বসিলাম এবং দত্তজাকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। তিনি আমাপেক্ষা অধিক ব্যগ্র ছিলেন। যথাস্থানে আসিয়া উপবেশন করিলেন। পূর্ব্ব প্রসঙ্গ চলিল। আমি বলিলাম—

কিন্তু দ্বিতীয় স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি কেমন ক'রে আসবে?—সতীত্ব-ধর্ম্ম তা হলে লোপ পাবে না কি?

দ। আসক্তিতেই অধর্ম্ম। সন্তানহীনা বিধবা যদি ইন্দ্রিয়াসক্তির বশবর্ত্তী হয়ে পুনর্বিবাহ করেন, তবে সতীত্ব লোপ পেল বৈকি? এমন তো সধবা নারীও যদি মনে-মনে অন্য পুরুষে আসক্তা হন, তবে তিনিও তো সতীত্ব হারালেন। সতীত্ব গাছের ফল নয়, কিন্তু আমরা বর্ত্তমানে এতটা কল্পনা করছিনে,—দুনিয়াটা নেহাত দেবতার হাট-বাজার নয়, সন্তানহীনা বালবিধবা সন্তান-কাম-নায়ই পুনর্বিবাহ করচেন, ইহাই আমরা কল্পনা করিতে চাই। নইলে "ঠগ বাছতে গাঁ উজোড়" হয়ে যায়।

আ। এসকল কথা শুনতে বড় ঘৃণা করে।

দত্ত। প্রথমতঃ একটু ভাগ্য মেনে চলা উচিত। সরলার ভাগ্য আর পদ্মমুখীর ভাগ্য কি সমান?

আ। ও ছুঁড়ীর নাম আমার সামনে কোরো না।

দ। ছি সরোজিনি! যতদিন তোমায় বিবাহ করেছি, কেবল এই একটিমাত্র দুর্ব্বলতা তোমার চরিত্রে লক্ষ্য করে আসছি,—চাঁদের বুকি

কলঙ্ক অনিবার্য্য? অবশ্য তোমার অমন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ভাইয়ের জন্য দুঃখ হবারই কথা; বিশেষ তুমি নিজে তাকে মালতীর সঙ্গে বিয়ে দিতে চেয়েছিলে,—ঠিকই জোড় মিলতো। আহা, মালতী এখন কেমনটি হয়েছে—সত্যি-সত্যিই যেন ফুটন্ত মালতী ফুলটি। কিন্তু যা হয়ে গেছে, তার জন্য চিরদিন মনে দুঃখ পোষণ করে কি হবে সরোজিনি?

আ। তোমার তো ঐ কথা। তার মুখ-খানির দিকে একবার চেয়ে দেখো দেখি;—আমার সোনামণি, আমার প্রফুল্লকুমার, হায় সে নিরপরাধ।—অপরাধের মধ্যে সে লেখা-পড়া শিখেছিল। সে পুরুষ মানুষ হয়ে কিনা আজ তার এই দণ্ড! তার চির-প্রফুল্ল, স্বভাব-প্রফুল্ল মুখ-খানি যেন সদাই ম্লান! জোর ক'রে মনের ভাব চেপে রাখে, জোর ক'রে হাসে; আমি এ সব বুঝতে পারি নে? আগে যার চুলটি একটু এদিক ওদিক হলে সহ্য হত না, জামার কাট্ একটু অপছন্দ হলে পরত না, এখন সে যা-হয় তাই পরে, চুলে একবার চিরুণী দিতে হয় তাই দ্যায়, ভদ্র-সমাজে তো বাহির হ'তে হবে। ছুঁড়ী সরলার উপর লেগেই আছে। কথায়-কথায় আমার বিধবা বোনকে কিনা ঠাট্টা করে "সুন্দরী"। ঈশ্বর তাকে সুন্দর করেছেন, সে কি করবে? একবিন্দু বুদ্ধি নেই, এ-দিকে ন্যাকার মত হিংসে টুকু, নষ্টামী টুকু, ষোলো আনা আছে। আর কেবল চিনে রেখেছে টাকা। সাধ করে' খুদী ঠান্‌দি ওর ভাইকে ব'লে ছিলেন, "কয় পুরুষ বড় মানুষ হ'য়েছে?" আজ কিনা আমার বোন তার বাপের ভিটেয় ঝেঁটা খেয়ে একবেলা ছুটো ভাত খায়, আর তাঁর দাসীগিরি করে! এ সব দেখে-শুনেও প্রফুল্ল চুপ করে' থাকে!

দ। পাগলো বলে কি—"আমি প্রায়শ্চিত্ত করছি—দেখি কত ধানে কত চাল।" ঘোট কথা, যার ওপর আন্তরিক ও স্বাভাবিক আকর্ষণ না থাকে, তার ওপর কথা কইতে প্রবৃত্তিই হয় না। নইলে পদ্মমুখী তো পদ্মমুখী, নুরজাহান, এলিজাবেথের মত গেছো মেয়ে-মানুষকেও প্রফুল্ল-কুমার চোখের ইঙ্গিতে পরিচালিত করতে পারে। প্রফুল্লরও অবশ্য অন্যায় আছে,—সে পদ্মমুখীকে কিছু বলে না সত্য, কিন্তু কখনো একটু শেখানো-পড়ানো, বোঝানো-সোঝানো, একটু আদর-সোহাগ করা—তাও নেই। ভালও বাসি নে, মন্দও বাসি নে, কথায় বলে "দেবতা তুমিও আমায় ঘাঁটিও না আমিও তোমায় ঘাঁটাবো না"; —না এ-দিকে, না ও-দিকে,—নির্ব্বিকার পরব্রহ্ম সেজে আছে। বৌটো ন্যাকা হাঁদা—যেমন রূপ তেমনি বুদ্ধি; এর উপর যদি প্রফুল্ল একটু চেষ্টা কর্‌ত, তবু না-হয় ভদ্রলোকের পাতে দেবার মত হ'ত;—তা নয়, সে আপন বুদ্ধি-মতই চলেছে, প্রফুল্লও হা'ল ছেড়ে বসে আছে। এদের মজা মন্দ নয়।

আ। তাকে শেখাবে কি? ছয় মাসে তাকে আমি পঞ্চাশ পর্য্যন্ত গণ্‌তে শেখাতে পারি নে। আর আমার সরলা সাত বছর বয়সে চারশো নাম্‌তা মুখস্থ বল্‌তে পারত। তাকে শেখাতে কি আমি চেষ্টার ত্রুটি রেখেছি? বাড়ীতে পাড়ার পাঁচটা মেয়ে-ছেলে এলে, একটু "এসো বোসো" তাও গুছিয়ে বলতে জানে না। কম অধর্ম্মের ভোগ! কি গড়ন! যেন কচ্ছপ। যাক্, ওসব কথা আর তুল না, যা বল্‌ছিলে তাই বল।

দ। ভাগ্য মান্‌লে দেখতে হয়, যে সন্তান না পেয়ে বিধবা হ'ল, তার ভাগ্য বিলক্ষণ মন্দ বৈ কি! বিবাহ সৃষ্টিরক্ষার জন্য, অর্থাৎ সন্তান-প্রাপ্তির জন্য। ইহা ঈশ্বরাভিপ্রেত, অতএব বিবাহ ধর্ম্মচর্য্যার জন্য। কারণ ঈশ্বরের নিয়ম প্রতিপালন করাই ধর্ম্ম, না করা ঘোর অধর্ম্ম। স্ত্রীলোকের স্বামী সেই ধর্ম্মচর্য্যার একমাত্র সহায়,

একমাত্র উপায়, এবং স্বামী নিজের ও সন্তানের রক্ষাকর্ত্তা এবং পালনকর্ত্তা; এজন্য স্বামী সর্ব্বাপেক্ষা পূজ্য। কেননা স্বামী ভিন্ন ধর্ম্মরক্ষাই হ'ল না—জন্মই বৃথা হ'ল, মহাপাপ হল। স্ত্রীলোক সুশিক্ষা পেলে বুঝতে শেখেন, এবং স্বামীকে দেবতা জ্ঞানে পূজো করেন। এখন দেখ, দ্বিতীয় স্বামী যখন 'স্বামী' অর্থাৎ ধর্ম্মরক্ষার সহায়, তখন তাঁ'কে ভক্তি অবশ্যই করতে হবে। পুরুষেরা ভার্য্যান্তর গ্রহণ ক'রে সেই ভার্য্যাকে অবশ্যই সহধর্ম্মিণী মনে করেন এবং স্ত্রীর মত শ্রদ্ধা করেন,—উপপত্নী বা ইন্দ্রিয়চরিতার্থের উপায় মাত্র মনে করেন না; অন্ততঃ ইহাই কল্পনা কর্‌তে চাই। নতুবা পুরুষেরও ভার্য্যান্তর-গ্রহণ উপপত্নী-সংরক্ষণ মনে করতে বাধ্য হ'তে হ'বে। এবং তা ক্ষমা করতে পারব না। কিন্তু সন্তানপ্রাপ্তির জন্য ইন্দ্রিয়ের সহায়তা আবশ্যক; অথচ ইন্দ্রিয় উদ্দেশ্য নহে, উপায়;——end নহে means. এই যে উপায় কথাটি বল্লুম, এই means, ইহাই মায়া—অর্থাৎ সৃষ্টির উপায়। সৃষ্টির জন্য আবশ্যক— divine necessity. কিন্তু উপায় অনেক সময় মানুষকে এমন অভিভূত করে ফেলে যে, মানুষ তখন উদ্দেশ্য ভুলে উপায়েরই সেবা করে। ইহাই পাপ, ইহাতেই পতন, সংসারে যত-কিছু দুঃখ, তা'র কারণ এই উপায়ের অযথা সেবা, এবং উদ্দেশ্যের লক্ষ্য হারাইয়া ফেলা। তুমি দরিদ্র—তুমি পীড়িত, তুমি জান না কিসে দারিদ্র্য যায় এবং কিসে পীড়া সারে;—এ সকল অনেক গূঢ় কথা; অথচ উপায়কে মোহময় না করলে সৃষ্টি হয় না, লীলা হয় না; ইহাই বেদান্তের 'মায়া'। এই মায়া ভেদ ক'রে তবে ব্রহ্মে পৌঁছিতে হবে,—গাছে উঠেই এর সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করতে হবে, মইএর ওপর বসে দোল খাওয়াতে থাকলে চলবে না। অর্থ সুখের উপায়, কিন্তু মানুষ সময়-সময় এমন দশায় পড়ে যে, তখন সে সুখ দিয়েও অর্থ ক্রয় করে, তখন সে কেবল প্রাণ পাত ক'রে দেহ নষ্ট ক'রে, অর্থ উপার্জ্জন করিতে থাকে—অর্থকেই উদ্দেশ্য করে ফেলে। যদি নিজেই মলুম তবে অর্থে কি হবে, তা ভুলে যায়। এই জন্যই সাধুরা সঞ্চয় করেন না, অবশ্য গৃহীকে সে-উপদেশ দেই না; তাদের বরং খুব সঞ্চয় করাই ধর্ম্ম। এখন দেখ, ইন্দ্রিয়-আলোচনা সন্তানের জন্য, কিন্তু পাছে জীব এতে বিরত হয়ে সৃষ্টিরক্ষার সাহায্যে প্রলুব্ধ না হয়, এজন্য এতে সুখ নিহিত আছে। কিন্তু দেখ, জগতের লোক উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলে উপায়ের দিকে সে ধায়,—কত খুনোখুনী, কত বিরহ হা হুতাশ, কত রোগ-শোক ভোগ করছে। এই তো মায়া, এই তো পাপ, এই তো মরণ, এই জন্যই দম্পতি-বন্ধন। কিন্তু সন্তান পেয়েও যদি বিধবা আবার বিবাহ করেন, তবে বুঝতে হবে তিনি উপায়ে মজেছেন, আসক্তিতে মজেছেন, এবং তাঁর স্বামী-প্রীতি কামজ; এজন্য তিনি অতি অশ্রদ্ধার পাত্রী। পুরুষের বেলাও ঠিক ঐ কথা। এরূপ করিতে থাকলে সমাজেও অশান্তি হয়—অতএব তাও পাপ। কারণ সমাজ ধর্ম্মচর্য্যার প্রধান সহায়। পুরুষের এরূপ আচরণে ততটা অশান্তির ভয় নেই, কিন্তু স্ত্রীলোকের বেলা ভেবে দেখ দেখি—পাঁচ সহোদর পাঁচ বাপের নাম বলবে! আইজাক্ নিউটন্ অত বড় লোক, তাঁর মাতা কি না তাঁর পিতার মৃত্যুর পরই অমনি তাঁকে তাঁর পিতামহীর কাছে ফেলে রেখে আবার বিবাহ করলেন, এজন্য নিউটন্ মাতার প্রতি আন্তরিক বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। সকল সন্তানই গর্ভধারিণীকে এক্ষেত্রে ঘৃণা করবে, কিন্তু পিতার প্রতি এজন্য ততটা ঘৃণা আসে না—এ স্বাভাবিক। কিন্তু সন্তানের দাবী স্ত্রীলোকের অবশ্যই

আছে। যাঁর প্রথম স্বামী সন্তান না দিয়ে মরে গেলেন, তিনি স্ত্রীর ধর্ম্মরক্ষা তো কিছুই করে যেতে পারলেন না,—তাঁর সঙ্গে বিবাহের ধর্ম্মানুমোদিত উদ্দেশ্য তো সিদ্ধ হয় নি। স্ত্রীও দুর্ভাগ্যবতী বটে। এখন তাকে বাধ্য হয়ে ধর্ম্মরক্ষার জন্যে পত্যন্তর গ্রহণ করতে হবে— কেবলমাত্র ধর্ম্মের জন্য, সন্তানের জন্য। সংসারে আর একটি অতি মহৎ, অতি পবিত্র পদার্থ আছে, তা প্রেম; প্রেম বল্‌তে কামজ আসক্তি মনে কোরো না—তুমি বুদ্ধিমতী, অবশ্য বোঝো। এই মধুর পবিত্র প্রেমের জন্য আমরা অন্য সব তুচ্ছ কর্‌তে পারি। এখন যদি স্ত্রী মৃত-স্বামীর প্রেমে পূতাত্মা হয়ে সন্তানপ্রাপ্তির দাবী তুচ্ছ করেন, তবে কার সাধ্য তাঁকে পুরুষান্তরে প্রেরণ করে!—কর্‌তে যাওয়াও মহাপাপ। কত পুরুষ বন্ধ্যা স্ত্রী-সত্ত্বেও বিবাহ করেন না, স্ত্রী সন্তান না রেখে মরে গেলেও আর বিবাহ করতে ইচ্ছে করেন না; কিন্তু এরূপ পবিত্রাত্মা পুরুষ বা স্ত্রী সংসারে খুব বেশি নেই। সাধারণ লোক নিয়েই আমাদের সমাজ, সাধারণ লোকের যা সাধ্য, তারও ব্যবস্থা সমাজে থাকা আবশ্যক। Unrealizable ideal নিয়ে কি সর্ব্বদা চলা যায়? স্ত্রী যদি বিধবা হওয়ার পর সন্তানের দাবী ত্যাগ না করেন, তবে জোর করে তাঁর ধর্ম্মানুমোদিত দাবী হতে বঞ্চিত কর্‌বার তুমি কে? এই কি হিন্দুর ধর্ম্ম? তারই না আজ এই পরিণাম! গাভী হিন্দুর দেবতা, কিন্তু আজকাল ভারতের গাভী অপেক্ষা অযত্ন পৃথিবীতে আর কোথাও কোনো গৃহ-পালিত পশুর আছে কি?

আ। রাগ কর কেন? একটু ভেবে দেখ দেখি, মৃত স্বামীর আত্মার এতে কি কষ্টই হয়। তিনি যে অন্তরীক্ষ থেকে দেখতে থাকবেন, এই তোমার ভালবাসা। এই তোমার পবিত্রতা! তখনকার কথা কেমন করে ভুললে? আমায় কেমন করে ভুললে?

দ। ভুল। আত্মা দেহত্যাগের পর পার্থিব কোনো কিছুর প্রতি আসক্তি রাখে না; এবং অল্প সময়ের মধ্যেই জন্মান্তর গ্রহণ করে ফেলে, একজন মরে, তার প্রাণের জনেরা কেঁদে আকুল, কিন্তু দেহ-বিচ্ছিন্ন আত্মা তাঁদের জন্য এক বিন্দুও সহানুভূতি দেখায় না। আত্মিক দেহ (psychic bodies) অনেক স্থলে তাদের জীবিত আত্মীয়কে দেখা দিয়ে এ-কথা বলে গেছেন, এর অনেক বিশ্বাসযোগ্য উদাহরণ আমরা পেয়েছি। কিন্তু যদি কোনো পার্থিব পদার্থ বা ব্যক্তির প্রতি অত্যধিক আসক্তি থাকতে কেউ দেহত্যাগ করে, তবে তার জন্মান্তরগ্রহণে বিলম্ব হয় বটে; এবং প্রেতাত্মা সেই ব্যক্তি বা পদার্থের পার্শ্বে ঘুর্‌তে থাকে,—এ অতি অনুন্নত আত্মার চিহ্ন। এরূপ প্রমাণও পাওয়া গেছে উন্নতাত্মা দেহত্যাগের পর দিব্য-জ্ঞানলাভ করে বুঝতে পারে, ধর্ম্মরক্ষার জন্য তার স্ত্রীর পুনর্বিবাহ আবশ্যক। পার্থিব প্রণয়ের জন্য তার আত্মার গাত্রদাহ আসে না। ম্যাডাম ব্ল্যাভ্যাস্কিও এই কথা বল্‌তেন। কিন্তু এমনও অবশ্য দেখা গিয়েছে যে স্বামী বা স্ত্রী পুনরায় বিবাহে প্রস্তুত, কিম্বা বিবাহ করেছেন, এমন সময় মৃত স্বামী বা স্ত্রীর আত্মা দেখা দিয়ে দুঃখ প্রকাশ করে গেছেন। কিন্তু সেরূপ ঘটনা অতি বিরল। এ কথা ধরতে হ'লে পুরুষেরও পুনর্বিবাহ-কালে এ কথা একবার চিন্তা করা উচিত। তা আমরা করে থাকি কি?

আ। পুরুষের এ বিষয় অধিক ভাবা উচিত। স্ত্রীলোক—বিশেষত হিন্দু-স্ত্রী স্বামীকে যত ভালবাসতে জানে, পুরুষ প্রায়ই স্ত্রীলোককে তত ভালবাসতে পারে না। এজন্য মৃত স্ত্রীর প্রেতাত্মার কষ্ট আরো অধিক,—তোমরা তার কি বুঝবে?

দ। আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি, কিন্তু পুরুষেরা তা পালন করেন না—অশৌচান্ত হতে ভর সয় না। ধর্ম্ম-কর্ম্ম কেবল মুখে, আদর্শ কেবল অবলাদের ঘাড়ে।

আ। একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, বিধবার বিয়ে দিতে চাচ্ছ,—কিন্তু ব্যভিচার করলে স্ত্রীলোকের ক্ষমা আছে কি ?

দ। যার ক্ষমা আছে এমন পাপ পৃথিবীতে নেই। Actionএর reaction, ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া অনিবার্য্য। ফলভোগ করতেই হবে। তবে ক্ষমা অর্থে আমি যদি প্রতিক্রিয়া দ্বারা ফলখণ্ডন বুঝতে চাই, তবে ক্ষমা আছে, নতুবা ফলভোগ অনিবার্য্য। পাপ অর্থে যার ফলে আমাকে কষ্ট পেতে হবে, কিন্তু মোটামুটি অনেকগুলি জড়িয়ে নিয়ে একটি "আমি" হয়েছি—আমার দেহ, আমার মন,আমার আত্মা ইত্যাদি। এর মধ্যে প্রত্যেকটির বিরুদ্ধেই পাপ করা যেতে পারে। ব্যভিচারে আর কিছু হোক্ আর না হোক্, আত্মা কলুষিত হবেই। তার ফলভোগ এজন্মে (যদি হয়) অনুতাপে, মৃত্যুর পর হ'লে আত্মার অধোগতিতে। কিন্তু অনুতাপরূপ প্রতিক্রিয়া-দ্বারা নিশ্চয়ই পাপক্ষয় হয়। তবে একটি কথা,—"এখন পাপ করে রাখি, শেষে অনুতাপ করে ঝেড়ে ফেলব," এমন মনে রেখে যে পাপাচরণ করে তার পাপক্ষয় কথনো হয় না। কোনো কার্য্যবিশেষে আত্মার পাপ হয় না, আত্মার পাপ হয় অভিসন্ধি বা উদ্দেশ্যে। আমি না বুঝে সাপের মুখে হাত দিলে আত্মার পাপ হয় না, দেহের পাপ হয়; এবং দেহের ফলভোগে অর্থাৎ সর্পদংশনের জ্বালায় ও মৃত্যুতেই তার ফলশেষ হল। আমি এতক্ষণ যা বুঝিয়েছি, তাতে তোমার বোঝা উচিত যে, বালবিধবার পুনর্বিবাহে একবিন্দুও পাপ নেই বরং পুণ্য। যদি আন্তরিকতা থাকে, তবে বালবিধবার ব্রহ্মচর্য্যেই বরং পাপ, অনিচ্ছায় সহমরণে তো আত্মহত্যার পাপ। এবং যে তার সমর্থন করে সে নরঘাতী রাক্ষস। যদি কোনো শিক্ষাভিমানী আমার এই কথার প্রতিবাদ করতে আসে, তবে আমি তাকে একথা বুঝিয়ে দিতে পারি। শাস্ত্রে যদি এ principleএর একবিন্দুও বিরুদ্ধবাদ কোথাও থাকে তবে আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধি হলে সে শাস্ত্রগ্রন্থ দগ্ধ করা হবে। কিন্তু বাস্তবিক হিন্দু-শাস্ত্রের বিধি এমন অসার পাপময় উপদেশের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়—তা হলে এতদিনে 'হিন্দু' নাম পৃথিবী হতে লোপ পেত।

আ। ছি ছি—কি সব বলতে লাগলে ?

দ। আমি কায়স্থ, আমি এসব বলবার কে ? এখনো ব্রাহ্মণ আছেন। হরিদাসবাবু কাল এই সব আমাদিগকে বুঝিয়েছেন—তিনি শিক্ষিত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ-সন্তান। কিন্তু যা বলছিলুম, মনের অগোচর পাপ নেই। বালবিধবার পুনর্বিবাহ কেবলমাত্র ধর্ম্মের জন্য সন্তানের জন্য; যে-নারী ইন্দ্রিয়সেবার জন্য, পুনর্বিবাহ করে, লোকে টের না পেলেও সে মনে-মনে বোঝে;—তাই-ব্যভিচারই পাপ; কেননা উপায়ে আসক্তি এসেছে, তার উদ্দেশ্য ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করা। উদ্দেশ্য মন্দ, এজন্য পাপ। আইন-বিজ্ঞান বা বিচারনীতি অর্থাৎ Jurisprudence উদ্দেশ্যের উপরেই বিচারকের নজর রাখতে বলে, ঈশ্বর তাই রাখেন। লর্ড লিটনের "Night and Morning"এর সেই কবরে লেখা হয়েছিল—"Man judges the deed, but God the circumstance"—ঠিক কথা, বালবিধবার পুনর্বিবাহে ব্যভিচার হল না।

আ। কিন্তু আর একজন স্বামী নিয়ে স্ত্রী কি তেমন ভক্তি-শ্রদ্ধা করতে পারবে ?

দ। না পারে তবে তার বিয়ে করার আবশ্যকতা নেই। ব্রহ্মচর্য্য ছেড়ে যদি বিধবা ধর্ম্মরক্ষার্থে বিবাহে রাজী হল, তবে

পিতা বা পিতৃস্থানীয় যে-পাত্রের হস্তে তাকে অর্পণ করবেন, তিনি অবশ্যই দেবতুল্য পূজ্য। যে-স্ত্রীকে বাধ্য হয়ে পুনর্বিবাহ করতে হল, তার দুর্ভাগ্যের জন্য ভগবানের নিকট অনুশোচনা করা উচিত। কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করা উচিত, যেন তার ইন্দ্রিয়ে আসক্তি না আসে। সেও যেন ঈশ্বর-চরণে প্রার্থনা করে, "আমি কেবল ধর্ম্মরক্ষার জন্যই পত্যন্তর গ্রহণে বাধ্য হলুম, তুমি আমায় ক্ষমা কোরো প্রভু।" মোট কথা এই যে সকল কথা বল্লুম, তা মানুষকে দেবতাজ্ঞানে বল্লুম। কয়জন নর-নারী এত ভেবে-চিন্তে কাজ করে? আমাদের শাস্ত্রকারেরা যেসকল বিধি-ব্যবস্থা রেখে গিয়েছেন, তার অনেকটা যেন প্লেটোর'আদর্শ সাধারণ তন্ত্রের' মত (Plato's Ideal Republic)—কি তার চেয়েও বেশী। তাঁরা মানুষকে একদম্ দেবতা গড়ে ফেলবার বন্দোবস্ত করে গিয়েছেন। বেশ তো, যিনি পারেন তিনি দেবতা হউন, সে তো ভাল কথা এবং যাদের শাস্ত্রে এইসকল পন্থা নিরূপিত আছে তারাও ধন্য। কিন্তু ঘরে-ঘরে দেবতা কোথায় পাব? মাঝে পড়ে এই নিরপরাধা অবলাদের জোর করে দেবী বলাতে গিয়ে কেলেঙ্কারীর বেহদ্দ করছি। অন্যথা তাদের চোখের জলে ভাসাচ্ছি, পাপ সঞ্চয়ের চরম করছি। নিজেরা কাপুরুষ, ধর্ম্মকর্ম্মহীন, নরপ্রেত, কিন্তু ঘরে এসে দেবতা নিয়ে থাক্‌বো! মতল্‌বটা এই! পিশাচ কখনো দেবীর যোগ্য হয়? এই সকল রাক্ষসের পাপেই আজ আমাদের এই দশা।

আ। পাগল হবে নাকি? তোমার সম্মুখে কি সেই রাক্ষসের দল দাঁড়িয়ে আছে নাকি?

দ। সত্যিই সরোজিনী! এসব কথা মনে হলে আমি পাগল হই। সরলার দিকে চাইলে, তার বিনা-অপরাধে নিরর্থক দণ্ডভোগের কথা ভাবলে আমি পাগলই হই। এক এক জন যেন মহা সাধু। নায়েব মহা—

আ। দম্‌খেয়ে গেলে যে?—

দ। না—কিছু না—

আ। আমি বুঝেচি;—তুমি মনে কর নায়েব-ম'শায়ের গুণকীর্ত্তি আমি কিছুই শুনি নি।

দ। সে কি? এসব কথা তোমার কানে কোথা হতে এল? আমরা কোথায় কথাটা চাপা দেবার চেষ্টায় আছি—

আ। হিমীর মুখে প্রথম শুনি। শেষে বিশ্বদূতী খুদীঠান্‌দির কাছে আগাগোড়া—সাধ-সীমন্তন-ষষ্ঠী-পূজো—সব খবর পেয়েছি।

দ। কি বল দেখি— তোমার খুদী-ঠান্‌দির বয়ানটা কি?

আ। সেই ওদের শশীর কথা তো? আহা মেয়েটার অল্প বয়েস, দেখতে-শুন্‌তেও, কেমন সুন্দর। তা এতদিন তো তার বাপের বাড়ীতে কেউ তার নামে একটা কথাও বলতে পারে নি! তার বাপ গরীব বুড়ো ব্রাহ্মণ, অবস্থাও ভাল নয়; ভাব্‌লে নায়েবের বাড়ী থাক্‌লে মেয়েটা দুটো খেতে-পরতে পাবে থাকুক। শেষে এই কাণ্ড! নায়েবের চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স হ'তে গেল, যেন গো-বেচারী, শুনেছি তো মহাধার্ম্মিক, সন্ধ্যাহ্নিকের ঘটায় ঘাটে মেয়েদের নাইবার যো নেই। ছেলের বিয়ে হ'য়েছে বলে' আর বিয়ে করলে না। শশীর বাপের কাছে গিয়ে বল্লে, এখানে আমায় দুটো রেঁধে ভাত দেবার কেউ নেই, বউ-মা ছেলে-মানুষ, তাকে দিয়েই বা কি করে রাঁধাই; যদি শশীকে আমাদের বাড়ী রাখেন —সে তো আমার মেয়ের মতন"। দেখ—এতে বুড়ো ব্রাহ্মণ কি করেই বা বুঝবে তার মতলব; যাক্ শশী গলায় দড়ি দিয়ে মরে ভালই করেছে। লজ্জায় তার ভাইটাও নাকি আফিং খেয়ে মরেছে। আহা ছেলেটির নাকি গেল-বছর বিয়ে হয়েছে। বুড়ো ব্রাহ্মণের আর কেউ রইল না। শশী কিন্তু বড় ভাল মানুষ ছিল আহা!

দ। আবার আজ সকালবেলা যখন তর্করত্ন-মশায় বিদ্যাসাগরকে মূর্খ বল্‌ছিলেন, তখন নায়েব-ম'শায়ের সম্মতিসূচক মাথানাড়ার ভাব দেখছিলে তো? কি বলব ব্রাহ্মণ, নইলে নিশ্চয় তাকে গুলি করে' মারতুম; তার পর যা হবার হ'তো।

আ। তাই বলে সরলার বিয়েতে আমার মত নেই।

দ। দেখ সরোজিনী, একটু ভেবে দেখ, সরলা কেমন করে ব্রহ্মচর্য্য পালন করবে? ছেলে-খেলা বটে? পরের বেলা ব্যবস্থা দেওয়া বড় সহজ। আমার শ্বশুরের বয়সী সেই ভদ্র লোকটির প্রতি সরলার এক সপ্তাহের মধ্যে এক বিন্দুও আসক্তি হওয়া সম্ভব কি? বাঙালীর মজ্জেলে সম্ভব বটে—Effeminate cowards! যদি সে বেচারা বেঁচেও থাকত, তবু না-হয় আমি সরলাকে সংশিক্ষা দিয়ে তার মনের স্বাভাবিক গতির পরিবর্ত্তন করতে পারতুম। সরলা আজো অর্দ্ধ-শিক্ষিতা। তার উপর সে এতদিন এত আমোদ আহ্লাদ করে, সখ্ করে কাটিয়েছে। যখনই তোমায় নিয়ে কল্‌কাতায় গিয়েছি, সার্কাসে গিয়েছি তাকে না নিয়ে যেতে পারি নি। যখনই আমি গাড়ী করে বেড়াতে বেরিয়েছি, সে অমনি সেজে-গুজে আমার সঙ্গে বেরিয়েছে। যেখানে যে ভাল জিনিষটি দেখেছি, যে ভাল কাপড়-চোপড় পেয়েছি, তার জন্য কিনেছি। এজন্য তোমার স্বর্গীয় পিতৃদেব কত রাগ করতেন্। তার চারধারে আমরা তেমনি আমোদ আহ্লাদ করব, আর সে অহল্যা-পাষাণী হয়ে থাকবে? যদি একটি সন্তান থাকত, যদি মৃত স্বামীর মূর্ত্তি হৃদয়ে অঙ্কিত থাকত, তথাপি না-হয় মনকে প্রবোধ দিতে পারত;—বাহ্য দুঃখ তুচ্ছ করতে পারত। সে কি অপরাধ করেছে? যদি বুঝতুম, তার বিয়ে দিলে কোনো অশাস্ত্রীয় কার্য্য হবে, অথবা সমাজের অমঙ্গলকর বা তার আত্মার কোনো অপবিত্রতার ভয় থাকবে, তবে অবশ্য সহ্য করতুম। বিধবা-বিবাহ সমাজে এতদিন নিশ্চয়ই প্রচলিত হত, কেবল পুরুষেরা হৃদয়হীন, উৎসাহহীন, উদ্যোগহীন, অশিক্ষিত এবং কাপুরুষ বলে এতদিন হয় নি। তাঁদের সুখটুকু তো ষোলো আনা বজায় আছে! কাজেই গা তাতে না। পুরুষেরা লুকিয়ে পলাণ্ডু, কুক্কুট, সুরা ইত্যাদি সবই উপভোগ করে শাস্ত্রের আদেশ লঙ্ঘন করে কলির সঙ্গে সঙ্গে চলেছে; কিন্তু বাল-বিধবার বিবাহটা তো আর লুকিয়ে হয় না। বিলেতেও লুকিয়ে গিয়ে সিভিল্ সার্ভিস্ পাশ করে এসে লুকিয়ে থাকা চলে না। বিলেত-ফের্ত্তারা তবু একটা আশ্রয় পেয়েছে, কিন্তু এরা যায় কোথায়? এরা যে লাখে-লাখে তুষানলে পুড়ছে—অথচ অকারণে, নিরপরাধে! যার ভগ্নী বা কন্যা বিধবা হয়, সে দিন-কতক মনে মনে খানিক ইচ্ছুক হয় বটে, কিন্তু সমাজের কর্ম্মনাশা তর্করত্নদের ভয়ে মনোভাব প্রকাশ করে না। তারপর নিজের ভবিষ্যতের আশা, বর্ত্তমানের সুখ, ছেলে পুলে কোলে করতে করতে, সব ভুলে যায়—সব জুড়িয়ে যায়। লজ্জাবতী অবলারা নীরবে সব সহ্য করে তাঁদের নিষ্ঠুর সমাজ-প্রপীড়িত জীবন অতিবাহিত করেন। হায় মা! কেন তোমরা এ পাপিষ্ঠদের গর্ভে ধারণ করতে এ অধঃপতিত হিন্দুর ঘরে জন্মগ্রহণ কর? সময় সময় মনাবেগ এমন হয়, যে তখন মনে হয়, যদি আমাদের সমাজ ইংরাজদের মত বিশৃঙ্খল হয়েও আমরা তাদের শতাংশের একাংশও যোগ্যতা লাভ করতে পারতুম, তাও বাঞ্ছনীয় ছিল। পুরুষের পুরুষত্বে, বীরত্বে, স্ত্রীলোকের ভক্তি আছে, admiration আছে, আত্মসমর্পণ

আসে ;—নইলে ডেস্‌ডেমোনা মুর ওথেলোর পায়ে লুটা'ত না, রক্ষোরাজভগিনী সূর্পণখা জটা-বল্কলধারী লক্ষ্মণের কাছে নাক রেখে যেত না। সে ক্ষমতা তো নেই! দেশের স্ত্রীলোকদেরও "লক্ষ্মী বউ" করে তুলেছে—যত বীরত্ব এই কোমলাঙ্গীদের ওপর!

আ। ছি ছি ছি, কি সর্ব্বনাশ! কি সব পাগলের মত আবোল্‌-তাবোল্‌ বক্‌তে আরম্ভ করেছ? হিন্দুর মুখে ঐ সব কথা! ছি ছি! তোমার রক্ত গরম হয়ে উঠলে আবার সেই আগেকার মত সাহেবী মেজাজ ফিরে আসে। তোমায় আমি কিছুতেই পেরে উঠলুম না! বুঝি—ছি ছি—

দ। কিন্তু ব্রাহ্মদের আমি আজীবন শ্রদ্ধা করব, তাঁদের মধ্যে দেবতার মত লোক আছেন। আমি আশা করি, আমাদের দূর ভবিষ্যতে এমন দিন আসবে, যখন দেশের সমস্ত লোকই পবিত্র পরিত্রাণপ্রদ উদার আধ্যাত্মিক সার্ব্বভৌমিক ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করবে। ব্রাহ্মেরাই বাস্তবিক এ-যুগের আদর্শ মানব। তাঁরা আমাদের আপনার জন। মিসেস্‌ মুখার্জ্জীকে না পেলে কার কাছে তুমি এমন সুশিক্ষা পেতে? বাংলার প্রায় পনেরো আনা সাহিত্য আজ তাঁদের হস্তে। আমাদের ঘরে স্ত্রীশিক্ষা তাঁদেরই হ'তে—ব্রাহ্মসমাজ না থাকলে বিলাত-প্রত্যাগত এই সকল ভারতের মুখোজ্জ্বলকারী সুসন্তানগণ আজ কোথায় আশ্রয় পেতেন? তোমার সমাজ তো রমেশচন্দ্র দত্ত, আনন্দমোহন বসু অপেক্ষা নায়েব মশায়কেই অধিক পছন্দ করেন! * * বাবুর মেজো ছেলে পুলিস সাহেব হয়েছেন, লুকিয়ে কেল্‌নারের খানা খেয়ে থাকেন, আরো কত কীর্ত্তি করেন, এ open secret সবাই জানে। অথচ পুজোর সময় তিনি 'পাঁঠা' ধরেন, ব্রাহ্মণকে পরিবেষণ করেন, ব্রাহ্মণেরাও খান—কেননা তিনি প্রকাশ্যে বিলেত যান নি বা প্রকাশ্যে খৃষ্টান বা ব্রাহ্ম হন নি।

আ। তুমি লজ্জা-সরমও ত্যাগ করতে আরম্ভ করলে? কথাগুলি ঠিক ব্রাহ্মদের মতই বলছ; তোমার টান আজো যায় নি!

দ। তাঁদের প্রতি আমাদের নিশ্চয়ই আন্তরিক টান আছে। তাঁদের মধ্যে বাড়াবাড়ি দেখলে প্রাণে আঘাত পাই! তাঁরা আমাদের আপনার জন। লোক-সংখ্যার অনুপাতে তাঁদের অপেক্ষা শিক্ষিত আর কোনো সম্প্রদায় ভারতে নেই। তাঁদের প্রতি আমার বিশেষ সহানুভূতি আছে।

আ। তাঁদের ভাল করবার জন্য আমাদের বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু হিন্দু-সমাজেও যে ভাল লোক থাকা একান্ত অসম্ভব নয়, একথা তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন? এখনো হিন্দু সমাজে এমন অনেক রমণী আছেন, যাঁরা দেবী। তুমি এরূপ স্ত্রীলোকের অস্তিত্ব হিন্দু-সমাজে অসম্ভব মনে করে আমাদের প্রতি অসম্মানই দেখাচ্ছ। হিন্দু নারীকে বিধর্ম্মীর চোখে দেখছ! বড়ই মর্ম্মাহত হলুম।

দ। ক্ষমা কর সরোজিনী। আমি সত্যি-সত্যিই ভাল বুঝতে পারি নে। তোমাকে না পেলে আমার মনের দশা আরো কি হ'ত জানি নে। কিন্তু তুমি একবার ভেবে দেখ—সরলা নিরপরাধ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বিপদে

এ যে পঙ্কিল পথ পিচ্ছিল অতি শঙ্কিত চিত্ত তাই হে,
তাহে উছল নদী, চঞ্চল গতি, তা'রি তট বাহি' যাই হে।
ক্রমে সন্ধ্যা আসিছে অন্ধতামসে নালোজ্জ্বল গগনে,
ওই পেচক ঝিল্লি উল্লাসে বসি ঝঙ্কার করে সঘনে ;
ক্রমে পন্থা না হয় লক্ষ্য পদে কণ্টক ফুটে লক্ষ,
তবু দীপ্ত আলোক ভিন্ন রক্ষা অন্য উপায় নাই হে।
একি বিদ্যুৎদ্যুতি ঘন ঘোরঘটা গর্জ্জন গুরুগম্ভীরে,
একি মত্ত বাত্যা উত্থিত ওগো কেমনে যাইব মন্দিরে ?
কোথা বিপদ-বিপথ-মিত্র, আজি জাগিছে তোমারি চিত্র,
আজি মুক্ত কর এ ক্ষণিক ভক্তে পদপাশে দিয়ে ঠাঁই হে।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

স্ত্রীর কর্ত্তব্য

দ্বিতীয় অধ্যায়

গার্হস্থ্য

হিন্দুর প্রথম আশ্রম গার্হস্থ্য। ইহার উপর হিন্দুর আর তিন আশ্রম নির্ভর করে। হিন্দুর আশ্রম-চতুষ্টয়ের মধ্যে গার্হস্থ্যাশ্রমই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, কিন্তু কঠোর এবং কষ্টসাধ্য। সংসারে রিপুগণের প্রাবল্যহেতু মানবদিগকে তাহাদিগের সহিত অহরহ সংগ্রাম করিতে হয় বলিয়া সংসারাশ্রমেই মানবের পূর্ণ মানবত্ব বিকশিত হয়। মনুষ্য সামাজিক জীব, একাকী থাকা তাহার স্বভাববিরুদ্ধ। তাহাতে না তাহার শান্তি, না তাহার সুখ, না তাহার কার্য্য করিবার ক্ষমতা হয়। এবং অন্যদিকে দেখিলে সে ইহ-লোক হইতে জ্ঞান কি ধর্ম্মের বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়া পরলোকের সম্বল করিতে পারে না। অসাধারণ প্রকৃতিসম্পন্ন দুই এক ব্যক্তির বিষয়ে যাহা হউক, কিন্তু সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে সর্ব্বক্ষণ সামাজিক সাহায্য ভিন্ন কোনো উন্নতির সম্ভাবনা নাই। গৃহস্থাশ্রম ঈশ্বর-প্রদত্ত পবিত্র আশ্রম। মাতা-পিতা, পতি-পত্নী, ভ্রাতা-ভগিনী, পুত্র-কন্যা লইয়া যে সম্বন্ধ তাহা ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট ও স্বর্গীয়। অন্যান্য জীবের শিশু সন্তানদিগকে পালন করিতে যত সময় ব্যয়িত হয়, মনুষ্য-সন্তানের পক্ষে তদপেক্ষা অধিক। অন্যান্য জন্তুর শাবকদিগকে যেরূপ শিক্ষা দান করিতে হয়, মনুষ্য-শিশুর প্রতি তদপেক্ষা অনেক গুণ অধিক চাই। মনুষ্যের ভাগ্য যেমন অবিশ্রান্ত দুঃখের অধীন, তাহাতে সুরসাল গৃহস্থাশ্রম না থাকিলে শীতল হইবার স্থান

আর কোথায় ? গৃহস্থ হইয়া যে ধর্ম্মকে লক্ষ্য না করিয়া কার্য্য করিল, সে আপনাকে আপনি ঠকাইল ; তাহার জীবনধারণ-করা বৃথা। গৃহস্থ আশ্রম ধর্ম্মসাধনের সোপান বলিয়াই হিন্দুর চতুরাশ্রমের মধ্যে ইহার প্রাবল্য এত অধিক। কত শত দুশ্চরিত্র উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি পরিবার-বদ্ধ হইয়া সাধু হইয়াছে, কত নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক কোমলস্বভাব ধারণ করিয়াছে। সত্য, দয়া, স্নেহ, ন্যায়পরতা ও ক্ষমার সহস্র সহস্র উপদেশ প্রতিগৃহ হইতে প্রতিক্ষণে উত্থিত হইতেছে। বস্তুতঃ এই পরিবারের ব্যবস্থা না থাকিলে লোক-সমাজ পরস্পরের অত্যাচারে ও ঘোরতর বিশৃঙ্খলায় ক্ষণকালের মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত। ঈশ্বরে ভক্তি এবং জীবে দয়া গৃহস্থাশ্রমেই মানবের প্রথম শিক্ষা হয়। এই শিক্ষা আরো উন্নত ও বিশুদ্ধ হইয়া একদিকে জনসমাজের কল্যাণসাধন করে, অন্যদিকে প্রত্যেকের অনন্ত জীবনের পথ পরিষ্কৃত করিয়া দেয়। উজ্জ্বল শ্বেতবস্ত্রে সামান্য দাগ লাগিলে যেমন তাহা স্পষ্টরূপে দেখা যায়, তেমনই সংসারাশ্রমে যদি মানব রিপুপরতন্ত্র হইয়া স্বীয় চরিত্রকে কলুষিত করে, তবে তাহা মানব-চক্ষে অত্যন্ত স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়।

গৃহস্থাশ্রম একটি বৃক্ষবিশেষ। ধর্ম্ম ইহার শাখা, মনুষ্য ইহার পত্র, দৃঢ়ব্রত ইহার মূল। দুঃখ কলহ এবং তাপ ইত্যাদি ঝঞ্ঝাবাতে ইহা উন্মূলিত হইবার আশঙ্কা থাকে। পরন্তু শীলতা স্বীয় সুশীতল বারি অভিসিঞ্চনে বৃক্ষটিকে সুদৃঢ় রাখে। শাখা-প্রশাখা ও পত্রাদিকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করায়। বৃক্ষকে ফল-পুষ্প-সমন্বিত করিয়া তাহার শোভা বর্দ্ধন করে। সুমতি এই বৃক্ষের রস, ইহা বৃক্ষের সর্ব্বস্থানে গমন করত বৃক্ষকে পুষ্ট করে। যতক্ষণ বৃক্ষ সুরক্ষিত থাকে, ততক্ষণ ইহার সুশীতল ছায়ায় সুখে উপবেশন করিয়া দ্রোহ, ঈর্ষা, দ্বেষাদির প্রচণ্ড কিরণ হইতে মানব আত্মরক্ষা করিয়া থাকে। যদি সুমতিরূপী রস এবং শীলতারূপী জল না থাকে, তবে বৃক্ষটি শুষ্ক হইয়া যায় ; অথবা রিপু আদি প্রচণ্ড বাত্যা-দ্বারা উৎখাত হইয়া পতিত হয়। তখন দুঃখ কলহ সন্তাপ প্রভৃতি আগমন করিয়া স্বীয় বল প্রদর্শন করে। কুটুম্বাদির ক্লেশের আর অবধি থাকে না। যাহারা আপনার, তাহারাও তখন পর হইয়া যায়। কেহ কাহারও সহিত বাক্যালাপও করে না। সংসারাশ্রম কঠোর হইলেও পরীক্ষা, শিক্ষা ও ধর্ম্মোপার্জ্জনের দিকে ইহা যেমন সাহায্য করে, তেমন আর কোনো আশ্রমেই করে না। এতদ্ব্যতীত সুখ, স্বচ্ছন্দতা দ্বারা জীবনকে মধুময় ও জ্ঞানধর্ম্মে বিভূষিত করিতে সংসারাশ্রমই মানবের একমাত্র অবলম্বন।

কেহ কেহ সংসারাশ্রমকে শকটের সহিত তুলনা করেন। ধর্ম্ম ইহার ধুরা, ভ্রাতৃভাব এবং প্রীতি ইহার চক্র, স্ত্রী ও পুরুষ ইহার বলদ। যদি পরিশ্রম ও সাহস সহকারে সুমার্গে চালিত হয় তবেই তো ইহার কল্যাণ হইয়া থাকে। নতুবা কুমার্গে পতিত হইয়া অচীরে ভগ্ন দশাপ্রাপ্ত হয়।

গৃহস্থাশ্রমে থাকিতে হইলে স্বার্থপরতাকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে। স্বার্থপরতা মনুষ্যকে আপনার মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখে। কি-প্রকারে আপনার এবং আপনার ক্ষুদ্র পরিবারের ভাল হয় স্বার্থপর ব্যক্তির কেবল এই ভাবনা, এই চিন্তা এবং এই কার্য্য। আপনার সুখে সে আপনি সুখী এবং আপনার দুঃখে সে আপনি দুঃখী। পরের দুঃখে তাহার দুঃখ হয় না, পরের সুখে তাহার সুখ হয় না। স্বার্থপর ব্যক্তি তাহার ভ্রাতা-ভগিনীর কোনো সম্বন্ধ রাখে না বা তাহাদিগকে আপনার বলিয়া জানে না। সংকীর্ণতা তাহার হৃদয়কে এত ক্ষুদ্র করিয়া

দেয় যে, তাহার মনে উচ্চভাবের স্ফূর্ত্তি পায় না। স্বার্থপর লোক দ্বারা কোনো মহদ্ব্যাপার সাধন, বা কোনো জাতির সৌভাগ্য-লক্ষ্মী লাভ হইয়াছে, জগতে তাহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। স্বার্থসঙ্কুচিত হৃদয় লইয়া কেহ কোনোকালে উন্নতির মঞ্চে আরোহণ করিতে পারে না। পরকে ভালবাসাই স্বর্গ। যদি ভালবাসা না থাকিত তবে পরের উপকার কে করিত? সকলেই আপনার আপনার জন্ম ভাবিয়া মরিয়া যাইত। ভালবাসা আছে বলিয়াই জগৎ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ভালবাসার জন্যই পিতা মাতা সন্তানের লালন পালন করেন এবং তাহাদিগের প্রীতির জন্য কত কষ্ট সহ্য করেন! ভালবাসার জন্যই স্বামী-স্ত্রীতে, ভ্রাতা-ভ্রাতায় অনুরক্ত হয়। ভালবাসা না থাকিলে সংসারে নিত্য কলহ বিরাজ করিত। প্রভাতে সমীরণের হিল্লোলে যেমন পুষ্প-কলিকা-সকল প্রস্ফুটিত হয়, তেমনি প্রীতির প্রভাবে হৃদয়ের সমুদায় সদ্ভাব বিকশিত হয়। প্রকৃত প্রণয় সম্পূর্ণ অন্তরের ব্যাপার। উভয়ের হৃদয় মার্জ্জিত, উদার এবং সদ্ভাবাপন্ন না হইলে প্রণয় উৎপন্ন হইতে পারে না। সংসারে থাকিয়া যাহাতে পরের সেবা করিতে পার, এবং যাহাতে মলিন জিহ্বা হইতে একটি সুমিষ্ট কথা বাহির করিয়া বিষণ্ণ আত্মাকে সুখ-শান্তি দিতে পারে তাহার চেষ্টা সর্ব্বদাই করিবে।

ভালবাসা যদি গৃহস্থের মূল হয় তবে বিনয় তাহার পুষ্প। এই পুষ্পের অবিদ্যমানে সংসার মরুময় হইয়া থাকে। মানবের পক্ষে বিনয় অমৃতাভিষিক্ত শরৎকৌমুদী। মানব জ্ঞানালোকে আলোকিত হইতে পারে কিন্তু যদি সে প্রভায় শমগুণ না থাকে, বিনয়-সুধা যদি তদভ্যন্তর হইতে নিঃসারিত না হয়, তবে জগতের চক্ষু কেন তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে? যদি হৃদয় [illegible] করিতে চাও, ভাই-ভগ্নীদিগকে ভালবাসা-সূত্রে বাঁধিবার যদি বাসনা থাকে, তাহা হইলে যে জ্ঞান-প্রসূনে বিনয়-মকরন্দ নিত্য বিরাজ করে, সেই চিররুচিপ্রদ দেববাঞ্ছনীয় সুকোমল কুসুম-শোভা সাদরে চক্ষে ধারণ কর। দেখিবে যেন স্বর্গের সম্পত্তি—অতি আদরের ধন এই বিনয়-রত্ন অযত্ন দ্বারা হৃদয়পুর হইতে নিষ্কাশিত না হয়। যে-হৃদয় বিনয়ামৃতে অভিষিক্ত নহে, সেই শ্মশান সদৃশ দগ্ধ হৃদয় আপনিও প্রকৃত সুখ-শান্তি সম্ভোগ করিতে পারে না, অন্যকেও তাহা প্রদান করিতে পারে না। যে-গৃহ বিনয়-প্রসূনে পুষ্পিত সেই গৃহেই সুখরূপী ফল ফলিয়া থাকে, নতুবা অনন্ত কষ্ট আসিয়া গৃহস্থাশ্রমকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে। বিনয় অপসৃত হইলেই মানব-হৃদয়ে লঘুচিত্ততা আসিয়া পড়ে। অগাধ ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইলেও গার্হস্থ্যধর্ম্মে মানব সমুদ্রের ন্যায় প্রশান্ত থাকিবে। গৃহস্বামী স্বীয় মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিলেই তাহার আশ্রিতগণ বিফল হইয়া থাকেন। এই জন্য গৃহস্থের বিনয় থাকাই চাই এবং তৎসঙ্গে ধৈর্য্য থাকা বিশেষ প্রয়োজনীয়। ধৈর্য্য না থাকিলে পারিবারিক কুশল ও শান্তি সংরক্ষিত হয় না। পরিবারের প্রকৃত ভার নারীগণের উপরেই পতিত হয়। তাঁহাদিগের কোমল হৃদয় সকলের জন্য যেরূপ ভাবিয়া থাকে, সকলের ব্যথায় যেরূপ ব্যথিত হয়, সকলের সুখের জন্য যেরূপ ত্যাগ স্বীকার করিয়া থাকে এরূপ আর কে করে? নারী-প্রকৃতি যত সহিষ্ণু ও ধৈর্য্যশীল হইবে, ততই তাহার মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইবে।

সংসারাশ্রমে শান্তি থাকা অত্যন্ত উচিত। যেখানে স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা, ভাই-ভগিনী একত্র হইয়া বাস করা যায়, এই পৃথিবীতে সেই স্থান স্বর্গতুল্য। মানব যেদিন হইতে পরিবারে বদ্ধ হইয়াছে তাহার পশুভাব সেই দিন হইতে দমন হইয়াছে; অনেক পরিমাণে এবং [illegible]

সঙ্গে সঙ্গে সুখের পরিমাণ সহস্র গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। যে স্বার্থপর মনুষ্য সমাজের কল্যাণ-চিন্তা করে না,এবং সমাজের হিতের জন্য এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিতে সম্মত নহে, সে ব্যক্তিও পরিবারের কল্যাণচিন্তা করে এবং পরিবারের সুখের জন্য আপনার সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। ইহার কারণ এই, পৃথিবী মরুভূমি তুল্য হইলেও স্বীয় পরিবারের প্রত্যেকের শান্তি ও আরামস্থান। পারিবারিক কোমল স্নেহসম্বন্ধ কঠোর হৃদয়কে বিগলিত করিয়া ফেলে; এবং তাহা হইতেও সহিষ্ণুতা, নিঃস্বার্থভাব ও দয়ার সহস্র সহস্র পরিচয় প্রদান করিতে থাকে। সংসারে যাহাতে শান্তি বিরাজ করে, তজ্জন্য ভগবান মানব হৃদয়কে স্নেহ, দয়া প্রণয় প্রভৃতি স্বর্গের কুসুমে ভূষিত করিয়াছেন। এই গুণগুলি যে-পরিবারে নাই, সে-পরিবারে শান্তি থাকিতে পারে না! সংসারে যাহাতে মনোভঙ্গ না হয় সদাই তাহার চেষ্টা দেখা উচিত।

গৃহস্থাশ্রমে মনোভঙ্গের প্রধান কারণ হিংসা। ঈশ্বরের দয়া যত বেশ ধারণ করিয়া জীবের কল্যাণসাধন করে, হিংসাও তত বেশ ধারণ করিয়া পরের অনিষ্ট-চেষ্টা করিয়া থাকে। ধন, মান, বিদ্যা, বুদ্ধি, শারীরিক রূপ ও পারিবারিক সৌভাগ্য —এমন কি ধর্ম্মের উপরও লোকের হিংসা হয়। অন্যের ধন, ঐশ্বর্য্য কেন আমার অপেক্ষা অধিক হইল, অন্যে লোকের নিকট এত পূজ্য ও যশস্বী হইবে কেন, অন্যে জ্ঞানে ও বুদ্ধি-কৌশলে আমাকে অতিক্রম করিল, অন্যের রূপ-লাবণ্য যেমন, আমার তেমন নয়, অন্যের যতগুলি পুত্র-কন্যা, ভাল ভাল কুটুম্ব, আমার তেমন নাই; এই ভাবিয়া হিংসুকের মন পীড়িত ও বিকারগ্রস্ত হইয়া থাকে। হিংসা অতি স্বার্থপর ও সঙ্কীর্ণ মন হইতে উৎপন্ন হয়। যে আপনার সুখকেই সুখ বলিয়া জানে, অন্যের সুখে কখনো সুখানুভব করে না, সে সর্ব্বাপেক্ষা হিংসাপরায়ণ হয়। আপনার পরিবার অতিক্রম করিয়া যাহার চিন্তা কখনো যায় না, তাহার হৃদয় উদার হইতে পারে না। জ্ঞানের অল্পতাতেও মনকে সঙ্কীর্ণ করিয়া রাখে। এই কারণে দেখা যায় এ দেশের পুরুষদিগের অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে হিংসাবৃত্তি প্রবল। হিংসায় স্ত্রীলোক লজ্জাহীনা হয়, সুরূপা হইলেও কদাকার হয় এবং তাহার যত সদ্‌গুণ থাকুক সকলি বিনষ্ট হইয়া যায়। গার্হস্থ্য ধর্ম্মে থাকিতে হইলে হিংসাকে দূর করিয়া দেওয়া উচিত।

গৃহস্থের সদাই পরিশ্রমী হওয়া উচিত। আলস্য দরিদ্রতার কারণ। পরিশ্রম ব্যতীত গৃহস্থের পালনও সম্ভবপর নহে। প্রথমত আলস্য অর্জ্জনের পথরোধ করিয়া দেয়, দ্বিতীয়ত সঞ্চিত ধনরাশির ব্যয় করিয়া থাকে। আয় বন্ধ হইলে ব্যয়ের সঙ্কুলান হওয়া সুদূরপরাহত। অলস ব্যক্তির পক্ষে ঋণগ্রহণও অসম্ভব হইয়া পড়ে; কারণ সে যখন স্বীয় অর্জ্জিত ধনরাশির ব্যয় করিয়াছে, তখন সে ঋণদাতাকে কি দিতে পারে? এমন পাপ কার্য্য নাই যাহা ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি করিতে পারে না। এবং পাপে লিপ্ত হইলেই সে নাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

অসময়ে নিদ্রা, পরসহবাস দারিদ্র্যের হেতু। সুতরাং গৃহস্থ ব্যক্তি এগুলিকে পরিত্যাগ করিবে। এতদ্ব্যতীত প্রীতির হ্রস্বতা, বিবেক-শূন্যতা, বালক-দিগের শিক্ষায় শিথিলতা, অসতর্কতা, ধৈর্য্যভ্রংশতা, চিত্তচাঞ্চল্য, সৎসঙ্গের পরিহার, কুসঙ্গ, সজ্জনের সহিত বিরোধ, পরনিন্দা এবং শীলতার পরিত্যাগ গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষে বিপদের হেতু জানিবে।

গৃহই রমণীদিগের রাজত্ব; সুতরাং দায়িত্বও অধিক। পদ্যে যে-সুখ অনুভব করা যায় না, সঙ্গীত যে-আনন্দ দিতে অক্ষম, গৃহ সে-আনন্দ দান করিতে সক্ষম। সংসারাশ্রমে স্বামীই রমণীর দেবতা। স্ত্রীলোকের পতির ন্যায় প্রিয় বস্তু [illegible]

জগতে আর নাই। তন্ত্রীশূন্য বীণা যেমন বাজিতে পারে না, এবং চক্রশূন্য রথও যেমন চলিতে পারে না, তেমনি স্বামী যদি না থাকেন, শত পুত্রের জননী হইলেও স্ত্রীলোকের সুখোৎপত্তি হইতে পারে না। কারণ তাহাদিগের প্রসূত সন্তান-গণ—যাহাদিগকে তাহারা আপনার হৃদয়ের ধন বলিয়া বিবেচনা করে তাহারাও বড় হইলে স্বাধীন হইতে চেষ্টা করিবে ; তখন তাহারা তাহাদিগের রহিবে না, কিন্তু তাহাদিগের যদি কেহ আপনার বলিয়া পৃথিবীতে থাকে সে তাহাদিগের স্বামী। পৃথিবীতে বন্ধুগণ তোমাকে সামান্য অর্থদানে কুণ্ঠিত হইবেন, কিন্তু তোমার স্বামী তোমাকে তাহার মন-প্রাণ গৃহ ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি যাবতীয় দুর্লভ পদার্থ অকাতরে অর্পণ করিয়াছেন। এ হেন স্বামীকে অবজ্ঞা করিলে তোমাদিগের নরকেও স্থান হইবে না। অনাহারে অনিদ্রায় যত বড় ব্রতেরই অনুষ্ঠান কর না কেন, আর যত বিপুল ধনরাশি দীন দরিদ্রকে দান কর না কেন, কিম্বা কঠোর তপস্যা অবলম্বনে পুণ্য সঞ্চয় কর না কেন, অথবা সত্য পথারূঢ় হইয়া যতই ধর্ম্মোপার্জ্জন কর না কেন, তোমার পতিভক্তি না থাকিলে সে সমস্তই ভস্মাকারে পরিণত হইবে।

সংসারে স্ত্রীগণের স্বামীই পরিচালক। এই লোভময় ভীষণ সংসারে স্ত্রীজাতি অতিশয় দুর্ব্বল প্রকৃতি। তাই তাহাদিগকে স্বামীর করে সমর্পণ করিয়া পিতা-মাতা নিশ্চিন্ত হন। স্ত্রী-জাতি যৌবন-মধ্যাহ্নে স্বামীর আশ্রয়ে উপনীত হইয়া পূর্ণবিকাশপ্রাপ্ত হয়, এবং আপনাকে নিরাপদ জ্ঞান করে। স্ত্রীজাতীর স্বামীই একমাত্র অবলম্বন, বিপদের বন্ধু, সম্পদের সখা, দুঃখের সহানুভূতি, আনন্দের প্রীতি, ধর্ম্মের সহায়, এমন কি সম্পদে-বিপদে, সুখে-দুঃখে এমন সমভাগী তাহাদের আর কেহ নাই। সংসার-ক্ষেত্রে উভয়েই উভয়ের হিতাকাঙ্ক্ষী। দুইটি প্রাণ একই লক্ষ্য করিয়া আজীবনের জন্য ছুটিয়াছে। স্বামী পথপ্রদর্শক, স্ত্রী অনুগামিনী, স্বামী কায়া, স্ত্রী তাঁহারই ছায়া মাত্র। স্বামী ভিন্ন স্ত্রীর অন্য গতি নাই। কিসে তাঁহার শুভ হইবে, স্ত্রীর জীবনে সেই ধ্যান-ধারণা। স্বামীই স্ত্রীলোকের জীবন-তরণীর একমাত্র কাণ্ডারী। কাণ্ডারী ব্যতীত নৌকা যেমন চলিতে সক্ষম না হইয়া বিপথে গমন করিয়া বিপদাপন্ন হয়, সেইরূপ স্বামীর সাহায্য ব্যতীত এই অনন্ত সংসার-সমুদ্রে স্ত্রী-জীবন দিশাহারা হইয়া আপন কর্ত্তব্য পথ স্থির করিয়া লইতে কষ্ট বোধ করে। অতএব স্ত্রীকে স্বামীর অনুগত হইতেই হইবে।

সংসারে পত্নীর দায়িত্ব অতি গুরুতর। কেবল মাত্র পতিকে যত্নপূর্ব্বক পান-ভোজন করাইলে, রোগের সময় তাঁহার শুশ্রূষা করিলে ও অন্যরূপে তাঁহার সুখস্বাস্থ্য সাধনে নিযুক্ত থাকিলেই যে স্ত্রীর উপযুক্ত পতি-সেবা হইল, সহ-ধর্ম্মিণীর কার্য্য হইল তাহা নহে। উহা আংশিক পতিসেবা বলা যাইতে পারে। পতিপরায়ণা হইতে হইলে স্ত্রীলোকের উল্লিখিত পতিসেবা তো চাই-ই, তদ্ব্যতীত পত্নীকে স্বামীর ধর্ম্ম-বিষয়ে সহায়তা করিতে হইবে। যে-নারী উল্লিখিত কার্য্যসকলের সঙ্গে ধর্ম্ম-বিষয়ে সহায়তা করিয়া পতির আত্মার কল্যাণসাধন করেন, তিনিই প্রকৃত পতিসেবাপরায়ণা সহধর্ম্মিণী ; তাঁহা দ্বারা যথার্থ পতিসেবা হয়। পতি শরীর নহে, শরীরস্থ আত্মা। অনেক ভোগসুখপরায়ণা নারী স্বামীর শরীরের প্রতি আসক্ত, তাঁহার শরীর লইয়াই দিবা-রাত্রি ব্যস্ত। স্বামীকে ঈশ্বরবিমুখ ধর্ম্মভ্রষ্ট নীতি-বিহীন দেখিয়াও সে-স্ত্রীর মনে ক্লেশ হয় না ; তাঁহাকে ধর্ম্মপথে আনয়ন করিবার জন্য যিনি যত্ন করেন না, সেই স্ত্রীকে কেমন করিয়া পতিব্রতা সহধর্ম্মিণী বলা যায়? পতির সঙ্গে যিনি নীচ পাশব সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া উচ্চ আধ্যাত্মিক দিব্য সম্বন্ধ স্থাপন করেন তিনিই প্রকৃত

তিনিই সতী পুণ্যবতী। তিনি নিজের জীবনের সদৃষ্টান্তে, ন্যায়ের তীক্ষ্ণ শাসনে, প্রেমের আকর্ষণে, বিনয়-গাম্ভীর্য্যপূর্ণ সদুপদেশে তাঁহাকে ধর্ম্মের দিকে—ঈশ্বরের দিকে আকর্ষণ করেন। স্ত্রীর উচ্চ ধর্ম্মভাব ও প্রাণগত যত্ন-চেষ্টা ও ব্যাকুলতায় পত্নীর ধর্ম্মবৃদ্ধি হয়, তিনি উচ্চ জীবন লাভ করেন। ইহাকে বলে প্রকৃত পতিসেবা ও পাতিব্রত্য।

সতী পুণ্যবতী নারী সংসারের শ্রী, গৃহের লক্ষ্মী, ধর্ম্মের প্রকৃত সঙ্গিনী, স্বামীর যথার্থ সহচরী ও বন্ধু। ইঁহার সহবাসে গৃহ পুণ্যধাম হয়, সংসার মধুময় হয়, সন্তান সন্ততির চরিত্র গঠিত হয়, গৃহে শান্তি বিরাজ করে। প্রকৃত সতীত্ব নারীজাতির দেবদুর্ল্লভ অলঙ্কার; জীবন-সংগ্রামে ইহা তাঁহাদের অভেদ্য কবচ, পরিবার-মধ্যে ইহা স্বর্গীয় কৌস্তুভমণি, ধর্ম্মজীবনে ইহা অদ্বিতীয় সহায়, জন-সমাজে ইহা পবিত্র আদর্শ। সতীত্ব জন-সমাজের মেরুদণ্ড, সতীত্ব সামাজিক জীবনের একমাত্র ভিত্তি। সতী জননীর ন্যায় বাৎসল্য-পরায়ণা, সখীর ন্যায় হিতৈষিণী ও সৎপরামর্শদাত্রী, কন্যার ন্যায় আজ্ঞানুবর্ত্তিনী, দাসীর ন্যায় পরিচর্য্যা-নিরতা। তিনি পতিসেবার জন্য যে-সময়ে যেরূপ প্রয়োজন, সেই সময়ে সেই মূর্ত্তি সেই বেশ পরিগ্রহ করেন।

পতিসেবা নারীর পক্ষে শ্লাঘার বিষয়। জনক-দুহিতা সীতা অতুল ঐশ্বর্য্য-ক্রোড়ে পালিতা হইয়া স্বামীর সঙ্গে বনে গমন করিয়াছিলেন। রাজদুহিতা জানকী শ্বাপদসঙ্কুল বন অপেক্ষা রাজান্তঃপুরই কষ্টকর স্থান জ্ঞান করিয়া মনের আনন্দে স্বামীর সহগামিনী হইয়াছিলেন। স্বামীর সঙ্গে বনে গমন করিয়া কুচক্রী সংসারের কঠোর নিষ্পীড়নে কত কষ্টই ভোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি তিনি স্বামীসেবা হইতে বিমুখা হন নাই। দক্ষকন্যা সতী পিতার সন্নিধানে স্বামীর নিন্দা শ্রবণ করিয়া স্বীয় প্রাণ উৎসর্গ করেন। মহারাজা হরিশ্চন্দ্রের রাণী শৈব্যা স্বামীকে বিশ্বামিত্রের ঋণ হইতে পরিমুক্ত করিবার জন্য আপনাকে বিক্রয় করিতে স্বামীকে পরামর্শ দিয়াছিলেন। বিপদকালে তিনি পিতৃ-গৃহে না যাইয়া স্বামীর সহিত থাকিতেও সুখ বোধ করিয়াছিলেন এবং স্বীয় অলঙ্কারাদি পরিত্যাগ করিয়া পতির সহিত থাকিতে স্বীকৃতা হইয়াছিলেন। চিতোরের রাণী পদ্মিনী স্বীয় স্বামী ভীমসিংহকে দিল্লীর বাদসাহ আলাউদ্দিনের হস্ত হইতে কৌশলে উদ্ধার করিয়াছিলেন। পতিপরায়ণা বেহুলা সর্পদষ্ট মৃত স্বামীর বিগলিত শরীর সঙ্গে লইয়া সামান্য ভেলাতে অকূল সাগরে ভাসমান হইয়া তাঁহাকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। সাবিত্রী সত্যবানের জন্য মৃত্যুর অধিপতি যমরাজের সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক স্বামীর প্রাণভিক্ষা লইয়াছিলেন। বহুকাল অতীত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এই সমস্ত সতী রমণীগণের নাম এখনো পর্য্যন্ত অটুট রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত দুর্গোর সুর্চ্চলা, চন্দ্রের রোহিনী, বশিষ্ঠের অরুন্ধতী, অগস্তের লোপামুদ্রা, চ্যবণের সুকন্যা, কপিলের শ্রীমতী, ইন্দ্রের শচী, দশরথের কৌশল্যা, সৌদাসের দময়ন্তী, ব্রহ্মার সাবিত্রী, এবং নারায়ণের লক্ষ্মী পতিব্রতা ধর্ম্মের জন্য জগতে বিখ্যাত। সতীত্বের গৌরব বুঝিত বলিয়াই রমণী-সম্মান, রমণী-মাহাত্ম্য একমাত্র ভারতবর্ষেই উচ্চতম সীমায় উপনীত হইয়াছে। স্মৃতি, শ্রুতি, পুরাণ—যেখানেই অন্বেষণ করিবে, সেইখানেই দেখিতে পাইবে—স্ত্রী-জাতির সম্মান, পত্নীর আদর, সাধ্বীর মাহাত্ম্য। সেইখানেই দেখিবে, নারী-হেলায় নিন্দা, পত্নী-অনাদরের কুৎসা, কুলবধূ সন্তাপের বিষময় ফল। তাই এত অধঃপতন-কালেও হিন্দুর ঘরে এই গৃহদেবতা লক্ষ্মীরূপিণী রমণী আদর-গৌরব কমে নাই। এখনো হিন্দু বুঝে, হিন্দু ভাবে,

সাধ্বী রমণী স্বর্গের সৃষ্টি, লক্ষ্মীর মূর্ত্তি, দেবীর প্রতিমা। তাই যে-শক্তি ধনধান্যদায়িনী সংসার-শ্রীবর্দ্ধিনী, তাহা লক্ষ্মীরূপে,—যে-শক্তি বিপদ-নাশিনী, শত্রু-দলনী, কালভয়নিবারিণী, তাহা কালীরূপে—যে-শক্তি জ্ঞান-প্রসবিনী, জ্ঞানদায়িনী, তাহা সরস্বতীরূপে—যে-শক্তি সর্ব্বভূত বিশ্ব প্রসবিনী, বিশ্বজননী, তাহাই আদ্যাশক্তি ভগবতী-রূপে এ-দেশে পূজিত। ইহা অপেক্ষা রমণী গৌরব ও রমণী-মাহাত্ম্যের উচ্চতা ও প্রবলতা আর কোথায় দৃষ্ট হয়?

মানব-সমাজ উন্নত করিতে হইলে স্ত্রীগণকে পতিব্রতা হইতেই হইবে। স্ত্রীজাতি সমাজের আকর্ষণ-দণ্ড। সদাচার ইহার মূল, ভক্তিই ইহার অঙ্গ, পরোপকার ইহার শার্ষ দেশ এবং আত্মত্যাগ ইহার আকর্ষণশক্তি। যতদিন এই কয়েকটি উপাদান অটুট থাকিবে ততদিন শক্তি অক্ষুণ্ণ ও সমাজ অটল থাকিবে। ততদিন শত সহস্র রাজনৈতিক বিপ্লব দেশকে আলোড়িত করিলেও সমাজকে তিলমাত্র কম্পিত করিতে পারিবে না। আজো হিন্দুর পবিত্র দাম্পত্য প্রণয় জগৎকে স্পর্দ্ধা করিতেছে;—আজো হিন্দু মহিলার দেবভক্তি, গুরুভক্তি, পতিভক্তি, জগতে স্ত্রী-চরিত্রের আদর্শ হইয়া রহিয়াছে। এই মহামন্ত্রের মহীয়সী শক্তির প্রভাবেই হিন্দুর প্রাচীন গরিমা আজো অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

বর্ত্তমান যুগের মহিলাগণ প্রায়ই প্রকৃত পাতি-ব্রত্যের ধার ধারেন না। গূঢ় অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবে যে, অধিকাংশ স্ত্রীলোক বাস্তবিক পতিকে প্রণয় করেন না। তাঁহারা অলঙ্কার, পরিচ্ছদ প্রভৃতি বিলাস-বস্তুর প্রকৃত প্রণয়িণী; পতি-প্রণয়িণী নহেন। যে-পতি অর্থশালী,উপার্জ্জন-শীল, পত্নীর আজ্ঞামত বিলাসবস্তুসকল প্রদান করিতে পারেন, তিনিই এখন পত্নীর প্রণয়-ভাজন। যদি তিনি অর্থোপার্জ্জন করিতে না পারেন তবে তিনি স্ত্রীর প্রণয়-অধিকারী নহেন। যে-স্ত্রী সর্ব্বদা তাঁহাকে বিবিধ উপাদেয় পদার্থ প্রদান করিত, তাঁহার সামান্য পীড়া হইলে তাঁহার অসুখের সীমা-পরিসীমা থাকিত না, অর্থাগমের অভাব-প্রযুক্ত ঘোর দরিদ্র-দশা উপস্থিত হইলে সেই স্ত্রী সেই পতিকে সহস্র কটুবাক্য না বলিয়া শাকান্নও প্রদান করে না। অনেক দুর্ভাগ্য পুরুষ এই অবস্থায় প্রত্যেক অন্নগ্রাস অশ্রুপাতের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাকে কি আমরা পতিপ্রেম বলিব? যে বিলাসবস্তুকে প্রণয় করে আমরা তাহাকে পতিব্রতা বলি না। বিলাস-প্রণয়িণী এবং বারাঙ্গনাতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই।

যেসকল মহিলা অলঙ্কার ও বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া স্বীয় সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে চাহেন, আমরা তাঁহাদিকে সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি করিতে নিষেধ করি না, কারণ যে-নারীর সৌন্দর্য্য নাই তাহার কিছুই নাই। সৌন্দর্য্যরক্ষা ও সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি বিষয়ে অবহেলা করা পাপ; কিন্তু আমরা এই মাত্র তাঁহাদিগকে বলিতে চাহি যে, শারীরিক সৌন্দর্য্য প্রকৃত সৌন্দর্য্য নহে, উহা অসারের অসার; দুই দিন পরে উহা জীর্ণ-শীর্ণ ভগ্ন হইবে, শতযত্নেও উহাকে অক্ষয় রাখিতে পারিবে না। কৃত্রিমতা যত কম হইবে ততই স্বভাবের প্রকৃত সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিবে। একটি সতী নারীর পবিত্রতা লজ্জা বিনয়ের নিকটে অন্য নারীর হীরা-মুক্তা-খচিত আভরণের কিছুমাত্র মূল্য নাই। সতীত্ব-ভূষণে যিনি ভূষিতা, তাঁহারই সৌন্দর্য্য। স্বার্থত্যাগে, বিলাসবাসনা বর্জ্জনে, ঈশ্বরোপাসনায়, প্রেম ও পবিত্রতায়, পরসেবায়, চিত্ত-সংযমে, জিতেন্দ্রিয়তায় ও দয়াদাক্ষিণ্যে সেই সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট হইয়া থাকে। জরা-বার্দ্ধক্যে সেই সৌন্দর্য্যের বিনাশ হয় না, মৃত্যুতেও সেই সৌন্দর্য্য বিলুপ্ত হয় না।

যাহাতে স্বামী-স্ত্রীতে কলহ না হইতে পারে

তদ্বিষয়ে নারীগণের মনোযোগী হওয়া উচিত। স্ত্রী-পুরুষের কলহ অমানুষোচিত বিগর্হিত কার্য্য। পত্নী পতিকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করিবেন, সকল ব্যাপারে তাঁহার বশবর্ত্তিনী হইয়া চলিবেন, তাঁহার দোষ ত্রুটি দেখিলে ক্ষমা করিবেন। পতিও পত্নীর প্রতি বিশুদ্ধ প্রীতিসম্পন্ন হইবেন, তাঁহার অপরাধ ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া অকৃত্রিম প্রণয়ের পরিচয় দিবেন, ইহাই স্বর্গীয় বিধি। মানগর্ব্বিত হইয়া প্রেমের ঝগড়ায় গালি তিরস্কার, লাঠালাঠি আসুরিক ভাব। যদি কখনো কলহ সঙ্ঘটন হয়, তবে তোমাদিগের শুভ পরিণয়-দিনের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়ো। তাহা হইলে তোমাদের মনোমালিন্য তৎক্ষণাৎ তিরোহিত হইবে। বিবাহ-দিনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যে, উভয়ে উভয়ের জীবন-পথের সঙ্গী ও সঙ্গিনী হইবে। বিবাহ-বাসরে স্বামী ও স্ত্রী কত সুখের কল্পনা মানস-পটে চিত্রিত করিয়া সংসারে প্রবিষ্ট হন, স্বামীর মনে কত আশা, তাঁহার এই নব-পরিণীতা ভার্য্যা কালে সুগৃহিণী হইয়া তাঁহার গৃহ উজ্জ্বল করিবে, তাঁহার গৃহ প্রীতি ও পবিত্রতার আধার হইয়া তাঁহাদিগের দাম্পত্য-জীবন কত সুখময় করিয়া তুলিবে, হিংসা-দ্বেষরূপ বিষবহ্নি তাঁহাদের সুখাগারে প্রবেশ করিয়া তাহা কলুষিত করিতে পারিবে না, সেখানে কেবলই চিরশান্তি বিরাজ করিবে। কিন্তু যদি তোমরা অনভিজ্ঞতার দোষে স্বামীর সেই আকাঙ্ক্ষিত বিষয়ের বিপরীত ব্যবহার করিয়া সংসার অশান্তিময় করিয়া তুল, তবে তাহা কি দুঃখের বিষয় নহে? উভয়ে উভয়ের প্রতি নির্ভর করিয়া যে-আশা-প্রদীপের উজ্জ্বলালোকে সংসারে আপনাদের জীবনের পথ অতি সুখকর ও অতি সহজসাধ্য জ্ঞান করিয়া আসিতেছিলেন, স্ত্রীগণ আপনাদের ব্যবহার দোষে মনোমালিন্যরূপ মহাবাত্যা সৃজনপূর্ব্বক আপনাদের সেই স্নিগ্ধোজ্জ্বল আশা-প্রদীপকে চিরজীবনের জন্য নির্ব্বাপিত করিয়ো না। রমণী চেষ্টা করিলে গৃহকে স্বর্গতুল্য করিতে পারেন, আবার স্বভাবদোষে তাহা নরকেও পরিণত করিতে পারেন। যে-গৃহে রমণী-কণ্ঠ হইতে অনবরত কর্কশ বাক্য নির্গত হইতেছে, যে-গৃহ কলহ ও অশান্তির চির-আবাস তাহাকে মূর্ত্তিমান নরক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আর একদিকে, যে-গৃহে রমণী নিজ সদ্‌গুণরাশি দ্বারা মধুরতা ও সৌন্দর্য্য বিকীর্ণ করিতেছেন, যে-গৃহ হইতে নিয়ত আনন্দ-রোল উত্থিত হইতেছে, অশান্তি ও কলহ যে-গৃহ হইতে বহুদূরে পলায়ন করিয়াছে, তাহাকে স্বর্গ বলিব না তো পৃথিবীতে আর স্বর্গের ছবি কোথায়? অনেক স্থলে পুরুষের কঠোর ব্যবহারে ও পুরুষের অবিবেচনায় গৃহের শান্তিভঙ্গ হয় স্বীকার করি; কিন্তু সে-গৃহের রমণী যদি স্নেহশীলা ধৈর্য্যশালা হন, তবে সে অশান্তি কত দিন থাকে? আমি একথা বলি না যে, পরিবার মধ্যে পুরুষের কোনো দায়িত্ব কোনো কর্ত্তব্য নাই। তাহারও গুরুতর কর্ত্তব্য আছে। পুরুষ রমণীকে শ্রদ্ধা করিবেন, রমণীও পুরুষকে শ্রদ্ধা করিবেন। স্ত্রী ও পুরুষ দ্বারা সংসার গঠিত। পুরুষ-প্রকৃতি কঠোর, স্ত্রী কোমলতার আধার। এই কঠোর ও কোমলের সংমিশ্রণ অতি মধুর। কেবল কঠোর অথবা কোমলে সংসার চলিতে পারে না, তাই বিধাতা তাঁহার অপূর্ব্ব সৃষ্টি-কৌশলে দুইটি প্রাণ একত্র করিয়া একের অভাব অন্যটিদ্বারা পূরণ করিয়াছেন। তাই একের অভাবে অন্যটি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। তাই একজন গরম হইলে অন্যজনের নরম হওয়া চাই। নতুবা কলহ বাড়িয়া যাইবে।

স্বামী যদি কোনো ঘটনাচক্রে দাম্পত্য প্রেমের সরস রাজ্য হইতে স্খলিত হইয়া কর্দ্দমময় সংসারে নিপতিত হয়, তবে বিদুষী জ্ঞানবতী উন্নতমনা সাধ্বী স্ত্রী সদা হাসি-হাসি-মুখে, মধুর সম্ভাষণে তাহাকে পাপ পথ হইতে উদ্ধার করিতে চেষ্টা

করিবেন। রাগে বিবাদে ও অভিমানে মুখ ভার করিয়া থাকিলে কোনো সুফল ফলিবে না বরং কুফলের সম্ভাবনা। অথবা স্বামীকে পরদাররত দেখিয়া নিজে পতিব্রতার ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিয়া নিজের পিতৃকুলের ও শ্বশুরকুলের উপর কলঙ্ক আনয়ন করিবে না, বরং স্বামীর অধীন থাকিয়া তাঁহার মন আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিবে। পত্নী যদি মনে-প্রাণে পতির সহিত প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করে, তবে পতিও তাহার গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাহার বশ হইয়া যাইবে। কারণ সদ্‌গুণের ন্যায় আকর্ষণকারী বস্তু পৃথিবীতে অতি বিরল। কিন্তু পত্নী যদি বিবাদ, রাগ, দ্বেষ ও কটুকর্কশ ভাষায় পূর্ণ হয়, তবে পতির অভিরুচি তাহার উপর হইতে অপসারিত হইয়া পরস্ত্রীতে ঘনীভূত হইতে পারে এবং যে অর্থ স্ত্রী বা তাহার সন্তান-সন্ততির সুখের জন্য সংগৃহীত হইত, তাহা না হইয়া পরের জন্য ব্যয়িত হইবে। সুতরাং তাহাতে স্ত্রী বা তাহার সন্তানাদির ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই। কিন্তু স্ত্রী যদি স্বামীর সহিত সদ্ভাব রাখে তবে সে-ধন আর অযথা খরচ হইতে পারে না—ইহা বড় অল্প লাভের বিষয় নহে।

সংসারে চরিত্রগঠনে নারী প্রধান সহায়। শৈশবে মাতা ও যৌবনে স্ত্রী-চরিত্র-সম্বন্ধে ভ্রান্ত পথিকের ধ্রুব নক্ষত্ররূপিণী। পুরুষ স্ত্রীর স্নেহ কোমলতা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণে বিস্মিত ও মোহিত হইয়া আত্মবিস্মৃত হয় এবং আত্ম-সমর্পণ করে। জ্ঞান, ধর্ম্ম ও আনন্দে সুশোভিত রমণী পতির গৌরব ও স্বর্গের দেবীতুল্যা। যে-গৃহে গৃহিণী ধর্ম্ম-বিরোধিনী, উগ্রপ্রকৃতি, কলহ-প্রিয়া, নীচাশয়া, সেই গৃহ হইতে সুখ-শান্তি বহু দূরে পলায়ন করে। সেই স্থান পাপের আবাস হইয়া থাকে। এইজন্য স্ত্রীগণকে মিষ্টভাষিণী হইতে হইবে। বেশভূষায় বিভূষিত হইয়া স্বামীর নয়নরঞ্জক আপাতরম্য পুতুল না হইয়া তাঁহার হৃদয়মোহিনী দেবী হইতে হইবে। পতির নয়নের উপর রাজত্ব না করিয়া স্নেহ কোমলতা প্রভৃতি গুণে তাঁহার হৃদয়ে রাজত্ব করিতে হইবে।

কখনো গৃহের অন্যান্য ব্যক্তিদিগের সহিত মনোমালিন্যের সৃষ্টি করিয়ো না। স্মরণ রাখিয়ো যে, পরমেশ্বর স্ত্রী-জীবন স্নেহ, প্রেম, দয়া, বদান্যতা, প্রীতি ও ক্ষমা প্রভৃতি নানাবিধ সদ্‌গুণের আধার করিয়া সৃজন করিয়াছেন। ইহার কোনো একটির অভাব ঘটিলে সংসার অশান্তিময় হইয়া উঠে। স্ত্রীলোক সংসারের ভিত্তিস্বরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। স্ত্রীলোকই সংসারের অধিষ্ঠাত্রী; তাঁহাদের নিজ জীবনের দায়িত্ব বুঝিয়া চলা উচিত। রমণী সুগৃহিণী হইয়া প্রিয়জনের সকল অবস্থার সহায় হইবেন। পরিবারের কর্ত্রীর শাসন ও কার্য্যপ্রণালী সুশৃঙ্খলাপূর্ণ হইবে; সম্মানের আসন চির অচল থাকিবে; অথচ কোমল হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত স্নেহ, প্রীতি-বিস্ফারিত আনন, সস্নেহ সম্ভাষণ, মধুর বচন, শ্রান্ত জনের আনন্দ-বিধায়ক হইয়া প্রতি জনকে আকৃষ্ট করিবে। সকল হৃদয় সেই শীতল ছায়ায় আসিয়া তৃপ্তিলাভ করিবার জন্য চিরদিন উৎসুক থাকিবে। যেসকল স্ত্রী, ধর্ম্ম এবং অন্যান্য বন্ধু হইতে স্বামীর চিত্তকে হরণ করিয়া লয়, যাহারা নানাপ্রকার কুহক দ্বারা স্বামীর মনে তাঁহার পিতা, মাতা, সহোদর, সহোদরা এবং অন্যান্য বন্ধুদিগের প্রতি অশ্রদ্ধা এবং অনাদর জন্মাইয়া দেয় কাল তাহারা কখনই অন্তরঙ্গ নহে; তাহারা ভুজঙ্গিনী। পক্ষান্তরে যেসকল স্ত্রী আপনা-দিগের স্বামীর হৃদয়কে দয়ার্দ্র এবং কোমল করিয়া পরসেবার জন্য প্রস্তুত করিয়া দেন, তাঁহারাই যথার্থ সতী। তাঁহারাই ধন্য এবং তাঁহারাই সকলের শ্রদ্ধা এবং আদরের পাত্র।

স্বামী প্রবাসে গেলে রমণী পিতা, মাতা, পুত্র, ভ্রাতা, শ্বশ্রূ, শ্বশুর বা মাতুলের অধীনে অবস্থান করিবেন। ইচ্ছানুসারে ভ্রমণ

আমোদ প্রমোদে যোগদান ইত্যাদি তাঁহার সর্ব্বতোভাবে পরিহর্ত্তব্য; নতুবা প্রণষ্টচরিত্র পুরুষের মন স্ত্রীলোকের উপর আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে ধর্ম্মমার্গ হইতে অপসারিত করিতে চেষ্টা করিবে। যুবতী স্ত্রীগণের সঙ্গে তাহার থাকা কর্ত্তব্য নহে। কারণ তাহাদিগের হাস্য-পরিহাসে মানসিক বিকৃতি হওয়া সম্ভব ও তজ্জনিত ভয়েরও কারণ হইয়া থাকে। বৃদ্ধাদিগের সহবাস প্রবাসগত ব্যক্তির স্ত্রীর পক্ষে প্রশস্ত। গৃহ-কার্য্য শিল্পকার্য্য, সন্তান-পালন প্রভৃতি কার্য্যে তাঁহার কালাতিপাত করা উচিত।

বিধবা রমণীগণের ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনই শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা। ইহা অতি উচ্চ ও পবিত্র নিয়ম। স্বামীর মৃত্যুর সহিত আপনার সমুদয় সুখ বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহার উদ্দেশে ব্রতপরায়ণা হওয়া এবং পরলোকে তাঁহার সহিত দেবভাবে মিলিত হইবার জন্য ধর্ম্মকার্য্যে জীবনকে উৎসর্গ করা যে কতদূর প্রণয়, বিশ্বাস ও আত্মার পরিচয় দেয় তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু এরূপভাবে পতির সহিত দৃঢ় প্রণয়-জনিত আন্তরিক অনুরাগের ভাব অতি পবিত্র। ইন্দ্রিয়-নিগ্রহই ব্রহ্মচর্য্যের উদ্দেশ্য, এ বিষয়টি সকলেরই শিক্ষা করা উচিত। শাস্ত্রীয় পুস্তক পাঠে মন কতকটা শান্ত হইতে পারে। নাটক নভেল বিধবাদিগের পক্ষে বিষ। প্রবাসগত স্বামীর স্ত্রীর পক্ষে যে-যে বিষয়ের বিধান আছে, বিধবারও তাহা পালন করা কর্ত্তব্য।

রমণীগণের পরনিন্দা ত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। নিজের গৃহস্থিত ব্যক্তিরই হউক বা প্রতিবেশীরই হউক কখনো নিন্দা করিবে না। পরনিন্দার ন্যায় গুরুতর পাপ আর নাই। মক্ষিকা যেমন ক্ষত পূঁজরক্ত অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়, নিন্দুকেরা তদ্রূপ কোথায় একটু দোষ ও ছিদ্র পাইবে তাহাই মনোযোগের সহিত অনুসন্ধান করে। বিন্দুমাত্র দোষ পাইলে তাহারা তাহাকে নিজগুণে বড় করিয়া তুলে। ইহাতে যেমন নিজের ক্ষতি তেমনি পরেরও ক্ষতি হইয়া থাকে। সুতরাং নিন্দার কালী মুখে মাখিয়া শ্রীহীন হইয়ো না; নিন্দার কলঙ্কে হৃদয়কে কলঙ্কিত করিয়ো না। ঈশ্বর যে তোমাকে কোমল রসনা দিয়াছেন, তাহা সদালাপ ও লোকের গুণকীর্ত্তন করিবার জন্য; কটূক্তি ও নিন্দা করিয়া জগতের অপকার করিবার জন্য নহে। লোকের গুণকীর্ত্তন করিয়া রসনাকে সার্থক কর; মানীর মান বাড়াইয়া নিজে মানী হও। ছিদ্রান্বেষণ না করিয়া গুণান্বেষণ কর। মধুকর যেমন নানা পুষ্প হইতে মধু আহরণ করে, তুমিও সকল লোকের গুণ গ্রহণ কর। শূন্যগর্ভ অসার লোকেরা বিদ্বেষ-বশতই পরনিন্দা করিয়া থাকে।

রমণীগণ অতি প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠিবেন। ইহাতে তাঁহাদিগের স্বাস্থ্য ভাল থাকিবে এবং গৃহকর্ম্মও সুশৃঙ্খলার সহিত যথাসময়ে নির্ব্বাহিত হইবে। রমণীগণ যদি অধিক বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রা যান, তবে গৃহের কার্য্যাদি অতি বিলম্বে সম্পাদিত হইবে। যাহারা অধিকক্ষণ পর্য্যন্ত শয্যায় শায়িত থাকে, রোগ তাহাদিগকেই সর্ব্বাগ্রে আক্রমণ করে। বিলম্বে গৃহের কর্য্যারম্ভ করিলে বিশ্রামের অবসরও পাওয়া যায় না। ইহা রমণীদিগের পক্ষে অন্য একটি অসুবিধা। অতি প্রত্যূষে উঠিয়া গৃহপরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা রমণীদিগের একটি বিশেষ কার্য্য; শরীরের স্বাস্থ্য ও মনের প্রফুল্লতা রক্ষার জন্য একার্য্য করিতেই হইবে। শারীরিক কার্য্য যথোচিত সম্পাদিত না হইলে স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা মনও উত্তেজিত হয়, কেন না প্রধানত মানসিক উত্তেজনা-দ্বারাই ইচ্ছামত পেশীসকল কার্য্য করিতে সক্ষম হয়। এবং পরে শারীরিক কার্য্যসকল তদ্দ্বারা সুচারুরূপে সম্পাদিত হওয়াতে শরীরের স্ফূর্ত্তি যেমন হয়, মনেরও তেমনি উৎসাহ ও আনন্দ হয়।

ভোজন প্রস্তুত হইলে প্রথমে বালক-বালিকা ও রোগী তৎপরে বৃদ্ধগণকে ভোজন করাইবে। অতঃপর গর্ভিণী স্ত্রী, কন্যা, পুত্রবধূ, অতিথি, স্বামী ও ভৃত্যকে ক্রমানুসারে ভোজন করাইয়া স্বয়ং আহার করিবে।

শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবার পূর্ব্বে স্বীয় অলঙ্কারাদি ঠিক ঠিক শরীরে আছে কি না দেখিয়া শয্যাত্যাগ করিবে। নতুবা যদি তাহা ভৃত্যাদির হস্তে আইসে, তাহা হইলে তাহার পুনঃপ্রাপ্তি একান্ত দুর্ঘট।

যদি কেহ কখনো তোমাকে কোনো বিষয়ে উপদেশ দেন তবে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে ভুলিয়ো না। সে উপদেশ তোমার মনোমত হউক বা না হউক তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলে একদিকে তোমার শিষ্টতা দেখানো হইল ও অন্যদিকে উপদেষ্টাও আনন্দিত হইলেন।

মিতব্যয়িতা রমণীগণের একটি প্রধান ধর্ম্ম। তাহা না থাকিলে পদে-পদে দুর্ভাগ্যের সম্ভাবনা। আয় অধিক এবং ব্যয় অল্প হইলে কোনো ক্ষতি নাই, পরন্তু ব্যয় যদি আয় অপেক্ষা অধিক হয় তবে ঋণগ্রস্ত হইয়া অশেষ দুঃখ সহিতে হয়। এ বিষয়টি গৃহিণী মাত্রেরই স্মরণ রাখা উচিত।

গৃহস্থাশ্রম রমণীগণের জানা উচিত যে, মিত্র সততা দ্বারা, শত্রু শীলতা দ্বারা, কৃপণ ধনদ্বারা, গুরুজন সেবা দ্বারা, বয়োকনিষ্ঠগণ ক্ষমা দ্বারা, বিদ্বানগণ বিনয় দ্বারা, মূর্খ মিষ্ট কথা দ্বারা, পুরুষ সেবা দ্বারা, অভিমানী প্রশংসা দ্বারা, ক্রোধী শান্তভাব দ্বারা, আত্মীয় বন্ধুগণ স্নেহ দ্বারা, পরজন উপকার দ্বারা, প্রতিবেশী দয়া দ্বারা, সংসার মিত্রভাব দ্বারা এবং স্বামী ভক্তি দ্বারা বশ হইয়া থাকেন।

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

প্রতিজ্ঞা-পালন

(গল্প)

সরলা সম্ভ্রান্ত গৃহের কন্যা এবং সম্ভ্রান্ত গৃহের বধূ। সরলার পিত্রালয় গোবিন্দপুর। সরলার পিতা একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন।

একদিন সরলার সকলই ছিল। পিতামাতার অপরিসীম স্নেহ, পতির অকৃত্রিম প্রেম, আত্মীয় স্বজনের অগাধ ভালবাসা, একদিন সে এ সমস্তই উপভোগ করিয়াছিল।

সরলার স্বামী একজন অতি সচ্চরিত্র এবং উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ন্যায় নির্ম্মল-চরিত্র যুবক আজকাল খুব কমই দৃষ্ট হয়।

কিন্তু কালের গভীরতম অন্ধকার-গর্ভে কি নিহিত আছে তাহা কে বলিতে পারে? হতভাগিনী সরলার কপাল ভাঙিল, এ জগতে তাহার সুখের দিন ফুরাইল। তাহার স্বামী অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। সরলা একমাত্র শিশু-পুত্র লইয়া সংসার-স্রোতে ভাসিয়া চলিল। বঙ্গ-বিধবাদের যে কি কষ্ট, কি লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্য কেহ বুঝিবে না।

জানি না কোন্ মহাপাপের ফলে বাংলায় রমণীজন্ম হয়। আমাদের সরলাও এই বাঙালীর গৃহে রমণী-জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিল; সুতরাং তাহাকেও যথেষ্ট নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল। সে-সকল দুঃখ-কাহিনী এখানে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

এইরূপে সুখে-দুঃখে—লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ভোগ করিয়া সংসারের শত অত্যাচারের ভিতর দিয়া সরলার বৈধব্য-জীবনের সুদীর্ঘ দ্বাবিংশ বর্ষ অতিক্রম হইয়া গিয়াছে। কত দুঃখে কত কষ্টে—সে তাহার অন্ধের-যষ্টি নয়নের-মণি শিশু-সন্তানটিকে

মানুষ করিয়াছে। কত ঝড় কত ঝঞ্ঝা তাহার মাথার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। তাহার জীবনে কত বিপ্লব বহিয়া গিয়াছে। এমনি করিয়া অদৃষ্টের সঙ্গে অবিরত যুদ্ধ করিয়া তাহার সুদীর্ঘ বাইশ বৎসর কাটিয়াছে।

তাহার শিশু-পুত্র নলিনী এখন শৈশব কৈশোর অতিক্রম করিয়া যৌবন-রাজ্যে বিচরণ করিতেছে। নলিনী প্রশংসার সহিত এম্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক দুইশত টাকা বেতনে রাজসরকারে ডেপুটীর কার্য্য পাইয়াছে।

অবস্থা কাহারো চিরদিন সমানভাবে থাকে না। তাই দেখাইবার জন্যই বোধ হয় দয়াময় জগদীশ্বর সরলাকে বহুদিন যাবত দুঃখের যন্ত্রে নিস্পেষিত করিয়া আজ তাহার প্রতি এই করুণা প্রকাশ করিয়াছেন।

নলিনী কার্য্য প্রাপ্ত হইয়া কটকে বদলী হইয়া গেল। সরলাও পুত্রের সহিত কটকে গিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। নদী-তীরে নলিনী একটি সুন্দর সুদৃশ্য বাসা ভাড়া লইয়া মাতা-পুত্রে তথায় স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিল। অবস্থার বিপর্য্যয়-হেতু সরলা এতদিন পুত্রের বিবাহ দেয় নাই, কিন্তু এখন আর সে বিঘ্ন নাই। ভগবানের অপার মহিমায় নলিনী আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধি-ভূষণে-বিভূষিত উচ্চরাজকর্ম্মচারী।

সরলা এখন পুত্রের বিবাহের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। এমন পাত্রের বিবাহের জন্য ভাবিতে হয় না, বিনা চেষ্টাতেই কন্যাদায়গ্রস্ত উমেদার আসিয়া জুটিতে লাগিল।

কার্য্যোপলক্ষে বিস্তর বাঙালী কটকে বাস করিতেছেন। তন্মধ্যে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতারও অভাব নাই। নলিনীকে অবিবাহিত জানিয়া বহু ব্যক্তি লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিল। যাহাদের অর্থ আছে তাহারা নলিনীর মাতার কাছে দর বলিয়া পাঠাইতে লাগিল; আর যাহাদের অর্থ নাই তাহারা "ছেলের বাজার চড়া" এমন ছেলের কাছে অগ্রসর হইতে পারিবে না বলিয়া নীরবে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল; এবং স্বীয় স্বীয় অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিল। যাহা হউক অনেক দেখা-শুনার পরে স্থানীয় সিবিল-সার্জ্জন ডাক্তার, এম বসুর কন্যা প্রতিভার সঙ্গে সরলা স্বীয় পুত্রের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিয়া ফেলিল। মিঃ বসু কন্যাকে চার হাজার টাকার গহনা এবং জামাতাকে নগদ তিন হাজার টাকা যৌতুক দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন।

মেয়েটিও দেখতে শুনতে মন্দ নয়,—শিক্ষিতা। বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া সরলা নলিনীকে সমস্ত জ্ঞাত করাইল। নলিনী তাহাতে অসম্মত হইল না। বলিতে কি নলিনীও প্রতিভাকে ইতি-পূর্ব্বে দেখিয়াছিল। তাহার মনোনীতও হইয়াছিল।

ডাক্তারবাবুর বাসা এবং নলিনীর বাসা ঠিক পাশাপাশি। উভয় বাটীর ছাদে উঠিলে পরস্পর বেশ দেখা-শুনা যাইত। প্রতিভা প্রায়ই ছাদে বেড়াইয়া বেড়াইত; কিম্বা ছাদে বসিয়া পুস্তক পাঠ করিত, কি উল ইত্যাদি লইয়া বুনিত, তাই নলিনী তাহাকে দেখিয়াছিল।

প্রতিভার সঙ্গে নলিনীর বিবাহের সমস্তই ঠিক হইয়া গেল। শুভ দিন দেখিয়া পাত্র ও পাত্রীর পাকা দেখা—আশীর্ব্বাদ হইল। ডাক্তার-বাবু নলিনীকে হীরকাঙ্গুরীয় দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। সরলা প্রতিভাকে মুক্তার মালা দিয়া আশীর্ব্বাদ করিল।

৩

নলিনীর বিবাহের সমস্তই প্রস্তুত। উভয় পক্ষই বিবাহের আয়োজনে ব্যস্ত। ডাক্তারবাবু খুব ঘটা করিয়া মেয়ের বিবাহ দিবেন। আর ভগবৎ-কৃপায় সরলারও এখন সুসময়, সেই-বা কেন আড়ম্বরশূন্য রাখিবে? উভয় পক্ষেরই আত্মীয় বন্ধুগণ নিমন্ত্রিত হইয়া বিবাহ-বাটী মুখরিত করিয়া তুলিয়াছেন। হাস্য-কৌতুকের

কলধ্বনি এবং আনন্দোচ্ছ্বাসে বাটী পরিপূর্ণ!

বিবাহের আর তিন দিবস মাত্র বিলম্ব আছে। এমন সময় একদিন সরলারই সমবয়স্কা একজন বিধবা অসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্না একটি বালিকাকে সঙ্গে লইয়া সরলার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া সরলা বড়ই আনন্দিতা হইল।

সরলা সহর্ষে রমণীকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল, "এতদিন কোথায় ছিলে ভাই বেয়ান।" আগন্তুক রমণী সরলার বাল্যকালের পাতানো বেয়ান। সরলা বলিল, "তোমায় দেখে বড় সুখী হয়েছি, যদি এসেছ তাহলে এখন আর তোমায় যেতে দেবো না।"

রমণী একটি সুগভীর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল, "বেয়ান, অল্প বয়েসে বিধবা হওয়ার যে কি কষ্ট তা'তো তুমি জানো ভাই!" তৎপরে সেই সুন্দরী বালিকাটিকে দেখাইয়া বলিল, "এই মেয়ে যখন চার বছরের, তখন আমি বিধবা হই,—আমার স্বামী সামান্য চাকরি করতেন, আমাদের জন্য কিছুই রেখে যেতে পারেন নি, তা বোধ হয় তুমি শুনে থাকবে ভাই। তাঁর মৃত্যুর পরে পেটের ভাতের জন্যে এই মেয়ে নিয়ে কত আত্মীয় কুটুম্বর কাছে গিয়েছি, কত লাঞ্ছনা, কত যন্ত্রণা ভোগ করেছি; তারপর এই মেয়ে বে'র যুগ্যি হয়েছে, পয়সার অভাবে এর বিয়ে দিতে পারি নি। আর আমার এমন কেউ আত্মীয় নেই যে, পয়সা খরচ করে' এই মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেয়। তাই নিরুপায়ে পড়ে' কত খুঁজে-খুঁজে কত লোকের কাছে সন্ধান নিয়ে আজ তোমার কাছে এসেছি। তোমার ছেলেবেলাকার একটি কথা মনে করে' বড় আশা করে' তোমার কাছে এসেছি—আমায় রক্ষা কর।"

সরলা ব্যগ্র হইয়া বলিল, "কি কি? আমায় কি করতে হবে বল। আমার সাধ্য হয় তো, আমাকে যা বলবে তাই করব, আমি প্রতিজ্ঞা করচি।"

রমণী বলিল, "ভাই যখন ছেলেবেলায় আমরা বেয়ান পাতিয়েছিলুম, তখন তুমি সত্য করে-ছিলে, আমাদের ছেলে-মেয়ে হ'লে পরস্পর তাদের বে' দিয়ে আমাদের এ সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখবে, তা তারা যেমনই কেন হোক না! ভগবানের কৃপায় তোমার একটি পুত্র, পরে আমার একটি কন্যা হয়েছে; তারপর আমরা দুজনেই বিধবা হয়ে অদৃষ্টের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করেছি। করুণাময়ের অপার করুণায় তুমি সংসার-যুদ্ধে জয়ী হয়েছ; তোমার ছেলে আজ দশজনের কাছে গণ্য-মান্য হয়ে উঠেছে—জানি, তোমার ছেলের সঙ্গে এখন আমার মেয়ের বিয়ের কথা বলা, আমার পক্ষে বামন হয়ে চাঁদ ধরবার বাসনার মত। কিন্তু তুমি যদি নিজগুণে তোমার সে সত্য-পালন কর, তা হলেই আমি এ দায় থেকে বাঁচি। আর ভাই এখনো তুমি প্রতিজ্ঞা করলে, যদি তোমার সাধ্য হয়, তবে আমি যা' বলব তাই করবে। লীলা আমার নীচ বংশোদ্ভবা নয় তাতো জান।"

সরলা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। অপরে হয় তো এ কথা শুনিলে বিদ্রূপের হাসি হাসিত, কিন্তু সরলা সে-প্রকৃতির লোক নহে। একদিন তাহারও অদৃষ্ট নিষ্ঠুর হাসি হাসিয়াছিল। তাই সে অপরের দুঃখে দুঃখিত হয়। তাই সে ব্যথিতের বেদনা অনুভব করিতে পারে। কিছু পরে সরলা বলিল, "তা' ভাই, এতদিন কেন এস নি? এখন যে ডাক্তারবাবুর মেয়ের সঙ্গে আমার নলিনীর বিয়ের সব ঠিক হ'য়ে গেছে। আশীর্ব্বাদ পর্য্যন্ত হয়ে গেছে, এখন আর কি করে' হয়?"

আগন্তুক রমণী বড় কাতরে সরলার হাত দুখানি দুই হস্তে জড়াইয়া ধরিয়া বড় করুণ, বড় মর্ম্মভেদীস্বরে বলিল,—"এ সংসারে আমার

এমন কেউ নেই যে, আমায় এ কন্যাদায় হতে উদ্ধার করে। নিষ্ঠুর দেশে অর্থ না পেলে কেউ মেয়েকে বিয়ে করবে না, আমি বড় আশা নিয়ে তোমার কাছে এসেছি, আমায় আশায় নিরাশ কোরো না। আমার লীলাকে তোমায় দিলুম, তুমি যা ভাল হয় কর।" এই বলিয়া রমণী কন্যার পুষ্পনিভ করকমলখানি সরলার হাতের উপর তুলিয়া দিল।

বুঝি সে সুধাস্পর্শে সরলার প্রাণ টলিল! আর সেই অনিন্দনীয় রূপরাশি দর্শনে বুঝি সরলার মনের ভিতর আনন্দের উৎস ছুটিতে লাগিল! সরলা সযত্নে বালিকার হাতখানি ধরিয়া তথা হইতে চলিয়া গেল।

৬

তখন বেলা সাড়েদশটা বাজিয়া গিয়াছে। নলিনী আহারাদি সম্পন্ন করিয়া কাছারী যাইবার নিমিত্ত হ্যাটকোট পরিয়া সুসজ্জিত হইতেছিল। আরদালী চাপরাশ আঁটিয়া সরকারী বাক্স বহিবার জন্য বিনীতভাবে দ্বারের পার্শ্বে প্রভুর অপেক্ষায় দণ্ডায়মান ছিল।

এমন সময় সরলা লীলার হাত ধরিয়া সেই কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া নলিনীকে বলিল, "বাবা নলিন্, তোমাকে একটা কথা শুনতে হবে—"

নলিনী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, "কবে তোমার কোন্ কথাটা শুনি নি মা?"

সরলা অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "জানি বাবা তা তুমি আমার সু-সন্তান, তাই সাহস করে তোমায় সকল কথা বলতে পারি, নইলে—"

নলিনী সহাস্যে বাধা দিয়া বলিল, "এখন কথাটা কি বলে' ফেল মা। দেরি হ'য়ে যাচ্ছে। এ মেয়েটি কে?" এই বলিয়া নলিনী লীলার দিকে চাহিল। লজ্জায় লীলার আয়ত নয়নদুটি নত হইয়া পড়িল। সরলা বলিল, "এরি কথা বলবার জন্যে তোমার কাছে এসেছি। ডাক্তারবাবুর মেয়ের সঙ্গে তোমার যে-বিয়ের কথা ঠিক করেছিলুম, তা' হবে না, তাঁর আশীর্ব্বাদী আংটিটি ফেরত দিতে হবে। এই মেয়েটিকে তোমায় বিয়ে করতে হবে।"

এই বলিয়া সরলা পুত্রের নিকট সকল কথা বিবৃত করিল। নলিনী সকল শুনিয়া বলিল, "তা' এ সকল কথার আমি কি জানি? তুমি যা' করবে তাই হবে।" এই বলিয়া ডাক্তারবাবুর প্রদত্ত নূতন প্রাপ্ত হীরকাঙ্গুরীয় খুলিয়া মাতার হস্তে অর্পণ করিল; আর অলক্ষ্যে আর একবার লীলার দিকে চাহিয়া লইল। লীলার সেই সরলতা-মাখা আনত বদনমণ্ডল, সেই সূক্ষ্ম সুকুমার সুবঙ্কিম জলের নীচে ঢল-ঢল ছল-ছল চক্ষুদুটিতে বুঝি নলিনীর হৃদয় আকৃষ্ট হইল।

নলিনী প্রফুল্লমনে কাছারি চলিয়া গেল।

সরলা ডাক্তারবাবুর অঙ্গুরীয় ফেরত পাঠাইল। এবং ডাক্তারকে পত্র লিখিয়া দিল যে, এ-বিবাহ হইবে না।

ডাক্তারবাবু সেই সময় হাসপাতাল পরিদর্শন করিয়া প্রত্যাগত হইয়াছেন মাত্র। হ্যাট্‌কোট খুলিয়া রাখিয়া মিষ্টান্নের ফর্দ্দ দেখিতেছিলেন, তখনো তাঁহার পেন্টুলেন পরা ও গ্যালিস আঁটা ছিল।

এমন সময় ভৃত্য আসিয়া সরলার প্রদত্ত পত্র ও অঙ্গুরীয় তাঁহার হস্তে প্রদান করিল। পত্র পাঠ করিয়া ডাক্তারবাবুর মস্তক বিঘূর্ণিত হইয়া উঠিল। বিবাহ-ভঙ্গের কারণ কি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া তিনি সেই অবস্থায়ই দ্রুতপাদ-বিক্ষেপে সরলার বাটীতে উপস্থিত হইলেন। এবং সরলাকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় সরলা অতি বিনীতভাবে তাঁহাকে সকল কথা বলিল।

নলিনীর ন্যায় জামাতা লাভ করা লোকে পরম সৌভাগ্য মনে করে। ডাক্তারবাবুও সহজে

এ-লোভ পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। যাহাতে এ বিবাহ সম্পন্ন হয়, তজ্জন্য সরলাকে বিস্তর অনুরোধ, উপরোধ করিতে লাগিলেন। এমন-কি আরো দুই এক হাজার টাকা বেশী দিতে চাহিলেন। কিন্তু সরলা স্থিরপ্রতিজ্ঞ। কিছুতেই স্বীকৃত হইল না। এবং অতি বিনীতভাবে বলিল, "মহাশয়, মাপ করবেন, আমাকে আর অর্থলোভ দেখাবেন না। আপনি সম্ভ্রান্ত এবং ধনবান, এ সংসারে আপনার ন্যায় ব্যক্তির কন্যার বিবাহের কোনো চিন্তা নেই। অর্থদ্বারা আপনি অনেক সৎপাত্র ক্রয় করতে পারবেন। কিন্তু এই অসহায় বিধবা ভদ্রমহিলা অর্থাভাবে এমন সুন্দরী কন্যারও বিবাহ দিতে সক্ষম হচ্ছেন না। আমি আমিও বাল্যকালে প্রতিশ্রুত ছিলুম যে, আমাদের পুত্রকন্যা হলে পরস্পর তাদের বিবাহ দেবো, সেই ভরসায় ইনি কন্যাদায়ে উৎপীড়িত হয়ে আমার কাছে এসেছেন। এখন আমি আমার কর্ত্তব্য পালন কোরবো।"

অগত্যা ডাক্তারবাবু ক্ষুণ্ণমনে চিন্তা করিতে করিতে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। এবং নিতান্ত অনিচ্ছা-সত্ত্বে সরলার মুক্তার মালা ফেরত দিলেন।

সরলার প্রকৃতি দেখিয়া ডাক্তারবাবু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। কেমন করিয়া সরলা এত টাকা এবং বড়লোক কুটুম্বের আশা ত্যাগ করিয়া একজন অসহায় কপর্দ্দকহীনা বিধবার কন্যার সহিত স্বীয় উপযুক্ত পুত্রের বিবাহ দিবে! সংসারে এমন মানুষ তো' দেখা যায় না!

বলা বাহুল্য, যথাসময়ে লীলার সহিত নলিনীর শুভ-বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। লীলার মাতা আশাতিরিক্ত সৎপাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিয়া মনের আনন্দে কাশীবাসিনী হইলেন।

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

নিবেদন

তোমারি দেওয়া সুখ
তোমারি দেওয়া দুখ,
যখন যা দাও হরি,
পাতিয়া লইব বুক।

চির শুভময় তুমি
কিছুতে অশুভ নয়,
অসহ হলেও ব্যথা
লুকাইয়ে শুভ রয়।

যা সাধ তোমার যবে
হউক সফল তাই,
রহিতে অচল পদে
শুধু হে শকতি চাই।

তোমারি বিধান তলে
"মূক" করি দাও মোরে,
যেন না বিচার করি
কখনো মোহেতে পড়ে।

শ্রীহেমন্তবালা দত্ত।

শীলা

(উপন্যাস)

"মহা মুস্কিলের কথা হল, কি কোরবো ?" গৃহিণী মেজাজ রুক্ষ করিয়া এই কথা বলিলেন। গৃহ-কর্ত্তা রামলোচন মিত্র কটকের কোনো প্রাইভেট ইস্কুলে হেড মাষ্টারের কার্য্য করেন। কাটজুড়ী নদীর ধারে তাঁর ক্ষুদ্র বাসাবাড়ী। গৃহিণীর কথা শুনিয়া তিনি ধীরে-ধীরে বলিলেন, "কি আর কোরবো বল, অভয়-দাদা যখন তাঁর মেয়েটির ভার আমায় দিয়ে গেছেন, তখন তাকে রাখতেই হবে।" অভয়াচরণ রামলোচনের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, বয়সে জ্যেষ্ঠ। তিনি পশ্চিমে লক্ষ্ণৌতে কাজ করিতেন। সেই সময়ে তিনি সেই-দেশস্থ এক ব্রাহ্ম-কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সেই পর্য্যন্ত তিনি সেই-স্থানেই বাস করিয়াছেন ও সেই-স্থানেই তাঁহার জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছিল। তিনি সেইখানে কোনো আপিসে কাজ করিতেন। তিনি বিদ্যাবুদ্ধিতে যত-না লোকের নিকট পরিচিত ছিলেন, তাঁহার সুকণ্ঠের জন্য ও বেহালা বাজাইবার অসাধারণ ক্ষমতায় তিনি সকলকার নিকট বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। একটিমাত্র কন্যাকে অকালে মাতৃহীনা করিয়া তাঁহার স্ত্রী পরলোক গমন করিয়াছিলেন। সেই পর্য্যন্ত অভয়াচরণ নিজের জীবনের সকল সুখ-সাধ বিসর্জ্জন দিয়া এই কন্যার লালনপালনে যত্নবান ছিলেন। কন্যাটি বিবাহের বয়সে উপনীত হইলেও অদ্যাপি তাহার বিবাহ দিতে পারেন নাই। সেই বিদেশে তাঁহার মনের মত সুপাত্রও পাওয়া যায় নাই। কন্যাটিকে সেখানকার ইংরাজী বালিকা-বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া রীতিমত সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন। এবং নিজে মনের মত করিয়া গীতবাদ্য শিখাইয়াছিলেন। অভয়াচরণের মৃত্যুর পর বালিকা প্রবাসে অসহায় হইয়া পড়িল। অভয়াচরণের আদেশ-মত তাঁহার এক বিশ্বস্ত বন্ধু তাহাকে রামলোচনের নিকট লইয়া যাইতে প্রস্তুত হইয়া রামলোচনকে সংবাদ দিলেন। দেশে রটিয়াছিল, অভয়াচরণ খৃষ্টানের কন্যা বিবাহ করিয়াছেন। তাই দেশের সকলে অভয়াচরণের সহিত কোনো সম্পর্ক রাখেন নাই।

অদ্য সেই বালিকার আসিবার কথা। রামলোচনের গৃহিণী সুরসুন্দরী বহুদিবসাবধি অজীর্ণ রোগে কষ্ট পাইতেছেন। তাঁহার শরীর শীর্ণ, মেজাজ আরো রুক্ষ। তাঁহার এই বহুদিন-বিস্মৃত ভাসুর-তনয়ার আগমন-সংবাদ তেমন সুবিধাজনক বোধ হইতেছিল না। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁগা তা তোমার দাদা কি কিছু টাকা-কড়ি রেখে গেছেন ?"

—তা রেখে গেছেন বই কি। তাঁর লাইফ-ইনসিওর ছিল, মেয়ের জন্য প্রভিডেন্ট ফণ্ডেও টাকা আছে। মাসে ৬০।৭০ টাকা আয়, সেই ভদ্র লোকটি তো তাই লিখেছেন।

—তা বেশ হবে, তাহলে আমাদের কিছু খরচ হবে না। হাঁ গা তা বিয়ে-থাওয়ার কি হবে ?

—দাদা তার ব্যবস্থাও করে গেছেন। নগদ টাকাও তো কিছু আছে।

—কত বড় মেয়ে ?

—তা বয়স ষোল সতেরো হবে।

—সে কি ! লোকে বলবে কি ? তাকে নিয়ে শেষে জাত খোয়াবো নাকি ?

—এ বিদেশে তোমার আবার জাত যাবার ভয় হ'ল কিসে ? সব তাতে অত ভয় পাও কেন ?

হাঁ তাকে কে আনতে গেল ? তার জন্য ঘর ঠিক করেছ ত ?

—সেজন্য তোমায় ভাবতে হবে না। যখন সে আমার বাড়ীতে আসছে, আমি সবই ঠিক কোরবো। তোমার ইস্কুলের চাপরাশী অচ্যুতকে পাঠিয়েছি।

—বেশ করেছ, সঙ্গে যে-ভদ্রলোকটি আসছেন, তিনি দাদার বন্ধু। কাল ভোরেই চলে যাবেন।

এমন সময় দূরে গাড়ীর শব্দে রামলোচনবাবু বারান্দায় বাহির হইলেন। গাড়ী সশব্দে আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। অচ্যুত চাপরাশী গাড়োয়ানকে কহিল,—"ঝট্ কলা সব্ সামান উতারি আন্"। *

তারপর সজোরে গাড়ীর দ্বার খুলিয়া দিবার পর, একজন ইংরাজী পরিচ্ছদে সজ্জিত বয়স্ক ব্যক্তি বাহির হইলেন। তাহার পরে একটি কিশোরী বালিকা আধুনিক সভ্য সজ্জায় সজ্জিত হইয়া জুতা-পায়ে নামিয়া দাঁড়াইল। রামলোচনবাবু বালিকার সজ্জা দেখিয়া যতটা বিস্মিত না হইলেন, তাহার সেই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে বিস্মিত হইয়া পড়িলেন। বালিকা ভয়চকিত-নেত্রে একবার বৃদ্ধের দিকে চাহিল। সেই-ভদ্র ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া রামলোচনবাবুকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, "মশায় ভাল আছেন ?"

রামলোচনবাবু প্রতি-নমস্কার করিয়া শুষ্ক কণ্ঠে কহিলেন, "আপনি অন্নদাবাবু ?"

—হাঁ মশায়, আর এই শীলা আপনার দাদার কন্যা।

শীলা অগ্রসর হইয়া সভয়ে তাহার খুল্লতাতকে প্রণাম করিল। খুল্লতাতও বিস্মিত ভাবে বলিলেন, "শীলা কি নাম ?",

অন্নদাবাবু হাসিয়া বলিলেন,"ওর নাম চারুশীলা কিন্তু ওকে ইস্কুলে সবাই 'শীলা' বলে' ডাকতো বলে আমরা সবাই ওকে 'শীলা' বলে ডাকি। ইংরাজী ইস্কুল কি না—শীলা ইংরাজী নাম। তাই তারা চারু বাদ দিয়ে 'শীলা' বলে ডাকতো।

রামলোচনবাবু কটকে থাকেন। ব্রাহ্ম সমাজের ও খৃষ্টান মিশনারীদের অনেক মেয়ে দেখিয়াছেন। শীলার সাজ-সজ্জা, তাঁহাদের ঘরে অদ্ভুত হইলেও নূতন বোধ হইল না। তদ্ভিন্ন তিনি প্রথমে শুনিয়াছিলেন, তাঁহার দাদা খৃষ্টান হইয়াছিলেন। এখন শীলাকে দেখিয়া তাঁহার সেই বিশ্বাস দৃঢ়মূল হইল। তিনি শীলাকে বলিলেন "এস বাড়ীর ভিতরে চল।"

গৃহিণীর সেদিন শরীর আরো বেশী অসুস্থ। একখান তক্তাপোষে মাদুর বিছাইয়া শুইয়াছিলেন। পদশব্দে উঠিয়া বসিলেন ও শীলাকে দেখিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত-লোচনে চাহিয়া রহিলেন। রামলোচনবাবু শীলাকে বলিলেন, "এই তোমার খুড়ীমা, ওঁর শরীর বড় অসুস্থ।" শীলা তাঁহাকে নমস্কার করিতে গেল। তিনি সভয়ে বলিয়া উঠিলেন,—"ওই বেশ হয়েছে থাক থাক্ রেলের কাপড়ে এখন ছুঁয়ো না। ওপরের ওই ছোট ঘরটা তোমার জন্যে ঠিক করা আছে। অমিটা গেল কোথায় ? অমি ও অমি—"

একটি দ্বাদশবর্ষীয় বালক "যাই মা" বলিয়া গৃহিণীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

—যা তোর দিদিকে ওপরে নিয়ে যা, অচ্যুতকে ডেকে দে ; জিনিস-পত্র ওপরে তুলবে।

অমিয় একদৃষ্টে অপলক-নেত্রে শীলার প্রতি চাহিয়াছিল। সে ধীরে-ধীরে বলিল, "চলুন ওপরে যাবেন।"

শীলা যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার মত ধীরে ধীরে তাহার সহিত চলিয়া গেল। গৃহিণী 'অচ্যুত, অচ্যুত' করিয়া ডাকায় সেই চাপরাশী সেতার হস্তে উপস্থিত হইয়া বলিল,—"কঁড় মা কঁড় কহুছি ? গাড়ীঅলা মোকে বাবুর পাকে থুচা

* শীঘ্র সব দ্রব্য নাবাইয়া আন।

বনাই দেলা মু তাকে দেখি নেবি। সে কো আড়ে পলাবা পুতাকে মারি পকাবি।" *

গৃহিণী অচ্যুতের সেই মেজাজ দেখিয়া বলিলেন, কিরে কি হয়েছে ? অমন করছিস কেন ?"

—"মু তার দশ গণ্ডা পয়সা ভড়া ঠিক করি থিলি। সে কর্ত্তাবাবুর পাকে কহিছে কি আট গণ্ডা তাকে দেই মু দুই গণ্ডা জটি নেবি। মু পুতাকে মারি পকাবি।" †

গৃহিণীর মেজাজের ঠিক নাই। তার এ বচসা ভাল লাগিল না। বলিলেন,—"দূর হোকগে তোর কথায় আর কাজ নেই। তোর হাতে ওটা কি ?"

—এটা বজা পরে। বাবা এ টুকি যে মেম পরি দিশুছে। মেমর সাজ পরিছন্তি। জোড়ে মেমর জুতা, সে বাবু ভি সাহেব পরি অছন ইঞ্জিরিতে কঁড় গট মট করুথিলে! বড়া সমান মা, কো আড়ে রাখিবি। ‡

—সব উপরের ছোট ঘরে আর বারান্দায় নিয়ে রাখ। হয়েছে, একি হল ? আর যে জাত-ধর্ম্ম কিছুই থাকবে না। শ্রীহরি একি করলে,—যা শীগগির সব নিয়ে যা।"

অচ্যুত এক এক করিয়া সব দ্রব্য উপরে রাখিয়া আসিল। রামলোচনবাবু অতিথিকে বাহিরে বসাইয়া ভিতরে গৃহিণীর নিকট আসিলেন।

গৃহিণী তখনো বিস্মিতভাবে বসিয়া আছেন। রামলোচনবাবুকে দেখিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "তাহলে এ সত্যই খৃষ্টান, জাত নেই। আমাদের কি হবে ?"

—অত এখন ভাবলে চলবে না। যখন দাদা তার মেয়েকে আমার কাছে পাঠাতে বলে গেছেন, আমার হাতে ভার দিয়েছেন, তখন আমি ফেলতে পারবো না।

গৃহিণী যদিও ক্রোধে উত্তেজিত, কিন্তু স্বর উচ্চে তুলিবার জো নাই। একে গৃহে অতিথি, তার উপর ওই মেয়েটাকে দেখিয়াও একটু থতমত খাইয়া আছেন। তিনি ক্রোধে কম্পিত-কণ্ঠে বলিলেন,—"এত উপকার না করলে কি হত না ? কেন ওর মামার বাড়ীর কি কেউ নেই ?"

—কেউ থাকলে কি সেই লক্ষ্ণৌ থেকে এখানে আসে ? আর এক কথা ;—এই নাও অন্নদাবাবু আমায় দিলেন, দাদা আমায় দু'হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ দিয়ে গেছেন।

গৃহিণী তাড়াতাড়ি ভাল করিয়া উঠিয়া বসিয়া কাগজ দুখানা হস্তে করিয়া বলিলেন, "সত্যি ? তবে তো তোমার দাদা খুব ভাল। মেয়ের জন্য কত টাকা আছে ?"

—মেয়ের বিয়ের দশ জন্য হাজার টাকা রেখে গেছেন। সেই টাকার সুদ ও প্রভিডেণ্ড্ ফণ্ডের ৩০৲ টাকা সবই ওর হাতে মাসে-মাসে আসবে। সে-সব ওর কাছেই আছে। অন্নদাবাবু বলছিলেন, আমরা যদি লীলাকে না রাখি, তাহলে ও কোনো মিশনারী মেমের কাছে থাকবে। কিন্তু যে ওকে রাখবে সে-ই এই দুই হাজার টাকা পাবে।

গৃহিণী তখনো মুঠার মধ্যে সেই কাগজ দুখানি ধরিয়া ছিলেন। তিনি চকিত হইয়া বলিলেন, "বাপরে তাকি হয়—দু হাজার টাকা সে কি কম কথা ? আর এতো আমাদের দেশ নয়। তোমার ইস্কুলের কত মাষ্টার তো ব্রাহ্ম ও খৃষ্টান। আমি

---

* মা কি বলছেন ? গাড়ীওয়ালা বাবুর কাছে আমায় মিথ্যাবাদী বলিল ;—তাহাকে দেখিয়া লইব সে কোথায় যাইবে। বেটাকে মারিয়া ফেলিব।

† আমি দশআনা ভাড়া করেছিলাম, সে কর্ত্তাবাবুর কাছে বলিল যে তাকে আটআনা দিয়া আমি ঠকিয়ে নিলাম। তাকে দেখে নেব।

‡ এটা বাজনা। বাবা এ মেয়ে মেমের মত। মেমের পোষাক পরা পায়ে মেমের জুতা। সঙ্গের বাবুও সাহেবের মত ইংরাজীতে কট মট করিতেছিল। বড় জিনিস মা, এই সব কোথায় রাখিব ?

ওকে কিছু ছুঁতে দেবো না, ওর ছোঁয়া জল পর্য্যন্ত খাব না। থাক ও যেমন এসেছে একপাশেই থাক।"

—যেমন সুন্দরী মেয়ে, তার উপর দশ হাজার টাকা, ও কি পড়তে পাবে। শীঘ্রই ওর বিয়ে হয়ে যাবে। ভাবনা নেই গিন্নী। কিন্তু তুমি একটু সামলে চোলো। মুখটা মিষ্টি রেখো। ইংরাজী জানা মেয়েরা একরোখা হয়, চট করে বাড়ী ছেড়ে চলে যাবে আর দুটি হাজার টাকা ফসকে যাবে।

গৃহিণী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আমি সব জানি গো সব জানি। আমায় আর শেখাতে হবে না।"

২

শীলা ধীরে ধীরে অমিয়র সহিত দ্বিতলের গৃহে প্রবেশ করিল। দ্বিতলে দুটি মাঝারি ঘর; একটি বারান্দা ও ছোট ঘর। সেই বারান্দার কোলে ছোট ঘরটি শীলার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; কারণ সেই ঘরটি উপরের একপার্শ্বে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সমস্ত দ্রব্যাদি না আসিল শীলা ততক্ষণ সেইস্থানে একভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। অমিয় ধীরে ধীরে তাহার কাছে গিয়া বলিল, "আপনি বসুন।" শীলা তাহার প্রতি চাহিল বালকের মুখ সরলতায় পূর্ণ। তাহার সেই সুকুমার মুখের প্রতি চাহিলে মনে আপনা হইতে স্নেহের উদ্রেক হয়। শীলা তাহার প্রতি চাহিয়া বলিল,—"আমায় আপনি বলছ কেন ভাই?"

—তবে কি বলব?

—আমি যে তোমার দিদি হই।

অমিয় হর্ষোৎফুল্ল-আননে বলিল, "তবে আমি তোমায় দিদিভাই বলব কেমন?" শীলা তাহার মধুর কথায় হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা তাই বোলো। এখন তুমি যাও, আমি শীগগির রেলের কাপড় ছেড়ে ফেলি, না হলে খুড়ীমা বিরক্ত হবেন।"

—আচ্ছা আমি এখন যাচ্ছি। আবার কিন্তু আসবো দিদিভাই কেমন?

সে চলিয়া গেল। শীলা ধীরে ধীরে তাহার একটি সিন্দুকের উপর বসিয়া পড়িল। সুদীর্ঘ পথ ট্রেনে আসিয়া তাহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। আজ সে এই সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে ও অপরিচিত ব্যক্তি-দিগের মধ্যে আসিয়া পড়িয়া নিজেকে সম্পূর্ণ অসহায় মনে করিল। সে বাল্যকাল হইতে যে-ভাবে লালিত হইয়াছে, ইহা তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের। তাহার পিতার সে বড় আদরের কন্যা ছিল। তাহার পিতা কখনো তাহাকে সঙ্গ-ছাড়া করেন নাই। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতে বলিয়াছিলেন, "কটকে তোমার কাকার কাছে গিয়ে থেকো, হাজার হোক এ বিদেশ।" শীলা পিতার সেই শেষ আদেশ মানিয়া আজ এখানে আসিয়াছে। তাহার খুড়ীমার মুখ মনে করিয়া হৃদয় কম্পিত হইল। কি করিয়া থাকিবে! সেতো হিঁদুয়ানীর কিছুই জানে না। তাহার ইস্কুলের বন্ধু 'এমেলি' 'মেরি' 'লুইসি'। সে এইপ্রকার বন্দীর দশায় কি থাকিতে পারিবে? তাহার দুই চক্ষু দিয়া অশ্রু প্রবাহিত হইল। সে ভাবিল, কেন সে সেখানকার কন্‌ভেণ্টে রহিল না! একাকী কি কেহ থাকে না? পিতার আদেশ মনে করিয়া সে তাহার অসংযত হৃদয়কে সংযত করিল। অশ্রু মুছিয়া শীঘ্র সে আপনার বেশ-ভূষা পরিত্যাগ করিয়া, সামান্য বস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ধীরে ধীরে আপনার দ্রব্যাদি গুছাইয়া রাখিল। সেতারটিকে, বক্স-হারমোনিয়মটিকে সযত্নে এক পার্শ্বে সরাইয়া রাখিল। আর কি কখনো সে এ-সব ব্যবহার করিবে? তাহার হৃদয় ভেদ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস উঠিল। কোথায় সে লক্ষ্ণৌ, আর কোথায় এই কটক? কি আশ্চর্য্য ঘটনা! সে কি একমাস পূর্ব্বে কল্পনায় ইহা ভাবিতে

পারিয়াছিল? এমন সময় চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। রামলোচনবাবু তাহাকে ডাকিলেন। সে চক্ষের জল মুছিয়া ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেল। গৃহিণী তখন উঠিয়া বসিয়াছেন। দূরে একখানি আসন পাতা রহিয়াছে ও আহার প্রস্তুত।

গৃহিণী মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "এসো খাও, পথে ক'দিন খুবই কষ্ট গেছে।"

শীলা অপ্রস্তুতভাবে বলিল, "না কষ্ট কিছু নয়। আমায় এখনি কেন খেতে ডাকলেন, আপনারা তো কেউ খান নি।"

গৃহিণী হাসিয়া বলিলেন, "সে কি হয়? আমার তো অম্বলের অসুখ, রাতে কোনো দিন খাই, কোনো দিন খাই নে। একটু খই দুধই খাবো। অমিটা বিকেলেই খায়। ওকে স্কুলে দিয়েছিলুম, সে ক'বছর ম্যালেরিয়ায় ভুগে স্কুল ছাড়া বন্ধ রেখেছি। ওঁর তো পড়ানোর সময় নেই, মাষ্টার রাখবারও সঙ্গতি নেই, ছেলেটা কেবল খেলেই বেড়ায়।"

—আমি ওকে কাল থেকে পড়াব।

—সত্যি নাকি? ও যে অনেক ইংরিজী পড়ে, আর কি কি ছাই পড়ে মনেও করতে পারি নি, তুমি কি সব পারবে?

—হাঁ আমি ওকে পড়াতে পারবো। আমার বাবা আমায় বলে গেছেন, যদি আমার ইচ্ছে হয়, আমি কোনো ইস্কুলে কাজ নিতে পারি। এজন্য তিনি আমায় বেশ ভাল করেই সব শিখিয়েছেন।

—তা বেশ তো তুমিই ওকে পড়িয়ো। ছেলেটা কেবল রোদে-রোদে ঘুরে বেড়ায় বইত নয়। তা খেতে বোসো, আর দেরি কোরো না। তোমার হলে তারপর বাবুরা খাবেন।

শীলা বসিয়া পড়িল। আহারাদির পর সে বারান্দায় একপার্শ্বে টুলে বসিয়া রহিল। অন্নদাবাবু ও রামলোচনবাবু আসিয়া আহার করিতে বসিলেন।

অন্নদাবাবু বলিলেন, "আমি তো কাল দুপুরের গাড়ীতেই যাব মা, তোমার যা দরকার হবে বোলো। আর তোমার মার কি-রকম আত্মীয় এখানে আছেন, তাঁর সঙ্গে তোমার দেখা হবেই, আমি চিনে দেবো। তাঁরা এখানেই অনেক দিন থেকে আছেন। তাঁদের মস্ত জমিদারী। তোমার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় হলে ভালই হবে। আমি পারি তো দেখাশোনা করে যাব।"

—মার তো কেউ আত্মীয় ছিলেন বলে মনে নেই, তাঁরা কি করেন? তাঁর নাম কি?

—প্রভাতবাবু এখানকার একজন মস্ত জমিদার। তাঁরা [illegible] থাকেন। আমি দেখি যদি পারি তোমারি কথা বলে যাব।

রামলোচনবাবু এতক্ষণ বিস্মিত হইয়া উভয়ের কথা শুনিতেছিলেন। প্রভাতচন্দ্র বসু কটকের একজন বিখ্যাত জমিদার। তাঁর পিতা নাবালক পুত্র রাখিয়া বহুদিন হইল স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। প্রভাতবাবুর মা তারাসুন্দরী দেবী তাঁহার জমিদারীর কাজ নিজেই দেখিয়া থাকেন। তাহাদের খুব নাম ডাক। দেশের সকল সাহেব মেম তাঁহাদের বাটীতে যাওয়া-আসা করে। অল্প দিন হইল প্রভাতবাবুর বিবাহ হইয়াছে। তাঁহার ছোট ভাই সুব্রত সম্প্রতি ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়াছে এবং সেখানেই প্র্যাকটিস করিতেছে।

রামলোচনবাবু বলিলেন, "প্রভাতবাবুর মার সঙ্গে কি বাবার মার সম্পর্ক ছিল?"

—কি সম্পর্ক ঠিক জানি নে, খুবই দূরের হবে অথবা আত্মীয় হবে। তবে প্রভাতবাবুর মার সঙ্গে তাঁদের খুব পরিচয় ছিল। যখন শীলা ছোট ছিল, প্রভাতবাবুর মা তখন ছেলেদের নিয়ে লক্ষ্ণৌ বেড়াতে যান, সেখানেই পুনরায় সব আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা হয়। অভয়াবাবু আমাকে বলেছিলেন, 'কটকে আমার ভাই আছেন, তারাদিদিরা আছেন, আমার মেয়ের কোনো কষ্ট হবে

না। তাঁরাও মাঝে মাঝে শীলাকে নিয়ে যাবেন।' আর আপনি তো বুঝছেন যে শীলার যাওয়াও দরকার।

শীলা তাহার খুড়ীমার নিকট উঠিয়া গেল।

অন্নদাবাবু বৈঠকখানায় আসিয়া বলিলেন, "প্রভাতবাবুর সহিত শীলাদের কোনো সম্পর্ক নেই; শীলার মার সঙ্গে প্রভাতবাবুর মাসীমার বন্ধুত্ব ছিল, সেই সম্পর্কে প্রভাতবাবুর মাকে দিদি বলেন। প্রভাতবাবুর ভাই সুব্রতর সঙ্গে শীলার বিয়ের কথা প্রভাতবাবুর মা বলেছিলেন, তাই কটকে মেয়ে পাঠাতে মনস্থ করেছিলেন। আপনি দেখবেন যেন মেয়েটির অমতে বিবাহ না হয়। শীলার ১৮ বৎসর উত্তীর্ণ হয়েছে; সে এখন সাবালিকা। শীলার পিতার ইচ্ছা ছিল, শীলা ভাল পাত্রে সমর্পিত হয়; এখানে এসে চেষ্টা করবেন স্থির করেছিলেন, কিন্তু অদৃষ্ট-দোষে তা ঘটল না। একটিমাত্র কন্যা বলে তিনি কোনোমতে তার বিবাহ শীঘ্র দিবার কথা মনেও আনেন নি। আপনিও তার অমতে তার বিবাহ দেবেন না। সে যদি মত না করে তবে সে যে-কোনো উপায়ে নিজের দিন কাটাবে। শীলা বড় বুদ্ধিমতী, সে আপনাদের কোনো কষ্ট দেবে না। তবে সুব্রতর সহিত বিবাহ হলেই শীলার পক্ষে ভাল হবে।"

রামলোচনবাবু এইসব কথাবার্ত্তা শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। শীলার সেই সুন্দর শ্রীসম্পন্ন মুখ দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে স্নেহের সঞ্চার হইয়াছে। তাহার জাতি না থাকিলেও বোধ হয় তিনি তাহাকে স্নেহ করিতে পারিবেন মনে হইতেছিল। তিনি গৃহিণীর নিকট সকল কথা বলিলেন। গৃহিণী শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। জমিদার-পুত্র জামাই হইলে মন্দ কি? তাঁর তো আর মেয়ের বিবাহ দিতে নাই যে জাত যাবে। জাত বাঁচিয়ে চললেই হবে।

শীলা শয়ন-কক্ষে গিয়া আপনার শয্যাদি প্রস্তুত করিয়া শয়নের উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় ধীরে ধীরে কক্ষদ্বারে আঘাত হইল; সে দ্বার খুলিয়া দিল, দেখিল অমিয়। সে চমকিত-ভাবে বলিল, "তুমি এখনো শোও নি!"

—দিদিভাই, আমি যে বলেছিলুম আবার আসবো, তাই এসেছি।

—তুমি কোন্ ঘরে শোও?

—এই পাশের ঘরে আমি একলা শুই।

—কেন?

—তা তো জানি নে, মা আমায় বলেছেন এই ঘরে শুতে; মাঝের দরজা খুলে রাখেন, আজ আমি ভেজিয়ে চলে এসেছি। এস দিদিভাই, তোমায় একটা জিনিস দেখাই।

এই বলিয়া বালক শীলার হাত ধরিয়া লইয়া সেই ঘরের জানালা উন্মুক্ত করিল। শীলা দেখিল সম্মুখে নদী, আর নদীর ধারেই প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা চন্দ্রালোকে উন্নত হইয়া রহিয়াছে।

—এ কাদের বাড়ী?

—ও-বাড়ী জমিদার শরৎ রায়ের। বাড়ীতে কেউ নেই, শুধু দুজন মালী আছে। আমি রোজ লুকিয়ে-লুকিয়ে ঐ বাগানে যাই, কাল তোমায় নিয়ে যাব। বাগানে কত ফলের গাছে। কেউ কোথাও নেই, বাড়ী খালি পড়ে আছে।

—খালি পড়ে আছে কেন? ও-বাড়ীতে কি কেউ নেই? জমিদারবাবু কোথায়?

—তিনি অনেক বছর হল বিলেত গেছেন। কেউ বলে দেশে ফিরেছেন, তিনি মস্ত জমিদার, তাঁর ঢের বাড়ী, অনেক-দেশে বাড়ী আছে। তিনি এখানে থাকেন না। বাড়ী চাবি-বন্ধ, বাবার কাছে তাঁর চাবি আছে। বাবা তাঁর মোক্তার কি না।

—মোক্তার কি?

"মোক্তারের মানে জান না" বলিয়া অমিয় হাসিয়া উঠিল।

—আচ্ছা তুমি এখন শোও গে, তুমি লক্ষ্মী ছেলে।

সস্নেহে তাহার ললাটে হস্তস্পর্শ করায় বালক প্রীত হইয়া চলিয়া গেল।

শীলা বহুক্ষণ সেই ইন্দ্রপুরী-তুল্য শূন্য প্রাসাদের প্রতি চাহিয়া রহিল। সে যেন স্বপ্ন দেখিতেছে! কল্পনায় দেখিল, সেই শূন্য প্রাসাদ লোকসমারোহে পূর্ণ, চারিদিক আলোকমালায় উজ্জ্বল, কক্ষে-কক্ষে আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে! কত লোক তাহাতে হাস্যমুখে বিচরণ করিতেছে! এমন সময় দূরে সেই প্রাসাদের নিকট হইতে অতি মধুর কণ্ঠে গীত শ্রুত হইল।

আমি জনম জনম কাহারে খুঁজিয়া
ফিরিনু কাহার আশে,
সে-কথা স্মরিয়া আমারে চাহিয়া
তাই বুঝি চাঁদ হাসে।
তাই লহরে লহরে তটিনী বহিয়া
কহে কত কল-কলে;
তাই সরমে আকুলি পড়িছে ঝরিয়া
ফুলদল তরুতলে।
ওগো পরাণ-রতন, কোন্ সিন্ধুতলে
করিছ কোথায় বাস,
এসো নিমেষের তরে সমুখে আমার
মিটাও সকল আশ।

শীলা কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া সেই গীতধ্বনি শুনিল। এ গীত সে বহুবার শুনিয়াছে, এমন মধুর কখনো বোধ হয় নাই! সে ধীরে ধীরে গবাক্ষ রুদ্ধ করিয়া শয্যা গ্রহণ করিল। (ক্রমশ)

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

বিবিধ তথ্য

১। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ভূতপূর্ব্ব ইস্কুল ইনস্পেক্টর মৌলবী আবদুল করিম সাহেব মুসলমান-সমাজে শিক্ষাবিস্তারের জন্য ও মুসলমান ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য ৫০,০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

২। কুচবিহারের মহারাজা ও মহারাণী শিকারে গিয়াছিলেন। মহারাণী স্বহস্তে ৩টা বাঘ শিকার করিয়াছেন। রাণী-শিকারী এই দ্বিতীয়।

৩। বোম্বাই আমেদাবাদের বিখ্যাত ধনকুবের স্যার চুণীভাই মধোলালের দেহান্তর ঘটিয়াছে। এদেশের হিন্দু অধিবাসীদের মধ্যে তিনিই একমাত্র "ব্যারনেট" ছিলেন। স্যার চুণীভাইএর পিতামহ ৫২ বৎসর পূর্ব্বে আমেদাবাদে প্রথম কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা করেন।

৪। বরোদার মহারাজ গায়কোয়াড়, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার জন্য একটি পরিষৎ প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করিয়াছেন। এজন্য তিনি মাসিক ১২০৲ টাকা বৃত্তি দিবারও ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের যে-কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী ছাত্র ইহার জন্য চেষ্টা করিতে পারেন।

৫। স্ত্রী-শিক্ষা-বিস্তারের উদ্দেশ্যে ভারত-গবর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহকে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট বলিতেছেন— "সমগ্র দেশের স্ত্রী-শিক্ষার জন্য ঠিক একপ্রকার ব্যবস্থা ও সকলের শিক্ষা এক ছাঁচে ঢালা হইবে, এমন হইতেই পারে না। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের শিক্ষা তাহাদের বিভিন্ন আদর্শ ও জীবন-যাত্রার

অনুকূল করিতে হইবে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাইতে পারে, কোথাও সামান্য লিখন, পঠন ও হিসাব পর্য্যন্তই শিক্ষা বলিয়া বিবেচিত হইবে; আবার কেহ কেহ মনে করেন, তাঁহাদিগের কন্যারা পারিবারিক কাজ-কর্ম্মের শিক্ষা পাইলেই যথেষ্ট; কেহবা বলেন, তাঁহাদের বালিকাদের ধর্ম্ম ও প্রাচ্য বিদ্যার শেষ শিক্ষা পাওয়া দরকার। আবার অন্য একদল বলিতেছেন, তাঁহাদের বালিকাদের যথারীতি ইংরাজী বিদ্যা ও চিকিৎসা-বিদ্যা শিখাইয়া দিতে হইবে। এইসকল দাবীরই বিচার করিতে হইবে। যথাসম্ভব সকলের প্রয়োজন মিটাইয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ে একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথা তিরোহিত হইতেছে, সংসারে প্রবীণা মহিলার অভাবপ্রযুক্ত নবীনাদের সন্তানপালন ও গৃহকর্ম্মে অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, এজন্য এসকল বিষয়ও তাহাদের শিক্ষা দেওয়া হইবে।

৬। আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি, বামাবোধিনীর সর্ব্ব প্রথম পরিচালক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন দত্ত মহাশয় বহুদিন শয্যাগত থাকিয়া সম্প্রতি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইনি চিরদিন বামাবোধিনীর হিতৈষী থাকিয়া ইহার উন্নতির চেষ্টা করিয়াছেন। ভগবান তাঁহার আত্মার শান্তিবিধান করুন।

বর্ষগীতি

বরষের পর যেতেছে বরষ আপন চিহ্ন আঁকি',
সিন্ধু-যাত্রী পথিক আমরা বিস্ময়ে চেয়ে থাকি!
কোথা হ'তে আসে তরুণ আশার লক্ষ উদার ঢেউ,
দেখিতে দেখিতে কোথা মিশে যায় ভাবিয়া না পাই কেউ!
কবে ফুটে উঠে রক্ত তপন উজ্জ্বল করি' ধরা—
পাখীকুল গায় কুসুম বিকাশে বহে বায়ু প্রাণহরা!
মনে অনুমানি বুঝি এ-ধরণী কেবলি জোছনা-মাখা,
বসন্ত হেথা রহে চিরদিন শান্তির কোলে ঢাকা!
আবার কখন সকলি মিলায় নিমেষ না হ'তে শেষ,
সারাটি বক্ষ কেঁপে উঠে দুখে হা বিধি, হা পরমেশ!
নিমেষে নিমেষে ফুরাইয়া আসে সম্বল যা' ছিল কিছু,
আমরা সবাই বৃথা ছুটে যাই আলেয়ার পিছু-পিছু!
নিবিড় সাধনে আকুল রোদনে বরষ বাধা না মানে,
আপনার মনে বেগে-চ'লে যায় অজানিত পথ-পানে!
দু'ফোঁটা অশ্রু নাহি ঝরে কভু, ভুলা'তে ব্যথিত-ব্যথা,
নাহি ফোটে হাসি অধর-প্রান্তে শুনি' কারো সুখ-কথা।
জগতের সব হরষ-বিষাদে স্থির অচঞ্চল রহি'—
আর্য্য ঋষির মতন কেবল বরষ যেতেছে বহি'!
বিশ্ব তোমার তপোবন কি গো, হে সৌম্য হে মহান্,
কার আশা চেয়ে অনন্য-হৃদয়ে করিতেছ এ ধেয়ান?
কেবা সে বিরাট দেবতা তোমার, কেবা সে পূজ্য তব?
সমুদ্র যাত্রী পথিক আমরা, তাঁরে কি দেখিতে পাব?
যা কিছু মোদের দিয়েছ আদরে যা-কিছু নিয়েছ হরি
হে বরষ, আজি শেষ মুহূর্ত্তে সাশ্রুনয়নে স্মরি!
বুঝিতেছি এবে কিছুই মোদের হয়নি ব্যর্থ কভু,
সকলি তোমার মঙ্গল-ক্রোড়ে পাইয়াছে ঠাঁই প্রভু!
নিঠুরের মতো কেমনে তোমায় দিব গো বিদায় আজ! নিখিল তেয়াগি এসো হে রাজন্, আমাদেরি হৃদি-মাঝ! হেথা হবে তব পূত রাজধানী—হেথা হবে তব ঘর, সিন্ধু-যাত্রী পথিক আমরা, সখা তব, নহি 'পর'!

শ্রীননীবালা দেবী

বামাবোধিনী পত্রিকা

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ কর্ত্তৃক

প্রবর্ত্তিত

৫২ বর্ষ

১৩২২ সাল

(বৈশাখ হইতে চৈত্র)

বামাবোধিনী-কার্য্যালয়

৩৯ নং এণ্টনিবাগান লেন, কলিকাতা

বার্ষিক মূল্য ২৸৴০ ; ষাণ্মাসিক মূল্য ১৸০

বর্ণানুক্রমিক বর্ষসূচী

১৩২২ সাল, ৫২ বর্ষ

Bamabodhini Patrika, No. 632. Registered No. C-[illegible] April 1916.

৬, সিমলা ষ্ট্রীট, প্যারাগন প্রেস হইতে শ্রীবিষ্ণুপদ হাজরা দ্বারা মুদ্রিত

এবং

৩৯, আন্টনিবাগান লেন হইতে শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।